মুসলিম বিশ্বের সুবিখ্যাত ও তথ্যনির্ভর অনন্য আকাইদ গ্রন্থ "শরহুল আকাইদিন নাসাফিয়্যাহ"
এর অনন্য ব্যাখ্যাগ্রন্থ

সহজ শরহে আকাইদ

আরবী—বাংলা

بَيَانُ الْفَوَائِدِ فِىْ حَلِّ شَرْحِ الْعَقَائِدِ

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে

মাওলানা মুজিবুল্লাহ কাসেমী রচিত

বয়ানুল ফাওয়াইদ অবলম্বনে

সহজ তরজমা, তাহকীক ও তাশরীহ

সহযোগীতায়

মুফতী মুহাম্মদ ফয়জুল্লাহ

হাফেয মাওলানা আইউবুর রহমান

সম্পাদনা

হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান

শায়খুল হাদীস

মাদরাসা দারুর রাশাদ, মিরপুর-১২, ঢাকা।

আল-কাউসার প্রকাশনী

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ফোনঃ ৭১৬৫৪৭৭

পাঠক বন্ধু মার্কেট ৫০ বাংলাবাজার ঢাকা। মোবাঃ ০১৭১৬ ৮৫৭৭২৮

প্রকাশক
মুহাম্মদ ব্রাদার্স
২১৭, ব্লক-ত মিরপুর-১২,
ঢাকা।

প্রকাশকাল
রবিউসসানী ১৪২৮ হিজরী

মূল্য **৫০০ টাকা মাত্র**

অক্ষর বিন্যাস
আল-কাউসার কম্পিউটার্স
মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

মুদ্রণ
মেসার্স জননী প্রিন্টার্স
বাংলাবাজার, ঢাকা।

প্রসঙ্গ কথা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّي عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ

এ কথা নিশ্চিত যে ছহীহ ঈমান আকীদাই হল পরকালের একমাত্র নাজাতের ওছিলা। তাই সমস্ত মুসলমানের জন্য ছহীহ ঈমান ও আকীদা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করে তদানুযায়ী দৃঢ় থাকা এবং ছহীহ ঈমান আকীদাকে পরকালের একমাত্র পাথেয় হিসাবে বেছে নেওয়া অত্যন্ত জরুরী। আর ছহীহ ঈমান আকীদার মূল উৎস হল কিতাবুল্লাহ ও সুন্নতে রাসূল। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তার সাহাবীগণের মত ও পথের উপর অটল ও অনড় ব্যক্তিদেরই নাম করণ করা হয়েছে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত।

ইলমুল আকায়েদ বা ছহীহ ঈমান আকীদা সম্পর্কে সর্বপ্রথম "আল–ফিকহুল আকবর" নামে একটি বিরল কিতাব লিখেন ইমামে আযম আবু হানীফা রহ.। পরবর্তীতে অনেকেই এ সম্পর্কে অনেক কিতাবাদি লিখেছেন, আজ থেকে প্রায় এগারশত বৎসর পূর্বে শাইখ নাজমুদ্দীন উমর বিন মুহাম্মদ নাসাফী রহ. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা সম্পর্কে " মতনুল আকাইদিন নাসাফিয়্যাহ্' রচনা করেন এবং পরবর্তীতে আল্লামা সা'দুদ্দীন মাসঈদ বিন উমর তাফতাযানী রহ. শরহুল আকাইদিন নাসাফিয়্যাহ নামে উক্ত রচনাটির বিস্তারিত ব্যখ্যা বিশ্লেষন পেশ করেন। গ্রন্থটি মুসলিম বিশ্বের উলামা মাশায়েখদের কাছে সর্বাধিক জনপ্রিয়তা লাভ করে। ভারত উপমহাদেশে কিতাবটি সকল মাদরাসার নেছাবভূক্ত এবং দারুল উলূম দেওবন্দর এর মুহাদ্দিস মাওলানা মুজিবুল্লাহ কাসেমী সাহেব বয়ানুল ফাওয়াইদ নামে উর্দূ ভাষায় কিতাবটির সহজ তরজমা, তাহকীক ও তাশরীহ পেশ করেন।

ইতোমধ্যে বাংলা ভাষায়ও কিতাবটির দুএকটি অনুবাদ বা ব্যাখ্যা গ্রন্থ বের হয়েছে তবে কোন কোন অনুবাদ খুবই সংক্ষিপ্ত আবার কোন কোনটি মূল কিতাবকে সামনে রেখে করা হয়েছে স্বতন্ত্র রচনা। তাই আমরা উপরোক্ত উর্দু শরাহটিকে সামনে রেখে কিতাবটির একটি সহজ ও সরল অনুবাদ ও ব্যাখ্যা গ্রন্থ প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করি, আর এ কাজ আঞ্জাম দেওয়ার জন্য দায়িত্ব প্রদান করি আমার স্নেহস্পদ মুফতী মুহাম্মদ ফয়জুল্লাহ ও হাফেয মাওলানা আইউবুর রহমানকে।

আমাদের বিশ্বাস ইলমে আকায়েদ তথা ছহীহ ঈমান আকীদা সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে সংকলনটি বিশেষভাবে সহায়ক হবে ইনশাআল্লাহ। আর কিতাবটি সংকলনের ক্ষেত্রে যে সব ব্যাপারে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে সেগুলো হল ঃ

- কিতাবের শুরুতে " মতনুল আকাইদিন নাসাফিয়্যাহ্' পেশ করা হয়েছে।
- কিতাবে শুরুতে কিতাবের বিষয় ও লিখকপরিচিতি পেশ করা হয়েছে।
- কিতাবের শুরুতে একটি বিস্তারিত সূচী পেশ করা হয়েছে।
- প্রতি বিষয়ের জন্য মূল কিতাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ শিরোনাম সংযোজন করা হয়েছে।
- মূল কিতাবের সহজ ও সরল অনুবাদ পেশ করা হয়েছে।
- মূল ইবারত হল কারার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পেশ করা হয়েছে।
- আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত বা মুক্তিপ্রাপ্ত দলসমূহের পরিচয় এবং ৭২টি ভ্রান্ত দলের বিবরণ পেশ করা হয়েছে।
- কিতাবে শেষাংশে স্বদেশী ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের বিভ্রান্তি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ সংযোজন করা হয়েছে।

পরিশেষে এ কাজে যারা আমাকে সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলের কাছে আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। কিতাবটির অনুবাদ ও বিশ্লেষণে কোন ভুল-ভ্রান্তি পরিলক্ষিত হলে বা কিতাবটির মানোন্নয়নের ব্যাপারে কোন সুপরামর্শ থাকলে তা আমাদের জানালে কৃতজ্ঞ হব এবং পরবর্তী সংস্করণে সুধরিয়ে নিব ইনশাআল্লাহ।

মাদরাসা দারুর রাশাদ
মীরপুর –১২ পল্লবী ঢাকা।

আরজ গুজার
মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

দ্বিতীয়খণ্ড সমাপ্ত

দেশীয় ভ্রান্ত দলসমূহের পরিচয়

مَتْنُ الْعَقَائِدِ لِلْعُمَرَ النَّسَفِي رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قَالَ اَهْلُ الْحَقِّ حَقَايِقُ الْاَشْيَاءِ ثَابِتَةٌ وَالْعِلْمُ بِهَا مُتَحَقِّقٌ خِلَافًا لِلسُّوفَسْطَائِيَّةِ وَاَسْبَابُ الْعِلْمِ لِلْخَلْقِ ثَلٰثَةٌ اَلْحَوَاسُّ السَّلِيْمَةُ وَالْخَبَرُ الصَّادِقُ وَالْعَقْلُ فَالْحَوَاسُّ خَمْسٌ اَلسَّمْعُ وَالْبَصَرُ وَالشَّمُّ وَالذَّوْقُ وَاللَّمْسُ وَبِكُلِّ حَاسَّةٍ مِنْهَا تَوَقُّفٌ عَلٰى مَا وُضِعَتْ هِيَ لَهٗ وَالْخَبَرُ الصَّادِقُ عَلٰى نَوْعَيْنِ اَحَدُهُمَا اَلْخَبَرُ الْمُتَوَاتِرُ وَهُوَ الْخَبَرُ الثَّابِتُ عَلٰى اَلْسِنَةِ قَوْمٍ لَا يُتَصَوَّرُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكِذْبِ وَهُوَ مُوجِبٌ لِلْعِلْمِ الضَّرُوْرِيِّ كَالْعِلْمِ بِالْمُلُوْكِ الْخَالِيَةِ فِي الْاَزْمِنَةِ الْمَاضِيَةِ وَالْبُلْدَانِ النَّائِيَةِ - اَلنَّوْعُ الثَّانِي خَبَرُ الرَّسُوْلِ الْمُؤَيَّدُ بِالْمُعْجِزَةِ وَهُوَ يُوْجِبُ الْعِلْمَ الْاِسْتِدْلَالِيَّ وَالْعِلْمُ الثَّابِتُ بِهٖ اَيْضًا هِيَ الْعِلْمُ الثَّابِتُ بِالضَّرُوْرَةِ فِي التَّيَقُّنِ اَمَّا الْعَقْلُ فَهُوَ سَبَبٌ لِلْعِلْمِ اَيْضًا وَمَا ثَبَتَ مِنْهُ بِالْبَدَاهَةِ فَهُوَ ضَرُوْرِيٌّ كَالْعِلْمِ بِاَنَّ كُلَّ الشَّيْءِ اَعْظَمُ مِنْ جُزْئِهٖ وَمَا ثَبَتَ مِنْهُ بِالْاِسْتِدْلَالِ فَهُوَ كَسْبِيٌّ- وَالْاِلْهَامُ لَيْسَ مِنْ اَسْبَابِ الْمَعْرِفَةِ بِصِحَّةِ الشَّيْءِ عِنْدَ اَهْلِ الْحَقِّ

وَالْعَالَمُ بِجَمِيْعِ اَجْزَائِهٖ مُحْدَثٌ اِذْ هُوَ اَعْيَانٌ وَاَعْرَاضٌ فَالْاَعْيَانُ مَا يَكُوْنُ لَهٗ قِيَامٌ بِذَاتِهٖ وَهُوَ اِمَّا مُرَكَّبٌ وَهُوَ الْجِسْمُ اَوْ غَيْرُ مُرَكَّبٍ كَالْجَوْهَرِ وَهُوَ الْجُزْءُ الَّذِي لَا يَتَجَزّٰى وَالْعَرَضُ مَا لَا يَقُوْمُ بِذَاتِهٖ وَيَحْدُثُ فِي الْاَجْسَامِ وَالْجَوَاهِرِ كَالْاَلْوَانِ وَالْاَكْوَانِ وَالطُّعُوْمِ وَالرَّوَايِحِ وَالْمُحْدِثُ لِلْعَالَمِ هُوَ اللّٰهُ تَعَالٰى الْوَاحِدُ الْقَدِيْمُ الْقَادِرُ الْحَيُّ الْعَلِيْمُ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ الشَّائِيَ الْمُرِيْدُ لَيْسَ بِعَرَضٍ وَلَاجِسْمٍ وَلَاجَوْهَرٍ وَلَامُصَوَّرٍ وَلَامَحْدُوْدٍ وَلَامَعْدُوْدٍ وَلَامُتَبَعِّضٍ وَلَامُتَجَزٍّ وَلَامُتَرَكِّبٍ وَلَامُتَنَاهٍ وَلَايُوْصَفُ بِالْمَائِيَّةِ وَلَابِالْكَيْفِيَّةِ وَلَايَتَمَكَّنُ فِيْ مَكَانٍ وَلَايَجْرِيْ عَلَيْهِ زَمَانٌ وَلَايُشْبِهُهٗ شَيْءٌ وَلَايَخْرُجُ عَنْ عِلْمِهٖ وَقُدْرَتِهٖ شَيْءٌ

وَلَهٗ صِفَاتٌ اَزَلِيَّةٌ قَائِمَةٌ بِذَاتِهٖ وَهِيَ لَاهُوَ وَلَاغَيْرُهٗ وَهِيَ الْعِلْمُ وَالْقُدْرَةُ وَالْحَيٰوةُ وَالسَّمْعُ وَالْبَصَرُ وَالْاِرَادَةُ وَالْمَشِيَّةُ وَالْفِعْلُ وَالتَّخْلِيْقُ وَالتَّرْزِيْقُ وَالْكَلَامُ وَهُوَ مُتَكَلِّمٌ بِكَلَامٍ هُوَ صِفَةٌ لَهٗ اَزَلِيَّةٌ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الْحُرُوْفِ وَالْاَصْوَاتِ وَهُوَ صِفَةٌ مُنَافِيَةٌ لِلسُّكُوْتِ وَالْاٰفَةِ وَاللّٰهُ تَعَالٰى مُتَكَلِّمٌ بِهَا اٰمِرٌ نَاهٍ مُخْبِرٌ

وَالْقُرْاٰنُ كَلَامُ اللّٰهِ تَعَالٰى غَيْرُ مَخْلُوْقٍ وَهُوَ مَكْتُوْبٌ فِيْ مَصَاحِفِنَا مَحْفُوْظٌ فِيْ قُلُوْبِنَا

مَقْرُوْءٌ بِاَلْسِنَتِنَا مَسْمُوْعٌ بِآذَانِنَا غَيْرُ حَالٍّ فِيْهَا وَالتَّكْوِيْنُ صِفَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى اَزَلِيَّةٌ
وَهُوَ تَكْوِيْنُهُ لِلْعَالَمِ وَلِكُلِّ جُزْءٍ مِنْ اَجْزَائِهِ وَقْتَ لِوُجُوْدِهٖ وَهُوَ غَيْرُ الْمُكَوَّنِ عِنْدَنَا
وَالْاِرَادَةُ صِفَةٌ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَزَلِيَّةٌ قَائِمَةٌ بِذَاتِهٖ

وَرُؤْيَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى جَائِزَةٌ فِى الْعَقْلِ وَاجِبَةٌ بِالنَّقْلِ وَرَدَ الدَّلِيْلُ السَّمْعِىُّ بِاِيْجَابِ رُؤْيَةِ
اللّٰهِ تَعَالٰى فِىْ دَارِ الْاٰخِرَةِ فَيُرٰى لَا فِىْ مَكَانٍ وَلَا عَلٰى جِهَةٍ وَمُقَابَلَةٍ وَاتِّصَالِ شُعَاعٍ
وَثُبُوْتِ مَسَافَةٍ بَيْنَ الرَّائِىْ وَبَيْنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَاللّٰهُ تَعَالٰى خَالِقٌ لِاَفْعَالِ الْعِبَادِ مِنَ
الْكُفْرِ وَالْاِيْمَانِ وَالطَّاعَةِ وَالْعِصْيَانِ وَهِىَ كُلُّهَا بِاِرَادَتِهٖ وَمَشِيَّتِهٖ وَحُكْمِهٖ وَقَضِيَّتِهٖ
وَتَقْدِيْرِهٖ وَلِلْعِبَادِ اَفْعَالٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ يُثَابُوْنَ بِهَا وَيُعَاقَبُوْنَ عَلَيْهَا وَالْحَسَنُ مِنْهَا
بِرِضَاءِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْقَبِيْحُ مِنْهَا لَيْسَ بِرِضَائِهٖ ۔ وَالْاِسْتِطَاعَةُ مَعَ الْفِعْلِ وَهِىَ حَقِيْقَةُ
الْقُدْرَةِ الَّتِىْ يَكُوْنُ بِهَا الْفِعْلُ وَيَقَعُ هٰذَا الْاِسْمُ عَلٰى سَلَامَةِ الْاَسْبَابِ وَالْاٰلَاتِ وَالْجَوَارِحِ
وَصِحَّةُ التَّكْلِيْفِ تَعْتَمِدُ عَلٰى هٰذِهِ الْاِسْتِطَاعَةِ وَلَا يُكَلَّفُ الْعَبْدُ بِمَا لَيْسَ فِىْ وُسْعِهٖ
وَمَا يُوْجَدُ مِنَ الْاَلَمِ فِى الْمَضْرُوْبِ عَقِيْبَ ضَرْبِ اِنْسَانٍ وَالْاِنْكِسَارِ فِى الزُّجَاجِ عَقِيْبَ
كَسْرِ اِنْسَانٍ وَمَا اَشْبَهَهٗ كُلُّ ذٰلِكَ مَخْلُوْقُ اللّٰهِ تَعَالٰى لَا صُنْعَ لِلْعَبْدِ فِىْ تَخْلِيْقِهٖ
وَالْمَقْتُوْلُ مَيِّتٌ بِاَجَلِهٖ وَالْمَوْتُ قَائِمٌ بِالْمَيِّتِ مَخْلُوْقُ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْاَجَلُ وَاحِدٌ وَالْحَرَامُ
رِزْقٌ ۔ وَكُلٌّ يَسْتَوْفِىْ رِزْقَ نَفْسِهٖ حَلَالًا كَانَ اَوْ حَرَامًا وَلَا يُتَصَوَّرُ اَنْ لَّا يَاْكُلَ اِنْسَانٌ رِزْقَهٗ
اَوْ يَاْكُلَ غَيْرُهٗ رِزْقَهٗ

وَاللّٰهُ تَعَالٰى يُضِلُّ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ وَمَا هُوَ الْاَصْلَحُ لِلْعَبْدِ فَلَيْسَ ذٰلِكَ
بِوَاجِبٍ عَلَى اللّٰهِ تَعَالٰى ۔ وَعَذَابُ الْقَبْرِ لِلْكَافِرِيْنَ وَلِبَعْضِ عُصَاةِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَتَنْعِيْمُ
اَهْلِ الطَّاعَةِ فِى الْقَبْرِ وَسُؤَالُ مُنْكَرٍ وَنَكِيْرٍ ثَابِتٌ بِالدَّلَائِلِ السَّمْعِيَّةِ وَالْبَعْثُ حَقٌّ
وَالْوَزْنُ حَقٌّ وَالْكِتَابُ حَقٌّ وَالسُّؤَالُ حَقٌّ وَالْحَوْضُ حَقٌّ وَالصِّرَاطُ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ
وَهُمَا مَخْلُوْقَتَانِ مَوْجُوْدَتَانِ بَاقِيَتَانِ لَا تَفْنِيَانِ وَلَا يَفْنٰى اَهْلُهُمَا ۔ وَالْكَبِيْرَةُ لَا تُخْرِجُ
الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ مِنَ الْاِيْمَانِ وَلَا تُدْخِلُهٗ فِى الْكُفْرِ وَاللّٰهُ تَعَالٰى لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ
وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ مِنَ الصَّغَائِرِ وَالْكَبَائِرِ وَيَجُوْزُ الْعِقَابُ عَلَى الصَّغِيْرَةِ
وَالْعَفْوُ عَنِ الْكَبِيْرَةِ اِذَا لَمْ تَكُنْ عَنِ الْاِسْتِحْلَالِ وَالْاِسْتِحْلَالُ كُفْرٌ ۔ وَالشَّفَاعَةُ ثَابِتَةٌ

لِلرُّسُلِ وَالْإِخْتِيَارُ فِى حَقِّ اَهْلِ الْكَبَائِرِ. وَاَهْلُ الْكَبَائِرِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَايَخْلُدُوْنَ فِى النَّارِ- وَالْاِيْمَانُ هُوَ التَّصْدِيْقُ بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَالْاِقْرَارُ بِهٖ فَاَمَّا الْاَعْمَالُ فَهِىَ تَتَزَايَدُ فِى نَفْسِهَا وَالْاِيْمَانُ لَا يَزِيْدُ وَلَا يَنْقُصُ . وَالْاِيْمَانُ وَالْاِسْلَامُ وَاحِدٌ وَاِذَا وُجِدَ مِنَ الْعَبْدِ التَّصْدِيْقُ وَالْاِقْرَارُ صَحَّ لَهٗ اَنْ يَّقُوْلَ اَنَا مُؤْمِنٌ حَقًّا وَلَا يَنْبَغِى اَنْ يَّقُوْلَ اَنَا مُؤْمِنٌ اِنْ يَشَاءُ اللّٰهُ وَالسَّعِيْدُ قَدْ يَشْقٰى وَالشَّقِىُّ قَدْ يَسْعَدُ وَالتَّغَيُّرُ يَكُوْنُ عَلَى السَّعَادَةِ وَالشَّقَاوَةِ دُوْنَ الْاِسْعَادِ وَالْاِشْقَاءِ وَهُمَا مِنْ صِفَاتِ اللّٰهِ وَلَاتَغَيُّرَ عَلَى اللّٰهِ تَعَالٰى وَلَا عَلٰى صِفَاتِهٖ . وَفِى اِرْسَالِ الرُّسُلِ حِكْمَةٌ وَقَدْ اَرْسَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى رُسُلًا مِنَ الْبَشَرِ اِلَى الْبَشَرِ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ وَمُبَيِّنِيْنَ لِلنَّاسِ مَا يَحْتَاجُوْنَ اِلَيْهِ مِنْ اُمُوْرِ الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا وَاَيَّدَهُمْ بِالْمُعْجِزَاتِ النَّاقِضَاتِ لِلْعَادَاتِ

وَاَوَّلُ الْاَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ آدَمُ وَاٰخِرُهُمْ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ وَقَدْرُوِىَ بَيَانُ عَدَدِهِمْ فِىْ بَعْضِ الْاَحَادِيْثِ وَالْاَوْلٰى اَنْ لَا يُقْتَصَرَ عَلٰى عَدَدٍ فِى التَّسْمِيَةِ وَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَلَايُؤْمَنُ فِىْ ذِكْرِ الْعَدَدِ اَنْ يَدْخُلَ فِيْهِمْ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ اَوْ يَخْرُجَ مِنْهُمْ مَنْ هُوَ فِيْهِمْ وَكُلُّهُمْ كَانُوْا مُخْبِرِيْنَ مُبَلِّغِيْنَ عَنِ اللّٰهِ تَعَالٰى صَادِقِيْنَ نَاصِحِيْنَ . وَاَفْضَلُ الْاَنْبِيَاءِ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ. وَالْمَلَائِكَةُ عِبَادُ اللّٰهِ الْعَامِلُوْنَ بِاَمْرِهٖ وَلَايُوْصَفُوْنَ بِذُكُوْرَةٍ وَلَا اُنُوْثَةٍ وَلِلّٰهِ تَعَالٰى كُتُبٌ اَنْزَلَهَا عَلٰى اَنْبِيَائِهٖ وَبَيَّنَ فِيْهَا اَمْرَهٗ وَنَهْيَهٗ وَوَعْدَهٗ وَوَعِيْدَهٗ . وَالْمِعْرَاجُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ فِى الْيَقْظَةِ بِشَخْصِهٖ اِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ اِلٰى مَاشَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى مِنَ الْعُلٰى حَقٌّ . وَكَرَامَاتُ الْاَوْلِيَاءِ حَقٌّ فَيَظْهَرُ الْكَرَامَةُ عَلٰى طَرِيْقِ نَقْضِ الْعَادَةِ لِلْوَلِيِّ مِنْ قَطْعِ الْمَسَافَةِ الْبَعِيْدَةِ فِى الْمُدَّةِ الْقَلِيْلَةِ وَظُهُوْرِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَاللِّبَاسِ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَالْمَشْىِ عَلَى الْمَاءِ وَفِى الْهَوَاءِ وَكَلَامِ الْجَمَادِ وَالْعَجْمَاءِ اَوْ غَيْرِ ذٰلِكَ مِنَ الْاَشْيَاءِ وَيَكُوْنُ ذٰلِكَ مُعْجِزَةً لِلرَّسُوْلِ الَّذِىْ ظَهَرَتْ هٰذِهِ الْكَرَامَةُ لِوَاحِدٍ مِنْ اُمَّتِهٖ لِاَنَّهٗ يَظْهَرُ بِهَا اَنَّهٗ وَلِىٌّ وَلَنْ يَّكُوْنَ وَلِيًّا اِلَّا وَاَنْ يَّكُوْنَ مُحِقًّا فِىْ دِيَانَتِهٖ وَدِيَانَتُهُ الْاِقْرَارُ بِرِسَالَةِ رَسُوْلِهٖ . وَاَفْضَلُ الْبَشَرِ بَعْدَ نَبِيِّنَا اَبُوْ بَكْرِ الصِّدِّيْقُ ثُمَّ عُمَرُ الْفَارُوْقُ ثُمَّ عُثْمَانُ ذِى النُّوْرَيْنِ ثُمَّ عَلِىٌّ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ وَخِلَافَتُهُمْ عَلٰى هٰذَا التَّرْتِيْبِ اَيْضًا

وَالْخِلَافَةُ ثَلٰثُوْنَ سَنَةً ثُمَّ بَعْدَهَا مُلْكٌ وَإِمَارَةٌ وَالْمُسْلِمُوْنَ لَابُدَّ لَهُمْ مِنْ إِمَامٍ يَقُوْمُ بِتَنْفِيْذِ اَحْكَامِهِمْ وَاِقَامَةِ حُدُوْدِهِمْ وَسَدِّ ثُغُوْرِهِمْ وَتَجْهِيْزِ جُيُوْشِهِمْ وَاَخْذِ صَدَقَاتِهِمْ وَقَهْرِ الْمُتَغَلِّبَةِ وَالْمُتَلَصِّصَةِ وَقُطَّاعِ الطَّرِيْقِ وَاِقَامَةِ الْجُمَعِ وَالْاَعْيَادِ وَقَطْعِ الْمُنَازَعَاتِ الْوَاقِعَةِ بَيْنَ الْعِبَادِ وَقَبُوْلِ الشَّهَادَاتِ الْقَائِمَةِ عَلَى الْحُقُوْقِ وَتَزْوِيْجِ الصِّغَارِ وَالصَّغَائِرِ الَّذِيْنَ لَا اَوْلِيَاءَ لَهُمْ وَقِسْمَةِ الْغَنَائِمِ ثُمَّ يَنْبَغِيْ اَنْ يَّكُوْنَ الْاِمَامُ ظَاهِرًا لَامُخْتَفِيًا وَلَا مُنْتَظَرًا وَ يَكُوْنُ مِنْ قُرَيْشٍ وَلَا يَجُوْزُ مِنْ غَيْرِهِمْ وَلَا يَخْتَصُّ بِبَنِيْ هَاشِمٍ وَاَوْلَادِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْاِمَامِ اَنْ يَّكُوْنَ مَعْصُوْمًا وَلَا اَنْ يَّكُوْنَ اَفْضَلَ مِنْ اَهْلِ زَمَانِهٖ وَيُشْتَرَطُ اَنْ يَّكُوْنَ مِنْ اَهْلِ الْوِلَايَةِ الْمُطْلَقَةِ سَائِسًا قَادِرًا عَلٰى تَنْفِيْذِ الْاَحْكَامِ وَحِفْظِ حُدُوْدِ دَارِالْاِسْلَامِ وَاِنْصَافِ الْمَظْلُوْمِ مِنَ الظَّالِمِ وَلَا يَنْعَزِلُ الْاِمَامُ بِالْفِسْقِ وَالْجُوْرِ وَتَجُوْزُ الصَّلٰوةُ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ وَيُكَفُّ عَنْ ذِكْرِ الصَّحَابَةِ اِلَّا بِخَيْرٍ وَنَشْهَدُ بِالْجَنَّةِ لِلْعَشَرَةِ الْمُبَشَّرَةِ الَّذِيْنَ بَشَّرَهُمُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَنَرٰى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ وَلَا نُحَرِّمُ نَبِيْذَ التَّمْرِ ۔ وَلَا يَبْلُغُ وَلِيٌّ دَرَجَةَ الْاَنْبِيَاءِ ۔ وَلَا يَصِلُ الْعَبْدُ اِلٰى حَيْثُ يَسْقُطُ عَنْهُ الْاَمْرُ وَالنَّهْيُ وَالنُّصُوْصُ تُحْمَلُ عَلٰى ظَوَاهِرِهَا وَالْعُدُوْلُ عَنْهَا اِلٰى مَعَانٍ يَدَّعِيْهَا اَهْلُ الْبَاطِنِ اِلْحَادٌ بِكُفْرٍ ۔ وَرَدُّ النُّصُوْصِ كُفْرٌ وَاسْتِحْلَالُ الْمَعْصِيَةِ كُفْرٌ وَالْاِسْتِهَانَةُ بِهَا كُفْرٌ وَالْاِسْتِهْزَاءُ عَلَى الشَّرِيْعَةِ كُفْرٌ وَالْيَأْسُ مِنَ اللّٰهِ كُفْرٌ وَالْاَمْنُ مِنَ اللّٰهِ كُفْرٌ وَتَصْدِيْقُ الْكَاهِنِ بِمَا يُخْبِرُهٗ عَنِ الْغَيْبِ كُفْرٌ ۔ وَالْمَعْدُوْمُ لَيْسَ بِشَيْءٍ ۔ وَفِيْ دُعَاءِ الْاَحْيَاءِ لِلْاَمْوَاتِ وَصَدَقَتِهِمْ عَنْهُمْ نَفْعٌ لَهُمْ ۔ وَاللّٰهُ تَعَالٰى يُجِيْبُ الدَّعَوَاتِ وَيَقْضِي الْحَاجَاتِ ۔ وَمَا اَخْبَرَ بِهِ النَّبِيُّ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ مِنْ خُرُوْجِ الدَّجَّالِ وَدَابَّةِ الْاَرْضِ وَيَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ وَنُزُوْلِ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ السَّمَآءِ وَطُلُوْعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا فَهُوَ حَقٌّ وَالْمُجْتَهِدُ قَدْ يُخْطِئُ وَقَدْ يُصِيْبُ ۔ وَرُسُلُ الْبَشَرِ اَفْضَلُ مِنْ رُسُلِ الْمَلَائِكَةِ وَرُسُلُ الْمَلَائِكَةِ اَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ الْبَشَرِ وَعَامَّةُ الْبَشَرِ اَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ الْمَلَائِكَةِ ۔

কিতাবের বিষয় পরিচিতি

ইলমুল আকাইদ

عقائد (আকাইদ) শব্দটি عقيدة এর বহুবচন। عقيده বলা হয়, ইয়াকীন বা মনের দৃঢ় বিশ্বাসকে। পরিভাষায় ইলমুল আকায়েদ হল–

هوعلم يقتدر به على اثبات العقائد الدينية بايراد الحجج عليها ودفع الشبهة عنها .

"ইলমে আকাইদ এমন এক জ্ঞান অর্জন করার নাম, যা দ্বারা দলীল-প্রমাণাদি স্থাপন করার মাধ্যমে দ্বীনী আকীদাসমূহকে প্রমাণ এবং তার সকল সংশয়-সন্দেহ দূর করা যায়। ইলমে আকাইদকে ইলমে কালামও বলা হয়।

উদ্দেশ্য

ইলমে আকাইদের উদ্দেশ্য হল, সহীহ আকীদার জ্ঞান অর্জন করতঃ ভ্রান্ত আকীদা হতে নিজেকে রক্ষা করা এবং ভ্রান্ত আকীদাকে দলীল-প্রমাণ দ্বারা খণ্ডন করে সমাজ ও জাতিকে তা হতে মুক্ত রাখার চেষ্টা করা।

আলোচ্য বিষয়

মুতাকাদ্দেমীন উলামায়ে কিরামের মতে ইল্‌মে কালামের আলোচ্য বিষয় হল, আল্লাহ তা'আলার জাত ও ছিফাত তথা তাঁর সত্তা ও গুণাবলী। আর মুতাআখ্‌খিরীন উলামায়ে কিরামের মতে ইলমে আকাইদের আলোচ্য বিষয় হল, দ্বীনী আকীদা ও বিশ্বাসসমূহ।

ইলমুল আকাইদ এর পাঠ্যকিতাবঃ ✪ আকীদাতুত ত্বহাবী ✪ শরহুল্‌ আকাইদ।

আকায়েদে নাসাফী -এর মুসান্নিফ

উমর ইবনে মুহাম্মদ নাসাফী রহ.

জন্ম ও বংশ ঃ নাম উমর। কুনিয়াত আবু হাফস। লকব মুফতীয়ের সাকালাইন ও নাজমুদ্দীন। পিতার নাম মুহাম্মদ। নাসাফ শহরে ৪৬১ হিজরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

ইলম অর্জন ঃ তিনি ছিলেন সমকালের সর্বশ্রেষ্ঠ আলিম, হাদীসবিদ, সাহিত্যিক, মুফাসসির, উছূলবিদ, ফিকহ ও ব্যাকরণবিদ। হাফেযদের মধ্যেও তিনি অন্যতম হাফেয ছিলেন। তিনি ফিকহ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন ছদরুল ইসলাম মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ বাযদবী থেকে। এছাড়াও যুগের আরও বড় বড় আলেম থেকে তিনি ইলম অর্জন করেন। তাঁর থেকে তাঁর পুত্র আবুল লায়িস আহমাদ নাসাফী, হিদায়া গ্রন্থকার এবং আরও অনেকে ইলম শিক্ষা করেন। তিনি জ্বিন-ইনসান উভয় জাতিকে ইলম শিক্ষা দিতেন। তাই তাঁকে মুফতীয়ে সাকালাইন বলা হত।

রচনাবলী ঃ তিনি ফিক্‌হ, তাফ্‌সীর ও ইতিহাস শাস্ত্রে একশত এর কাছাকাছি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল ✪ তাইসীর –এটি তাফসীর বিষয়ক সংকলন। ✪ কিতাবুল মাওয়াকীত। ✪ আল-আশআর। ✪ কিতাবুশ শুরুত। ✪ তোলাবাতুল তোলাবা। ✪ তারীখে বুখারা। ✪ আকায়েদে নাসাফী। ✪✪ ফাত্‌ওয়ায়ে নাসাফী।

ইন্তেকালঃ তিনি ৫৩৭ হিজরীতে সমরকন্দে ইন্তেকাল করেন।

আকায়েদে নাসাফীর শরাহ ঃ আকায়েদে নাসাফির অনেক শরাহ প্রকাশিত হয়েছে। বিশেষ কয়েকটি হলঃ ✪ 'শরহুল আকায়েদ'–ইসলামী আকিদা-বিশ্বাসের এটি একটি অন্যতম সংকলন। ✪ কলায়েদ আলা আকায়েদ। ✪ কওলী ওয়াফী। ✪ দুররাহ। ✪ হাল্লে মা'কিদ।

শরহুল আকায়েদ এর মুছান্নিফ

মাসউদ ইবনে উমর তাফতাফায়ানী রহ.

জন্ম ও বংশ ঃ নাম মাসউদ। লক্বব সা'দুদ্দীন। পিতার নাম উমর। লক্বব কাযী ফখরুদ্দীন। দাদার নাম আব্দুল্লাহ। লক্বব বুরহানুদ্দীন। তিনি ৭২২ হিজরীতে খোরাসানের তাফতাযান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রাথমিক অবস্থাঃ বাল্যকালে তাঁর মেধা দুর্বল ছিল। তথাপি সর্বদা তিনি লেখাপড়ার মধ্যে লেগে থাকতেন। একদিন স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে দু'আ পেয়ে তিনি প্রখর মেধাবী হয়ে উঠেন।

ইলমী খেদমত ঃ তিনি কুতুবুদ্দীন রাযী ও যুগ বরেণ্য আলেমদের থেকে ইলম অর্জন করেন। তিনি ছিলেন জ্ঞানের বিশ্বকোষ। শায়খ শামসুদ্দীন প্রমূখ ব্যক্তিত্ব তাঁর থেকে ইলমে দ্বীন শিক্ষা করেন। সৈয়দ আহমদ তাহতাভী বলেন, তাঁর যুগে হানাফী মাযহাবের প্রভাব খর্ব হয়ে গিয়েছিল। আল্লামা কাফাভী বলেন, জগদ্বাসী তাঁর মত জ্ঞানী কাউকে দেখেনি আর কাউকে দেখবেও না। তাঁর জ্ঞান-গবেষণা থেকে ঐ যামানার লোকেরা দলে দলে উপকৃত হয়েছে।

ইন্তেকাল ঃ তিনি ৭৯২ হিজরীতে সমরকন্দে ইন্তেকাল করেন। সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়।

রচনাবলী ঃ জ্ঞানার্জনের পর কর্মজীবনে অধ্যবসায়, অবসরে নাহু-ছরফ, মান্তিক, ফিকহ, উছূলে ফিক্হ, তাফসীর, হাদীস, আকায়েদ, বালাগাত প্রভৃতি শাস্ত্রে তিনি বহু কিতাব রচনা করেছেন। মাত্র ১৬ বছর বয়সে তিনি শরহে তাসরীফে যানজানী রচনা করেন। তাঁর পাঁচটি কিতাব মাদ্রাসার পাঠ্যভূক্ত। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, তিনি কত বড় লেখক ছিলেন। তিনি আরও অনেক কিতাব লিখেছেন। তম্মধ্যে প্রধান কয়েকটি হলঃ

✪ মুখতাছারুল মা'আনী। ✪ শরহে তাসরীফ ✪ মুতাওয়াল ✪ সা'দিয়াা তালবীহ ✪ শরহে আকায়েদ ✪ হাশিয়ায়ে শরহে মুখতাছারুল উছূল। মাকাছেদ। শরহে মাকাছেদ। তাহযীবুল মানতিক ওয়াল কালাম ✪ শরহে মিফতাহুল উলূম,✪ শরহে হাদীসে আরবাইন।

মুখতাছারুল মা'আনীর হাশিয়া ও শরাহ ঃ প্রখ্যাত আলিমগণ এ গ্রন্থের উপর ১৭টির অধিক হাশিয়া লিখেছেন। যেমন, ✪ হাশিয়ায়ে মুখতাছারুল মা'আনী –শেখ নিযামুদ্দীন খেতাবী। ✪ হাশিয়ায়ে মুখতাছারুল মা'আনী –শেখ অজিহুদ্দীন গুজরাহী। ✪ নায়লুল আনামী শরহে মুখতাছারুল মা'আনী –মাওঃ মুহাঃ হানীফ গঙ্গুহী।

শরহে আকায়েদের হাশিয়া ও শরাহ ঃ শরহে আকায়েদের উপর ৩২টির অধিক হাশিয়া রচিত হয়েছে। তম্মধ্যে উল্লেখযোগ্য ৩টি হলঃ ✪ হাশিয়ায়ে রমাযান আফিন্দী –শেখ রমাযান। ✪ ইকদুল কারায়েদ শরায়েহ আকায়েদ।

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের পরিচয়

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত পরিভাষাটি বর্তমানে বিকৃতির আবর্তে পড়ে ঘুরপাক খাচ্ছে। বলতে গেলে কম বেশী সবাই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের দাবীদার। অথচ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অন্তর্ভূক্ত হওয়ার জন্য যে সব গুণাবলী দরকার তা তাদের মধ্যে নেই। এ ছাড়া আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সঠিক পরিচয় জানা না থাকার কারণে, কারা আহলে সুন্নাতের অন্তর্ভূক্ত কারা অন্তর্ভুক্ত নয় ? তা জানা সম্ভব হয় না। সুতরাং সর্বপ্রথম আমাদের উচিত হবে তাদের পরিচয় জানা এবং সে অনুযায়ী চলার চেষ্টা করা। নিম্নে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পরিচয় তুলে ধরা হল।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের উৎস ঃ

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত এ পরিভাষাটির মূল উৎস হলো একটি হাদীস। হাদীসটি হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বনী ইসরাঈল বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল আর আমার উম্মত তেহাত্তর দলে বিভক্ত হবে। তন্মধ্যে একটি মাত্র দল ছাড়া সবাই দোযখে যাবে। একথা শোনে সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন। হে আল্লাহর রাসূল ঐ দলটি কারা ? উত্তরে নবীজী বললেন,

ما انا عليه وأصحابى

যে মতও পথের উপর আমি এবং আমার সাহাবারা আছি।

এ উত্তরটির দিকে গভীর ভাবে লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবেন যে, আসলে নবীজী আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের কথাই বলেছেন, তবে একথাটি বুঝার জন্য সামান্য বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। এখানে দেখুন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইঙ্গিত পূর্ণ দুটি শব্দ উল্লেখ করেছেন। একটি হলো أنا। দ্বিতীয়টি হলো أصحابى - أنا। অর্থ আমি এ শব্দটি বলে তিনি আপন সত্তাকে বুঝিয়েছেন। আর أصحاب বলে স্বীয় সাহাবাদেরকে বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি এবং সাহাবাগণ সত্য মিথ্যা পরখ করার মাপকাঠি। তবে এখানে রাসূলুল্লাহ ﷺএর সত্তা দ্বারা তাঁর সুন্নাতকেই বুঝানো হয়েছে। কারণ সুন্নাত বলা হয় এমন পন্থাকে যা রাসূলুল্লাহ ﷺ অবলম্বন করেছেন। চাই তা আকীদা সর্ম্পকীয় হোক। এতে বুঝা গেল রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সত্তার বিভিন্ন দিক হল সুন্নাতের আলোচ্য বিষয়। আর এখানে সাহাবা দ্বারা সাহাবাদের পুরো জামাতই উদ্দেশ্য। সুতরাং এখন أصحاب এবং أنا এর অর্থ দাঁড়ালো সুন্নাত এবং জামাত। এ অর্থটি হাদীসের দৃষ্টিকোণ থেকেও সঠিক, কারণ ماأنا عليه وأصحابى এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্য এক এক বর্ণনায় বলেছেন, من كان على السنة والجماعة অর্থাৎ যারা সুন্নাত এবং জামা'আতের উপর থাকে। এতে বুঝা যায় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত নামটি রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেই রেখেছেন।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পরিচয় জানার জন্য সংক্ষেপে দুটি জিনিস জেনে রাখা দরকার। একটি হল সুন্নাত, অর্থ ঐ সকল কথা বা কাজ যা রাসূলুল্লাহ ﷺ করেছেন বা বলেছেন। আবার কেউ কেউ বলেন সুন্নাত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কোরআন এবং হাদীসটি হল অপর জামাত এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, এ উম্মতের পূর্বতী নেককার লোকজন অর্থাৎ সাহাবা এবং তাবেঈণ গণ, যারা কোরআন হাদীসের প্রমাণ্য সৎকথার উপর স্থির ছিলেন। আর কেউ বলেছেন, জামাত দ্বারা ঐ সকল আহকাম বা বিধি-বিধান উদ্দেশ্য- যেগুলোর ব্যাপারে সাহাবাগণ চার খলীফার যুগে একমত হয়েছিলেন। সুতরাং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত এমন একটি দলের নাম যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সাহাবাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেন এবং তাদের ত্বরীকার উপর স্থির থাকেন, কোন ধরণের বেদআতে লিপ্ত হন না।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের উপরোক্ত সংজ্ঞায় রাসূল এবং সাহাবা উভয়ের ত্বরীকার উপর স্থির থাকার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং কেউ যদি শুধু রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ত্বরীকা মানে সাহবাদের ত্বরীকা না মানে, তবে সে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

উল্লেখ্য, হুজুরের নিকট সাহাবাদের প্রশ্ন ছিল মুক্তিকামী দল সম্পর্কে। সুতরাং এর পরিষ্কার উত্তর أنا وأصحابى হওয়া ছিল। অর্থাৎ ঐ দলটি আমি এবং আমার সাহাবা। কিন্তু তিনি সরাসরি এ উত্তর না দিয়ে ماأنا عليه وأصحابى, বলে উত্তর দিয়েছেন। এর কারণ হলো,

প্রশ্নকারীর উদ্দেশ্য নবীজীর যযুগের হক পন্থি কারা হবে তা নির্দিষ্ট করা। সুতরাং তিনি যদি হক পন্থি হওয়ার জন্য শুধু কোরআন সুন্নাহের অনুসরণকেই মাপকাঠি বানাতেন তাহলে এ উত্তরটি ঐ যুগটি র যথোপযুক্ত হত না, য যুগে বাতিল দলটি পর্যন্ত কোরআন সুন্নাহর অনুসারী হওয়ার দাবী করে। এজন্য তিনি এমন একটি পরীক্ষিত মূলনীতির শুধু কোরআন হাদীস নয়। বরং কোরআন হাদীসের ঐ বাস্তব চিত্র যা তিনি সাহাবাদের সামনে নমুনা হিসেবে পেশ করেছেন। আর সাহাবায়ে কিরাম তা দেখে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। এতে বুঝা যায় সাহাবাদের সামনে এক দিকে তাঁর অনুপম আদর্শ ছিল। অন্য দিকে তার বাস্তবচিত্র ছিল। এমতাবস্থায় প্রশ্নকারীর জন্য এর চেয়ে পরিষ্কার উত্তর আর কি হতে পারে? যারা তার কাছে সরল পথের খুঁজে আসতেন তাদেরকে তিনি হাত দিয়ে দেখিয়ে দিতেন এবং মুখে বলে দিতেন যে, সরল পথ এটিই। এজন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ মুক্তিকামী লোকদের নাম না নিয়ে তাদের ঐ সকল গুণাবলীর কথা উল্লেখ করেছেন, যা মুক্তিকামী দল নির্ণয়ে যুগে যুগে কাজে লাগবে।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বৈশিষ্টাবলী

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত ওরাই যাদের মধ্যে নিম্ন বর্ণিত দশটি বৈশিষ্ট থাকবে।

(১) শায়খাইন অর্থাৎ হযরত আবু বকর এবং হযরত ওমর রাযি. কে অন্য সাহাবীদের উপর প্রাধান্য দেওয়া।

(২) রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দুই জামাতাকে সম্মান করা।

(৩) দুই কেবলা অর্থাৎ কাবা এবং বাইতুল মুকাদ্দাসের কদর করা।

(৪) পরহেজগার এবং বাইতুল মুকাদ্দাসের কদর করা।

(৪) পরহেজগার এবং ফাসেক উভয় ব্যক্তির জানাযার নামায পড়া।

(৫) নেককার এবং ফাসেক উভয় ব্যক্তির জানাযার নামায পড়া।

(৬) ন্যায় পরায়ন এবং জালেম কোন বাদশার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করা।

(৭) উভয় পায়ের মোজার উপর মাসেহ করা।

(৮) তাকদীর তথা ভাল মন্দ আল্লাহর পক্ষ থেকে হওয়াকে বিশ্বাস করা।

(৯) নবীগণ এবং জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন সাহাবী ছাড়া অন্য কারো জন্য জান্নাত বা জাহান্নামের সাক্ষী না দেওয়া।

(১০) নামায এবং যাকাত এ দুইটি ফরজ আদায় করা।

উপরোক্ত বৈশিষ্টগুলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বড় নিদর্শন গুলোর কয়েকটি নতুবা এছাড়া তাদের আরো অনেক নিদর্শনাবলী রয়েছে।

ভ্রান্ত দল এবং তাদের পরিচয়

যে সমস্ত লোক আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিরোধী তারা সকলেই গোমরাহ। কারণ তারা শরী'আতের মূল নীতি বাদ দিয়ে নিজেরা নতুন মূল নীতি আবিস্কার করে। কোন কোন ক্ষেত্রে তারা কোরআন হাদীস মেনে নেয়। তারা শরী'আতকে নিজেদের আবিষ্কৃত মূলনীতি মানদণ্ডে বিচার করতে গিয়ে সম্পূর্ণ বিকৃত করে বসে। নিম্নে এমন কয়েকটি মৌলিক ভ্রান্ত দল এবং তাদের পরিচয় তুলে ধরা হল–

(১) রাওয়াফেজ ঃ এর অপর নাম হল যায়দিয়া। এটি এমন একটি দল যার অনুসারীরা স্বীয় নেতাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। তাদেরকে রাফেজী বলার কারণ হল, প্রথমে তারা হযরত আলী রাযি. এর পর পৌত্র যাইদ বিন আলীর হাতে বাই'আত গ্রহণ করে ছিলেন। পরে তারা তার নিকট আবেদন করেন যে, আপনি শাইখাইন অর্থাৎ হযরত আবু বকর রাযি. এবং ওমর রাযি. এর প্রতি ঘৃণা পোষণ করুন। কিন্তু তিনি তা অস্বীকার করেন। ফলে তারা তাকে ছেড়ে চলে যান।

বৈশিষ্টাবলী ঃ (১) তারা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ থাকে। (২) হযরত আলী রাযি. ব্যতীত সকল সাহাবীকে বিশেষত হযরত আবু বকর এবং হযরত ওমর রাযি. হযরত যুবাইর রাযি, কে গালমন্দ করে। (৩) হযরত আয়েশা রাযি. এর উপর হযরত ফাতেমা রাযি. কে প্রাধান্য দেয়। (৪) একিই শবেআদ তিন তালাক পতিত হওয়াকে অস্বীকার করে। (৫) নামাযের জন্য ইকামত এবং জামাত সুন্নাত হওয়াকে অস্বীকার করে। (৬) মৌজার উপর মাসেহ করাকে অস্বীকার করে। (৭) তারাবীর নামাযকে অস্বীকার করে। (৮) নামাযে দাঁড়িয়ে বাম হাতের উপর ডান হাত রাখাকে অস্বীকার করে। (৯) মাগরিবের নামাযের জন্য তড়ি ঘড়ি করাকে অস্বীকার করে। (১) রোজার ইফতারকে অস্বীকার করে।

(২) খাওয়ারেজ ঃ যে কোন এমন দলকে বলা হয়, যার অনুসারীরা এমন কোন হক পন্থি নেতার বিরুদ্ধাচরণ করে যার ব্যাপারে সবাই একমত। চাই এ ধরনের বিদ্রোহ সাহাবাদের যুগে হক পন্থী ইমামের বিরুদ্ধে হোক, বা সাহাবাদের পরে তাবেঈনদের বিরুদ্ধে হোক। সর্বপ্রথম এ রকম বিদ্রোহ হযরত আলী রাযি. এর সাথে করা হয়। তাও করেন এমন কিছু লোক যারা সিফফীনের যুদ্ধে তার সাথে শরীক ছিলেন।

বৈশিষ্টাবলী ঃ (১) কোন মুসলমান গোনাহ করলে তাকে কাফের বলে আখ্যায়িত করে। (২) অত্যাচারী বাদশার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বৈধ মনে করে। (৩) হযরত আলী রাযি. কে অভিশাপ দেয়। (৪) জামাত এবং নামাযের সুন্নাতকে অস্বীকার করে।

(৩) জাবারিয়া ঃ এটি জাহামিয়ার একটি শাখা দল। এরা বান্দার কাজকে সম্পূর্ণ রূপে অস্বীকার করে তাকে আল্লাহর দিকে ইঙ্গিত করে।

বৈশিষ্টাবলী ঃ

(১) এরা বান্দাকে মাটি এবং পাথরের ন্যায় একান্ত বাধ্য মনে করে। কাজ কর্মের ব্যাপারে বান্দার কোন এখতিয়ার নেই বলে। যে সব কাজ কর্ম বান্দা থেকে পাওয়া যায় তা অনিচ্ছাকৃত ভাবেই পাওয়া যায় এতে বান্দার কোন অধিকার নেই মনে করে। যেমন লম্বা এবং খাট হওয়ার ক্ষেত্রে তার কোন অধিকার নেই। সুতরাং তাকে তার কর্মের প্রতিদান দেওয়া হবে না।

(২) ধন সম্পদকে আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বস্তু মনে করে।

(৩) বান্দা কাজ করলে আল্লাহ তা'আলার তওফীক পাওয়া যায় বলে।

(৪) নবীজীর শারীরিক মেরাজ কে অস্বীকার করে।

(৫) রুহ জগতের অঙ্গীকারকে অস্বীকার করে।

(৬) জানাযার নামায ওয়াজিব হওয়াকে অস্বীকার করে।

৪। **ক্বাদরিয়া ঃ** এটি জাবারিয়ার পরিপন্থী একটি দল তাকদীরকে অস্বীকার করে বিধায় এদেরকে কাদরিয়া বলা হয়। তারা বান্দাকে স্বীয় কর্মের স্রষ্টা মনে করে। কাদরিয়াদের ব্যাপারে হাদীসে ঘৃণার শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। তাদেরকে এ উম্মতের অগ্নি পূঁজক বলা হয়েছে। তারা রোগাক্রান্ত হলে সেবা করতে এবং মারা গেলে জানাযা পড়তে নিষেধ করা হয়েছে।

বৈশিষ্টাবলী ঃ (১) মূলত বান্দার সকল কর্মকাণ্ড তার ইচ্ছাধীন, এতে আল্লাহ তা'আলার কোন জোর জবরদস্তি নেই। (২) কোন কাজ বান্দার নিকট ঈমানের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তা আল্লাহ তা'আলার নিকট কুফরী হিসেবে গণ্য হতে পারে। (৩) বান্দার কাজের পূর্বেই আল্লাহ তা'আলার তাওফীক হয়। শারীরিক মেরাজ সঠিক নয়। (৫) রুহ জগতে কোন অঙ্গীকার নেওয়া হয়নি। (৬) জানাযার নামায ওয়াজিব নয়।

(৪) জাহ্বামিয়া ঃ এ দলটির সম্পর্ক জাহাম বিন সফওয়ান সমরকন্দীর সাথে। জাহাম বিন সফওয়ান প্রথমে হারেছ বিন সুরাইজ যিনি বনী উমাইয়ার রাজত্বের শেষের দিকে খোরাসানে বিদ্রোহ করে ছিলেন, তার সেক্রেটারী ছিলেন। সে সর্বপ্রথম বেদাতী কর্মকাণ্ড তরমযে প্রকাশ করে। পরে সালেম বিন আহবাজ তাকে মারব নামক স্থানে হত্যা করে। এরা মুতাজেলাদের মত আল্লাহ তা'আলার অনাদি গুণাবলীগুলো অস্বীকার করেন। তারা বলে, যে সব গুণাবলী দ্বারা বান্দাকে গুণান্বিত করা যায় সে গুলি দিয়ে আল্লাহ তা'আলাকে গুণান্বিত করা ঠিক নয়। নতুবা বান্দা এবং আল্লাহ তা'আলার মাঝে কোন পার্থক্য থাকবে না।

বৈশিষ্টাবলী ঃ (১) ঈমানের সম্পর্ক নিছক অন্তরের সাথে মুখের সাথে নয়। (২) জান কবজ একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই করে থাকেন ফেরেশতা নয়। কারণ জান কবজ কারী কোন ফেরেশতা নেই। (৩) রুহ জগতকে অস্বীকার করে। (৪) মুনকার নাকীর ফেরেশতাদ্বয়ের প্রশ্ন করাকে অস্বীকার করে। (৫) হাউজে কাউসারকে অস্বীকার করে, তারা বলে। এগুলো কল্পনা ছাড়া অন্য কিছু নয়।

৬। **মারজিয়্যা ঃ** এরা বলে, ঈমান নিয়ে কোন গোনাহ করলে ইমানের ক্ষতি হয় না। যেমন কুফর নিয়ে ইবাদত করলে কোন লাভ হয় না।

বৈশিষ্টাবলী ঃ (১) আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম আ.কে স্বীয় আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। (২) আরশ আল্লাহ তা'আলার আবাস স্থল। (৩) নাজাতের জন্য ঈমান যথেষ্ট। সুতরাং ইবাদতের আলাদা কোন লাভ নেই এবং গোনাহ করলেও কোন ক্ষতি নেই। (৪) রমনীগণ বাগানের ফলের ন্যায়, সুতরাং যে কোন ধরণের রমনী ভোগ করা যাবে। বিয়ের কোন প্রয়োজন নেই।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْمُتَوَحِّدِ بِجَلَالِ ذَاتِهٖ وَكَمَالِ صِفَاتِهٖ الْمُتَقَدِّسِ فِيْ نُعُوْتِ الْجَبَرُوْتِ عَنْ شَوَائِبِ النَّقْصِ وَسِمَاتِهٖ وَالصَّلٰوةُ عَلٰى نَبِيِّهٖ مُحَمَّدٍ الْمُؤَيَّدِ بِسَاطِعِ حُجَجِهٖ وَوَاضِحِ بَيِّنَاتِهٖ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ هُدَاةُ طَرِيْقِ الْحَقِّ وَحُمَاتِهٖ

সহজ তরজমা

যাবতীয় প্রশংসা ঐ আল্লাহর, যিনি আপন মহান সত্ত্বায় ও স্বীয় পূর্ণাঙ্গ গুণাবলীতে অদ্বিতীয়। যিনি স্বীয় বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের গুণাবলীতে দোষ-ত্রুটির সংমিশ্রণ ও তার নিদর্শনাদি থেকে পবিত্র। পরিপূর্ণ রহমত বর্ষিত হোক তার নবী মুহাম্মদ ﷺ এর ওপর, যাকে তার প্রাঞ্জল দলীলাদি ও সুস্পষ্ট প্রমাণপঞ্জি দ্বারা শক্তিশালী করা হয়েছে। তদ্রুপ তার সাহাবীগণের ওপর, যারা সত্য-সঠিক পথের দিশারী ও তার পৃষ্ঠপোষক।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ اَلْحَمْدُ : اَلْحَمْدُ শব্দের অর্থ : সমস্ত প্রশংসা। আর حمد এরূপ প্রশংসাকে বলে যার ভিত্তি হচ্ছে প্রশংসিত সত্তার স্বঅর্জিত সাধারণ গুণ-বিশেষ।

قَوْلُهُ اَلْمُتَوَحِّدِ : একক-অদ্বিতীয়। اَلْمُتَوَحِّدِ শব্দে واحد শব্দের তুলনায় مُبَالَغَةٌ অধিক। এর বিস্তারিত বিবরণ হল : আরবী ব্যাকরণবিদগণ باب تَفَعُّل এর অনেকগুলো خاصيت উল্লেখ করেছেন। উক্ত খাছিয়তের তিনটি খাছিয়ত হল।

(১) طَلَب مَاخذ অর্থাৎ শব্দের মূল ধাতু অন্বেষণ করা যথা : تَعَظم অর্থাৎ, সে মাহাত্ম্য অন্বেষণ করেছে।

(২) تَكَلُّف অর্থাৎ কোন গুণের সাথে তার গুণান্বিত হওয়ার জন্য চেষ্টা ও কষ্ট স্বীকার করা। যেমন تَحَلَّم অর্থাৎ সে বহু চেষ্টা ও কষ্ট স্বীকার করে ক্রোধ দমন করেছে, বা ধৈর্য ধারণ করেছে।

(৩) صَيْرُوْرَة এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থার দিকে স্থানান্তরিত হওয়ার যেমন- تَحَجَّرُ الطِّيْن অর্থাৎ আগুনে পোড়ানো ব্যতীতই কাদা পাথরে পরিণত হয়ে গেছে। اَلْمُتَوَحِّد শব্দে তিনটি অর্থই হতে পারে।

প্রথম অর্থ হিসেবে مُتَوَحِّد এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহর মহান সত্তাই এককত্বের অধিকারী।

দ্বিতীয় অর্থ(تَكَلُّف) হিসেবে অর্থ হবে আল্লাহ তা'আলা এককত্বে পরিপূর্ণ।

তৃতীয় অর্থে (صَيْرُوْرَة) ব্যবহৃত হবে না। এখানে বরং, মহান আল্লাহর এককত্বে পরিপূর্ণতা-ই প্রকৃত উদ্দেশ্য হবে। অতএব اَلْمُتَوَحِّد এর অর্থ হবে আল্লাহ তা'আলার সত্তাই এককত্বের প্রকৃত অধিকারী, তিনি এককত্বে পরিপূর্ণ।

بِجَلَالِ ذَاتِهٖ : جَلَال অর্থ, বড়ত্ব। جَلَال ঐ অবস্থাকেও বলে, যা অন্যের ভয়-ভীতির কারণ হয়। এখানে جَلَال এর দিকে ذات এর اضافت এবং صفات এর দিকে كمال এর اضافت-টি اضافت الصفة الى الموصوف এর অন্তর্ভুক্ত। উহ্য ইবারত হল, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْمُتَوَحِّدِ بِذَاتِهٖ الْجَلِيْلَةِ وَصِفَاتِهٖ الْكَامِلَةِ আর صفات বলতে صفات ثبوتيه (ইতিবাচক গুণাবলী) বুঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ তা'আলার জন্য প্রমাণিত আছে এবং আল্লাহর সত্ত্বায় না থাকা দোষণীয়। যেমন- ইলম, হায়াত, কুদরাত, শ্রবণ ও দর্শন প্রভৃতি।

اَلْجَبَرُوْت : শব্দটি جيم ও باء বর্ণে যবর সাথে, مَلَكُوْت এর ওজনে। অর্থ, বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব।

صفات جبروت বলতে صفات سلبيه (নেতিবাচক গুণাবলী) যথা, আল্লাহ তা'আলার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ না হওয়া, جَوْهَر না হওয়া, جسم না হওয়া, زمانى এবং مكانى না হওয়া ইত্যাদি বুঝানো হয়েছে।

بِسَاطِعِ حُجَجِهٖ : এখানে ساطع এর ইযাফত حجج এর দিকে এবং واضح এর ইযাফত بينات এর দিকে اضافت الصفة الى الموصوف হয়েছে। যা بِالْحُجَجِ السَّاطِعَةِ وَالْبَيِّنَاتِ الْوَاضِحَةِ এর অর্থে ব্যবহৃত।

هُدَاةُ : শব্দটি هادى এর বহুবচন। অর্থ- রাহবর, দিশারী, পথপ্রদর্শক। আর حُمَاة শব্দটি حَامِىْ এর বহুবচন অর্থ- সংরক্ষক, পৃষ্ঠপোষক।

وَبَعْدُ ! فَإِنَّ مَبْنَى عِلْمِ الشَّرَائِعِ وَالْأَحْكَامِ وَاسَاسَ قَوَاعِدِ عَقَائِدِ الْإِسْلَامِ هُوَ عِلْمُ التَّوْحِيْدِ وَالصِّفَاتِ الْمَوْسُوْمِ بِالْكَلَامِ الْمُنْجِي عَنْ غَيَاهِبِ الشُّكُوْكِ وَظُلُمَاتِ الْأَوْهَامِ ، وَاِنَّ الْمُخْتَصَرَ الْمُسَمّٰى بِالْعَقَائِدِ لِلْإِمَامِ الْهُمَامِ قُدْوَةِ عُلَمَاءِ الْإِسْلَامِ نَجْمِ الْمِلَّةِ وَالدِّيْنِ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّسَفِيِّ اَعْلَى اللّٰهُ دَرَجَتَهٗ فِيْ دَارِالسَّلَامِ يَشْتَمِلُ مِنْ هٰذَا الْفَنِّ عَلٰى غُرَرِ الْفَرَائِدِ وَدُرَرِالْفَوَائِدِ فِيْ ضِمْنِ فُصُوْلٍ هِيَ لِلدِّيْنِ قَوَاعِدُ وَاُصُوْلٌ ـ وَاِثْنَاءِ نُصُوْصٍ هِيَ لِلْيَقِيْنِ جَوَاهِرُ وَفُصُوْصٌ مَعَ غَايَةٍ مِنَ التَّنْقِيْحِ وَالتَّهْذِيْبِ وَنِهَايَةٍ مِنْ حُسْنِ التَّنْظِيْمِ وَالتَّرْتِيْبِ ، فَحَاوَلْتُ اَنْ اَشْرَحَهٗ شَرْحًا يُفَصِّلُ مُجْمَلَاتِهٖ وَيُبَيِّنُ مُعْضَلَاتِهٖ وَيَنْشُرُ مَطْوِيَّاتِهٖ وَيُظْهِرُ مَكْنُوْنَاتِهٖ مَعَ تَوْجِيْهٍ لِلْكَلَامِ فِيْ تَنْقِيْحٍ وَتَنْبِيْهٍ عَلَى الْمُرَامِ فِيْ تَوْضِيْحٍ ، وَتَحْقِيْقٍ لِلْمَسَائِلِ غِبَّ تَقْرِيْرٍ، وَتَدْقِيْقٍ لِلدَّلَائِلِ اثَرَ تَحْرِيْرٍ، وَتَفْسِيْرٍ لِلْمَقَاصِدِ بَعْدَ تَمْهِيْدٍ ، وَتَكْثِيْرٍ لِلْفَوَائِدِ مَعَ تَجْرِيْدٍ طَاوِيًا كَشْحَ الْمَقَالِ عَنِ الْاِطَالَةِ وَالْاِمْلَالِ ، وَمُتَجَافِيًا عَنْ طَرَفَيِ الْاِقْتِصَادِ الْاِطْنَابِ الْاِخْلَالِ وَاللّٰهُ الْهَادِيْ اِلٰى سَبِيْلِ الرَّشَادِ ، وَالْمَسْئُوْلُ لِنَيْلِ الْعِصْمَةِ وَالسَّدَادِ ، وَهُوَ حَسْبِيْ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ

সহজ তরজমা

আকাইদে নাসাফী ও শরহে তাফতাযানীর বৈশিষ্ট্য

হামদ ও সালাতের পর কথা হল, علم الشرائع والاحكام এর বুনিয়াদ এবং আকাইদে ইসলামের মূলনীতির গোড়া হল, علم التوحيد والصفات তথা আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ ও গুণাবলীর ইলম। যা ইলমে কালাম নামে অভিহিত। যা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অমানিশা এবং সন্দেহের আধার থেকে মুক্তি দেয়। আর (এক কথা হল,) সাহসী ইমাম, ইসলামপন্থী আলেম-ওলামার পথনির্দেশক এবং দ্বীন-ধর্মের নক্ষত্র ওমর নাসাফী (আল্লাহ তা'আলা শান্তির আবাসভূমিতে (জান্নাতে) তার মরতবা বুলন্দ করুন।) এর আকাইদ নামক সংক্ষিপ্ত পুস্তিকাটি এ বিষয়ের দেদীপ্যমান ও মূল্যবান বিষয়াবলীর উপর সন্নিবেশিত, এমন পরিচ্ছেদসমূহের আওতায়, যা দ্বীনের সংবিধান ও মূলনীতি, এমন কিছু প্রমাণপঞ্জীর অধীনে, যা ইয়াকীন তথা সুদৃঢ় বিশ্বাসের মনিমুক্তা (সমতূল্য)। সীমাহীন যাচাই-বাছাই ও অতি চমৎকার শৃঙ্খলা ও বিন্যাসের সাথে। সুতরাং আমি ইচ্ছা করলাম, এর এমন একটি শরাহ রচনা করব, যা তার অস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত বিষয়গুলোকে খুলে দিবে, কঠিন বিষয়াদিকে স্পষ্ট করে দিবে, জটিল-পেঁচানো কথাগুলোকে পরিস্কার করে দিবে এবং তার গোপন কথাগুলোকে প্রকাশ করে দিবে। বাক্যকে তার উদ্দেশ্যাভিমুখি করার পাশাপাশি তাকে স্বচ্ছ করার ব্যাপারে, উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত করার সাথে সাথে বক্তব্যকে স্পষ্ট করার ব্যাপারে, মাসায়িলকে প্রমাণিত করার পাশাপাশি তা বর্ণনা করার পর এবং প্রামাণাদির সূক্ষ্ম দিকসমূহ বর্ণনা করার সাথে সাথে তাকে অতিরিক্ততা থেকে মুক্ত করার পর এবং মাসআলাসমূহের উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যার পাশাপাশি একটি ভূমিকা প্রদানের পর এবং অতি উপকারী বিষয়াদি বর্ণনা করার সাথে সাথে অতিরিক্ততা থেকে ইবারতকে মুক্ত করাসহ আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে কথা দির্ঘায়িত করা ও (দির্ঘায়িত করে) বিরক্তি ভাব সৃষ্টি করা এবং মধ্যমপন্থার দুই দিক তথা অতি সংক্ষেপ ও অতি দীর্ঘ করা থেকে পাশ কাটিয়ে। আল্লাহই সঠিক পথের দিশারী এবং হেফাজত ও সত্যতা লাভের আবেদন স্থল। তিনিই আমার জন্য যথেষ্ট ও উত্তম কার্য নির্বাহী।

সহজ তাশরীহ ও তাহকীক

شرائع ঃ শব্দটি شريعة এর جمع। অর্থঃ পথ, রাস্তা, ইসলাম পন্থীদের পরিভাষায় শরী'আত বলতে দ্বীন ইসলামকে বুঝায়। আবার কখনও দ্বীনের যাবততীয় মাসআলাকেও শরী'আত বলে। ব্যাখ্যাকার এখানে علم الشرائع। দ্বারা তৃতীয় অর্থটি বুঝিয়েছেন।

احكام ঃ এ শব্দটি حكم এর বহুবচন। আলিমগণের পরিভাষায় حكم বলতে আল্লাহ তা'আলার সেসব কালামকে বুঝায়, যা বান্দাদের নিকট হতে কোন কাজ করা বা কোন নিষেধ করা বা কোন বিষয়ে তাদেরকে স্বাধীনতা প্রদানের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত। প্রথমটির উদাহরণ- اقيموا الصلوة। দ্বিতীয়টির উদাহরণ- لا تقربوا الزنا- তৃতীয়টির উদাহরণ- اذا حللتم فاصطادوا। কারও কারও মতে علم الشرائع বলে اصول فقه আর علم الاحكام বলে فروع فقه বুঝানো হয়েছে। আবার কারও কারও মতে علم الشرائع বলতে শরী'আতের সাথে সম্পৃক্ত যাবতীয় ইলম যেমন, হাদীস-তাফ্সীর প্রভৃতিকে বুঝানো হয়েছে। আর علم الاحكام বলতে اصول فقه এবং فروع فقه কে বুঝানো হয়েছে। মোটকথা, ইলমে কালাম এসব ইলমের বুনিয়াদের মর্যাদা রাখে। কারণ, ইলমে কালামের মাধ্যমেই প্রমাণাদিসহ আল্লাহ তা'আলার সত্তা ও সিফাত-গুণাবলী এর পরিচয় লাভ হয়। আর একথা নিশ্চিত যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা সত্ত্বা ও গুণাবলির জ্ঞান লাভ হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত কুরআন হাদীস, اصول فقه ও فروع فقه -এর জ্ঞানও লাভ হবে না।

قواعد ঃ قاعدة এর বহুবচন। আলিমগণের পরিভাষায় قاعدة ঐ قضية كلية কে বলে, যা দ্বারা তার موضوع এর প্রতিটি অংশের অবস্থা জানা যায়। موضوع এর افراد বা এর অবস্থা জানার নিয় হল, যে فرد এর অবস্থা জানবে তাকে موضوع আর قضية كلية কে محمول বানাতে হবে। موضوع এবং محمول মিলে প্রথম مقدمة অর্থাৎ صغرى হবে। আর ঐ قضية كلية কে দ্বিতীয় مقدمة অর্থাৎ كبرى বানাতে হবে। যেমন, كل نقص منفى عن الواجب এটা একটা قضيه كليه যার موضوع (كل نقص) এর افراد এর মধ্যে جسميت ও রয়েছে। আপনি جسميت কে موضوع এবং قضية كلية এর موضوع অর্থাৎ نقص কে محمول বানিয়ে বলুন, الجسمية نقص। এটা প্রথম مقدمة অর্থাৎ صغرى হল। এবার قضية كلية কে كبرى বানিয়ে দিন। অর্থাৎ এভাবে বলুন الجسميه نقص - وكل نقص منفى عن الواجب। তাহলে ফলাফল হবে فالجسمية منفية عن الواجب

عقائد ঃ عقائد শব্দটি عقيدة এর বহুবচন। عقيدة ঐ قضية কে বলে, যার সত্যায়ণ করা হয়। ভিন্ন শব্দে এমনও বলা যায় যে, কোন কথার সত্যতার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে তাকে সত্য বলে মেনে নেওয়াকে عقيدة বলে। ইলমে কালামকে ইসলামী আকাইদের মূলনীতির ভিত্তি এ জন্য বলা হয়েছে যে, ইলমে কালাম ঐ সব মূলনীতি একত্রিত করে এর তার উপর দলীল কায়েম করে।

غياهب ঃ এ শব্দটি غيهب এর বহুবচন। অর্থ, অন্ধকার। যেমন, فرس غيهب কুচকুচে কালো ঘোড়াকে বলে। شكوك এর দিকে غياهب এর ইযাফতটি اضافة المشبه به الى المشبه। জাতীয়।

همام ঃ দুঃসাহসী, নির্ভীক, বীর বিক্রম, মহারাজা।

نجم الملة والدين ঃ دين ও ملة বলতে شريعة বুঝানো হয়েছে। কেননা দ্বীন অর্থ اطاعت। বা আনুগত্য। শরী'আতের আনুগত্য করা হয়। বিধায় একে دين বলা হয়। আবার যেহেতু দ্বীনের বিষয়গুলো গ্রন্থনা করা হয় আর ملت শব্দটি املاء। অর্থাৎ লেখা-গ্রন্থনা কর থেকে নির্গত, এজন্য একে ملت বলা হয়। نجم الملت। والدين এটা ماتن বা আকাইদ গ্রন্থকারের উপাধি। প্রকৃত নাম ওমর। উপনাম আবুল হাফস। তুর্কিস্তানের নাসাফ নামক শহরে জন্মগ্রহণ করায় তাকে নাসাফী বলা হয়।

غرر ঃ (গইনে পেশ ও راء তে যবর) এটি غرة গইনে পেশ ও راء তে তাশদীদ। এর বহুবচন। অর্থ, ঘোড়ার কোপালের শুভ্রতা। যা ঘোড়ার ভাল এবং বরকতময় হওয়ার লক্ষণ ধরা হয়। পরবর্তীতে তা ভাল-উন্নত অর্থে ব্যবহৃত থাকে।

فَرَائِدُ ঃ فَرِيْدَةٌ এর বহুবচন। এমন মুক্তা, যা কোন ঝিনুকে একটি মাত্রই থাকে। একটি হওয়ায় তা যেমন বড় হয়, তেমনি বেশী উজ্জ্বলও হয়। ফলে তা বেশী মূল্যবান হয়। غُرَرُالفرائد এর মধ্যে غُرَرُ অর্থাৎ উপকারী কথাকে দামী এবং মূল্যবান হওয়ার দিক থেকে فرائد তথা একক মুক্তার সাথে তুলনা দেওয়া হয়েছে। কাজেই غُرَرُ হল مشبه আর اَلْفَرَائِدُ হল مشبه به এবং উক্ত اِضَافَةُ الْمُشَبَّهِ اِلَى الْمُشَبَّهِ بِهِ এর অন্তর্ভুক্ত।

دُرَرُالفَوَائِدِ ঃ (দালে পেশ ও রা-এ যবর) دُرَّةٌ (دال এ পেশ ও راء এ তাশদীদ এর বহুবচন। অর্থ, মুক্তা। فَوَائِدُ - فائده এর বহুবচন। অর্থ, ভাল এবং উপকারী। فوائد অর্থাৎ ভাল ও উপকারী কথা সমূহকে উপকারী ও অতি মূল্যবান হওয়ার দিক থেকে درر অর্থাৎ মুক্তার সাথে তুলনা করা হয়েছে। অতএব فوائد মুশাব্বাহ আর درر মুশাব্বাহ বিহী এবং উক্ত এযাফত اضافة المشبه الى المشبه به এর আওতাভুক্ত।

اثنا نُصُوصٌ ঃ اِثْنَا এটা ثَنْيٌ এর বহুবচন। যা عَصًا এর ওজনে। অর্থ– মধ্যে আওতায়।

نُصُوصٌ - نَصٌّ এর বহুবচন। نص বলতে শরী'আত প্রণেতার কথা বুঝানো হয়েছে অথবা এমন সব কথাকে বুঝানো হয়েছে, যা স্পষ্টভাবে তার উদ্দেশ্য বুঝায়।

تَنْقِيْحٌ ঃ হাড্ডি থেকে মগজ বের করা, গাছের অতিরিক্ত বা অপ্রয়োজনীয় ডালপালা কেটে ফেলা।

تَهْذِيْبٌ ঃ সংশোধন করা, অনুপযোগী জিনিস থেকে খালি করা, সাজানো।

مُعْضَلَاتِه ঃ (ضاد এ যের) مُعْضَلَةٌ এর বহুবচন। অর্থ– কঠিন দুর্বোধ্য। বলা হয়– اَعْضَلَ الْمَرَضُ الطَّبِيْبَ। অসুস্থতা ডাক্তারকে অপারগ বানিয়ে দিয়েছে অর্থাৎ রোগ অনারোগ্য প্রমাণিত হয়েছে।

غِبَّ تَقْرِيْرِ ঃ অর্থাৎ লেখক ও অন্যান্য আলিমগণের কথা আলোচনার পর। কেননা শারেহের নীতি হল, তিনি এ কিতাবে প্রথমে লেখক ও অন্যান্য আলিমগণের কথা আলোচনা করেন। এরপর তার মতানুসারে বিশুদ্ধ কথাটি প্রমাণিত করেন। تَحْقِيْق বলে মাসআলাসমূহকে দলীল-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত করা। আর تَدْقِيْق বলে দলীলগুলোর ভূমিকাসমূহকে প্রমাণিত করা এবং তার উপর আরোপিত অভিযোগ খণ্ডন করা বুঝিয়েছেন।

تَمْهِيْد ঃ এমন জিনিস আলোচনা করা, যার উপর উদ্দেশ্য বুঝা নির্ভরশীল থাকে। كَشْحُ الْمَقَال বলতে রূপকার্থে বিমুখ হওয়া বুঝানো হয়েছে। اخلال অর্থ, এত সংক্ষেপ যা উদ্দেশ্য বুঝতে বিঘ্নতা সৃষ্টি করে।

اِعْلَمْ اَنَّ الْاَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ مِنْهَا مَايَتَعَلَّقُ بِكَيْفِيَّةِ الْعَمَلِ وَتُسَمّٰى فَرْعِيَّةً وَعَمَلِيَّةً وَمِنْهَا مَايَتَعَلَّقُ بِالْاِعْتِقَادِ، وَتُسَمّٰى اَصْلِيَّةً وَاِعْتِقَادِيَّةً ، وَالْعِلْمُ الْمُتَعَلِّقُ بِالْاُوْلٰى يُسَمّٰى عِلْمُ الشَّرَائِعِ وَالْاَحْكَامِ ، لِمَا اَنَّهَا لَاتُسْتَفَادُ اِلَّا مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ ، وَلَا يَسْبِقُ الْفَهْمُ عِنْدَ اِطْلَاقِ الْاَحْكَامِ اِلَّا اِلَيْهَا وَبِالثَّانِيَةِ عِلْمُ التَّوْحِيْدِ وَالصِّفَاتِ لِمَا اَنَّ ذٰلِكَ اَشْهَرُ مَبَاحِثِهِ وَاَشْرَفُ مَقَاصِدِهِ ـ

সহজ তরজমা

আহকামে শরইয়্যাহ ও তদসংশ্লিষ্ট ইলম

জেনে রেখ, احكام شرعية এর মধ্য হতে কিছু এমন, যা আমলের পদ্ধতির সাথে সম্পৃক্ত, সেগুলোকে فرعية এবং عملية বলা হয়। আবার তন্মধ্যে কিছু এমন যা اعتقاد (বিশ্বাস) এর সাথে সম্পৃক্ত, সেগুলোকে اعتقادية এবং اصلية বলা হয়। প্রথম প্রকারের আহকামের সাথে সম্পৃক্ত ইলমকে علم الشرائع والاحكام বলা হয়। কেননা তা কেবল শরী'আতের মাধ্যমেই জানা যায়। অধিকন্তু احكام শব্দটি বলা মাত্রই স্মৃতিশক্তি সে (احكام عملية এর) দিকেই ধাবিত হয়। দ্বিতীয় প্রকারের আহকামের সাথে সম্পৃক্ত علم কে عِلْمُ التَّوْحِيْدِ وَالصِّفَات বলা হয়। কেননা তা (তাওহীদ ও সিফাতের মাসআলা) -ই এ শাস্ত্রের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ বিষয় এবং শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শারেহ রহ. উপরোল্লেখিত ইবারতে আহকামে শরইয়্যাহ ও তার সাথে সম্পৃক্ত ইলমের শ্রেণীভাগ করেছেন। বিস্তারিত বিবরণ হল, احكام شرعيه অর্থাৎ যেসব احكام আমরা شريعت থেকে জানতে পাই, তা দু ধরনের। কিছু তো আমলের সাথে সম্পৃক্ত অর্থাৎ সেসব দ্বারা বান্দার কাছ থেকে কোন আমল কামনা করা হয়। যেমন, শরী'আতের বিধান মতে নামায-রোযা ফরয। حكم দ্বারা বান্দার কাছ থেকে আমল তথা নামায-রোযা আদায় করা কামনা করা হয়েছে। আমলের সাথে সম্পর্ক রাখায় এসব আহকামকে احكام عمليه বলা হয়। আবার اصول اعتقاديه এর ইলম থেকে নির্গত হওয়ায় احكام فرعية বলা হয়। আর যে শাস্ত্রটি এসব আহকামের বর্ণনার সাথে সম্পৃক্ত, তাকে علم الشرائع والاحكام বলা হয়। কেননা এসব ইলম কেবল শরী'আত দ্বারাই অর্জিত হয়। এক্ষেত্রে আকল বা বিবেকের কোন দখল নেই। বিধায় এগুলো علم الشرائع বলা হয়। তাছাড়া احكام শব্দটি বলা মাত্র স্মৃতিশক্তি আমলের সাথে সম্পৃক্ত জিনিসের দিকেই ধাবিত হয়, বিধায় علم الاحكام বলা হয় হয়েছে।

আর কিছু আহকাম এমন রয়েছে, যা শুধু মানা এবং اعتقاد (বিশ্বাসের) সাথে সম্পর্ক রাখে। যেমন, শরী'আতের বিধান মতে আল্লাহ তা'আলাকে চিরঞ্জীব, সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা ইত্যাদি মান্য করা জরুরী। এগুলোতে কোন আমল কাম্য নয় বরং আল্লাহ তা'আলা এসব গুণে গুণান্বিত আছেন বলে মেনে নেওয়া ও বিশ্বাস করাই কাম্য। اعتقاد এর সাথে সম্পৃক্ত হওয়ায় এসব আহকামকে احكام اعتقاديه বলে। আর احكام عمليه এগুলো থেকে নির্গত হওয়ায় এগুলোকে احكام اصليه বলে। আর যে শাস্ত্র দ্বারা এসব আহকামের ইলম অর্জিত হয়, তাকে علم التوحيد و الصفات বলে। কারণ, যদিও এ শাস্ত্রে অন্যান্য মাসায়িল যেমন নবুওত, ইমামত, প্রভৃতির আলোচনাও রয়েছে, কিন্তু এসব আলোচনায় توحيد এবং صفات এর মাসআলা সরাসরি আল্লাহর ذات (সত্তা) এর সাথে সম্পর্ক রাখায় বেশী প্রসিদ্ধ এবং মর্যাদাশীল। এ কারণে تَسْمِيَةُ لِلْكُلِّ بِاسْمِ اَشْهَرِ اَجْزَائِهٖ وَاَشْرَفِ اَجْزَائِهٖ হিসেবে এ নামে (তথা علم التوحيد والصفات বা ইলমে কালাম নামে) অভিহিত করা হয়েছে।

وَقَدْ كَانَتِ الْأَوَائِلُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ رِضْوَانُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْنَ لِصَفَاءِ عَقَائِدِهِمْ بِبَرَكَةِ صُحْبَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَقُرْبِ الْعَهْدِ بِزَمَانِهِ وَلِقِلَّةِ الْوَقَائِعِ وَالْاِخْتِلَافَاتِ وَتَمَكُّنِهِمْ مِنَ الْمُرَاجَعَةِ إِلَى الثِّقَاتِ مُسْتَغْنِيْنَ عَنْ تَدْوِيْنِ الْعِلْمَيْنِ وَتَرْتِيْبِهِمَا أَبْوَابًا وَفُصُوْلًا، وَتَقْرِيْرِ مَقَاصِدِهِمَا فُرُوْعًا وَأُصُوْلًا إِلَى أَنْ حَدَثَتِ الْفِتَنُ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْبَغْيِ عَلَى أَئِمَّةِ الدِّيْنِ وَظَهَرَ اِخْتِلَافُ الْآرَاءِ وَالْمَيْلِ إِلَى الْبِدَعِ وَالْأَهْوَاءِ وَكَثُرَتِ الْفَتَاوٰى وَالْوَاقِعَاتُ وَالرُّجُوْعُ إِلَى الْعُلَمَاءِ فِي الْمُهِمَّاتِ فَاشْتَغَلُوْا بِالنَّظَرِ وَالْاِسْتِدْلَالِ وَالْاِجْتِهَادِ وَالْاِسْتِنْبَاطِ وَتَمْهِيْدِ الْقَوَاعِدِ وَالْأُصُوْلِ وَتَرْتِيْبِ الْأَبْوَابِ وَالْفُصُوْلِ وَتَكْثِيْرِ الْمَسَائِلِ بِأَدِلَّتِهَا وَإِيْرَادِ الشُّبَهِ بِأَجْوِبَتِهَا وَتَعْيِيْنِ الْأَوْضَاعِ وَالْاِصْطِلَاحَاتِ وَتَبْيِيْنِ الْمَذَاهِبِ وَالْاِخْتِلَافَاتِ، وَسَمَّوْا مَا يُفِيْدُ مَعْرِفَةَ الْأَحْكَامِ الْعَمَلِيَّةِ عَنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيْلِيَّةِ بِالْفِقْهِ، وَمَعْرِفَةَ أَحْوَالِ الْأَدِلَّةِ إِجْمَالًا فِيْ إِفَادَتِهَا الْأَحْكَامَ بِأُصُوْلِ الْفِقْهِ، وَمَعْرِفَةَ الْعَقَائِدِ عَنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيْلِيَّةِ بِالْكَلَامِ ـ

সহজ তরজমা

ইলমে কালাম সংকলনের কারণ

আর পূর্ববর্তীগণ তথা সাহাবা ও তাবেঈগণ নবী করীম ﷺ-এর সুহবতের (সাহচর্যের) বরকতে এবং তাঁর যুগের নিকটবর্তী হওয়ার কারণে, নতুন নতুন মাসায়িল ও মতানৈক্য কম হওয়ায়, নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিবর্গের শরণাপন্ন জিজ্ঞাসা করতে সক্ষম হওয়ায় উক্ত শাস্ত্র দুটি (عِلْمُ الشَّرَائِعِ وَالْأَحْكَامِ এবং عِلْمُ التَّوْحِيْدِ وَالصِّفَاتِ) প্রণয়ন এবং তাকে অধ্যায় ও পরিচ্ছেদ আকারে বিন্যস্ত করা এবং তার মাসায়িলকে جزئيات ও كليات রূপে বর্ণনা করা থেকে অমুখাপেক্ষী ছিলেন। এমনকি যখন মুসলমানদের মাঝে (আকীদাগত) ফিৎনা এবং দ্বীনের ইমামগণের উপর অন্যায়-অবিচার বর্ণনাকারীদের মতবিরোধ দেখা দিল, বিদ'আত ও কু-প্রবৃত্তির দিকে মানুষের আকর্ষণ প্রকাশ পেল, নতুন নতুন মাসায়িল ও তার ব্যাপারে আলেমগণের ফাত্ওয়া এবং গুরুত্বপূর্ণ মাসাআলা নিয়ে জনসাধারণ ব্যাপকভাবে ওলামাগণের শরণাপন্ন হতে লাগল, তখন ওলামায়ে কিরাম মনোনিবেশ করলেন গবেষণা, দলীল উপস্থাপন, ইজতিহাদ, মাসয়ালার শেকড় সন্ধান, মূলনীতি গঠন, অধ্যায় ও পরিচ্ছেদাকারে বিন্যাস, দলীলসহ বেশী বেশী মাসআলা আলোচনা, উত্তরসহ অভিযোগ বর্ণনা, পারিভাষিক শব্দাবলী (বিশেষ বিশেষ অর্থের জন্য) নির্ধারণ এবং নানা মতবিরোধ বর্ণনায়। এভাবে তারা যে ইলম আহকামে আমলিয়্যাকে তার বিস্তারিত দলীলসহ পরিচয় দান করে, তাকে فقه বলে নামকরণ করেছেন। আর যে বিদ্যা আহকাম জানার ক্ষেত্রে দলীল-প্রমাণের সংক্ষিপ্ত জ্ঞান দান করে, তাকে উসূলে ফিক্হ বলে নাম রেখেছেন। আর যে ইলম বিস্তারিত প্রমাণাদির আলোকে আকাইদের জ্ঞান দান করে, তাকে ইলমে কালাম বলে নামকরণ করেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

সাহাবী যুগে ইলমে কালাম ও ইলমে ফিক্হ

শারেহ রহ. ইলমে কালাম ও ইলমে ফিক্হের প্রয়োজনীয়তা এবং এই দুইটি বিষয় সংকলনের পটভূমি আলোচনা করছেন। যার সারকথা হল, প্রবীনদের মধ্য হতে হযরত সাহাবায়ে কিরাম রাযি. এর আকীদা নবী করীম ﷺ-এর সংশ্রবের বরকতে এবং তাবেয়ীদের আকীদা নবী করীম ﷺ এর নিকটবর্তী যুগ হওয়ায় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও

শংসয়-সন্দেহ থেকে মুক্ত ছিল। তাছাড়া তখন শরী'আতে যার হুকুম স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয় নি, এমন মাসআলা এবং মতবিরোধ কম হত। যদি কোন নতুন মাসআলা দেখা দিত কিংবা কোন বিষয়ে বিরোধ সৃষ্টি হত, তখন বড় বড় সাহাবীগণের নিকট জিজ্ঞাসা করে সন্দেহ ও বিরোধ দূর করা যেত, যাদের জ্ঞানের গভীরতা, প্রশস্ততা, একনিষ্ঠতার উপর মানুষের পূর্ণ আস্থা ছিল। এসব কারণে এ দুটি শাস্ত্র প্রণয়ণের প্রয়োজন ছিল না।

উক্ত শাস্ত্র দুটির প্রয়োজনীয়তা

কিন্তু পরবর্তীতে যখন মুসলমানদের পরস্পরের মাঝে আকীদাগত ফিৎনা দেখা দেয়। মুতাযিলা ও খারেজীদের মত ফিৎনাবাজদের আবির্ভাব ঘটে। হকপন্থী আলেমদের উপর জুলুম ও নির্যাতন, মানুষ বিদআত ও কু-সংস্কারের অনুসরণের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে। এমনিভাবে আমলের সাথে সম্পৃক্ত অনেক নতুন নতুন মাসআলা সামনে আসতে শুরু করে, সে বিষয়ে উলামায়ে কিরামের প্রদত্ত উত্তর ও ফাত্ওয়ায় বিরোধ দেখা দেয় এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মানুষ অধিকহারে আলিমদের শরণাপন্ন হতে থাকে, তখন যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা অন্তর্দৃষ্টি এবং দলীল পেশ করার যোগ্যতা দান করেছেন, তারা এ বিষয় দুটির মাসআলাগুলো চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন। সাথে সাথে তার উপর আরোপিত অভিযোগ-আপত্তিগুলোর উত্তর দেন।

সেই সঙ্গে যে ইলম দ্বারা বিস্তারিত দলীল-প্রমাণসহ احكام عمليه এর পরিচয় লাভ হয়, তাকে فقه বলে নামকরণ করেন। আর যে ইলম দ্বারা বিস্তারিত দলীল-প্রমাণসহ ইসলামী আকাইদ জানা যায়, তাকে ইলমে কালাম বলে অভিহিত করলেন।

উপরিউক্ত বিবরণ থেকে ইলমে কালামের নিম্নোক্ত সংজ্ঞাটি জানা গেল অর্থাৎ ইসলামী আকীদা সমূহ বিস্তারিত দলীল-প্রমাণসহ জানাকে ইলমে কালাম বলে। যেমন احكام عمليه কে বিস্তারিত দলীল-প্রমাণ দ্বারা জানাকে ইলমে فقه বলে।

مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ ঃ এটা الاوائل এর بيان হয়েছে। আর الاوائل হল كَانَتْ এর ইসম।

لِصَفَاءِ عَقَائِدِهِمْ ঃ জার-মাজরূর মিলে পরবর্তী مُسْتَغْنِيْنَ এর সাথে متعلق হয়েছে। এরপর مُسْتَغْنِيْنَ তার মুতা'আল্লিকসহ كانت এর خبر হয়েছে।

تَدْوِيْنَ الْعِلْمَيْنِ ঃ عِلْمَيْنِ বলতে علم الكلام এবং علم الشرائع والاحكام উদ্দেশ্য।

حَدِيْثُ الْفِتَنِ ঃ এখানে فتن বলতে আকীদাগত ফিৎনা উদ্দেশ্য অর্থাৎ যে ফিৎনা খারেযী, রাফেযী মু'তাযিলা অন্যান্য ভ্রান্ত সম্প্রদায় কর্তৃক উদ্ভাবিত হয়েছে।

اَلْبَغْيُ عَلٰى اَئِمَّةِ الدِّيْنِ ঃ কোন কোন খলীফার পক্ষ থেকে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ও তার সাথীবর্গের উপর কুরআনে কারীমকে মাখলূক না বলার কারণে যে জুলুম ও অত্যাচার করা হয়েছিল, এখানে তাই উদ্দেশ্য। সে সময় রাষ্ট্র পরিচালনায় মু'তাযিলাদের প্রভাব বেশী থাকায় কুরআন মাখলূক হওয়ার আকীদাটি সরকারী মাযহাবে পরিণত হয়েছিল।

بِدَعٌ ঃ শব্দটি بِدْعَةٌ এর বহুবচন। যা নববী যুগে দ্বীন হিসেবে ছিল না, পরবর্তীকালে কোন শরঈ দলীল-প্রমাণ ছাড়াই দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়েছে, তাকেই বিদ'আত বলে।

لِاَنَّ عُنْوَانَ مَبَاحِثِهِ كَانَ قَوْلُهُمْ اَلْكَلَامُ فِيْ كَذَاوَكَذَا وَلِاَنَّ مَسْئَلَةَ الْكَلَامِ كَانَتْ اَشْهَرُ مَبَاحِثِهِ اَوْ اَكْثَرَهَا نِزَاعًا وَجِدَالًا حَتّٰى اَنَّ بَعْضَ الْمُتَغَلِّبَةِ قَتَلَ كَثِيْرًا مِنْ اَهْلِ الْحَقِّ لِعَدَمِ قَوْلِهِمْ بِخَلْقِ الْقُرْاٰنِ وَلِاَنَّهُ يُوْرِثُ قُدْرَةً عَلَى الْكَلَامِ فِيْ تَحْقِيْقِ الشَّرْعِيَّاتِ وَاِلْزَامِ الْخُصُوْمِ كَالْمَنْطِقِ لِلْفَلَاسِفَةِ وَلِاَنَّهُ اَوَّلُ مَا يَجِبُ مِنَ الْعُلُوْمِ الَّتِيْ اِنَّمَا تُعَلَّمُ وَتُتَعَلَّمُ بِالْكَلَامِ فَاُطْلِقَ عَلَيْهِ هٰذَا الْاِسْمُ لِذٰلِكَ ثُمَّ خُصَّ بِهِ وَلَمْ يُطْلَقْ عَلٰى غَيْرِهِ تَمْيِيْزًا وَلِاَنَّهُ اِنَّمَا يَتَحَقَّقُ بِالْمُبَاحَثَةِ وَاِدَارَةِ الْكَلَامِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ وَغَيْرُهُ قَدْ يَتَحَقَّقُ بِمُطَالَعَةِ الْكُتُبِ وَالتَّاَمُّلِ وَلِاَنَّهُ اَكْثَرُ الْعُلُوْمِ نِزَاعًا وَخِلَافًا فَيَشْتَدُّ افْتِقَارُهُ اِلَى الْكَلَامِ مَعَ الْمُخَالِفِيْنَ وَالرَّدِّ عَلَيْهِمْ وَلِاَنَّهُ لِقُوَّةِ اَدِلَّتِهِ صَارَ كَاَنَّهُ هُوَ الْكَلَامُ دُوْنَ مَاعَدَاهُ مِنَ الْعُلُوْمِ كَمَا يُقَالُ لِلْاَقْوٰى مِنَ الْكَلَامَيْنِ هٰذَا هُوَ الْكَلَامُ وَلِاَنَّهُ لِابْتِنَائِهِ عَلَى الْاَدِلَّةِ الْقَطْعِيَّةِ الْمُؤَيَّدُ اَكْثَرُهَا بِالْاَدِلَّةِ السَّمْعِيَّةِ كَانَ اَشَدُّ الْعُلُوْمِ تَاْثِيْرًا فِي الْقَلْبِ وَتَغَلْغُلًا فِيْهِ فَسُمِّيَ بِالْكَلَامِ الْمُشْتَقِّ مِنَ الْكَلْمِ وَهُوَ الْجَرْحُ وَهٰذَا هُوَ كَلَامُ الْقُدَمَاءِ

সহজ তরজমা

ইলমে কালাম নাম রাখার অষ্ট কারণ

(এ শাস্ত্রের নাম রাখা হয়েছে ইলমে কালাম) কারণ, এ শাস্ত্রের বিষয়াবলীর শিরোনাম ছিল الكلام فى كذا وكذا। তাছাড়া কালামের বিষয়টি এ শাস্ত্রের মাসআলাসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বেশী প্রসিদ্ধ এবং চরম বিতর্কিত ও বাক-বিতন্ডাপূর্ণ বিষয় ছিল। এমনকি কোন কোন জালিম অনেক হকপন্থী আলেমকে "কুরআন মাখলূক" এর প্রবক্তা না হওয়ার কারণে হত্যা করেছে। অধিকন্তু এ শাস্ত্র শরঈ মাসআলাসমূহকে প্রমাণিত করা এবং বিরোধীদেরকে লাজওয়াব ও নিরুত্তর করতে কথা বলার শক্তি সঞ্চার করে, যেমন মান্তিক (শাস্ত্র) দার্শনিকদের জন্য (শক্তি যোগায়)। তদ্রূপ কথা বলার মাধ্যমে যেসব বিদ্যা শেখা বা শেখানো হয়, তন্মধ্যে এ বিদ্যাটি সর্বপ্রথম ওয়াজিব। ফলে এ বিদ্যাকে উক্ত নামে অভিহিত করা হয়েছে। এরপর অন্যান্য বিদ্যা থেকে এটিকে পৃথক রাখার জন্য এ নামটি এ বিদ্যার জন্যই নির্দিষ্ট করা হয়েছে। অন্যান্য বিদ্যার ক্ষেত্রে এ নামটি ব্যবহার করা হয় নি। আবার এ বিদ্যাটি শুধু আলোচনা-পর্যালোচনা ও উভয় পক্ষের মতবিনিময়ের ফলে অর্জিত হয়। আর অন্যান্য বিদ্যা অধ্যয়ন ও চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে অর্জিত হয়। সাথে সাথে এ বিদ্যাটি অন্যান্য বিদ্যার তুলনায় বেশী বিবাদ ও বিতর্কপূর্ণ। ফলে এ বিদ্যাটি প্রতিপক্ষের সাথে আলোচনা ও তাদের মতামত খণ্ডানোর বেশী মুখাপেক্ষী এবং এ শাস্ত্রটি তার দলীলাদি শক্তিশালী হওয়ায় এটি এমন হয়ে পড়েছে, যেন এটাই কালাম। এতদ্ভিন্ন অন্যগুলো কালামই নয়। যেমন দুটি কালাম বা কথার মধ্যে বেশী শক্তিশালীটিকে (এটাই একমাত্র কালাম বা কথা) বলে আখ্যা দেওয়া হয়। তাছাড়া এ বিদ্যাটি অকাট্য দলীল-প্রমাণের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় যেগুলোর বেশীর ভাগই নকলী প্রমাণাদির দ্বারা সমর্থিত– ফলে অন্যান্য বিদ্যার তুলনায় এটি অন্তরে বেশী প্রভাব বিস্তার ও রেখাপাত করে। এ কারণে এটিকে "কালাম" নামে অভিহিত করা হয়েছে। যা كلم ধাতু হতে নির্গত। যার অর্থ– যখম করা, আহত করা। এটাই হল, মুতাকাদ্দিমীন বা পূর্ববর্তীদের কালাম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

উপরোল্লেখিত ইবারতে ব্যাখ্যাকার আল্লামা তাফতাযানী রহ. ইল্মে কালামের নামকরণের ৮টি কারণ আলোচনা করেছেন। এর কোনটিতে তিনি কালাম বলতে আল্লাহ তা'আলার কালাম বুঝিয়েছেন। কোনটিতে প্রচলিত কালাম অর্থাৎ কথাবার্তা, আলোচনা-পর্যালোচনা উদ্দেশ্য নিয়েছেন। আবার কোনটিতে তার مشتق منه অর্থাৎ كلم এর অর্থের প্রতি লক্ষ্য করেছেন। আমি এখানে নামকরণের কারণগুলো ক্রমান্বয়ে আলোচনা করছি।

(১) পূর্ববর্তী মনীষীদের কিতাবাদিতে এ বিদ্যার আলোচনাগুলোর শিরোনাম চয়ন করা হত بَابُ كَذَا অথবা فصل এর পরিবর্তে كلام শব্দ দ্বারা। যেমন, اثبات نبوت এর মাসআলার শিরোনাম হত اَلْكَلَامُ فِيْ فى كذا اِثْبَاتِ النُّبُوَّةِ তদ্রুপ কুরআন مخلوق হওয়া-না হওয়ার মাসআলায় শিরোনাম হত الكلام فى مسئلة خلقَ القرانَ ইত্যাদি। ফলে تسمية بلفظ عنوان مباحثه হিসেবে তার নাম কালাম রাখা হয়েছে।

(২) এক সময় আল্লাহ তা'আলার কালাম মাখলূক হওয়া-না হওয়ার মাসআলাটি এ শাস্ত্রের অন্যান্য মাসআলার মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ছিল। ফলে تَسْمِيَةُ الشَّيْئِ بِاسْمِ اَشْهَرِ اَجْزَائِهِ হিসেবে এ শাস্ত্রকে কালাম নামে অভিহিত করা হয়।

(৩) দর্শন শাস্ত্রের বিষয়াদি প্রমাণ করার ক্ষেত্রে চিন্তা-গবেষণার ভুল-ত্রুটি থেকে রক্ষাকারী ইলম দ্বারা কথা বলার শক্তি অর্জিত হয়। বিধায় দার্শনিকগণ দর্শন শাস্ত্রকে منطق বা যুক্তিবিদ্যা নামে আখ্যায়িত করেছেন। তদ্রুপ আহকামে শরঈয়্যাহকে প্রমাণ করা ও প্রতিপক্ষকে নিরুত্তর করার ক্ষেত্রেও এ বিদ্যা দ্বারা কথোপকথন ও আলোচনা, পর্যালোচনার উপর শক্তি অর্জন হয়। বিধায় কালাম শাস্ত্রবিদগণ এ বিদ্যাটির নাম কালাম রেখেছেন।

(৪) কালামের মাধ্যমে যেসব বিদ্যা অর্জন করা হয়, এ বিদ্যাটিও তার একটি। এ দিক বিবেচনায় তো সব বিদ্যাকে تسمية الشئ باسم السبب হিসেবে কালাম নামে অভিহিত করা যেত। কিন্তু এ বিদ্যাটি দ্বারা যেহেতু আল্লাহ তা'আলার সত্ত্বার পরিচিতি লাভ হয়। আর আল্লাহ তা'আলার সত্তার পরিচিতি লাভ সর্বপ্রথম ওয়াজিব বিষয়। কাজেই কালামের মাধ্যমে অর্জিত ইলমসমূহের মধ্যে এ বিদ্যাটিও সর্বপ্রথম ওয়াজিব বিষয় হবে। কেননা ওয়াজিব অর্জনের মাধ্যমও ওয়াজিব। অতএব এ বিদ্যাটি সর্বপ্রথম ওয়াজিব হওয়ায় একে কালাম নামে অভিহিত করা হয়েছে। আবার কালাম দ্বারা অর্জিত অন্যান্য ইলম থেকে একে স্বতন্ত্র রাখতে এ (কালাম) নামটি এ ইলমের সাথে খাছ করে দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য ইলমের ক্ষেত্রে এ নামটি ব্যবহার করা হয় নি। যদিও নামকরণের কারণ সেগুলোর মধ্যেও বিদ্যমান।

(৫) অন্যান্য বিদ্যা কিতাব অধ্যায়ন ও চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমেও অর্জিত হয়। কিন্তু এ বিদ্যাটি দ্বিপক্ষীয় কালাম ও আলোচনা-পর্যালোচনার মাধ্যমে অর্জিত হয়। দ্বিপক্ষীয় কালাম এবং আলোচনা পর্যালোচনা না হওয়া পর্যন্ত কেউ এ বিষয়টির পূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে পারে না এবং কেউ বাগ্মী ও তর্কবিদ হতে পারে না। কেমন যেন কালাম বা কথোপকথন এ বিদ্যা অর্জন ও তাতে দক্ষতা সৃষ্টির উপায়। বিধায় تسمية الشئ باسم السبب। হিসেবে এ বিদ্যাকে কালাম বলা হয়।

(৬) এ শাস্ত্রের সম্পর্ক বস্তুতঃ আকীদাগত বিষয়াদির সাথে। আর আকীদাগত বিষয়াদিতে বিতর্ক ও বিরোধ তুলনামূলক বেশী। কাজেই বিরোধ মীমাংসা ও প্রতিপক্ষের মতামত খণ্ডন করতে প্রতিপক্ষের সাথে কালাম এবং আলোচনা-পর্যালোচনার তীব্র প্রয়োজন দেখা দেয়। সুতরাং বলা যায়, এ শাস্ত্রটি কালাম বা কথোপকথণের মুখাপেক্ষী এবং কালাম হল محتاجُ اليه। ফলে تسمية المحتاج باسم المحتاج اليه হিসেবে এ শাস্ত্রকে কালাম বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

(৭) কোন বিষয়ে দুজন ব্যক্তি নিজ নিজ মতামত ব্যক্ত করল। কিন্তু তাদের একজনের কথা দলীলনির্ভর হওয়ায় বেশী শক্তিশালী বলে বিবেচিত হল। যেমন, সে সুনির্দিষ্টভাবে দৃঢ়তার সাথে বলে দিল, এটাই আসল কথা। তাহলে এ ব্যক্তির কথাটি দলীলনির্ভর হওয়ায় অধিক যোগ্যতা লাভ করেছে। পক্ষান্তরে অপর ব্যক্তির কথা যেন কথা হওয়ারই যোগ্য নয়। তেমনি এ শাস্ত্র তার দলীল-প্রমাণ শক্তিশালী হওয়া এমন হয়ে গেছে, যেন এটাই কালাম বা কথা। আর অন্যান্য শাস্ত্র তার মোকাবিলায় কালাম বা কথা হওয়ার উপযুক্তই নয়।

(৮) এ শাস্ত্রের বিষয়াদি এমন অকাট্য ও যুক্তিসংগত, যার বেশীর ভাগই নকলী দলীল-প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্থ ও সমর্থিত। ফলে তা অন্তরে বেশী প্রতিক্রিয়াশীল ও দ্রুত রেখাপাত করে। যেন তা বুক চিরে ও ক্ষতবিক্ষত করে অন্তরে ঢুকে পড়ে। বিধায় এ শাস্ত্রকে কালাম নামে আখ্যা দেওয়া হয়েছে, যা كلم (যখম করা, ক্ষত বিক্ষত করা) ধাতু থেকে নির্গত।

কারা সেই স্বৈরাচারী জালিম ?

حَتّٰى اَنَّ بَعْضَ الْمُتَغَلِّبَةِ : এখানে খলীফা মামুন, মু'তাছিম প্রমূখ উদ্দেশ্য। এরা মু'তাযিলাদের একনিষ্ঠ সাহায্যকারী ছিল। তারা ঈমান ও কুফরের মাপকাঠি নিরুপন করেছিল خلق قران এর বিষয়টিকে। ফলে হকপন্থী অনেক আলেমকে خلق قران এর প্রবক্তা না হওয়ায় হত্যা করেছে। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ. কে কঠিন স্বশ্রম কারাদণ্ডও প্রদান করেছে।

প্রবীনদের ইলমে কালাম

هٰذَا هُوَ كَلَامُ الْقُدَمَاءِ : অর্থাৎ পূর্ববর্তী মনীষীগণ ইলমে কালামের বিষয়াদি এমন অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত করতেন, যার বেশীর ভাগই নকলী দলীলাদি দ্বারা সমর্থিত ছিল। তাতে যুক্তিদর্শনের কোন সংমিশ্রণই ছিল না। ফলে তাদের ইলমে কালামকে ইলমে কালামে নকলীও বলা যায়।

وَمُعْظَمُ خِلَافِيَاتِهِ مَعَ الْفِرَقِ الْاِسْلَامِيَّةِ خُصُوْصًا الْمُعْتَزِلَةَ لِاَنَّهُمْ اَوَّلُ فِرْقَةٍ اَسَّسُوْا قَوَاعِدَ الْخِلَافِ لِمَا وَرَدَ بِهِ ظَاهِرُ السُّنَّةِ وَجَرٰى عَلَيْهِ جَمَاعَةُ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ فِيْ بَابِ الْعَقَائِدِ وَذٰلِكَ لِاَنَّ رَئِيْسَهُمْ وَاصِلُ بْنُ عَطَاءٍ اِعْتَزَلَ عَنْ مَجْلِسِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ رَحِمَهُ اللّٰهُ يُقَرِّرُ اَنَّ مَنِ ارْتَكَبَ الْكَبِيْرَةَ لَيْسَ بِمُؤْمِنٍ وَلَا كَافِرٍ وَيُثْبِتُ الْمَنْزِلَةَ بَيْنَ الْمَنْزِلَتَيْنِ فَقَالَ الْحَسَنُ قَدِ اعْتَزَلَ عَنَّا فَسُمُّوا الْمُعْتَزِلَةَ وَهُمْ سَمَّوْا اَنْفُسَهُمْ اَصْحَابَ الْعَدْلِ وَالتَّوْحِيْدِ لِقَوْلِهِمْ بِوُجُوْبِ ثَوَابِ الْمُطِيْعِ وَعِقَابِ الْعَاصِيْ عَلَى اللّٰهِ تَعَالٰى وَنَفْيِ الصِّفَاتِ الْقَدِيْمَةِ عَنْهُ

সহজ তরজমা

প্রবীনদের সাথে কাদের মতানৈক্য ছিল বেশি ?

মুতাকাদ্দেমীনদের বেশীর ভাগ মতানৈক্য ছিল ইসলামী ফিরকাগুলোর সাথে, বিশেষভাবে মুতাযিলাদের সাথে। কেননা এরাই হল সর্বপ্রথম দল, যারা আকীদাগত সুস্পষ্ট সুন্নতের বিবরণ এবং সাহাবায়ে কিরামের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে (অলিক) নীতিমালা প্রনয়ণ করেছে। তার কারণ ছিল, তাদের নেতা ওয়াছেল ইবনে আতা হযরত হাসান বসরী রহ. এর মজলিস থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল। সে বলত, কবীরা গুণাহে লিপ্ত ব্যক্তি মুমিনও নয়; কাফিরও নয়। এভাবে সে ঈমান ও কুফরীর মাঝে তৃতীয় আরেকটি স্তর দাঁড় করাত। তখন হযরত হাসান বসরী রহ. বললেন, সে আমাদের দল থেকে আলাদা হয়ে গেছে। ফলে তাদেরকে معتزله (বিচ্ছিন্নতাবাদি) নামে অভিহিত করা হয়। অবশ্য তারা নিজেদেরকে اصحاب العدل والتوحيد (ইনসাফ ও তাওহীদপন্থী) নাম রেখেছে। কেননা তারা দাবী করত, আল্লাহর উপর তার অনুগত ও বাধ্যগত বান্দাকে বিনিময় দেওয়া এবং নাফরমান ও অবাধ্য বান্দাকে শাস্তি দেওয়া আবশ্যক। আর আল্লাহ তা'আলা صفات قديمة (চিরন্তন গুণাবলী) এর অধিকারী নন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

নকলী দলীল প্রাধান্য পাওয়ার কারণ

ومعظم خلافياته ঃ ইতোপূর্বেই শারেহ রহ. তার هذا هو كلام القدماء উক্তি দ্বারা প্রমাণ করেছেন, মুতাকাদ্দিমীনদের ইলমে কালামে যৌক্তিক দলীলের উপর নকলী দলীলকে অগ্রাধিকার দিতেন। এখানে এবার তিনি তার কারণ দর্শাতে গিয়ে বলেন, মুতাকাদ্দিমীনরা কেবল ইসলামী ফিরকাসমূহ যেমন, মুতাযিলা, খারেজী ও রাফেযীদের বিরোধিতার সম্মুখীন ছিলেন। এদের প্রত্যেকেরই কুরআন-সুন্নাহর প্রতি ঈমান ছিল। বিধায় তাদের মুকাবিলায় কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা দলীল পেশ করাই যথেষ্ট ছিল। এর বাইরে যাওয়ার আদৌ কোন প্রয়োজন ছিল না। তাছাড়া তৎকালীন মুসলমানরা ইউনানী দর্শনের সাথে পরিচিত ছিল না। ফলে আকাইদ শাস্ত্রে সৃষ্ট সংশয় ও সন্দেহাবলী নিরসনে দার্শনিক ভঙ্গিতে দলীল পেশ করারও কোন প্রয়োজন দেখা দেয় নি।

মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের গোড়াপত্তন

وذالك لان رئيسهم ঃ শারিহ রহ. এখানে মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের গোড়া পত্তনের (ইতিহাস) আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত আমলকে কামালে ঈমান বা ঈমানের পরিপূর্ণতার অংশ সাব্যস্ত করেন। যার অর্থ হচ্ছে, আমলে ঘাটতি দেখা দিলে ঈমান থাকে বটে; কিন্তু তা কামেল বা পরিপূর্ণ থাকে না। পক্ষান্তরে মুতাযিলাদের মতে আমল তথা ওয়াজিব বিষয়গুলো পালন করা এবং নিষিদ্ধ বিষয়গুলো বর্জন করা মূল ঈমানের অংশ, যা না হলে ঈমানই অবশিষ্ট থাকে না। সুতরাং কবীরা গুণাহ বর্জন করাও যেহেতু মূল ঈমানের অংশ, ফলে তা বর্জন করাও মূল ঈমানের অংশ হবে। তাছাড়া মুতাযিলা সম্প্রদায়ের মতে كفر এর বাস্তবতা হল, নবী করীম ﷺ যা নিয়ে এসেছেন, তাকে মিথ্যা প্রতিপন্নতা এবং প্রকাশ্যে তা অস্বীকার করা। কাজেই তাদের মতে কবীরা গুণাহে লিপ্ত ব্যক্তি হাকীকতে ঈমানের অংশ কবীরা গুণাহ বর্জন না করায় ঈমান থেকে খারিজ হয়ে যাবে। আবার كفر এর হাকীকত তথা মিথ্যা প্রতিপন্ন করা না পাওয়া যাওয়ায় কুফরীর অন্তর্ভূক্ত হবে না।

সুতরাং হাসান বসরী রহ. এর মজলিসে যখন জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, আমাদের যুগে কিছু সংখ্যক লোক বলে, কবীরা গুণাহে লিপ্ত ব্যক্তি মুমিনই নয়। আবার কিছু সংখ্যক লোক বলে, ঈমান থাকাবস্থায় কোন গুণাহেই ক্ষতি নেই। এখন আপনিই বলুন, আমরা কার কথা সত্য মনে করব? হাসান বসরী রহ. ভাবতে লাগলেন, ইত্যাবসরে ওয়াছিল বিন আতা বলে উঠল, কবীরা গুণাহে লিপ্ত ব্যক্তি মুমিনও নয় কাফিরও নয়। এভাবে সে ঈমান ও কুফরীর মাঝে নতুন এক স্তর দাঁড় করেছে।

যার প্রেক্ষিতে হাসান বসরী রহ. বললেন, সে আমাদের দল থেকে আলাদা হয়ে গেছে। সেদিন থেকে ওয়াছিল বিন আতা ও তার অনুসারীদেরকে মু'তাযিলা তথা হক্ব জামাত বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায় বলা হয় এবং ওয়াছিল বিন আতাকে মু'তাযিলা মতাদর্শের প্রবর্তক চিহ্নিত করা হয়।

স্বঘোষিত আদল ও তাওহীদপন্থী

কিন্তু সত্য পথচ্যুত এ গোষ্ঠী নিজেদেরকে اصحاب العدل والتوحيد পরিচয় দেয়। কারণ, তারা বলে, আল্লাহ তা'আলার উপর আনুগত্যশীল বান্দাকে নেক ও বিনিময় প্রদান আর গুণাহগারকে শাস্তি প্রদান করা ওয়াজিব। কেননা এটাই হল, ইনসাফ ও ন্যায়নীতির দাবী। পক্ষান্তরে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত তদ্দত্তরে বলেন, আল্লাহ তা'আলার উপর কোন কিছুই ওয়াজিব নয়। কেননা অনুগত-অবাধ্য সকলেই আল্লাহর বান্দা ও অধীনস্থ। আর মালিকের জন্য মালিকানাধীন বস্তুতে যে কোন ধরনের হস্তক্ষেপের অধিকার রয়েছে। কাজেই আল্লাহ তা'আলা অনুগত বান্দাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করলে তা হবে ইনসাফ আর জান্নাতে দিলে, তা হবে তার অনুগ্রহ-অনুকম্পা।

তাছাড়া اصحاب توحيد নাম রাখার কারণ হল, তারা আল্লাহ তা'আলার صفات قديمه তথা চিরন্তন গুণাবলী যেমন ইলম, হায়াত, কুদরত ইত্যাদি স্বীকার করে না বরং বলে, এটাই তাওহীদ ও একত্ববাদের দাবী। কারণ, আল্লাহ তা'আলার صفات قديمه (চিরন্তন গুণাবলী) মেনে নিলে একাধিক قديم (চিরন্তন) মেনে নিতে

হয়। যা তাওহীদ পরিপন্থী। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত তদুত্তরে বলেন, توحيد বলতে বুঝায়, قديم সত্ত্বা শুধু একজন। এ হিসেবে একাধিক সত্ত্বাকে قديم মেনে নেওয়া তাওহীদ পরিপন্থী। কিন্তু একাধিক গুণাবলীকে قديم সাব্যস্থ করা তাওহীদ পরিপন্থী নয়।

ওয়াসেল ইবনে আতার পরিচয়

তিনি ৮০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। মহান ও প্রসিদ্ধ তাবেঈ হযরত হাসান বসরী রহ. (যার জন্ম ২১ হিজরী সনে) এর ছাত্র ছিলেন। হাসান বসরী রহ. এর পিতা আবুল হাসান ইয়াসার ছিলেন প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত যায়েদ বিন ছাবিত আনসারী রাযি. এর আযাদকৃত গোলাম। আর তার মাতা ছিলেন উম্মুল মোমেনীন হযরত উম্মে সালমা রাযি. এর আযাদকৃতা। হাসান বসরী রহ. ১১০ হিজরী সনে পরলোক গমন করেন।

ঈমান ও কুফরের মধ্যবর্তী স্তর

يُثْبِتُ الْمَنْزِلَةَ بَيْنَ الْمَنْزِلَتَيْنِ ঃ এখানে ঈমান ও কুফরীর মধ্যবর্তী একটি স্তর উদ্দেশ্য; জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী কোন স্তর নয়। যেমন, منزلة بين المنزلتين বলায় কিছু সংখ্যক লোকের মতিভ্রম ঘটেছে। কেননা মুতাযিলা সম্প্রদায়ও বলে না যে, কবীরা গুণাহে লিপ্ত ব্যক্তি জান্নাত এবং জাহান্নাম কোনটিতেই প্রবেশ করবে না বরং তারা বলে, কবীরা গুণাহে লিপ্ত ব্যক্তি তওবা বিহীন মারা গেলে কাফিরদের মত চির জাহান্নামী হবে।

لِقَوْلِهِمْ بِوُجُوْبِ ثَوَابِ الْمُطِيْعِ ঃ এটা اصحاب العدل নামকরণের কারণ।

وَنَفْيِ الصِّفَاتِ الْقَدِيْمَةِ ঃ এটা اصحاب التوحيد নামকরণের কারণ।

তথাকথিত আদল ও তাওহীদপন্থীদের ভ্রান্তি

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত বলেন, মু'তাযিলাদের توحيد ও عدل বড় বিস্ময়কর। কেননা তাদের তাওহীদ দ্বারা ইনসাফ বাতিল হয়ে যায়। আর আদল-ইনসাফ দ্বারা توحيد বাতিল হয়ে যায়। প্রথমতঃ তারা যখন توحيد বাঁচাতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী অস্বীকার করল, তখন "কালাম" গুণটিকেও অস্বীকার করা হল। আর কালাম গুণটিকে অস্বীকার করা মানে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কোন বিষয়ের আদেশ-নিষেধকেও অস্বীকার করা। কেননা امر ও نهى (আদেশ-নিষেধ) কালাম -এরই প্রকার। তাহলে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যখন কোন আদেশ-নিষেধ নেই, এমতাবস্থায় গুণাহের কারণে কাউকে সাজা প্রদান করা জুলুম হবে। সুতরাং তাদের কথিত আদল-ইনসাফ আর রইল কোথায়? দ্বিতীয়তঃ মু'তাযিলারা বলে, আল্লাহ তা'আলা বান্দার কাজের স্রষ্টা বা খালেক নন, অন্যথায় বান্দারা তাদের কর্মের সাজা বা বিনিময় লাভ করলে তা হবে উধোর পিণ্ডি ভুদোর ঘাড়ে, যা নিতান্তই জুলুম। কাজেই ইনসাফের দাবী মতে বান্দা নিজেই তার কাজের خَالِقْ বা স্রষ্টা হবে। সুতরাং তাদের বক্তব্য অনুসারে বান্দা সৃজনে আল্লাহ তা'আলার অংশীদার সাব্যস্ত হল, যা খোদায়ী ঘোষণা اَلَا لَهُ الْخَلْقُ এর বিরোধী। এমতাবস্থায় তাদের তাওহীদই থাকল কোথায়?

ثُمَّ اِنَّهُمْ تَوَغَّلُوْا فِىْ عِلْمِ الْكَلَامِ وَتَشَبَّثُوْا بِاَذْيَالِ الْفَلَاسِفَةِ فِىْ كَثِيْرٍ مِّنَ الْاُصُوْلِ وَالْاَحْكَامِ وَشَاعَ مَذْهَبُهُمْ فِيْمَا بَيْنَ النَّاسِ اِلٰى اَنْ قَالَ الشَّيْخُ اَبُو الْحَسَنِ الْاَشْعَرِىُّ لِاُسْتَاذِهٖ اَبِىْ عَلِىِّ الْجُبَّائِىْ مَاتَقُوْلُ فِىْ ثَلٰثَةِ اِخْوَةٍ مَاتَ اَحَدُهُمْ مُطِيْعًا وَالْاٰخَرُ عَاصِيًا وَالثَّالِثُ صَغِيْرًا فَقَالَ اِنَّ الْاَوَّلَ يُثَابُ فِى الْجَنَّةِ وَالثَّانِىْ يُعَاقَبُ فِى النَّارِ وَالثَّالِثُ لَايُثَابُ وَلَايُعَاقَبُ فَقَالَ الْاَشْعَرِىُّ فَاِنْ قَالَ الثَّالِثُ يَارَبِّ لِمَا اَمَتَّنِىْ صَغِيْرًا وَمَا اَبْقَيْتَنِىْ اِلٰى اَنْ اَكْبُرَ فَاُوْمِنَ بِكَ وَاُطِيْعَكَ فَاَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَمَاذَا يَقُوْلُ الرَّبُّ فَقَالَ يَقُوْلُ الرَّبُّ اِنِّىْ كُنْتُ اَعْلَمُ مِنْكَ اَنَّكَ لَوْكَبُرْتَ لَعَصَيْتَ فَدَخَلْتَ النَّارَ فَكَانَ الْاَصْلَحُ لَكَ اَنْ تَمُوْتَ صَغِيْرًا فَقَالَ الْاَشْعَرِىُّ فَاِنْ قَالَ الثَّانِىْ يَارَبِّ لِمَ لَمْ تُمِتْنِىْ صَغِيْرًا لِئَلَّا اَعْصِىَ لَكَ فَلَا اَدْخُلَ النَّارَ فَمَاذَا يَقُوْلُ الرَّبُّ فَبُهِتَ الْجُبَّائِىُّ وَتَرَكَ الْاَشْعَرِىُّ مَذْهَبَهٗ فَاشْتَغَلَ هُوَ وَمَنْ تَبِعَهٗ بِاِبْطَالِ رَاْىِ الْمُعْتَزِلَةِ وَاِثْبَاتِ مَاوَرَدَ بِهِ السُّنَّةُ وَمَضٰى عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ فَسُمُّوْا اَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ

সহজ তরজমা

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের গোড়াপত্তন

অতঃপর মুতাযিলা সম্প্রদায় কালাম শাস্ত্র নিয়ে সিমাহীন ব্যস্ত হয়ে পড়ল। অনেক মূলনীতি ও হুকুম আহকামে দার্শনিকদের আচল জড়িয়ে ধরল। আর তাদের মতাদর্শ জনগণের মাঝে ছড়িয়ে পড়ল। এমনকি একদিন শাইখ আবুল হাসান আশ'আরী রহ. আপন উস্তাদ আবু আলী জুব্বায়ীকে বললেন, এমন তিন ভাই সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি –যাদের একজন অনুগত হয়ে এবং দ্বিতীয়জন অপরাধী হয়ে আর তৃতীয়জন শৈশবে মারা গেল? তখন তিনি (উস্তাদ) বললেন, প্রথমজনকে জান্নাতে প্রতিদান দেওয়া হবে। দ্বিতীয়জনকে জাহান্নামে শাস্তি প্রদান করা হবে আর তৃতীয়জন না জান্নাতে যাবে; আর না জাহান্নামে। অতঃপর (আবুল হাসান) আশ'আরী বললেন, যদি তৃতীয়জন বলে, হে প্রভু! শৈশবে কেন আমার মৃত্যু দান করলে? প্রাপ্ত বয়স পর্যন্ত কেন আমায় বাঁচিয়ে রাখলে না? তাহলে তো আমি তোমার প্রতি ঈমান আনতাম ও তোমার আনুগত্য করতাম। তাতে আমি জান্নাতে প্রবেশ করতাম। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা কি উত্তর দিবেন? তিনি (উস্তাদ) বললেন, আল্লাহ তা'আলা বলবেন– তোমার ব্যাপারে আমি ভাল করে জানতাম যে, তুমি বড় হয়ে অবাধ্য হবে। ফলে জাহান্নামে যাবে। কাজেই শৈশবে মৃত্যুবরণ করাই তোমার জন্য ভাল ছিল। অতঃপর আশ'আরী বললেন, দ্বিতীয়জন যদি বলে, হে প্রভু! আপনি শৈশবে কেন আমাকে মৃত্যু দান করেন নি? তাহলে তো আমি অবাধ্যও হতাম না আর জাহান্নামেও যেতাম না। তখন আল্লাহ তা'আলা কি উত্তর দিবেন? এতে আবু আলী জুব্বায়ী হতবম্ভ হয়ে গেল। তখন থেকেই আবুল হাসান আশ'আরী রহ. তার (উস্তাদের) মতাদর্শ বর্জন করলেন এবং তিনি ও তার অনুসারীরা মুতাযিলাদের মতাদর্শের অসারতা প্রমাণ এবং সুন্নাতে রাসূল যা বর্ণনা করেছে ও সাহাবায়ে কিরাম যার উপর চলেছেন, তা প্রমাণে লিপ্ত হলেন। এ কারণেই তাদেরকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জান্নাত নামে অভিহিত করা হয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের উত্থান-পতন

পূর্বেই বলা হয়েছে, হযরত হাসান বসরী রহ. এর জামানায় মুতাযিলাদের আবির্ভাব হয়েছিল। যিনি ১১০ হিজরী সনে পরলোকগমণ করেন। তারপর যখন ১৩৭ হিজরীতে আবু জাফর মানসুর আব্বাসী খলীফা নিযুক্ত

হলেন এবং বাগদাদে তার প্রতিষ্ঠিত ইদারায়ে বাইতুল হিকমাহ হতে ইউনানী দর্শনের বইগুলোর অনুবাদ শুরু হল, তখন মুসলমানরা ইউনানী দর্শনের সাথে পরিচিত হন। বেশি বেশি অন্যান্য মাযহাবের আলেম ও দার্শনিকদের সাথে মেলামেশা হতে থাকে এবং দলীল-প্রমাণ পেশ ও আলোচনা-পর্যালোচনার এক নতুন ধারা সামনে আসে। ফলে কুরআন সৃষ্ট, মানুষ বাধ্য, তাকদীর, আল্লাহর দিদার অসম্ভব ইত্যাদি নতুন নতুন অনেক বিষয়ের জন্ম হয়। ধর্মীয় দর্শনের এ দলটির নেতৃত্বে ছিল মুতাযিলা সম্প্রদায়। তথাপি হারুনুর রশীদের শাসনামল পর্যন্ত মুতাজিলা সম্প্রদায় উন্নতি লাভ করতে সক্ষম হয় নি। ১৯৮ হিজরী সনে মামুনুর রশীদ খেলাফতের মসনদে অধিষ্ঠিত হলেন। তিনি ছিলেন ইউনানী দর্শন ও যুক্তিবাদে প্রভাবিত এবং মুতাযিলা মতাদর্শের মদদদাতা এবং বলিষ্ঠ আহবায়ক। মুতাযিলা সম্প্রদায় তার যুগেই সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিল। খলীফা মামুন মুহাদ্দিসগণকে (যারা মুতাযিলাদের বিরোধী ছিল) خلق قران এর বিষয়ে জোরপূর্বক মুতাযিলাদের পক্ষপাতি বানাতে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছে। কোন কোন মুহাদ্দিসকে خلق قران এর প্রবক্তা না হওয়ায় হত্যা করেছে। মামুনের ইন্তেকালের পর মু'তাসিম ও ওয়াসিক তার ওয়াসিয়াত মুতাবিক মুতাযিলা মতাদর্শ গ্রহণ করে এবং মুহাদ্দিসগণের মধ্য হতে বিশেষতঃ ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. কে "কুরআন সৃষ্ট" বলে না মানায় জুলুম ও নির্যাতনের লক্ষ্যস্থল বানিয়েছে। কিন্তু মুতাওয়াক্কিল যখন খেলাফতের মসনদে আরোহন করলেন, যিনি মুতাযিলা মতদর্শের প্রতি নাখোশ ছিলেন এবং ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. এর ভক্ত ছিলেন, তিনি মুতাযিলাদেরকে সরকার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেন। ফলে তদের শক্তি ভেঙ্গে পড়ে।

আবুল হাসান আশ'আরী রহ. এর আবির্ভাব

ইমাম আহমাদ রহ. এর অতুলনীয় হিম্মত ও মনোবলের ফলশ্রুতিতে কুরআন সৃষ্ট হওয়ার বিষয়টি নিস্তেজ হয়ে পড়ে। কিন্তু অন্যান্য বিষয়াবলী সে সময়ও প্রাণবন্ত ছিল। মুতাযিলা সম্প্রদায় ঐ সব বিষয়াবলীতে দার্শনিক ভঙ্গিতে দলীল পেশ করত। ফলে জনসাধারণ প্রভাবিত হত। মনে করত, মুতাযিলারা গভীর জ্ঞানের অধিকারী ও বিচক্ষণ তাদের গবেষণা যুক্তির অতি নিকটবর্তী এবং মুতাযিলাদের প্রতিদ্বন্দ্বী মুহাদ্দিসগণ ও তাদের মতাবলম্বী আলেমগণ প্রমাণ পেশ করার নতুন ভঙ্গির দিকে লক্ষ্য করেন নি, যা মুতাযিলা ও দার্শনিকদের প্রভাবে প্রচলিত হয়ে পড়েছিল। ফলশ্রুতি আলোচনার মজলিসে মুহাদ্দিসগণের এ দুর্বলতা অনুভূত হত। এভাবে যাহেরী শরী'আত ও সালাফে সালেহীনের মতাদর্শের অবমাননা হচ্ছিল। স্বয়ং মুহাদ্দিসগণ ও তাদের শীর্ষদের অনেকে মুতাজিলাদের যুক্তিবাদ ও দার্শনিকতায় প্রভাবিত হয়ে পড়ছিল। ২৪১ হিজরীতে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. ইন্তেকালের পর হাম্বলী মাযহাবে তার মত প্রজ্ঞা সম্পন্ন আলেম জন্ম নেয় নি, যারা পরিস্থিতির মুকাবিলা করতে পারে। ফলে ইসলামের এমন একজন ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন ছিল, যিনি হবেন কুরআন ও সুন্নাহে পূর্ণ দক্ষ ও যুক্তিবাদের অলিগলি সম্পর্কে সম্যক অবগত। আল্লাহ তা'আলা শাইখ আবুল হাসান আশ'আরী রহ. এর আকারে সে পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্ব দান করলেন, যার নাম আবুল হাসান আলী। পিতার নাম ইসাঈল। তিনি ২৬০ হিজরী সনে বসরায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আবু মূসা আশ'আরী রাযি. এর বংশধর হওয়ায় তাকে আশ'আরী বলা হয়। শৈশবে তার পিতা ইসমাঈলের মৃত্যু হয়। তখন তার মা সমকালের প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও মুতাযিলা মতাদর্শের বলিষ্ঠ আহবায়ক আবূ আলী যুব্বায়ীর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। শাইখ আবুল হাসান আশ'আরী তারই কোলে লালিত পালিত হন। আবূ আলী যুব্বায়ী একজন সফল উস্তাদ এবং লেখক ছিলেন বটে। কিন্তু বাগ্মিতা ও আলোচনায় পারদর্শী ছিলেন না। পক্ষান্তরে আবুল হাসান আশ'আরী রহ. ছিলেন বড় আলোচক ও প্রত্যুৎপন্নমতি। আবু আলী জুব্বায়ী তাকে বিভিন্ন আলোচনায় আগে বাড়িয়ে দিতেন। বাহ্যতঃ মনে হত– মুতযিলা মতাদর্শ প্রচার-প্রসারে তিনি আপন উস্তাদ আবু আলী জুব্বায়ীকেও ছাড়িয়ে যাবেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তার মাধ্যমে কুরআন ও সুন্নাতের প্রচারের ইচ্ছা করেছেন। ফলে ব্যাখ্যাকার কর্তৃক বর্ণিত ঘটনাটি সংগঠিত হয়েছিল। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে শাইখ আবুল হাসান আশ'আরী রহ. এর জীবনের মোড় ঘুরে যায়।

উস্তাদের সাথে আশ'আরীর মতবিরোধ ঃ

ঘটনার বিবরণ ও তার পটভূমি হল, মুতাযিলারা বলত, اصلح للعباد। তথা বান্দার জন্য যা যা কল্যাণকর, তা দেওয়া আল্লাহ তা'আলার উপর ওয়াজিব। শাইখ আবুল হাসান রহ. এর উক্ত মূলনীতির ব্যাপারে কিছুটা অস্বস্তি দেখা দিল। তিনি স্বীয় উস্তাদ আবু আলী জুব্বায়ীকে জিজ্ঞসা করলেন, আপনি এমন তিন ভাইয়ের ব্যাপারে কি

বলেন– যাদের একজন আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যে জীবন-যাপন করে মৃত্যুবরণ করেছে। দ্বিতীয়জন জীবনভর নাফরমানী করে মারা গেল। আর তৃতীয়জন শৈশবেই মারা গেল, তাকে তো অনুগত বা নাফরমান কোনটাই বলা চলে না। কারণ, সে তো মুকাল্লাফ বা শরী'আতের আদিষ্টই ছিল না। উত্তরে আবু আলী জুব্বয়ী বললেন, প্রথমজনকে জান্নাতে প্রতিদান দেওয়া হবে। দ্বিতীয়জনকে জাহান্নামে শাস্তি প্রদান করা হবে। আর তৃতীয়জনকে শাস্তি ও বিনিময় কোনটিই প্রদান করা হবে না।

শাইখ আবুল হাসান আশ'আরী রহ. পুনরায় তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে তৃতীয়জন যদি বলে, হে প্রভু! তুমি কেন আমাকে বড় হতে দাও নি? তাহলে তো আমি তোমার আনুগত্য করে জান্নাতে যেতে পারতাম। তখন আল্লাহ তা'আলা কি উত্তর দিবেন? আবু আলী জুব্বায়ী মুতাযিলীদের وجوب اصلح আকীদার ভিত্তিতে উত্তর দিলেন, আল্লাহ তা'আলা বলবেন– তোমার ব্যাপারে আমার জানা ছিল যে, তুমি বড় হয়ে নাফরমানী করবে এবং জাহান্নামে যাবে। তাই তোমার জন্য শৈশবে মারা যাওয়াই কল্যাণকর ছিল। শাইখ আবুল হাসান রহ. পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, তখন যদি দ্বিতীয়জন বলে, হে আল্লাহ! কেন তুমি আমাকে শৈশবে মৃত্যু দিলে না? তাহলে তো আমি তোমার আবাধ্য হয়ে জাহান্নামে যেতাম না। তখন আল্লাহ তা'আলা কি বলবেন? এ প্রশ্ন শুনে আবু আলী জুব্বায়ী নিরুত্তর-লাজওয়াব হয়ে গেলেন। তখন থেকেই শাইখ আবুল হাসান রহ. মুতাযিলাদের আকীদার বিরোধী হয়ে গেলেন।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পরিচয়

তিনি অনুভব করলেন, এগুলো ধারণা মাত্র। বস্তুতঃ সাহাবয়ে কিরাম ও সালাফে সালেহীনের মতাদর্শ সত্যনিষ্ঠ ও যথার্থ ছিল। কাজেই দীর্ঘ চল্লিশ বছর মুতাযিলা মতাদর্শের সহগযোগীতা ও প্রচারের পরও তার অন্তরে এসবের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্রোহ জন্ম নেয়। সুতরাং জামে মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে তিনি ঘোষণা দেন, আমি অদ্যাবদি মুতাযিলা ছিলাম। আমার অমুক অমুক আকীদা ছিল। এখন আমি এ সব আকীদা থেকে তওবা করছি। আজ থেকে মুতাযিলাদের মতামত খণ্ডন করা এবং তাদের দুর্বলতা প্রকাশ করাই আমার কাজ। ফলে সেদিন থেকেই তিনি তার অনুসারীসহ হাদীস ও সুন্নাতের বর্ণনাকৃত এবং সাহাবায়ে কিরামের অনুসৃত পথের সহযোগিতা ও প্রচারে আত্মনিয়োগ করলেন। এজন্যই এদেরকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত নামে আখ্যায়িত করা হয়।

তৎকালীন সময়ে ইসলামী জগতের আরেক এলাকা মাওয়ারাউন্ নাহরে অপর একজন আলেম শাইখ আবু মান্সূর মাতুরিদী রহ. ইলমে কালামের প্রতি মনোনিবেশ করেন। তিনি আশ'আরী ইলমে কালামের অংশভুক্ত অতিরিক্ত বিষয়াদি বাদ দিয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ইলমে কালামকে আরও বেশী মধ্যমপন্থী, সম্পূরক ও সুসংহত করেন। এভাবেই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত আশ'আরী ও মাতুবিদী দুটি গবেষণা কেন্দ্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে। শাইখ আবু মানসূর মাতুরিদী ফিকহী দৃষ্টিকোণ থেকে হানাফী আর আবুল হাসান আশ'আরী রহ. ছিলেন শাফিঈ। এরই ভিত্তিতে শাফিঈ আলেম ও মুতাকাল্লিমগণ উসূল ও আকাইদে আশ'আরী, যেমনিভাবে হানাফী উলামায়ে কিরাম ও মুতাকাল্লিমগণ হলেন মাতুরিদী। বস্তুতঃ আশ'আরী ও মাতুরিদীগণের মধ্যকার মতবিরোধগুলো শাখাগত (মৌলিক নয়)। তাদের মাঝে বিরোধপূর্ণ মাসআলা সর্বোচ্চ ত্রিশটি –এর বেশীর ভাগই শব্দগত বিরোধ।

ثُمَّ لَمَّا نُقِلَتِ الْفَلْسَفَةُ عَنِ الْيُوْنَانِيَّةِ اِلَى الْعَرَبِيَّةِ وَخَاضَ فِيْهِ الْاِسْلَامِيُّوْنَ وَحَاوَلُوْا الرَّدَّ عَلَى الْفَلَاسِفَةِ فِيْمَا خَالَفُوْا فِيْهِ الشَّرِيْعَةَ فَخَلَطُوْا بِالْكَلَامِ كَثِيْرًا مِنَ الْفَلْسَفَةِ لِيَتَحَقَّقُوْا مَقَاصِدَهَا فَيَتَمَكَّنُوْا مِنْ اِبْطَالِهَا وَهَلُمَّ جَرًّا اِلَى اَنْ اَدْرَجُوْا فِيْهِ مُعْظَمَ الطَّبْعِيَّاتِ وَالْاِلٰهِيَّاتِ وَخَاضُوْا فِي الرِّيَاضِيَّاتِ حَتّٰى كَادَ لَا يَتَمَيَّزُ عَنِ الْفَلْسَفَةِ لَوْلَا اِشْتِمَالُهُ عَلَى السَّمْعِيَّاتِ وَهٰذَا هُوَ كَلَامُ الْمُتَأَخِّرِيْنَ ـ

সহজ তরজমা

ইলমে কালামের সাথে দর্শনশাস্ত্রের সংমিশ্রণ

অতঃপর দর্শন শাস্ত্র যখন ইউনানী ভাষা হতে আরবীতে রূপান্তরিত হল, মুসলমানরাও তা শিখায় রত হলেন এবং যেসব মৌলিক বিষয়ে দার্শনিকরা শরী'আতে ইসলামীর বিরোধিতা করেছেন, তা খণ্ডাতে লাগলেন, তখন তারা কালাম শাস্ত্রে দর্শনের বেশ সংমিশ্রণ ঘটালেন, যাতে তার বিষয়াদি প্রমাণ করে তা খণ্ডাতে পারেন। এভাবে সংমিশ্রণ করতে করতে এক পর্যায়ে প্রকৃতি বিদ্যা ও ইলমে ইলাহির বিরাট অংশ ইলমে কালামের অন্তর্ভুক্ত করে দিলেন এবং গণিত শাস্ত্রেও লিপ্ত হলেন। এমনকি ইলমে কালাম দর্শন শাস্ত্র থেকে পৃথক না থাকারই উপক্রম হল। যদি তা سمعى ও نقلى (বিবরণ) সম্পৃক্ত না হত। আর এটাই হল মুতাআখ্খিরীনদের ইলমে কালাম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

কেন এই সংমিশ্রণ ?

উল্লেখিত ইবারতে কালাম শাস্ত্রে দর্শনের সংমিশ্রণের কারণ এবং মুতাআখ্খিরীন ও মুতাকাদ্দিমীনদের কালাম শাস্ত্রে বিদ্যমান পার্থক্যের কারণ আলোচনা করা হয়েছে। সারকথা, ইউনানী দর্শন যার অনেক উসূল এবং মূলনীতি ইসলামী শরী'আতের সাথে সাংঘর্ষিক, এর সূচনা খলীফা মানসূর আব্বাসীর যুগে হলেও মামুনের খেলাফত আমলে বেশী কাজ হয়েছে। তখন মুসলমান উলামায়ে কিরাম ও মুতাকাল্লিমীন তা অর্জনে আত্মনিয়োগ করেন এবং তারা দর্শনের শরী'আত বিরোধী মূলনীতিসমূহকে খণ্ডন এবং তাদেরই ভাষা ও পরিভাষায় আলোচনা-পর্যালোচনা করে ইসলামী আকাইদ عقل (যুক্তি) ও نقل (বর্ণিত দলীল-প্রমাণ) এর সাথে একেবারেই সংগতিপূর্ণ বলে প্রমাণ করার ইচ্ছা করলেন। এ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সামনে রেখেই তারা কালাম শাস্ত্রে দর্শনের যথেষ্ট সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন।

অনুজদের ইলমে কালাম ঃ

ইলমে কালামে দর্শনের এ সংমিশ্রণ অব্যাহত থাকে। এমনকি প্রকৃতি বিদ্যা ও ইলমে ইলাহির বেশ কিছু অংশ বরং গণিত শাস্ত্রেরও কিছু অংশ ইলমে কালামের আওতাভুক্ত করে কালাম শাস্ত্রকে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছেন, যদি কালাম শাস্ত্রে سمعى (শ্রুত) ও نقلى (ঐতিহ্যগত) কিছু মাসআলা যেমন– কবর, হাশর-নশর, জান্নাত-দোজখ ইত্যাদি না থাকত, তাহলে দর্শন ও কালাম শাস্ত্রের মাঝে কোন পার্থক্যই থাকত না। দর্শন মিশ্রিত এই ইলমে কালামই হল متاخرين তথা অনুজ উলামায়ে কিরামের ইলমে কালাম। অপরদিকে মুতাকাদ্দিমীনদের ইলমে কালাম ছিল দর্শনের ছোঁয়া মুক্ত।

وَبِالْجُمْلَةِ هُوَ اَشْرَفُ الْعُلُوْمِ لِكَوْنِهٖ اَسَاسَ الْاَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَرَئِيْسَ الْعُلُوْمِ الدِّيْنِيَّةِ وَكَوْنِ مَعْلُوْمَاتِهٖ الْعَقَائِدَ الْاِسْلَامِيَّةَ وَغَايَتُهُ الْفَوْزُ بِالسَّعَادَةِ الدِّيْنِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّةِ وَبَرَاهِيْنُهُ الْحُجَجُ الْقَطْعِيَّةُ الْمُؤَيَّدُ اَكْثَرُهَا بِالْاَدِلَّةِ السَّمْعِيَّةِ وَمَا نُقِلَ عَنِ السَّلَفِ مِنَ الطَّعْنِ فِيْهِ وَالْمَنْعِ عَنْهُ فَاِنَّمَا هُوَ لِلْمُتَعَصِّبِ فِي الدِّيْنِ وَالْقَاصِرِ عَنْ تَحْصِيْلِ الْيَقِيْنِ وَالْقَاصِدِ اِلَى اِفْسَادِ عَقَائِدِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْخَائِضِ فِيْمَا لَا يَفْتَقِرُ اِلَيْهِ مِنْ غَوَامِضِ الْمُتَفَلْسِفِيْنَ وَاِلَّا فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ الْمَنْعُ عَمَّا هُوَ اَصْلُ الْوَاجِبَاتِ وَاَسَاسُ الْمَشْرُوْعَاتِ ۔

সহজ তরজমা

ইলমে কালাম সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ

মোটকথা, (ইলমে কালাম চাই তা মুতাকাদ্দিমীনদের হোক কিংবা মুতাআখ্খিরীনদের হোক) এ শাস্ত্র অন্যান্য সকল শাস্ত্র অপেক্ষা বেশী শ্রেষ্ঠ। কারণ, এটি শরঈ আহকামের মূল উৎস, উলূমে দীনিয়ার প্রধান, তার আলোচ্য বিষয় ইসলামী আকাইদ সংক্রান্ত, তার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য দ্বীনী ও দুনিয়াবী সৌভাগ্য লাভ করা। তার প্রমাণাদি এমন অকাট্য –যার বেশীর ভাগ নকলী দলিলাদি দ্বারাও সমর্থিত। আর সালাফে সালেহীন কর্তৃক এ ব্যাপারে যে সমালোচনা ও অভিযোগ এবং তা অর্জন করার যে নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে, তা কেবল দ্বীনের ব্যাপারে একগোঁয়েমী, ইয়াকীন তথা দৃঢ়তা ও নিশ্চয়তা লাভে অক্ষম। মুসলমানদের ঈমান-আকীদা বিনষ্টকারী ও দার্শনিকদের অহেতুক সূক্ষ্ম বিষয়াবলী নিয়ে ব্যস্ত ব্যক্তিদের ব্যাপারে (প্রযোজ্য)। অন্যথায় যে শাস্ত্র واجبات (আবশ্যকীয় বিষয়াদি) এর উৎস এবং শরঈ আহকামের গোড়া, তার ব্যাপারে কিভাবে বাঁধা প্রদান করা যায়?

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

ইলমে কালাম শ্রেষ্ঠ কেন ?

শারেহ রহ. উপরিউক্ত ইবারতে ইলমে কালামের শ্রেষ্ঠত্বের ৫টি কারণ বর্ণনা করেছেন। যথা–

(১) ইলমে কালাম সেসব শরঈ আহকামের মূল ও গোড়া, যার আলোচনা হয় ইলমে ফিকহে। কারণ, আহকামে শরইয়্যাহকে বাস্তবে পরিণত করার আবশ্যকীয়তা কেবল তখনই উপলব্ধি হয়, যখন বিধান দাতা ও তা আনয়নকারী তথা আল্লাহ ও তদ্বীয় রাসূল ﷺ এর পরিচয় লাভ হয়। আর আল্লাহ ও তার রাসূল ﷺ এর পরিচয় ইলমে কালামের মাধ্যমে অর্জিত হয়।

(২) যাবতীয় দ্বীনী ইলম যেমন তাফসীর, হাদীস, ফিক্হ এবং তাসাওউফ ইত্যাদির উর্ধ্বে ইলমে কালামের স্থান। কারণ, এ সব ইলম আল্লাহ তা'আলার সত্ত্বা ও গুণাবলী এবং নবুওয়াত এর ইলমের উপর নির্ভরশীল। ইলমে কালামই যার একমাত্র উপায়।

(৩) ইলমে কালামের এ মর্যাদা অর্জিত বিষয়ের দিক থেকে। কারণ, এ শাস্ত্রের মাধ্যমে ইসলামী আকাইদের বিষয়াবলী জানা যায়, যার ফযীলত ও মর্যাদার ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই।

(৪) এ শাস্ত্র চূড়ান্ত ফলাফলের দিক থেকেও শ্রেষ্ঠ। এর দ্বারা দ্বীন-দুনিয়ার সফলতা ও সৌভাগ্য লাভ করা যায়।

(৫) এ শাস্ত্রের পঞ্চম শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণাদির দিক থেকে অর্থাৎ এ শাস্ত্রের বিষয়াবলী যেসব অকাট্য প্রমাণাদি দ্বারা সাব্যস্থ করা হয়, তার বেশীর ভাগই নকলী প্রমাণ তথা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা সমর্থিত।

সাল্ফে সালেহীনের দৃষ্টিতে ইলমে কালাম

وَمَا نُقِلَ عَنِ السَّلَفِ : এটি একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব অর্থাৎ কালাম শাস্ত্র এত মর্যাদাপূর্ণ হওয়া স্বত্ত্বেও সালাফে সালেহীন এ শাস্ত্রের নিন্দা ও তা অর্জন করতে নিষেধ করেছেন কেন? যেমন, ইমাম আবু ইউসুফ রহ.

ইলমে কালাম শিক্ষার্থীদেরকে যিনদীক বলেছেন। ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেছেন, কালাম শাস্ত্র শিক্ষার্থীদের ব্যাপারে আমার সিদ্ধান্ত হল তাদেরকে পিটিয়ে উটে চড়িয়ে শহরে ঘুড়ানো হবে আর বলা হবে, এটা কুরআন ও সুন্নাহ পরিত্যাগকারীদের শাস্তি।

আবার কোন কোন মাশায়িখ বলেছেন, কোন ব্যক্তি যদি তার ধন-সম্পদ ইসলামী আলেম-উলামাদেরকে দেওয়ার ওয়াসিয়ত করে, তাহলে কালাম শিক্ষার্থীগণ উক্ত ওয়াসিয়তের আওতাভুক্ত হবে না। কেমন যেন তাদের মতে কালাম শাস্ত্রের সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই।

শারেহ রহ. উপরিউক্ত প্রশ্নের জবাবে বলেন, সালাফে সলেহীন থেকে কালাম শাস্ত্রের যে নিন্দাবাদ ও তা অর্জনের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত আছে, তা শুধু চার ব্যক্তির জন্য।

(১) যে ব্যক্তি দ্বীনের ব্যাপারে গোঁড়ামী করে সত্য প্রস্ফুটিত হওয়ার পরও তা মানতে অপ্রস্তুত।
(২) স্বল্প বুদ্ধি ও স্বল্প মেধা সম্পন্ন লোকের জন্য, যে মাসআলার গভীরে পৌঁছতে না পেরে সঠিক দ্বীনের পরিবর্তে সন্দেহ ও সংশয়ে নিপতিত হয়।
(৩) যার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হল, দুর্বল মুসলমানদের অন্তরে সন্দেহের বীজ ঢুকিয়ে তাদের ঈমান-আকীদা নষ্ট করা।
(৪) যে ব্যক্তি দার্শনিকদের অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয় সূক্ষ্ম বিষয়াবলীতে মত্ত হয়ে যায়।

ثُمَّ لَمَّا كَانَ مَبْنَى عِلْمِ الْكَلَامِ عَلَى الْاِسْتِدْلَالِ بِوُجُوْدِ الْمُحْدَثَاتِ عَلٰى وُجُوْدِ الصَّانِعِ وَتَوْحِيْدِهٖ وَصِفَاتِهٖ وَاَفْعَالِهٖ ثُمَّ الْاِنْتِقَالُ مِنْهَا اِلٰى سَائِرِ السَّمْعِيَّاتِ نَاسَبَ تَصْدِيْرُ الْكِتَابِ بِالتَّنْبِيْهِ عَلٰى وُجُوْدِ مَا يُشَاهَدُ مِنَ الْاَعْيَانِ وَالْاَعْرَاضِ وَتَحَقُّقِ الْعِلْمِ بِهَا لِيُتَوَصَّلَ بِذٰلِكَ اِلٰى مَعْرِفَةِ مَاهُوَ الْمَقْصُوْدُ الْاَهَمُّ فَقَالَ قَالَ اَهْلُ الْحَقِّ

সহজ তরজমা

ইলমে কালামের মূখ্য বিষয়

যেহেতু ইলমে কালামের বুনিয়াদ স্রষ্টার অস্তিত্ব, তার একত্ববাদ, গুণাবলী ও কার্যকলাপের উপর মাখলূকের অস্তিত্ব দ্বারা প্রমাণ পেশ করা। অতঃপর সেসব বিষয়াবলী থেকে অন্যান্য নকলী বিষয়াবলীর দিকে প্রত্যাবর্তনের উপর, তাই কিতাবের শুরুতে ঐসব اعراض ও اعيان এর অস্তিত্ব ও তার জ্ঞান লাভের ব্যাপারে অবগত করা যথোচিৎ মনে হল, যা প্রত্যক্ষ ও অনুভূত। যাতে এ বিষয়টিকে এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের মাধ্যম বানানো যায়। সুতরাং তিনি (গ্রন্থকার) বলেন, হকপন্থীরা বলেছেন....।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

অমূখ্য বিষয় দিয়ে কিতাব শুরু করার কারণ ঃ গ্রন্থকার কিতাবের শুরুতে প্রথমেই اشياء (বিভিন্ন বস্তু) এর অস্তিত্ব ও তার অস্তিত্বের জ্ঞান এবং সেগুলোর নশ্বরতার বিবরণ দিয়েছেন। কিন্তু প্রশ্ন হয়, ইলমে কালামের মূল বিষয় হল স্রষ্টার অস্তিত্ব, একাত্ববাদ ও স্রষ্টার গুণাবলী ইত্যাদি। তাহলে গ্রন্থকার (বক্ষমান) العقائد النسفيه নামক গ্রন্থটি মূখ্য বিষয়ের পরিবর্তে উদ্দেশ্য নয় এমন বিষয় দিয়ে কেন শুরু করলেন?

শারেহ এ প্রশ্নের জবাবে বলেন, এতে সন্দেহর কোন অবকাশ নেই যে, স্রষ্টার অস্তিত্ব, গুণাবলী ও তার একত্ববাদের আলোচনা ইলমে কালামের মূল্য বিষয়। কিন্তু কালাম শাস্ত্রে এ সবের উপর مخلوق এর অস্তিত্ব ও তার حادث (ধ্বংসশীল) হওয়ার মাধ্যমে দলীল পেশ করা হয়, এজন্য প্রথমে مخلوقات এর অস্তিত্ব ও তার জ্ঞান লাভের ব্যাপারে অবগত করা ঠিক হয়েছে, যা আমরা প্রত্যক্ষ করি– স্বাধিষ্ট হোক চাই আপাতন হোক। যাতে এগুলো দ্বারা দলীল পেশ করার মাধ্যমে এ শাস্ত্রের সূক্ষ্ম বিষয়াদির পরিচয় লাভ হয়। এ কারণেই গ্রন্থকার প্রথমে قَالَ اَهْلُ الْحَقِّ..... الخ বলেছেন।

ثُمَّ الْاِنْتِقَالُ مِنْهَا ঃ অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তার স্বত্ত্বা গুণাবলী ও কার্যকলাপ প্রমাণিত করার পর مسائل سمعيه (শ্রুত বিষয়) যেমন মুনকার-নকীরের প্রশ্ন, কবরের আযাব, পুলসিরাত, আমল ওজনের পাল্লা, জান্নাত, জাহান্নামের

অবস্থার জ্ঞান রাসূলের নিকট শ্রবণের উপর নির্ভরশীল। আর রাসূলের রাসূল হওয়া, রেসালাতের দলীল তথা তার হাতে মুজিযা প্রকাশিত হওয়ার উপর নির্ভরশীল। অপর দিকে মুজিযা প্রকাশ করা আল্লাহ তা'আলার একটি কাজ। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর জন্য افعال (ক্রিয়াকলাপ) এর গুণ প্রমাণিত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত سمعيات (শ্রুত বিষয়াদির) জ্ঞান অর্জিত হবে না।

وَهُوَ الْحُكْمُ الْمُطَابِقُ لِلْوَاقِعِ يُطْلَقُ عَلَى الْاَقْوَالِ وَالْعَقَائِدِ وَالْاَدْيَانِ وَالْمَذَاهِبِ بِاعْتِبَارِ اِشْتِمَالِهَا عَلٰى ذٰلِكَ وَيُقَابِلُهُ الْبَاطِلُ وَاَمَّا الصِّدْقُ فَقَدْ شَاعَ فِي الْاَقْوَالِ خَاصَّةً وَيُقَابِلُهُ الْكِذْبُ وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِاَنَّ الْمُطَابَقَةَ تُعْتَبَرُ فِي الْحَقِّ مِنْ جَانِبِ الْوَاقِعِ وَفِي الصِّدْقِ مِنْ جَانِبِ الْحُكْمِ فَمَعْنٰى صِدْقُ الْحُكْمِ مُطَابَقَتُهُ لِلْوَاقِعِ وَمَعْنٰى حَقِّيَّتِهِ مُطَابَقَةُ الْوَاقِعِ اِيَّاهُ

সহজ তরজমা

হক ও সিদকের পার্থক্য

আহলে হক্বগণ বলেন, বাস্তবসম্মত হুকুমকে حق বলে। কথা-বার্তা, বিশ্বাস, দ্বীনও ধর্মের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ হয়। কেননা বাস্তবসম্মত হুকুম এগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে। তার বিপরীত হচ্ছে, বাতিল। তবে صدق (সত্যতা) শব্দটির বেশী ব্যবহার বিশেষতঃ কথাবর্তার ক্ষেত্রে হয়। তার বিপরীত শব্দ আসে كذب (মিথ্যা)। কখনও এতদুভয় তথা حق ও صدق এর মাঝে পার্থক্য করে বলা হয়, حق এর ক্ষেত্রে মুতাবিক হওয়ার বিষয়টি বাস্তবের পক্ষ থেকে ধর্তব্য হয় আর صدق এর মধ্যে ধর্তব্য হয় حكم এর পক্ষ থেকে। কাজেই صدق الحكم এর অর্থ হল, হুকুমটি বাস্তব অনুযায়ী হওয়া। আর حقية الحكم অর্থ হল, বাস্তবটা হুকুম এর অনুকূলে হওয়া।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

কারা এ আহলে হক ?

(ক) আহলে হক বলতে এখানে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত উদ্দেশ্য। তাদেরকে এ নামে অভিহিত করার একটি কারণ হল, حق আল্লাহ তা'আলার একটি নাম। আর যেহেতু اهل السنة والجماعة আল্লাহ তা'আলার وجود তথা অস্তিত্ব প্রমাণ করে, তাই তাদেরকে আহলে হক বলা হয়।

(খ) حق অর্থ, দৃঢ়তা এবং সতর্কতা। সুতরাং যেসব বিষয়াবলী সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত, তার উপর সাহাবা রাযি. আমল করেছেন, সেগুলোর সংরক্ষণ ও অনুসরণে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। কোন যৌক্তিক দলীলের ভিত্তিতে তা থেকে বিমুখ হয়ে যান নি। এটাই সতর্কতার দাবী। আর এজন্যই তাদেরকে اهل حق তথা সতর্কতাবলম্বী বলে আখ্যা দেওয়া হয়।

হক শব্দের অর্থ ?

وَهُوَ الْحُكْمُ ঃ এটা حق এর অর্থের বিবরণ অর্থাৎ حكم বলে কোন জিনিসকে অন্য জিনিসের দিকে সম্বন্ধ করা। তা ইতিবাচক হোক চাই নেতিবাচক হোক। যদি তা বাস্তবসম্মত হয়, তাহলে তা হক। আর বাস্তবসম্মত না হলে বাতিল। যেমন, আল্লাহ তা'আলার একক সত্ত্বা হওয়া বাস্তবসম্মত। অতএব আমরা যে আল্লাহ তা'আলার দিকে এক হওয়ার নিসবত করে اَللّٰهُ وَاحِدٌ বলা একটি বাস্তবসম্মত হুকুম। আর যেসব হুকুম বাস্তবসম্মত, তা হক। কাজেই আমাদের আল্লাহর দিকে এক হওয়ার নিসবত করা এবং الله واحد বলাও হক। পক্ষান্তরে আল্লাহ একাধিক হওয়া বাস্তবতা বিরোধী। অতএব কারও জন্য আল্লাহর দিকে তিন এর নিসবত করা এবং الالهة ثلاثة বলা বাস্তব বিরোধী একটি হুকুম। আর যেসব حكم বাস্তবসম্মত নয়, তা বাতিল। কাজেই আল্লাহর দিকে তিন এর নিসবত করে اَلْاٰلِهَةُ ثَلَاثَةٌ বলাও বাতিল।

"হক" এর ব্যবহারস্থল ঃ

يُطْلَقُ عَلَى الْاَقْوَالِ ঃ "হক" এর অর্থ বর্ণনার পর শারেহ রহ. তার ব্যবহারের স্থান বর্ণনা করছেন। সুতরাং তিনি বলেন, حق এর প্রয়োগ اقوال (কথা-বার্তার) ক্ষেত্রে হয়। যেমন, বলা হয় اقوال حقه। আকাইদের ক্ষেত্রেও হয়। যেমন, বলা হয় عقائد حقه। আবার اديان (দ্বীন-ধর্মের) ক্ষেত্রেও ব্যবহার হয়। যেমন, اديان حقه। তদ্রূপ مذاهب (মাযহাব সমূহ) এর উপরও হয়। যেমন, বলা হয় مذاهب حقه ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য যে, حق যেহেতু বাস্তবসম্মত হুকুমকে বলে, সেহেতু اقوال ، اَدْيَان ، مذاهب ، عقائد হল معنى غير موضوع له বা অপ্রণীত অর্থ। আর غير موضوع له এর ক্ষেত্রে حق এর ব্যবহার রূপকভাবে হয়ে থাকে। কাজেই এ চারটি শব্দের ক্ষেত্রে حق এর প্রয়োগ রূপক হবে। আর مجاز বা রূপকতার জন্য কোন না কোন علاقة বা যোগ্যসূত্র থাকা আবশ্যক। তাই শারিহ রহ. স্বীয় উক্তি لِاشْتِمَالِهَا عَلَى ذَالِكَ দ্বারা বর্ণনা করেছেন, مجار এর যোগসূত্র হল, اشتمال। অর্থাৎ এ চারটির বেলায় حق শব্দের প্রয়োগ হয় এ হিসেবে যে, এ চারটি এর معنى موضوع له তথা বাস্তবসম্মত হওয়ার উপর সম্পন্ন। যেমন, আমাদের উক্তি الله احد। আল্লাহর দিকে এক হওয়ার নিসবতের উপর সম্পন্ন। আর আল্লাহর দিকে এক হওয়ার এ حكم টি এমন, যা বাস্তব সম্মত। অতএব আমাদের الله واحد। উক্তিটি বাস্তবসম্মত একটি হুকুম।

সিদকের ব্যবহারস্থল ঃ

اَمَّا الصِّدْق ঃ صدق এর ব্যবহার বিশেষতঃ اقوال। এর বেলায় প্রসিদ্ধ। যেমন, বলা হয়, اقوال صادقة।
আবার مذهب - عقائد - اديان এর ক্ষেত্রে صدق এর ব্যবহার হয়। তবে খুবই দুর্লভ।

উল্লেখ্য যে, শারিহ রহ. حق এর অর্থ ও প্রয়োগস্থল বর্ণনা করেছেন আর صدق এর শুধু প্রয়োগস্থল বর্ণনা করেছেন; অর্থ বর্ণনা করেন নি। এতে ইংগিত করা হয়েছে, শারিহ রহ. এর মতেও حق ও صدق এর মাঝে অর্থগত তেমন কোন পার্থক্য নেই। শুধু ব্যবহারিক পার্থক্য আছে অর্থাৎ প্রথমটি ব্যাপক। তা اديان، عقائد، مذهب، اقوال। সর্বক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। আর দ্বিতীয়টি খাছ। তা সাধারণতঃ اقوال। এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

"হক" ও "সিদক" এর আপেক্ষিক পার্থক্য

وقديفرق ঃ উপরে حق এর অর্থ বর্ণনা করে আর صدق এর অর্থ বর্ণনা না করে বুঝিয়েছেন, উভয়টির মাঝে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। এখন আপেক্ষিক পার্থক্য বর্ণনা করছেন। যার সারকথা হল, مطابقت শব্দটি باب مفاعلة এর মাসদার। এর خاصيت হল, مشاركت অর্থাৎ فاعل ও مفعول উভয়ে কর্মে শরীক হওয়া এবং উভয়টি فاعل ও مفعول হওয়া বুঝায়। এমনিভাবে واقع (বাস্তবতা) এবং حكم উভয়টিকে মুতাবিক এবং মুতাবাক বলা যায়। সুতরাং حق এর বেলায় مطابقة (সামঞ্জস্যতা) এর ধর্তব্য واقع (বাস্তবতা) এর দিক থেকে এবং واقع ই হল, মুতাবিক এবং حكم এর حق হওয়া বলতে বাস্তবতা حكم এর مطابق (অনুযায়ী) হওয়া উদ্দেশ্য। আর صدق এর ক্ষেত্রে حكم এর দিক থেকে مطابقة (সামঞ্জস্যতা) ধর্তব্য; হুকুমই মুতাবিক হয় এবং حكم এর صادق হওয়া বলতে হুকুমটিবাস্তব সম্মত হওয়া উদ্দেশ্য।

জ্ঞাতব্য ঃ যেহেতু আহলে হক বলতে বিশেষ একটি দলকে বুঝানো হয়েছে। যাকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত বলে। এ হিসেবে এখানে অপর কয়েকটি দলের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি প্রদান নিরর্থক হবে না। আপনি নিশ্চয় জানেন যে, মানুষের সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য এবং পূর্ণতা হল مبدء (সূচনাস্থল) ও معاد (প্রত্যাবর্তনস্থল) এর পিরিচিতি লাভ করা। যার একটি পন্থা হল, চিন্তা-গবেষণা ও দলীল-প্রমাণ। আরেকটি পন্থা হল, সাধনা ও মুযাহাদা। সুতরাং প্রথম পন্থা অবলম্বনকারী যদি কোন আসমানী দ্বীনের অনুসারী হয়, তাহলে তাদেরকে মুতাকাল্লিমীন বলে। আর দ্বিতীয় পন্থা অবলম্বনকারীগণ যদি احكام شرع। এর সাথে সামঞ্জস্যতা বজায় রাখে, তাহলে তাদেরকে সূফী বলে। নতুবা اشراقيين। বলে।

حَقَائِقُ الْأَشْيَاءِ ثَابِتَةٌ حَقِيْقَةُ الشَّيْئِ وَمَاهِيَتُهُ مَابِهِ الشَّيْئُ هُوَ هُوَ كَالْحَيْوَانِ النَّاطِقِ بِخِلَافِ مِثْلُ الضَّاحِكِ وَالْكَاتِبِ مِمَّا يُمْكِنُ تَصَوُّرُ الْاِنْسَانِ بِدُوْنِهِ فَاِنَّهُ مِنَ الْعَوَارِضِ-

সহজ তরজমা

বস্তুমূলের অস্তিত্ব

মূল বস্তুগুলো বাস্তবে বিদ্যমান। কোন বস্তুর حقيقة বা ماهية ঐ জিনিসকে বলে, যা দ্বারা বস্তুটি বস্তুতে পরিণত হয়। যেমন, انسان এর জন্য حيوان ناطق। তবে ضاحك، كاتب ইত্যাদি এর বিপরীত। যেগুলো এছাড়াও মানুষ কল্পনা করা যায়। কেননা এগুলো حقيقة নয় বরং عوارض বা আপাতনের অন্তর্ভুক্ত।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

হাকীকত ও মাহিয়্যাতের সংজ্ঞা

শারিহ রহ. حقيقة ও ماهية এর একই ব্যাখ্যা উল্লেখ করে ইংগিত করেছেন, حقيقة ও ماهية এর মাঝে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। শারিহ রহ. এর বক্তব্যের ব্যাখ্যা হল, حقيقة الشئ وماهيته হল মুবতাদা। ما শব্দটি موصوله আর به এর মধ্যকার باء বর্ণটি سببيت (কারণ বর্ণনা) এর জন্য। অতঃপর جار ও مجرور মিলে يكون এর সাথে মুতা'আল্লিক। الشئ হচ্ছে يكون উহ্য ফে'লে নাকেসের ইসম। প্রথম هو যমীরটি فصل (পৃথক করণ) এর জন্য। আর দ্বিতীয় هو শব্দটি উহ্য يكون এর খবর, যার مرجع হল الشئ। মূল বাক্য হবে, حقيقة الشئ وماهيته مايكون به الشئ ذالك الشئ অর্থাৎ شى এর حقيقة এবং ماهية ঐ জিনিস হয়, যা দ্বারা ঐ বস্তুটি شى তথা বস্তুতে পরিণত হয়। যেমনঃ আটা, পানি, আগুন এমন জিনিস, যা দ্বারা রুটি রুটিতে পরিণত হয়। উল্লেখিত সংজ্ঞা অনুপাতে বঝুা গেল, এখানে আটা, পানি, আগুন হচ্ছে, রুটির হাকীকত এবং মাহিয়্যাত। সার কথা হল, شى এর حقيقة তার ذاتيات বা মৌলিক উপাদান। তা ব্যতিত ঐ বস্তুটি কল্পনা করা যায় না। তদ্রুপ حيوانية এবং ناطقية এ দুটি এমন জিনিস, যা দ্বারা মানুষ মানুষে পরিণত হয়। আর যেহেতু কোন বস্তু যে জিনিস দ্বারা বস্তুতে পরিণত হয়, ঐ জিনিসই বস্তুটির حقيقة হয়। সেহেতু حيوان এবং ناطق এ দুটি انسان এর حقيقة এবং ماهية। মোটকথা, কোন বস্তুর حقيقة বা ماهية তার ذاتيات (মৌলিক উপাদন) হয়। তাছাড়া ঐ বস্তুটি কল্পনা করা যায় না। ضاحك ও كاتب ইত্যাদি এর বিপরীত। কারণ, এগুলো انسان এর حقيقة নয় বরং এগুলো انسان এর عوارض (আকস্মিক সংযোজন) এর অন্তর্ভুক্ত। এ ছাড়াও মানুষ কল্পনা করা যায়।

وَقَدْ يُقَالُ اَنَّ مَا بِهِ الشَّيْئُ هُوَهُوَ بِاِعْتِبَارِ تَحَقُّقِهِ حَقِيْقَةٌ وَبِاِعْتِبَارِ تَشَخُّصِهِ هُوِيَّةٌ وَمَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ ذَالِكَ مَاهِيَةٌ

সহজ তরজমা

হাকীকত-মাহিয়্যাতের পার্থক্য ঃ আর কখনও حقيقة ও ماهية এর মাঝে আপেক্ষিক পার্থক্য বর্ণনার লক্ষ্যে বলা হয়, যে বস্তু দ্বারা বস্তুটি বস্তুতে পরিণত হয়, তা বস্তাবে বিদ্যমান হিসেবে হাকীকত, তা নির্দিষ্ট হওয়ার দিক থেকে هوية আর এগুলো লক্ষ্য না করলে মাহিয়্যাত।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এ পার্থক্য মৌলিক নয় আপেক্ষিক ঃ এ উক্তিটির সারকথা হল, حقيقة এবং ماهية এর মাঝে বাস্তবে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। যেমন, উপরে শারিহ রহ. উভয়টির একই সংজ্ঞা উল্লেখ করে সেদিকে ইংগিত

করেছেন। কিন্তু উভয়টির মাঝে আপেক্ষিক পার্থক্য রয়েছে। অর্থাৎ একটি বস্তু যা এক, কিন্তু তাতে বিভিন্ন দিক থাকে। আর ঐসব দিক বিবেচনায় তার ভিন্ন ভিন্ন নাম তৈরী হয়। যেমন, যায়েদ নামের একজন ব্যক্তি। সে লিখে এবং সেলাই কাজ করে ইত্যাদি। প্রথম দিক হিসেবে তাকে كاتب (লিখক) বলে। দ্বিতীয় দিক বিবেচনায় তাকে خياط (দর্জী) বলে। আর এগুলো না লক্ষ্য করলে সে একজন মানুষ। তদ্রুপ ما به الشئ هو هو অর্থাৎ যা দ্বারা কোন বস্তু বস্তুতে পরিণত হয়, যেমন انسان حيوان ناطق এর জন্য এর একটি দিক হল, তা বাস্তবে বিদ্যমান। এ হিসাবে তাকে حقيقة انسان বলা হবে। কেমন যেন حقيقة অর্থ বিদ্যমান। অন্যদিক হল, বাস্তবে সে নির্দিষ্ট এবং নির্ধারিত। এজন্যই তাকে هو ضمير এর مرجع বানানো যায়। কেননা ضمير নির্ধারিত ব্যক্তি বা বস্তুর দিকে ফিরে। এদিক থেকে তাকে هويت বলে। যা هو যমীর থেকে গৃহীত। আর ঐ দুই দিক লক্ষ্য না করলে তা ماهية বলে। মোটকথা, حقيقة ও ماهية একই জিনিস অর্থাৎ ما به الشئ এর দুইটি ভিন্ন দিক হিসেবে দুটি নাম ধারণ করেছে। কাজেই উভয়টির মধ্যকার উপরিউক্ত পার্থক্য আপেক্ষিক বলে প্রমাণিত হল।

> وَالشَّيْئُ عِنْدَنَا هُوَ الْمَوْجُوْدُ وَالثُّبُوْتُ وَالْوُجُوْدُ وَالْكَوْنُ اَلْفَاظٌ مُتَرَادِفَةٌ مَعْنَاهَا بَدِيْهِيُّ التَّصَوُّرِ

সহজ তরজমা

"শাই (الشئ) কি? ঃ আমাদের (আশায়েরাদের) মতে شئ হল, موجود বা বিদ্যমান বস্তু। আর كون، ثبوت، تحقق، وجود সবই مترادف বা সমার্থক শব্দ। এ গুলোর অর্থ একেবারে স্পষ্ট।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

অভিধানে شئ এমন বস্তুকে বলে, যাকে مبتداء ও مخبر عنه বানানো কিংবা যার ব্যাপারে কোন সংবাদ দেওয়া সম্ভব, এ হিসেবে আস্তি-নাস্তি এবং সম্ভব-অসম্ভব সবগুলোকে شئ বলা হয়। আস্তি বা অস্তিত্বহীনকে شئ বলা স্পষ্ট। আর নাস্তি বা অস্তিত্বহীন সম্ভাব্য -এর উদাহরণ হল, যেমন- কোন নিঃসন্তান ব্যক্তি বলল, আমার ছেলে ইনশাআল্লাহ আলেম হবে। এ উদাহরণে ছেলে না থাকলেও বিষয়টি সম্ভব বলে তার ব্যাপারে উক্ত সংবাদ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তার ছেলে شئ (বস্তু)। আর অসম্ভব এর উদাহরণ আমাদের উক্তি شريك البارى ممتنع। এখানে আল্লাহর অংশীদার অসম্ভব হওয়া সত্ত্বেও তাকে مخبر عنه এবং مبتداء বানানো হচ্ছে। তার ব্যাপারে এটা অসম্ভব হওয়ার সংবাদ দেওয়া হচ্ছে। আর যে জিনিসকে مبتداء এবং مخبر عنه বানানো যায়, তা شئ হয়। কাজেই অসম্ভবও شئ বা বস্তু।

আর পরিভাষায় আশায়েরাদের মতে شئ মূলতঃ বিদ্যমান বস্তুকে বলে। অবশ্য কোথাও যদি অস্তিত্বহীন বস্তুকে شئ বলা হয়, তা হবে রূপকার্থে। অস্তিত্বহীন شئ না হওয়ার স্বপক্ষে আশায়েরাদের দলীল আল্লাহ তা'আলার বাণী وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا অর্থাৎ আমি তোমাকে সৃষ্টি করেছি। অথচ ইতোপূর্বে (সৃষ্টির পূর্বে) তুমি কোন বস্তুই ছিলে না। আর একথা দিবালোকের পরিস্কার যে, সৃষ্টির পূর্বে মানুষ অস্তিত্বহীন ছিল। তাহলে আল্লাহ তা'আলা যখন মানুষকে অস্তিত্বহীন অবস্থায় شئ নয় বলেছেন, এতে বুঝা গেল অস্তিত্বহীন-شئ নয় বরং شئ হল যা মওজূদ বা বিদ্যমান।

পক্ষান্তরে মুতাযিলাদের মতে شئ-মওজূদ এবং অস্তিত্বহীন উভয় অর্থেই حقيقة কিন্তু ثابت معدوم شئ এর অর্থে ব্যবহৃত। কেননা তাদের মতে ثبوت এটা وجود এর চেয়ে ব্যাপক। দলীল হল, ممكن معدوم তার অস্তিত্বের পূর্বে হয়ত আবশ্যক হবে অথবা অসম্ভব হবে অথবা সম্ভব হবে। প্রথম এবং দ্বিতীয়টি অসম্ভব। অন্যথায় আবশ্যক হতে সম্ভব কিংবা অসম্ভব থেকে সম্ভব এর দিকে রূপান্তরিত হওয়া আবশ্যক হবে। অথচ এ তিনটি জিনিস حقيقة এর দিকে ভিন্ন এবং এক حقيقة থেকে অন্য حقيقة এ রূপান্তর অসম্ভব। কাজেই তৃতীয় সম্ভাবনাটিই নির্ধারিত হয়ে গেল। অর্থাৎ ممكن তার وجود এর পূর্বেও ممكن ছিল। আর امكان এটি একটি গুণ, যার জন্য

موصوف দরকার। এখন ঐ মওসূফ মওজূদ তো হতে পারবে না। কারণ, এতে شئ তার অস্তিত্বের পূর্বে মওজূদ হওয়া আবশ্যক হবে, তা ثابت হবে। কাজেই প্রমাণিত হয়ে গেল, অস্থিত্বহীন সম্ভাব্য বস্তু شئ হওয়া মানে সেটি ثابت প্রমাণিত।

وَالثُّبُوتُ وَالتَّحَقُّقُ ...الخ ঃ অভিধানে এ চারটি শব্দ একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ হিসেবে একটি অপরটির স্থানে ব্যবহৃত হতে পারে।

فَاِنْ قِيلَ فَالْحُكْمُ بِثُبُوتِ حَقَائِقِ الْاَشْيَاءِ يَكُونُ لَغْوًا بِمَنْزِلَةِ قَوْلِنَا الْاُمُورُ الثَّابِتَةُ ثَابِتَةٌ قُلْنَا اِنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَا نَعْتَقِدُهُ حَقَائِقَ الْاَشْيَاءِ وَنُسَمِّيهِ بِالْاَسْمَاءِ مِنَ الْاِنْسَانِ وَالْفَرَسِ وَالسَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اُمُورٌ مَوْجُودَةٌ فِي نَفْسِ الْاَمْرِ كَمَا يُقَالُ وَاجِبُ الْوُجُودِ مَوْجُودٌ

সহজ তরজমা

একটি অভিযোগ ও তার জবাব ঃ সুতরাং যদি বলা হয়, তাহলে তো ثبوت حقائق اشياء তথা মূল বস্তুসমূহ বাস্তবে বিদ্যমান থাকার حكم লাগানো অনর্থক হবে এবং আমদের উক্তি الامورالثابتة ثابتة এর মত হবে। আমরা তার উত্তর দেব, তা দ্বারা উদ্দেশ্য হল, যেসব জিনিসকে আমরা حقائق اشياء মনে করি এবং انسان، فرس، سماء، ارض ইত্যাদি নামে অভিহিত করি– এগুলো এমন, যা বাস্তবে বিদ্যমান। যেমন বলা হয়, واجب الوجود موجود তথা অনিবার্য সত্ত্বা বিদ্যমান।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

উপরে শারিহ রহ. حقيقة ও ماهية এর মাঝে আপেক্ষিক পার্থক্য বর্ণনা করতে গিয়ে প্রথমতঃ বলেছিলেন, مابه الشئ বাস্তবে অস্তিত্ববান ও বিদ্যমান হওয়ার দিক থেকে حقيقة বলে। এতে বুঝা গেল, حيقية অর্থ موجود বা বিদ্যমান। দ্বিতীয়তঃ বলেছিলেন, আশায়েরাদের মতে شئ মওজূদকে বলে। তৃতীয়তঃ বলেছিলেন, وجود এবং ثبوت সমার্থক। যার ফলে موجود এবং ثابت শব্দদ্বয়ও সমার্থবোধক হবে। এ তিনটি কথার আলোকে একটি অভিযোগ সৃষ্টি হয়। শারিহ রহ. এখানে তার উত্তর দিচ্ছেন।

প্রশ্ন ঃ যখন حقيقة প্রথম مقدمه এর حكم অনুপাতে বাস্তবে বিদ্যমান। আর تحقق তৃতীয় مقدمه অনুসারে ثبوت এর সমার্থক, তাহলে حقائق শব্দটিও ثابتات এর অর্থে হল। আর দ্বিতীয় مقدمه এর حكم অনুপাতে اشياء হল, موجودات এর অর্থে। আর তৃতীয় মুকাদ্দামা অনুসারে ثابت এর মুরাদিফ হল, তাহলে اشياء শব্দটি ثابتات এর অর্থে হল। حقائق اشياء এবং اشياء হুবহু একই জিনিস হল। আর গ্রন্থকারের উক্তি حقائق الاشياء এটা الثابتات ثابتة এর অর্থে হল। সুতরাং তার উপর حكم লাগানো অর্থাৎ حقائق الاشياء ثابتة বলা الثابتات ثابتات এর পর্যায়ে হবে। যা নিঃসন্দেহে অনর্থক কথা। কেননা কথা অর্থবোধক ও উপকারী হওয়ার জন্য موضوع ও محمول এর মধ্যে বৈপরিত্য থাকা আবশ্যক। অথচ এখানে তা নেই।

জবাব ঃ শারেহ রহ. উক্ত অভিযোগের উত্তর দিয়েছেন, এখানেও موضوع এবং محمول এর মাঝে বৈপরিত্য বিদ্যমান। এটি–اعتقاد হিসেবে موضوع আর نفس الامر (বাস্তবতা) হিসেবে محمول অর্থাৎ موضوع তথা حقائق الاشياء উক্তিটি الثابتات এর অর্থে হওয়ায় যে ثبوت বুঝা যায়, তা হল, اعتقادى (বিশ্বাসগত) আর محمول তথা ثابتة দ্বারা যে ثبوت উদ্দেশ্য, তা হল نفس الامرى (বাস্তবিক)। তাহলে গ্রন্থকারের উক্তি حَقَائِقُ الْاَشْيَاءِ ثَابِتَةٌ এর অর্থ দাঁড়ায় اَلثَّابِتَاتُ فِىْ اِعْتِقَادِنَا ثَابِتَةٌ فِىْ نَفْسِ الْاَمْرِ অর্থাৎ আমাদের বিশ্বাসে যা সাবিত এবং বিদ্যমান, তা বাস্তবেও সাবিত ও বিদ্যমান। আর ثبوت اشياء এর ব্যাপারে আমাদের বিশ্বাস বাস্তবসম্মত।

المراد به ঃ অর্থাৎ যে সব জিনিসকে আমরা حقائق الاشياء তথা বিদ্যমান ও মওজূদ মনে করি এবং তার বিভিন্ন নাম রাখি, তা বাস্তবেও বিদ্যমান আছে।

كما يقال ঃ এটা উল্লেখিত تاويل অর্থাৎ موضوع আকিদাগত আর محمول বাস্তবসম্মত হওয়া উদ্দেশ্য নেওয়ার সমর্থন করে। কারণ, واجب الوجود হল, একটি মওজুদ বস্তুর নাম বা বাস্তব সত্ত্বা। তথাপি বলা হয়, واجب الوجود موجود যা আমাদের উক্তি الموجود موجود এর সমপর্যায়ে। যার محمول ও موضوع উভয়টি এক। তাপরও উক্ত কালামটি مفيد (অর্থবোধক ও উপকারী) শুধু এ কারণে যে, এখানে موضوع বিশ্বাসজনিত আর محمول বাস্তবিক হওয়া উদ্দেশ্য। সুতরাং واجب الوجودموجود এর অর্থ হবে, الموجود الذى نعتقده واجب الوجود موجود فى نفس الامر অর্থাৎ যে موجود কে আমরা واجب الوجود বলে বিশ্বাস করি তা বাস্তবেও বিদ্যমান। তেমনিভাবে গ্রন্থকারের উক্তি حقائق الاشياء ثابتة বাক্যটির موضوع আকীদাগত হিসেবে এবং محمول বাস্তব হিসেবে হওয়ার কারণে অর্থবোধক ও উপকারী হবে।

وَهٰذَا كَلَامٌ مُفِيْدٌ رُبَمَا يَحْتَاجُ اِلَى الْبَيَانِ لَيْسَ مِثْلَ قَوْلِكَ الشَّابِتُ ثَابِتٌ وَلَامِثْلَ قَوْلِنَا اَنَا اَبُو النَّجْمِ وَشِعْرِى شِعْرِى عَلٰى مَالَا يَخْفٰى

সহজ তরজমা

উপরিউক্ত বাক্যের ব্যাখ্যা ঃ আর এ কালাম তথা বাক্যটি অর্থবোধক; অনর্থক নয়। যা খুব কমই ব্যাখ্যার মুখাপেক্ষী হয় এবং তোমাদের উক্তি الثابت ثابت এর মত নয়। (কেননা এটা তো অনর্থক) এবং কবির উক্তি انا ابوالنجم وشعرى شعرى এর মতও নয়। (কেননা এটি تاويل এর অধিক মুখপেক্ষী।)

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

ব্যাখ্যাতাগণ উক্ত উবারতটির একাধিক অর্থ বর্ণনা করেছেন। যথা– (১) رب যদি تقليل এর জন্য হয় তাহলে عبارت এর উদ্দেশ্য হবে حقائق الاشياء ثابتة কথাটি অর্থবোধক; নিরর্থক নয়। এর ব্যাখ্যার তেমন একটা প্রয়োজন হয় না। কারণ, موضوع আকীদাগত ধরে নেওয়া সমাজে প্রচলিত ও সুবিদিত। কাজেই এর অর্থ সুস্পষ্ট। তবে দুর্বল মেধাসম্পন্ন ব্যক্তিদেরকে বুঝানোর জন্য কখনও কখনও এর ব্যাখ্যা করতে হয়।

وليس مثل قولك والثابت ثابت ঃ অর্থাৎ তোমাদের উক্তি الثابت ثابته এর মত নয়। কেননা এটা তো অনর্থক কালাম। এখানে বক্তা মওযূ'-মাহমূল উভয়টিকে বাস্তব হিসেবে বলেছেন।

ولامثل قوله اناابوالنجم وشعرى شعرى ঃ এবং আবুন্নাজম এর উক্তি اناابوالنجم وشعرى شعرى এর মত নয়। কেননা এ বাক্যটি শুদ্ধ করতে বহু ব্যাখ্যার আশ্রয় নিতে হয়। কারণ, شعرى شعرى এর অর্থ হল, شعرى الان كشعرى فيما مضى "আমরা বর্তমানের কবিতা অতীতকালের কবিতাসমূহের মত।" বার্ধক্যের কারণে আমরা জ্ঞান-প্রজ্ঞায় কিংবা আমার কবিতা, সাহিত্য ও ভাষালংকার প্রভাবিত হয়নি। উক্ত ব্যাখ্যাটি বড়ই লৌকিকতাপূর্ণ বিধায় সহজে অনুমেয় নয়। ফলে অনেক ব্যাখ্যার প্রয়োজন দেখা দেয়। সম্পূর্ণ কবিতাটিতে আবুন্নাজম তার স্বপ্নের অবস্থা বর্ণনা করেছে। কবিতাগুলো নিম্নরূপঃ

لِلّٰهِ دُرِّى مَا اَجَسَنُ صَدْرِىْ- تَنَامُ عَيْنِىْ وَفُؤَادِىْ يَسْرِىْ

مَعَ الْعَفَارِيْتِ بِاَرْضِ قَفْرٍ- اَنَا اَبُو النَّجْمِ وَشِعْرِىْ شِعْرِىْ

(২) দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হল, ربمايحتاج الى البيان কথাটি মুসান্নিফ রহ. এর উক্তি هذاكلام مفيد এর تاكيد হয়েছে। চাই رب শব্দটি تقليل এর জন্য হোক কিংবা تكثير এর জন্য। এখানে بيان বলতে দলীল বুঝানো হয়েছে। সুতরাং ইবারতের অর্থ হবে, حَقَائِقُ الْاَشْيَاءِ ثَابِتَةٌ একটি অর্থবোধক ও উপকারী কালাম।

(৩) তৃতীয় ব্যাখ্যা হল, بيان অর্থ تاويل। আর ইবারতের উদ্দেশ্য হচ্ছে, حَقَائِقُ الْاَشْيَاءِ ثَابِتَةٌ এটি উপকারী অর্থবোধক কালাম; কখনও বাহ্যিক অর্থ ছেড়ে উদ্ভট ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু اَلثَّابِتُ ثَابِتٌ বাক্যটি তার

বিপরীত। কেননা এটা নিরর্থক। তদ্রূপ انا ابوالنجم وشعرى شعرى ছন্দটিও এর বিপরীত। কারণ, এটি এমন তাবীল ও ব্যাখ্যার মুখাপেক্ষী, যা তাকে বাহ্যিক অবস্থা থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যায়।

وَتَحْقِيْقُ ذٰلِكَ اَنَّ الشَّيْئَ قَدْ يَكُوْنُ لَهُ اِعْتِبَارَاتٌ مُخْتَلِفَةٌ يَكُوْنُ الْحُكْمُ عَلَيْهِ بِشَيْئٍ مُفِيْدًا بِالنَّظْرِ اِلٰى بَعْضِ تِلْكَ الْاِعْتِبَارَاتِ دُوْنَ الْبَعْضِ كَالْاِنْسَانِ اِذَا اُخِذَ مِنْ حَيْثُ اَنَّهُ جِسْمٌ مَاكَانَ الْحُكْمُ عَلَيْهِ بِالْحَيْوَانِيَّةِ مُفِيْدًا وَاِذَا مِنْ حَيْثُ اَنَّهُ حَيْوَانٌ نَاطِقٌ كَانَ ذٰلِكَ لَغْوًا

সহজ তরজমা

উপরিউক্ত প্রশ্নোত্তরের বিশ্লেষণ ঃ উপরিউক্ত উত্তরের বিশ্লেষণ হল, একটি شئ এর বিভিন্ন দিক থাকে। তন্মধ্যে কোন এক দিক থেকে তার উপর একটি হুকুম লাগানো অর্থবহ ও উপকারী হয়। কিন্তু অন্য দিক থেকে নিরর্থক হয়। যেমন, انسان কে যখন এ দিক থেকে দেখা হবে যে,সে দেহবিশিষ্ট, তাহলে তার উপর حيوانيت তথা প্রাণী হওয়ার حكم লাগানো অর্থবহ হবে। আর যখন এ দিক থেকে দেখা হবে যে, সে حيوان ناطق বা বোধসম্পন্ন প্রাণী, তখন উক্ত حكم লাগানো নিরর্থক হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এখানে উল্লেখিত উত্তরের এমন বিশ্লেষণ পেশ করা হচ্ছে, যাতে অভিযোগ ও উত্তরের উদ্দেশ্যও পরিজ্ঞাত হয়ে যায়। বিশ্লেষণের সারকথা হল, একটি জিনিসে অনেক দিক লক্ষণীয় থাকে। কোন দিক থেকে তার উপর হুকুম লাগানো স্বার্থক হয়। আবার কোন দিক থেকে তার উপর হুকুম লাগানো স্বার্থক হয় না। যেমন, انسان একটি দেহ এবং আবার হাইওয়ান। সুতরাং তাকে جسم হিসেবে দেখা হলে তার উপর প্রাণী হওয়ার হুকুম লাগানো যাবে। ফলে الانسان حيوان বললে বাক্যটি অর্থবহ হবে। কারণ, এমতাবস্থায় الانسان حيوان বলা هذا الجسم حيوان বলার মতই। কিন্তু যদি انسان কে প্রাণী হিসেবে ধরা হয়, তাহলে الانسان حيوان বলা নিরর্থক হবে। কারণ, তখন الانسان حيوان এর অর্থ হবে هذا الحيوان حيوان (এ প্রাণীটি একটি প্রাণী)।

তদ্রূপ গ্রন্থকার রহ. এর বক্তব্য حقائق الاشياء ثابتة এর দুটি দিক রয়েছে। একটি হল, তা বাস্তবে বিদ্যমান আছে। এ হিসেবে তার উপর ثبوت এর হুকুম লাগানো নিরর্থক হবে। এমতাবস্থায় حقائق الاشياء ثابتة বাক্যটি الثابتات ثابتة এর অর্থে হয়ে যাবে। আর প্রশ্নের উৎসমূল এটিই। অন্য দিক হল, সেটি পরিজ্ঞাত। এ হিসেবে তার উর ثبوت এর হুকুম লাগানো অর্থবহ হবে। কেননা তখন حقائق الاشياء ثابتة এর অর্থ হবে المعلومات ثابتة। উত্তরের উৎসমূলও এটিই।

وَالْعِلْمُ بِهَا اَىْ بِالْحَقَائِقِ مِنْ تَصَوُّرَاتِهَا وَالتَّصْدِيْقُ بِهَا وَبِاَحْوَالِهَا مُتَحَقِّقٌ وَقِيْلَ الْمُرَادُ الْعِلْمُ بِثُبُوْتِهَا لِلْقَطْعِ بِاَنَّهُ لَاعِلْمَ بِجَمِيْعِ الْحَقَائِقِ وَالْجَوَابُ اَنَّ الْمُرَادَ الْجِنْسُ رَدًّا عَلَى الْقَائِلِيْنَ بِاَنَّهُ لَاثُبُوْتَ لِشَيْئٍ مِنَ الْحَقَائِقِ وَلَاعِلْمَ بِثُبُوْتِ حَقِيْقَةٍ وَلَابِعَدَمِ ثُبُوْتِهَا

সহজ তরজমা

বস্তুসমূহের অস্তিত্বের জ্ঞান ? মূল বস্তুসমূহের জ্ঞান অর্থাৎ এগুলোর অনুভূতি-কল্পনা, এগুলোর অস্তিত্ব ও অবস্থা সম্পর্কে تصديق বিদ্যমান; বাস্তবে প্রমাণিত। কেউ কেউ বলেছেন, লেখেকের উক্তি العلم بها দ্বারা উদ্দেশ্য হল, বস্তুসমূহের অস্তিত্বের জ্ঞান। কেননা এতটুকু নিশ্চিতভাবে জানা আছে যে, সকল বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞান নেই। এর উত্তর হল, الحقائق দ্বারা جنس حقائق উদ্দেশ্য। তাদের মতামত খণ্ডানোর উদ্দেশ্যে– যারা বলে, কোন বস্তুর অস্তিত্ব নেই; কোন বস্তুর অস্তিত্ব-অনস্তিত্বের জ্ঞানও নেই।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

কোন কোন সুফাস্তাঈর মতে বস্তুর অস্তিত্ব জ্ঞান

কোন কোন সুফাস্তাইয়্যাহদের মতে কোন বস্তুর অস্তিত্ব-অনস্তিত্বের জ্ঞান কারও নেই। এমতটি খণ্ডন করতে গিয়ে মুসান্নিফ রহ. বলেন, যেমনিভাবে কোন বস্তুর বিদ্যমান হওয়া ও অস্তিত্ব থাকা বাস্তবসম্মত; কাল্পনিক ধারণাগত বা আকীদাগত নয়, তেমনিভাবে বস্তুসমূহের অস্তিত্বের জ্ঞান এবং সেগুলোর অবস্থাদি যেমন সম্ভাব্যতা-নশ্বরতা ইত্যাদির জ্ঞানও বাস্তবিক এবং প্রমাণিত। যেমন, আসমান-জমীন এগুলো কাল্পনিক বা ধারণাগত জিনিস নয় বরং বাস্তবে এগুলো বিদ্যমান। অনুরূপভাবে বাস্তবে এগুলোর অবস্থা ও অস্তিত্বের জ্ঞানও আমাদের আছে এবং সেগুলোর অবস্থা যেমন আসমান আমাদের উপরে, জমীন আমাদের নিচে –এ জ্ঞানও আমাদের আছে।

قوله : قيل ঃ শারিহ রহ. গ্রন্থকারের উক্তি العلم بها, এর মধ্যকার যমীরে মাজরূরের مرجع সব্যস্থ করেছিলেন الحقائق কে। কোন কোন শারিহ বলেছেন, الحقائق এর মধ্যকার لام تعريف টি ইস্তিগরাকের জন্য, বিধায় অর্থ দাঁড়ায় "সমস্ত বস্তুর জ্ঞান বিদ্যমান।" অথচ একথা নিশ্চিত যে, সমস্ত বস্তুর জ্ঞান বান্দার নেই। এ কারণে ব্যাখ্যাকার ثبوت শব্দটি مضاف হিসেবে উহ্য মেনে বলেছেন, গ্রন্থকারের উক্তি العلم بها দ্বারা العلم بثبوتها উদ্দেশ্য অর্থাৎ সমস্ত বস্তু প্রমাণিত হওয়ায় জ্ঞান বিদ্যমান।

الجواب ঃ উত্তরের সারমর্ম হল, مضاف উহ্য ধরে নেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। কেননা الحقائق এর মধ্যকার لام تعريف টি استغراق এর জন্য নয় বরং جنس এর জন্য এবং গ্রন্থকারের উক্তি العلم بها দ্বারা العلم بجنس الحقائق উদ্দেশ্য। কেননা এখানে উদ্দেশ্য হল, ঐ সব লোকেদের মতামত খণ্ডানো, যারা বলে– কোন জিনিসের অস্তিত্ব ও অস্তিত্বের জ্ঞান মানুষের নেই। একথা স্পষ্ট যে, لاعلم بثبوت شئ من الحقائق ولاعدم بثبوته এটা سالبه كليه। সুতরাং যখন جنس حقائق এর অস্তিত্বের জ্ঞান হবে, তখন তা হবে موجه جزئيه এর হুকুমে। এমতাবস্থায় তাদের سالبه كليه বাতিল হয়ে গেল। কেননা ايجاب جزئى দ্বারা سلب كلى বাতিল হয়ে যায়।

> خِلَافًا لِلسُّوفِسْطَائِيَّةِ فَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ يُنْكِرُ حَقَائِقَ الْأَشْيَاءِ وَيَزْعُمُ أَنَّهَا أَوْهَامٌ وَخَيَالَاتٌ بَاطِلَةٌ وَهُمُ الْعِنَادِيَّةُ وَمِنْهُمْ مَنْ يُنْكِرُ ثُبُوتَهَا وَيَزْعُمُ أَنَّهَا تَابِعَةٌ لِلْاِعْتِقَادِ حَتَّى أَنَّ اِعْتَقَدْنَا الشَّيْئَ جَوْهَرًا فَجَوْهَرٌ أَوْ عَرَضًا فَعَرَضٌ أَوْ قَدِيْمًا فَقَدِيْمٌ أَوْ حَادِثًا فَحَادِثٌ وَهُمُ الْعِنْدِيَّةُ وَمِنْهُمْ مَنْ يُنْكِرُ الْعِلْمَ بِثُبُوْتِ شَيْئٍ وَلَا ثُبُوتِهِ وَيَزْعُمُ أَنَّهُ شَاكٌّ وَشَاكٌّ فِيْ أَنَّهُ شَاكٌّ وَهَلُمَّ جَرًّا وَهُمُ اللَّاأَدْرِيَّةُ ـ

সহজ তরজমা

সূফাস্তাইয়্যাহ ফিরকা ও তাদের মতবাদ ঃ সূফাস্তাইয়্যাহ সম্প্রদায় এর সম্পূর্ণ বিরোধী। কেননা তাদের মধ্যে কেউ কেউ মূল বস্তুসমূহকেই অস্বীকার করে এবং বলে, এগুলো সব কাল্পনিক ও ভ্রান্ত ধারণা। এদেরকে عنادية বলা হয়। আবার তাদের (سوفسطائيه) মধ্যে কেউ কেউ বস্তুসমূহের বাস্তবতাকে অস্বীকার করে এবং বলে, এটা আমদের বিশ্বাসের অনুগত। এমনকি আমরা যদি কোন বস্তুকে جوهر বলে মনে করি, তাহলে তা جوهر আর عرض মনে করলে তা عرض অথবা قديم মনে করলে তা قديم অথবা حادث মনে করলে তা حادث। এদেরকে عنديه বলা হয়। আবার তাদের মধ্যে কেউ কেউ বস্তুসমূহ বিদ্যমান হওয়া বা না হওয়ার জ্ঞানকে অস্বীকার করে এবং বলে, আমদের এ ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। বস্তুতঃ তাদের এ ব্যাপারেও সন্দেহ রয়েছে যে, তাদের এ বিষয়ে সন্দেহ আছে। এভাবেই চলতে থাকে। এদেরকে লা-আদ্‌রিয়্যাহ বলা হয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

সূফাস্তাঈদের পরিচয় ঃ কেউ কেউ বলেন– সূফাস্তাইয়্যাহ হল, নির্বোধ দার্শনিকদের একটি দল, যাদের তিনটি গ্রুপ রয়েছে। শারিহ রহ. এরও একই মত। কিন্তু মুহাক্কিকগণ বলেছেন, পৃথিবীতে উক্ত মাযহাব অনুসারী

কেউ নেই বরং যে ব্যক্তি ভুল-ভ্রান্তিতে লিপ্ত, সে তার ভুল-ভ্রান্তিতে সূফাসতাঈ। এ শব্দটির উৎসমূল থেকেই তা পরিষ্কার হয়ে যায়। যে বিষয়টি শীঘ্রই শারিহ রহ. আলোচনা করবেন। মোটকথা, سوفسطائيه এর তিনটি গ্রুপ। এক গ্রুপকে عناديه বলা হয়।

ইনাদিয়ার মতাদর্শ ঃ এরা বস্তুসমূহের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে এবং বলে, যা কিছু আমরা দেখি বা অনুভব করি, এগুলো কল্পনা ও ধারণা মাত্র। বাস্তবে কোন বস্তুর অস্তিত্ব প্রমাণিত নেই। তারা আরও বলে, যে কোন বাক্য চাই তা بديهى হোক نظرى হোক, তার বিপরীত বাক্য অবশ্যই রয়েছে। কাজেই اذا تعارضا تساقطا এ মূলনীতি অনুসারে উভয়টির কোনটির প্রমাণিত হবে না। যেমন, মুতাকাল্লিমীনদের একটি বাক্য আছে, جوهرفرد অর্থাৎ جزءلايتجزى (পরমাণু) বিদ্যমান। এর বিপরীত দার্শনিকদের একটি বাক্য আছে, প্রত্যেকটি جوهر কে অসংখ্য ভাগে ভাগ করা যায়। বিভাজন কোন অংশে গিয়ে শেষ হয়ে যাবে না। ফলে কোন جزء বা অংশকে جزء لايتجزى বলা যাবে না। সুতরাং মুতাকাল্লিমীনদের বাক্যটি দার্শনিকদের প্রমাণাদি দ্বারা বাতিল সাব্যস্ত হয়। আর দার্শনিকদের বাক্যটি মুতাকাল্লিমীনদের প্রমাণাদি দ্বারা বাতিল হয়ে যায়। এ দলটিকে عناديه বলার কারণ হতে পারে, এরা অন্যায়ভাবে অস্বীকার করে। আর عناد অর্থ অন্যায়ভাবে লড়াই করা। অথবা হতে পারে, এরা সত্য বিমুখ। যেমন, عند عن الطريق অর্থ রাস্তা থেকে বিমুখ হওয়া।

ইন্দিয়াহ মতবাদ ঃ দ্বিতীয় গ্রুপকে عنديه বলা হয়। আর عند অর্থ– বিশ্বাস, আস্থা। যেমন বলা হয়– خروج الدم ينقض الوضوء عند ابى حنيفه অর্থাৎ রক্ত নিঃসরণ অযু ভেঙ্গে দেয় – ইমাম আবু হানীফা রহ. বিশ্বাস মতে। কেননা এরা বস্তুসমূহের বাস্তব অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। তবে আকীদা বা বিশ্বাসগত অস্তিত্ব স্বীকার করে। তারা বলে, বাস্তবে বস্তু বলতে কোন কিছুই নেই বরং সব কিছুই আমদের আকীদা বা বিশ্বাসের অধীন। এমনকি আমরা কোন জিনিসকে جوهر বলে বিশ্বাস করলে, তা জওহার আর عرض বলে বিশ্বাস করলে عرض হবে। এমনিভাবে যে জিনিসকে আমরা جوهر বিশ্বাস করি তা আমাদের নিকট جوهر বটে। কিন্তু এ জিনিসকেই অন্য কেউ عرض বিশ্বাস করলে তা তাদের নিকট عرض বলে গণ্য হবে এবং নিজ নিজ মতামত প্রত্যেকের নিকট সঠিক। যদিও প্রতিপক্ষের নিকট তা বাতিল। এরই ভিত্তিতে এদেরকে عنديه বলা হয়।

লা-আদ্রিয়া মতবাদ ঃ তৃতীয় গ্রুপকে لاادريه বলা হয়। এরা বস্তুসমূহের অস্তিত্ব-অনস্তিত্বের জ্ঞান ও নিশ্চয়তাকে অস্বীকার করে এবং উভয়টির ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করে। যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়, বস্তুসমূহ কি প্রমাণিত ও বিদ্যমান? তারা বলবে, لاادرى (আমি জানি না) আবার যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, বস্তুসমূহ কি প্রমাণিত ও বিদ্যমান নয়? তবুও তারা لاادرى বলে সন্দেহ প্রকাশ করবে। এমনকি তারা যে বিষয়টি নিয়ে সন্দিহান –এ ব্যাপারেও তাদের সন্দেহ আছে। সুতরাং তাদের কাউকে যদি প্রশ্ন করা হয়, তোমার কি বস্তুসমূহ প্রমাণিত হওয়ার জ্ঞান নেই? তখনও বলবে لاادرى অর্থাৎ আমার যে জানা নেই– একথাটিও আমার জানা নেই।

গ্রন্থকার স্বীয় উক্তি حقائق الاشياء ثابتة দ্বারা বস্তুসমূহ বাস্তবে বিদ্যমান হওয়ার দাবী করে عناديه এবং عنديه ফিরকার বিরোধিতা করেছেন। আর والعلم بها متحقق দ্বারা বস্তুসমূহের অস্তিত্বে জ্ঞানের দাবী করে لاادرية ফিরকার বিরোধিতা করেছেন। গ্রন্থকার রহ.-এর উক্তি خلافا للسوفسطائيه এর ব্যাখ্যা এটাই।

وَلَنَا تَحْقِيقًا اِنَّا نَجْزِمُ بِالضَّرُورَةِ بِثُبُوتِ بَعْضِ الْاَشْيَاءِ بِالْعَيَانِ وَبَعْضِهَا بِالْبَيَانِ وَاِلْزَامًا اَنَّهُ اِنْ لَمْ يَتَحَقَّقْ نَفْيُ الْاَشْيَاءِ فَقَدْ ثَبَتَ وَاِنْ تَحَقَّقَ فَالنَّفْيُ حَقِيقَةٌ مِنَ الْحَقَائِقِ لِكَوْنِهِ نَوْعًا مِنَ الْحُكْمِ فَقَدْ ثَبَتَ شَيْئٌ مِنَ الْحَقَائِقِ فَلَمْ يَصِحَّ نَفْيُهَا عَلَى الْاِطْلَاقِ وَلَا يَخْفَى اَنَّهُ اِنَّمَا يَتِمُّ عَلَى الْعِنَادِيَّةِ -

সহজ তরজমা

বস্তুসমূহের অস্তিত্বে আমাদের প্রমাণ ঃ আমাদের তাত্ত্বিক দলীল হল, আমরা কিছু কিছু বস্তুর অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করার কারণে এবং কিছু কিছু বস্তুর অস্তিত্ব দলীল থাকার কারণে বিশ্বাস করি। আর ইলযামী দলীল হল, যদি বস্তুসমূহের অনস্তিত্ব সত্য না হয়, তাহলে অস্তিত্ব থাকা প্রমাণিত হল। আর যদি সত্য হয়, তাহলে এটা অস্তিত্ব না থাকাও তো একটি হাকীকত। কারণ, نفی বা অস্বীকৃতি حکم এর এক প্রকার। তাহলে একটি হাকীকত তো প্রমাণিত হল। কাজেই বস্তুর অস্তিত্বহীনতা পুরোপুরিভাবে বিশুদ্ধ (প্রমাণিত) হল না। একথা নিশ্চিত অস্পষ্ট নয় যে, উক্ত দলীল শুধু ইনাদিয়াদের বিরুদ্ধে সঠিকভাবে প্রযোজ্য।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তাত্ত্বিক দলীল ও আক্রমণাত্মক দলীল কি ? তাহকীকী বা তাত্ত্বিক দলীল বলতে ঐ দলীল বুঝায়, যার মুকাদ্দামাগুলো আসলেই সত্য, যদিও প্রতিপক্ষের দৃষ্টিতে তা সত্য নয়। তারা সেগুলোকে স্বীকারও করে না। এমন দলীল দ্বারা সত্যকে প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হয়; প্রতিপক্ষকে লা-জওয়াবও নিরুত্তর করা নয়। কারণ, প্রতিপক্ষ বলতে পারে, আপনাদের দলীল যেসব মুকাদ্দমার উপর প্রতিষ্ঠিত ঐ মুকাদ্দমাগুলোই আমাদের মতে সঠিক নয়। আর ইলযামী বা আক্রমনাত্মক দলীল বলতে প্রতিপক্ষের স্বীকৃত মুকাদ্দমা দ্বারা গঠিত দলীলকে বুঝানো হয়েছে। যার ফলে তাদের মতামত বাতিল ও ভ্রান্ত হওয়া আবশ্যক হয়। যদিও দলীল প্রদানকারীর দৃষ্টিতে ঐ মুকাদ্দমাগুলো সঠিক নয়। এরূপ দলীল দ্বারা প্রতিপক্ষকে লা-জওয়াব এবং নিরুত্তর করাই কেবল উদ্দেশ্য।

তাহকীকী দলীল ঃ বস্তুসমূহের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে তাহকীকী (তাত্ত্বিক) দলীল হল, আমরা কোন কোন জিনিসের অস্তিত্ব স্বচক্ষে দেখার ফলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। আর কোন কোন জিনিসের অস্তিত্ব বিশ্বাস করি দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে। যেমন– আসমান যমীন, নদ-নদী, মাঠ-প্রান্তর, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি স্বচক্ষে দেখে বিশ্বাস করি। আর আল্লাহর অস্তিত্ব দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে বিশ্বাস করি। তদ্রূপ দূর হতে দৃশ্যমান ধোঁয়ার অস্তিত্ব দেখে বিশ্বাস করি আর তখন আগুনের অস্তিত্ব বিশ্বাস করি দলীলের ভিত্তিতে অর্থাৎ ধোঁয়া হল, আগুনের প্রতিক্রিয়া। আর যে বস্তু কোন জিনিসের প্রতিক্রিয়া হয়, বস্তুটি ঐ জিনিস ব্যতিত অস্তিত্বে আসে না। এখানে ধোঁয়ার অস্তিত্ব আছে, বিধায় নিশ্চিতভাবে বলা যায়, সেখানে আগুনেরও অস্তিত্ব আছে। এ দলীল প্রসঙ্গে সুফাসতাইয়্যাহগণ বলতে পারে, আপনারা এ ব্যাপারে নিশ্চিত হলেও আমরা নিশ্চিত হতে পারি না বরং আমরা মনে করি, এগুলো সব কল্পনা এবং ধারণা মাত্র। বাস্তবে কোন জিনিসেরই অস্তিত্ব নেই।

ইলযামী দলীল ঃ আর ইলযামী দলীল হল, আমরা সূফাস্তাইয়্যাহদেরকে জিজ্ঞাসা করব, نفی اشیاء তথা বস্তুসমূহের অনস্তিত্ব বা অস্তিত্বহীনতা তোমরা যার প্রবক্তা সেটা কি বাস্তবে বিদ্যমান? যদি উভয়ে তারা না বলে তাহলে এটা نفی এর অস্বীকৃত হল। আর نفی কে অস্বীকার করলে সেটা স্বীকৃতিতে পরিণত হয়। ফলে বস্তুসমূহের অস্তিত্ব প্রমাণিত হল। আর যদি হ্যাঁ বলে তাহলে বলব, نفی বা অস্বীকৃতি ও একটি হাকীকত, যা বাস্তবসম্মত। কেননা হুকুম দুই প্রকার। ইতিবাচক ও নেতিবাচক। অতএব نفی -ও হুকুমের একটি প্রকার। আর একটি হুকুম হল তাসদীক। আর تصديق হল ইলম। আর ইলম হল, একটি نفسانی کیفیت (আত্মিক অবস্থা)। মূলতঃ আত্মিক অবস্থা হল আরয। আর عرض হল, বাস্তব বিদ্যমান বিষয়াবলী এবং حقائق اشیاء এর একটি। তাহলে বস্তুসমূহের نفی অনস্তিত্ব বা অস্তিত্বহীনতাও একটি হাকীকত। কাজেই যখন একটি হাক্বীকত প্রমাণিত হল তখন موجبه

نفي এর حقائق اشياء হিসেবে سلب كلي প্রমাণিত হল। ফলে সাধারণভাবে بعض الحقائق ثابت তথা جزئيه এর দাবী করে "কোন বস্তুরই অস্তিত্ব নেই" বলা আদৌ ঠিক নয়। কেননা ايجاب جزئي (অংশ বিশেষ মেনে নেওয়া) দ্বারা سلب كلي বা পরিপূর্ণরূপে অস্বীকৃতি বাতিল হয়ে যায়।

উক্ত ইলযামী দলীলের ব্যাপারে শারিহ রহ. বলেন, এটা কেবল ইনাদিয়াদের বিরুদ্ধে দলীল হতে পারে। কারণ, ইন্দিয়ারা বলবে, এ দলীল তোমাদের ধারণা অনুসারে সঠিক, কিন্তু আমাদের মতে সঠিক নয়। আর লা-আদ্‌রিয়্যাদের বিরুদ্ধে তো এটা কোন দলীলই হবে না। কারণ, তারা প্রশ্নের উভয় অংশের উত্তরে لاادري (আমি জানি না) বলে উভয় অংশকেই অস্বীকার করবে।

قَالُوا اَلضَّرُورِيَّاتُ مِنْهَا حِسِّيَّاتٌ وَالْحِسُّ قَدْ يَغْلَطُ كَثِيْرًا كَالْاَحْوَلِ يَرَى الْوَاحِدَ اِثْنَيْنِ وَالصَّفْرَاوِيُّ قَدْ يَجِدُ الْحُلْوَ مُرًّا وَمِنْهَا بَدِيهِيَّاتٌ وَقَدْتَقَعُ فِيهِ اِخْتِلَافَاتٌ وَتَعْرِضُ بِهَا شُبَهٌ يَفْتَقِرُ فِي حَلِّهَا اِلَى اَنْظَارٍ دَقِيقَةٍ وَالنَّظَرِيَّاتُ فَرْعُ الضَّرُورِيَّاتِ فَفَسَادُهَا فَسَادُهَا وَلِهٰذَا كَثُرَ فِيهَا اِخْتِلَافُ الْعُقَلَاءِ

সহজ তরজমা

সূফাস্তাইয়্যাদের প্রমাণ ঃ সূফাস্তাইয়্যারা বলে, ضروريات এর মধ্যে কিছু হল حسيات (ইন্দ্রিয় অনুভূত জিনিস)। আর ইন্দ্রিয় বা অনুভূতি শক্তি মাঝেমধ্যে বেশ ভুল করে। যেমন একজন টেরা ব্যক্তি একটি জিনিসকে দুটি দেখে; জণ্ডিস আক্রান্ত ব্যক্তি কখনও মিষ্টিকে তিতা মনে করে। আবার এর মধ্যে কিছু রয়েছে بدهيات (সতঃসিদ্ধ)। অনেক সময় এগুলোতে মতানৈক্য দেখা দেয় এবং এমন অনেক সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি হয়, যা নিরসন করতে সূক্ষ্ম যুক্তির প্রয়োজন হয়। আর نظريات হল, ضروريات এর শাখা। কাজেই ضروريات এর فساد বা বিনষ্টতা نظريات এর فساد (বিনষ্টতা)। এ কারণেই نظريات এর মধ্যে বিজ্ঞজনের অনেক বিরোধ রয়েছে।

সহজ তাহকীক তাশরীহ

ইলম দুই প্রকার। যদি কোন জিনিসের জ্ঞান চিন্তা-গবেষণা ও জানা বিষয়সমূহকে তারতীব দানের মাধ্যমে অর্জিত হয়ে থাকে, তাহলে তা নযরী। নতুবা তা জরুরী আর জরুরী। অনেক ভাগে বিভক্ত। যেমন,-حسيات حسيات- تجربيات- حدسيات - وحدانيات -متواتر- بدهياتএবং فطريات ইত্যাদি। এসবের মধ্যে حسيات (ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়াবলী) এবং بدهيات (সতঃসিদ্ধ বিষয়াবলী) কে সর্বাধিক শক্তিশালী সাব্যস্ত করা হয়েছে।

লা-আদ্‌রিয়্যাদের আপত্তি ঃ সুফাস্‌তাইয়্যাহদের একটি দল লা-আদ্‌রিয়্যারা বলে, ضروريات এর মধ্য হতে حسيات এর অস্তিত্বের নিশ্চিত জ্ঞান অর্জিত হতে পারে না। কারণ, حسيات এর জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম হল পঞ্চইন্দ্রীয় বা অনুভূতি শক্তি। আর পঞ্চইন্দ্রীয় كليات কে অনুধাবন করতে পারে না। কেননা عقل বা বিবেক كليات কে অনুধাবন করতে পারে না। আর جزئيات এর অনুধাবনের ক্ষেত্রে حواس বা অনুভূতি শক্তি প্রচুর পরিমাণ ভুল করে। যেমন, জণ্ডিস আক্রান্ত ব্যক্তি মিষ্টি জিনিসকে তিক্ত অনুভব করে। চোখটেরা ব্যক্তি একটি জিনিসকে দুটি দেখে। দৃষ্টিশক্তি অনেক সময় ছোট জিনিসকে বড় দেখে, যেমন আঙ্গুরকে পানিতে রাখলে তার আসল আকৃতি থেকেও বড় দেখা যায়। এমনিভাবে বড় জিনিসকেও কখনও ছোট দেখে। যেমন, খোলা আকাশের উড়ন্ত উড়োজাহাজকে তার আসল আকৃতি থেকেও ছোট দেখা যায়। বৃষ্টির ফোটাকে তারের মত দেখা যায়। এমনিভাবে একটি রশির এক প্রান্তে একটি আগুনের কয়লা বেঁধে ঘুরালে আগুনের বৃত্তের মত দেখা যাবে। চলন্ত রেলের আবদ্ধ বগিতে বসা ব্যক্তির কাছে রেলটি স্থির বলে মনে হয়। দ্রুতগামী রেলে বসা ব্যক্তি রেল লাইনের পার্শে দাঁড়িয়ে থাকা গাছপালা ও বৈদ্যুতিক খুটিকে চলমান মনে করে। মোটকথা, এত অধিক ভুলের স্বীকার হওয়ার সত্ত্বেও حسيات এর অস্তিত্বের ব্যাপারে নিশ্চিত কিভাবে হওয়া যায়?

এমনিভাবে বদীহিয়্যাতও ضروريات এর অন্তর্ভুক্ত। এতে অনেক বিরোধ হয়। যার ফলে এগুলোর অস্তিত্বের ব্যাপারে নির্ভর করা যায় না। যেমন, ফিরকায়ে মুশাব্বিহা বলে, প্রতিটি বিদ্যমান বস্তু কোন স্থানে সমাসীন হওয়া জরুরী। আশায়িরাগণ একে অস্বীকার করেন। তাছাড়া মুতাযিলা সম্প্রদায় বলে, বান্দা তার ইচ্ছাধীন কাজকর্মের

স্রষ্টা। আশায়িরাগণ এটাকে অস্বীকার করেন। দার্শনিকগণ বলেন, স্বধীনকর্তার পক্ষে তার ক্ষমতাধীন দুটি জিনিসের কোন একটিকে কোন عِلَّة مُرَجِّح বা প্রাধান্য দেওয়ার মত কোন কারণ ব্যতিত প্রাধান্য্য দেওয়া অসম্ভব। এটাকে তারা بَدْهِى মনে করেন। অথচ আশায়িয়াগণ এটাকে অস্বীকার করেন। بَدْهِيَّات এর ব্যাপারে এসব মতবিরোধ بَدْهِيَّات এর অস্তিত্বের নির্ভরতাকে শেষ করে দেয়। কারণ, এক্ষেত্রে بَدَاهَت বা স্বতঃসিদ্ধতার দাবীটাই ভুল হতে পারে। তাছাড়া بَدْهِيَّات এর মধ্যে অনেক সময় এমন এমন সন্দেহ-সংশয়ের সৃষ্টি হয়, যা নিরসন করতে সূক্ষ্ম চিন্তা-গবেষণার প্রয়োজন হয়। আর চিন্তা-গবেষণার মুখাপেক্ষী হওয়া بَدَاهَت পরিপন্থী। আবার হতে পারে চিন্তা-গবেষণার পরও সন্দেহ দূর হবে না এবং তা দূরীকরণেও ভ্রান্তির শিকার হবে। তাহলে حِسِّيَّات এবং بَدْهِيَّات এ দুটি ضَرُوْرِيَّات এর শক্তিশালী প্রকার হওয়া সত্ত্বেও যখন এগুলোর অস্তিত্বের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায় না, তখন ضروريات এর অন্যান্য প্রকারের অস্তিত্বের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার কোন প্রশ্নই আসে না। তাছাড়া ضَرُوْرِيَّات এর জ্ঞানও হতে পারে না। কারণ, نَظَرِيَّات তার শাখা। এ ضَرُوْرِيَّات কে বিন্যাস দিয়েই نَظَرِيَّات এর জ্ঞান লাভ হয়। কাজেই ضَرُوْرِيَّات এর فَسَاد (বিনষ্টতা) তথা তার জ্ঞান না হওয়া, نَظَرِيَّات এর জ্ঞান না হওয়াকে আবশ্যক করে। আর এ কারণেই ضَرُوْرِيَّات এর অস্তিত্বের জ্ঞান না হওয়া نَظَرِيَّات জ্ঞান না হওয়ার কারণ। এজন্যই نَظَرِيَّات এর মধ্যে অধিক মতানৈক্য রয়েছে।

قُلْنَا غَلَطُ الْحِسِّ فِى الْبَعْضِ لِاَسْبَابٍ جُزْئِيَّةٍ لَايُنَافِى الْجَزْمَ بِالْبَعْضِ بِانْتِفَاءِ اَسْبَابِ الْغَلَطِ وَالْاِخْتِلَافَاتُ فِى الْبَدِيْهِىِّ لِعَدَمِ الْاِلْفِ اَوْ لِخَفَاءٍ فِى التَّصَوُّرِ لَايُنَافِى الْبَدَاهَةَ وَكَثْرَةُ الْاِخْتِلَافِ لِفَسَادِ الْاَنْظَارِ لَاتُنَافِى حَقِيَّةَ بَعْضِ النَّشْرِيَّاتِ- وَالْحَقُّ اَنَّهٗ لَاطَرِيْقَ اِلَى الْمُنَاظَرَةِ مَعَهُمْ خُصُوْمًا مَعَ اللَّاَادْرِيَّةِ لِاَنَّهُمْ لَايَعْتَرِفُوْنَ بِمَعْلُوْمٍ لِيَثْبُتَ بِهٖ مَجْهُوْلٌ بَلِ الطَّرِيْقُ تَعْذِيْبُهُمْ بِالنَّارِ لِيَعْتَرِفُوْا اَوْ يَحْتَرِقُوْا - وَسُوْفَسْطَا اِسْمٌ لِلْحِكْمَةِ الْمُمَوَّهَةِ وَالْعِلْمِ الْمُزَخْرَفِ لِاَنَّ سُوْفَا مَعْنَاهُ الْعِلْمُ وَالْحِكْمَةُ وَاَسْطَا مَعْنَاهُ الْمُزَخْرَفُ وَالْغَلَطُ وَمِنْهُ اشْتُقَّتِ السَّفْسَطَةُ كَمَا اشْتُقَّتِ الْفَلْسَفَةُ مِنْ فَيْلَاسُوْف اَىْ مُحِبُّ الْحِكْمَةِ -

সহজ তরজমা

উক্ত আপত্তির জবাব ঃ আমরা উত্তরে বলব, কোন কোন জিনিসে বিশেষ কোন কারণে ইন্দ্রিয়ের ভুল করা অন্য কোথাও এরূপ না হওয়ার কারণে কোন কোন জিনিস সম্পর্কে নিশ্চয়তা লাভের পরিপন্থী নয়। আর (উভয় পক্ষের) ধারণায় অস্পষ্টতা থাকায় অথবা সুসম্পর্ক না থাকায় بَدِيْهِى এর মধ্যে বিরোধ দেখা দেওয়া بَدَاهَت বিরোধী নয়। চিন্তা-গবেষণা অশুদ্ধ হওয়ায় অধিক মতানৈক্য কোন কোন نظريات এর শুদ্ধতার পরিপন্থী নয়। আসল কথা হল, তাদের সাথে বিশেষতঃ لَاَادْرِيَّة এর সাথে বিতর্কের কোন প্রদ্ধতিই নেই। কারণ, তারা কোন জানা বিষয়কেই স্বীকার করে না যে, তার মাধ্যমে অজানা বিষয়কে প্রমাণ করা হবে বরং একমাত্র পন্থা হল, তাদেরকে আগুনে শাস্তি দেওয়া। হয়ত তারা স্বীকার করবে, নয়ত জ্বলে পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবে। আর سُوْفَسْط সজ্জিত জ্ঞানের নাম। কারণ, سُوْفا অর্থ জ্ঞান-বিদ্যা। আর اَسْطا অর্থ, সাজানো এবং ভুল। আর এ থেকেই سُوْفَسْط শব্দটি নির্গত হয়েছে। যেনিভাবে فَلْسَفَه শব্দটি فَيْلَسُوْف (অর্থ দর্শন প্রিয়) থেকে নির্গত।

সহজ তাহকীক তাশরীহ

হিস্যিয়াতের ক্ষেত্রে আপত্তির জবাব ঃ শারিহ রহ. প্রথমেই حِسِّيَّات এর অস্তিত্বের ব্যাপারে লা-আদ্‌রিয়্যাদের পক্ষ থেকে আরোপিত অভিযোগের উত্তর দিচ্ছেন। কোন কোন জিনিসের অনুভবের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ের ভুল করার উপর ভিত্তি করে লা-আদরিয়্যারা সাধারণতঃ মনে করেছে। অতঃপর অন্য কোন জিনিসের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ের কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য হবে না। শারিহ রহ. এ ব্যাপকতাকে অস্বীকার করে বলেন, বিশেষ কোন

কারণে কারো ইন্দ্রিয় কোন কোন জিনিসের অনুভবের ক্ষেত্রে ভ্রান্তির শিকার হওয়া, অন্যত্র এসব কারণ না পাওয়া গেলে সে ক্ষেত্রে নিশ্চয়তা লাভের পরিপন্থী নয়। কেননা হতে পারে অন্যত্র এ কারণ বিদ্যমান নেই। যেমন, জণ্ডিস রোগী মিষ্টিকে তিক্ত অনুভব করার কারণ তার জণ্ডিস রোগী হওয়া। সুতরাং যে জণ্ডিস রোগী নয় তার আস্বাদন শক্তি ভুল অনুভব করবে না। অথবা দ্রুতগামী রেলে ভ্রমণরত ব্যক্তি বৈদ্যুতিক খুটিকে চলন্ত দেখার কারণ ছিল ট্রেনের দ্রুতগামীতা। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শী খুটিকে স্থির মনে করবে।

বদীহি বিষয়ের ক্ষেত্রে আপত্তির জবাব ঃ

আর بدهيات এর অস্তিত্বের ব্যাপারে লা-আদ্‌রিয়্যাদের অভিযোগের জবাব হল, কোন কোন সময় একটি বাক্য আসলেই بديهى হয়। কিন্তু কারও নিকট তার موضوع এবং محمول এর যথাযথ ধারণা অস্পষ্ট থাকে। ফলে সে ঐ بديهى বাক্যটির ব্যাপারে বিরোধিতা করে এবং তা অস্বীকার করে। কিন্তু যখন তার নিকট موضوع ও محمول এর যথাযথ ধারণা এসে যায়, তখন বিরোধ নিঃশেষ হয়ে যায়। যেমন, واجب الوجود ليس بعرض একটি بديهى বাক্য। এ ব্যাপারে কেউ কেউ মতানৈক্য করে। কিন্তু যখন তাকে موضوع এবং محمول এর যথাযথ ধারণা দেওয়া হবে এবং বলা হবে, واجب الوجود ঐ সত্তাকে বলে, যে আপন অস্তিত্বে অন্যের মুখাপেক্ষী নয়। আর عرض বলে ঐ জিনিসকে, যা তার অস্তিত্ব লাভে ঐ স্থানের মুখাপেক্ষী, যার সাথে মিশে সে অস্তিত্ব লাভ করবে। তাহলে তৎক্ষণাৎ সেই বলে উঠবে, واجب الوجود عرض নয়। এমনিভাবে একটি بديهى বাক্যের ব্যাপারে সুসম্পর্ক না থাকলেও বিরোধ হয়। যেমন, মানুষের নিকট অন্য মাযহাবের মাসআলাসমূহ بديهى হলেও সুসম্পর্কিত নয়। ফলে তাদের সাথে মতানৈক্য করে। কিন্তু যদি নিজে ঐ মাযহাব গ্রহণ করে, তাহলে ঐ মাযহাবের যেসব মাসআলায় ইতোপূর্বে তার বিরোধ ছিল, এখন সুসম্পর্কের কারণে তা আর থাকে না। মোটকথা, বাক্যের موضوع ও محمول যথাযথ ধারণা অস্পষ্ট হওয়ায় অথবা বাক্যের সাথে সুসম্পর্ক না থাকায় بديهى বাক্য ও বিষয়াবলীতে মতবিরোধ দেখা দেওয়া ঐ বিষয়ের بداهت পরিপন্থী নয়।

নয্‌রিয়্যাতের উপর উত্থাপিত প্রশ্ন নিরসন ঃ

শারেহ রহ. অধিক মতবিরোধের ফলে نظريات এর অস্তিত্ব সম্পর্কে আরোপিত প্রশ্নের জবাব وكثرة الاختلاف الخ উক্তি দ্বারা দিয়েছেন। অর্থাৎ কোন কোন نظريات এর মধ্যে বিরোধ কারও কারও চিন্তা-গবেষণা তথা মুকাদ্দামাগুলো সাজানোর ক্ষেত্রে ভুল-ভ্রান্তির কারণে হয়ে থাকে। আর চিন্তা-গবেষণায় ভুল হওয়ায় কোন কোন نظريات এর মধ্যে বিরোধ অন্যান্য نظريات সত্যতা এবং প্রমাণিত হওয়ার পরিপন্থী নয়। কেননা হতে পারে ঐ نظرى টি সঠিক চিন্তা-গবেষণা এবং মুকাদ্দামাগুলোকে বিশুদ্ধভাবে বিন্যাসের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে।

লা-আদ্‌রিয়াদের উপযুক্ত জবাব ঃ

قوله: الحق انه الخ ঃ পরিশেষে শারিহ রহ. বলেন, সত্য কথা হল, সূফাসতাইয়্যাহ বিশেষতঃ লা-আদরিয়্যাদের সাথে বিতর্কে জড়ানোর কোন পদ্ধতি নেই। কারণ, বিতর্কের উদ্দেশ্য তো শ্রোতা যা জানে এবং যেগুলো সে স্বীকার করে, সেগুলোকে সাজিয়ে-গুছিয়ে তাকে এমন বিষয়ের ধারণা দেওয়া, যা সে পূর্বে জানত না বা স্বীকার করত না। আর লা-আদ্‌রিয়্যারা তো কোন জিনিস জানা আছে বলেই স্বীকার করে না যে, তার মাধ্যমে অজানা জিনিস জানা যাবে বরং যে বস্তুর ব্যাপারেই তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তারা لاادرى বলে দিবে। সুতরাং তাদের সাথে বিরোধ মীমাংসার পন্থা একটিই অর্থাৎ তাদেরকে আগুনে ফেলে দেওয়া হবে। যাতে তারা কষ্ট যন্ত্রনা ভোগ করে। তাহলে আমাদের দাবী প্রমাণিত হয়ে যাবে। কারণ, কষ্ট-যন্ত্রনাও একটি বাস্তবতা। আর স্বীকার না করলে আগুনে রেখে দেওয়া হবে। যাতে জ্বলে পুড়ে ভস্ম হয়ে যায় এবং আপদ দূর হয়ে যায়।

সুফাস্তা শব্দের তাহকীক ঃ

قوله : سوفسط ঃ শারিহ রহ. এখানে سوفسط এর উৎসমূল বর্ণনা করছেন। সারকথা হল, এ শব্দটি ইউনানী ভাষা থেকে আরবীতে রূপান্তর হয়েছে। যা سوفا ও اسطا শব্দদ্বয়ের সমন্বয়ে গঠিত। سوفا অর্থ– জ্ঞান-প্রজ্ঞা-বিদ্যা। আর اسطا অর্থ, সজ্জিত বা ভুল। কাজেই سوفسط এর অর্থ দাঁড়ায়, সজ্জিত বিদ্যা, জ্ঞান এবং ভুল জ্ঞান। অতঃপর তা থেকে بعثرة এর ওজনে رباعى এর মাসদার سفسطه রূপান্তর করা হয়েছে। যেমন,

فلسفة শব্দটি رباعى এর مصدر এবং আরবীতে রূপান্তরিত, যা ইউনানী ভাষার দুটি শব্দ فيلا (প্রেমিক) سوفا (বিদ্যা) হতে নির্গত। যার সমন্বিত অর্থ– দর্শন প্রেমিক, জ্ঞান প্রিয়।

وَأَسْبَابُ الْعِلْمِ هُوَ صِفَةٌ يَتَجَلَّى بِهَا الْمَذْكُورُ لِمَنْ قَامَتْ هِيَ بِهِ أَيْ يَتَّضِحُ وَيَظْهَرُ مَا يُذْكَرُ وَيُمْكِنُ أَنْ يُعَبَّرَ عَنْهُ مَوْجُودًا كَانَ أَوْ مَعْدُومًا فَيَشْمَلُ إِدْرَاكَ الْحَوَاسِ وَإِدْرَاكَ الْعَقْلِ مِنَ التَّصَوُّرَاتِ وَالتَّصْدِيقَاتِ وَغَيْرِ الْيَقِينِيَّةِ.

সহজ তরজমা

ইলমের উৎস ঃ আর জ্ঞানের মাধ্যম... । এটি (জ্ঞান) এমন একটি গুণ, যার দ্বারা কোন বস্তু ঐ ব্যক্তির নিকট স্পষ্ট হয়ে যায়। যার সাথে তা (জ্ঞান) প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ আলোচিত বস্তু এবং যার ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব, তা স্পষ্ট হয়ে যায়। কাজেই সংজ্ঞাটি পঞ্চইন্দ্রিয়ের জ্ঞান, বিবেকের জ্ঞান চাই তা تصور এবং تصديقات يقينيه এবং غير يقينيه যাই হোক সবগুলোকে শামিল করে।

সহজ তাহকীক তাশরীহ

ইলমের সংজ্ঞা ঃ শারিহ রহ. ইলমের দুটি তারিফ বা সংজ্ঞা উল্লেখ করেছেন। একটি সংজ্ঞা শাইখ আবু মানসূর মাতুরিদী রহ. প্রদান করেছেন অর্থাৎ صفه يتجلى بها المذكور । অপর সংজ্ঞাটি সামনে আসছে। যার আলোচনা শারিহ রহ. তার উক্তি بخلاف قولهم صفة توجب تميزا لا يحمل النقيض দ্বারা বর্ণনা করবেন। প্রথম সংজ্ঞাটি ব্যাপক। আর দ্বিতীয় সংজ্ঞাটি খাস। তারপর শারিহ রহ. প্রথম সংজ্ঞায় একটি শর্তযুক্ত করে উভয় সংজ্ঞাকে এক ও অভিন্ন সাব্যস্ত করবেন।

প্রথম সংজ্ঞার মর্মার্থ হল, ইলম এমন একটি গুণের নাম, যার কারণে ঐ গুণে গুণান্বিত ব্যক্তির স্মৃতিপটে কোন বস্তু এমনভাবে প্রতিভাত হয়ে উঠে, কেমন যেন সে স্বচক্ষে দেখছে। যেমন, গোলাপ ফুলের নাম শোনা মাত্রই তার রং-রূপ ও গঠন আমাদের স্মৃতিপটে এমনভাবে প্রতিভাত হয়ে উঠে, যেন তা আমাদের সামনে। বুঝা গেল, আমাদের মাঝে এমন কোন গুণ এবং অদৃশ্য শক্তি রয়েছে, যার কারণে বস্তুর রূপরেখা আমাদের স্মৃতিতে ভেসে উঠে। যে গুণটির মাধ্যমে বিভিন্ন বস্তু প্রতিভাত হয়ে উঠে, তাকেই বলে ইলম।

المذكور শব্দচয়নের মর্মার্থ ঃ এখানে مذكور শব্দটি দ্বারা شئ বা বস্তু বুঝানো হয়েছে। চাই তা বিদ্যমান হোক বা না হোক; তার অস্তিত্বহীনতা সম্ভব হোক বা অসম্ভব হোক। এ স্থলে صفة يتجلى بها الشئ বললেই সব চেয়েবেশী ভাল হত। আশায়িরাদের পরিভাষায় شئ শব্দটি বিদ্যমান এর ক্ষেত্রে হাকীকত; অবিদ্যমান এর ক্ষেত্রে মাজায হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আর সংজ্ঞায় مجازى শব্দের ব্যবহার সমীচীন নয়। বিধায় শারিহ রহ. الشئ এর পরিবর্তে المذكور শব্দ ব্যবহার করেছেন।

يتضح ويظهر ঃ এটা يتحلى এর ব্যাখ্যা। আর শারিহ রহ. এর مايذكر উক্তিটি الذكور এর ব্যাখ্যা অর্থাৎ علم এমন গুণের নাম, যার কারণে ঐ বস্তু প্রতিভাত হয়ে উঠে, যার উল্লেখ করা হয় বা নাম নেওয়া হয়।

একটি প্রশ্নের অবসান

ويمكن ان يعبر عنه ঃ এটা يذكر এর উপর ব্যাখ্যামূলক আত্ফ হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হল, একটি অভিযোগের নিরসন করা। অভিযোগের সারাংশ হচ্ছে, অনেক জিনিস এমন আছে, যার আলোচনা করা হয় না। সেগুলোর নাম উচ্চারণ করা হয় না। শুধুমাত্র চিন্তা-ভাবনা ও কল্পনা করলেই সেগুলো স্মৃতিপটে উদ্ভাসিত হয়ে যায়। তাহলে অনুল্লেখিত ঐ বস্তুসমূহ যে গুণের কারণে উদ্ভাসিত হয়, উপরিউক্ত সংজ্ঞানুপাতে সে গুণটি علم নামে অভিহিত হবে না। অথচ তাও ইলম। কাজেই সংজ্ঞাটি جامع বা পূর্ণাঙ্গ হল না। উত্তরের সারমর্ম হল, কার্যত কোন জিনিস উল্লেখ করা জরুরী নয় বরং উল্লেখযোগ্য হওয়াই যথেষ্ট। অর্থাৎ علم ঐ গুণকে বলে, যার কারণে ঐ বস্তু উদ্ভাসিত হয়, যার আলোচনা করা হয় অথবা আলোচনা করা হয় না বটে, তবে আলোচনা করা সম্ভব।

সংজ্ঞাটির পরিধি

فيشمل ঃ এখান থেকে শারিহ রহ. সংজ্ঞাটির ব্যাপকতা বর্ণনা করছেন। ইবারতটি বুঝার জন্য ভূমিকা স্বরূপ প্রথমে স্মরণ রাখতে হবে যে, পঞ্চইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যা অনুধাবন করা হয়, যেমন দৃষ্টিশক্তি দ্বারা রং ও আকার-আকৃতি, শ্রবণশক্তি দ্বারা আওয়াজ, ঘ্রাণশক্তি দ্বারা সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ, আস্বাদন শক্তি দ্বারা স্বাদ এবং স্পর্শ শক্তি দ্বারা গরম ও ঠাণ্ডা ইত্যাদি অনুধাবন করা হয়। এসব অনুধাবনকে احساس (অনুভূতি) বলা হয়। আর عقل এর মাধ্যমে যে অনুধাবন হয়, তাকে تعقل বলে। অতঃপর عقل এর অনুধাবন তথা تعقل কে নিম্নরূপে ভাগ করা হয় অর্থাৎ আকলের মাধ্যমে যে জিনিস অনুধাবন করা হয়, তা হয়ত نسبت تامه خبريه সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস থেকে শূন্য হবে, তাহলে তাকে تصور বলে। আর যদি نسبت تامه خبريه সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস হয়, তাহলে তাকে تصديق বলে। অতঃপর تصديق এর মধ্যে বিপরীতমূখী সম্ভাবনা থেকে থাকলে তাকে ظن বলে। যেমন, প্রমাণাদি ও নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে কারও আকল অনুধাবন করল যে, এ বছর প্রচুর বৃষ্টি হবে। কিন্তু আবার তার মতে বৃষ্টি কম হওয়ার সম্ভাবনাও আছে। তাহলে সে বলবে, আমার ধারণা হচ্ছে, এ বছর খুব বৃষ্টি হবে। এরূপ বলবে না যে, এ ব্যাপারে আমার يقين বা দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে।

আর তাসদীকে যদি বিপরীতমুখী সম্ভাবনা না থাকে, তাহলে উক্ত تصديق কে اعتقاد এবং جزم বলে। যেমন, আপনি আপনার আকল দ্বারা অনুধাবন করলেন, ইসলামই সত্য ধর্ম। অধিকন্তু আপনার এ অনুভূতি এতই পাকাপোক্ত যে, আপনার বিবেক এর বিপরীত কোন কথা শুনতেও রাজি নয়; ইসলাম ধর্ম ভ্রান্ত হওয়ার ব্যাপারে আপনার বিবেকে সম্ভাবনার লেশ মাত্র নেই। তাহলে উক্ত تصديق কে আপনার اعتقاد বলা হবে। কাজেই আপনি বলবেন, আমার اعتقاد (দৃঢ় বিশ্বাস) হল, ইসলামই সত্য ধর্ম।

অতঃপর উক্ত দৃঢ় বিশ্বাস যদি বাস্তবতা বিরোধী হয়, তাহলে একে جهل مركب বলে। যেমন, কেউ তার বিবেকের মাধ্যমে অনুধাবন করল, নবী মানুষ হয় না। আর তার এ অনুভূতি এতই মজবুত যে, নবী মানুষ হওয়ার সামান্যতম সম্ভাবনাও তার নিকট নেই। তাহলে উক্ত تصديق অনুভূতিকে اعتقاد বলা হবে। আর যেহেতু উক্ত اعتقاد বাস্তবতা বিরোধী, তাই উক্ত اعتقاد কে جهل مركب বলা হবে। আরও বলা হবে, নবী মানুষ না হওয়ার اعتقاد পোষণকারী جهل مركب এ লিপ্ত।

আর যদি اعتقاد বাস্তবসম্মত হয়, কিন্তু تشكيك مشكك অর্থাৎ সন্দেহ সৃষ্টিকারী কোন দলীল সন্দেহ সৃষ্টি করে উক্ত اعتقاد কে দূর এবং নিঃশেষ করতে পারে, তাহলে তাকে تقليد বলে। যেমন, কোন ব্যক্তি জনৈক আলেমের প্রতি সুধারণা বশতঃ তার অনুসরণ করে কোন জিনিসকে حلال অথবা حرام অথবা مكروه অথবা مستحب বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে। তার কাছে এর বিপরীত কোন সম্ভাবনাই নেই। তাহলে এটাকে تقليد বলা হবে। কেননা হতে পারে ভবিষ্যতে তার সামনে ঐ اعتقاد পরিপন্থী কোন দলীল যেমন, ঐ আলেমের অন্য উক্তি এসে যেতে পারে। যার কারণে তার প্রথম اعتقاد দূরীভূত হয়ে যাবে। আর যদি اعتقاد বাস্তবসম্মত হওয়ার পাশাপাশি এত মজবুত ও দৃঢ় হয় যে, تشكيك مشكك (কোন সন্দেহ সৃষ্টিকারী দলীলের মাধ্যমে) তা দূরীভূত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে, তাহলে উক্ত تصديق কে ইয়াকীন বলে।

উক্ত বিবরণের সারমর্ম দাঁড়াল, عقل এর অনুধাবন প্রথমতঃ দুই প্রকার। একটি تصور অপরটি তাসদীক অতঃপর تصديق আবার চার প্রকার। (১) ظن (২) جهل مركب (৩) تقليد (৪) يقين । শেষটি ব্যতিত বাকি সব تصديق তথা ظن , جهل مركب এবং تقليد কে تصديقات غير يقينيه বলে।

দার্শনিকগণ عقل এর অনুধাবন তথা تعقل কে ইলম বলে গণ্য করেন; حواس তথা উন্দ্রিয়ের অনুভূতিকে ইলম বলে গণ্য করেন না। আর কালাম শাস্ত্রবীদগণ عقل ও حواس উভয়টির অনুভূতিকে ইলম বলে গণ্য করেন। তবে عقل বা বিবেকের অনুধাবনের ব্যাপারে সামান্য মতানৈক্য আছে। কারও কারও মতে عقل এর অনুধাবনের সব প্রকারই ইলম। আর কারও কারও মতে কোন কোন প্রকার ইলম, সবগুলো নয়।

فيشمل ... الخ বাক্যটির বিশ্লেষণ

উক্ত ভূমিকার পর উল্লেখিত ইবারতের সমাধান দাঁড়ায়, ইলমের উল্লেখিত সংজ্ঞায় علم কে এমন গুণ বলা হয়েছে, যার কারণে কোন বস্তু স্মৃতিপটে উদ্ভাসিত হয়ে যায়। আর এটা عقل ও حواس উভয়টির অনুধাবন দ্বারাই হয়ে থাকে। তাহলে বুঝা গেল, সংজ্ঞাটিতে عقل ও حواس উভয়ের অনুধাবন অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অতঃপর সংজ্ঞায় উল্লেখিত يتجلى শব্দটি ينكشف এর অর্থে ব্যবহৃত। যা مطلق বা শর্তহীন হওয়ায় انكشاف تام এবং انكشاف ناقص উভয় প্রকারকে শামিল করে। ফলে উপরিউক্ত সংজ্ঞাটি عقل এর অনুধাবন তথা تصور এবং تصديق يقيني (যার মধ্যে انكشاف تام হয়) এবং تصديقات غير يقينيه যা দ্বারা انكشاف ناقص (অপূর্ণ উদ্ভাস) হয় যেমন, ظن - جهل مركب, تقليد সবগুলোকেই শামিল করে নেয়।

قوله ادراك الحواس : এখানে حواس বলতে বাহ্যিক পঞ্চইন্দ্রিয়কে বুঝানো হয়েছে। কেননা আশায়িরাগণ حواس باطنه (সুপ্ত ইন্দ্রিয়সমূহ) যথা, حس مشترك - حافظه - متصرفه - وهم - خيال ইত্যাদির অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। এরপর عقل ও حواس এর দিকে ادراك এর اضافت করায় এমন ভাবা যাবে না যে, عقل ও حواس -ই مدرك তথা অনুধানকারী বরং মানুষই حواس এবং عقل এর মাধ্যমে বস্তুসমূহের জ্ঞান লাভ করে। কাজেই মূল অনুধাবনকারী হল মানুষ, যাকে نفس (আত্মা) শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়। আর حواس ও عقل হল, অনুধাবনের মাধ্যম। সুতরাং حواس ও عقل এর দিকে ادراك এর اضافت টা اضافت الشئ الى فاعله জাতীয় নয় বরং اضافت الشئ الى التة এর অন্তর্ভূক্ত। আর ادراك الحواس এর অর্থ হবে, حواس তথা ইন্দ্রিয়সমূহের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান।

من التصورات : এটা শুধু ادراك العقل এর বিবরণ। কারণ, কালাম শাস্ত্রবিদ ও দার্শনিকদের মধ্য হতে কারও মতে ইন্দ্রিয়ের জ্ঞানকে تصور এবং تصديق বলা হয় না। تصور এবং تصديق তো শুধু تعقل তথা عقل এর জ্ঞান ও অনুধাবনের প্রকার। যেমন পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

بِخِلَافِ قَوْلِهِمْ صِفَةٌ تُوجِبُ تَمِيِيْزًا لَا يَحْتَمِلُ النَّقِيْضَ فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ شَامِلًا لِإِدْرَاكِ الْحَوَاسِ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ التَّقْيِيْدِ بِالْمَعَانِي وَلِلتَّصَوُّرَاتِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا لَا نَقَائِضَ لَهَا عَلَى مَازَعَمُوا لٰكِنَّهُ لَا يَشْمَلُ غَيْرَ الْيَقِيْنِيَّاتِ مِنَ التَّصْدِيْقَاتِ هٰذَا وَلٰكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَحْمِلَ التَّجَلِّي عَلَى الْاِنْكِشَافِ التَّامِ الَّذِي لَا يَشْمَلُ الظَّنَّ لِأَنَّ الْعِلْمَ عِنْدَهُمْ مُقَابِلٌ لِلظَّنِّ -

সহজ তরজমা

ইল্‌মের দ্বিতীয় সংজ্ঞা

আশায়িরাদের কারও কারও বক্তব্য এর বিপরীত। তারা বলেন, (ইলম হল) এমন একটি গুণ, যা এমন পার্থক্যবোধ সৃষ্টি করে, যা তার বিপক্ষের সম্ভাবনা রাখে না। কারণ, সংজ্ঞাটি যদিও মা'আনীর শর্তারোপ না করায় পঞ্চইন্দ্রিয়ের অনুভূতিকে শামিল করে এবং تصورات কেও (শামিল করে), সে মতে কারও কারও উক্তি অনুসারে تصورات বিপক্ষ হয় না। তবে উক্ত সংজ্ঞা تصديقات غير يقينه কে আওতাভুক্ত করবে না। অবশ্য মুনাসিব হল, (প্রথম সংজ্ঞার) تجلى শব্দটিকে انكشاف تام অর্থে ধরে নেওয়া, যা ظن কেও শামিল করে। কারণ, আশায়িরাদের মতে ইলম হল ظن এর বিপরীত।

সহজ তাহকীক তাশরীহ

দ্বিতীয় সংজ্ঞাটির বিশ্লেষণ

প্রকৃত সংজ্ঞা ছিল صفة توجب تميزا بين المعانى অর্থাৎ ইলম এমন গুণকে বলে, যা দ্বারা অন্তরে অর্থসমূহ এমনভাবে উদ্ভাসিত এবং অন্যান্য জিনিস থেকে পৃথক হয়ে যায় যে, বিপরীত দিকের কোন সম্ভাবনাই থাকে না। আর معانى ঐ বিদ্যমান বস্তুসমূহকে বলে, যা حواس ظاهر তথা বাহ্যিক পঞ্চইন্দ্রিয় দ্বারা অনুধাবন করা যায় না। কিন্তু যখন علم এমন গুণকে বলা হবে, যার কারণে معانى غير محسوسه উদ্ভাসিত হয় এবং অন্য সব জিনিস থেকে আলাদা হয়ে যায়; ইন্দ্রিয়ানুভূত জিনিসগুলো উদ্ভাসিত ও আলাদা হয় না, তখন উপরিউক্ত

সংজ্ঞানুপাতে পঞ্চইন্দ্রিয় দ্বারা অর্জিত জ্ঞান (যার কারণে অনুভূত জিনিসগুলো উদ্ভাসিত ও পৃথক হয়) ইলম বলে গণ্য হবে না। অথচ শাইখ আবুল হাসান আশ'আরী রহ. মতেও ইন্দ্রিয়ের অনুধাবনকে علم (জ্ঞান) বলে। যেমন শাইখ আবু মানসূর মাতুরীদি ইন্দ্রিয়ের অনুধাবনকে ইলম বলেন। এরই ভিত্তিতে পরবর্তী যুগের উলামায়ে কিরাম স্বয়ং শারিহ রহ. -ও معاني এর শর্ত বাদ দিয়ে এসব শব্দাবলীই উল্লেখ করে বলেছেন,

صفة توجب تميزا لايحتمل النقيض অর্থাৎ علم এমন একটি গুণ, যা জ্ঞানী ব্যক্তির অন্তরে কোন বস্তুকে এমনভাবে উদ্ভাসিত এবং আলাদা করে দেয় যে, উক্ত উদ্ভাসিত ও আলাদা বস্তুটি বিপরীত দিকের কোন সম্ভাবনাই রাখে না। চাই তা محسوسات হোক বা মা'আনী। সুতরাং যেহেতু حواس এবং عقل উভয়টি অনুধাবনের মাধ্যমে কোন বস্তু অন্তরে উদ্ভাসিত ও অন্য সব কিছু থেকে আলাদা হয়, সেহেতু حواس ও عقل উভয়টির অনুধাবনই ইলম হবে। তবে উপরিউক্ত সংজ্ঞাটি لايحتمل النقيض এর শর্তারোপের কারণে –যার تصورات এর বিপরীত পক্ষ মানে না, তাদের মতানুসারে যদিও تصورات কে عقل এর অনুধাবনের প্রকারভুক্ত করে। এমনিভাবে تصديق يقيني কেও অন্তর্ভুক্ত করে। কেননা এতেও বিপরীত পক্ষের সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু সংজ্ঞাটি تصديقات غير يقينيه তথা جهل مركب - ظن - تقليد কে শামিল করবে না। বুঝা গেল, প্রথম সংজ্ঞাটি দ্বিতীয় সংজ্ঞা অপেক্ষা খাস।

ফাওয়ায়েদে কুয়ূদ

لايحتمل النقيض ঃ বিপরীত পক্ষের সম্ভাবনা না রাখা কথাটি ব্যাপক। চাই বস্তুটির বিপরীত পক্ষই না থাক অথবা বিপরীত পক্ষ আছে বটে, কিন্তু ادراك (অনুভূতি-জ্ঞান) নিশ্চিত হওয়ায় তা দূরীভূত হওয়া অসম্ভব। ফলে এর বিপরীত পক্ষের সম্ভাবনা নেই।

قوله على ما زعموا ঃ এটি দুর্বল উক্তি। যা কথাটি অগ্রাহ্য ও অপছন্দনীয় হওয়ার ইংগিত করে অর্থাৎ তাসাওউরাতের বিপক্ষ হয় না –কথাটি কারও কারও মত। তারা বলেন, تصورات নিসবত থেকে খালি হওয়ায় তা মুফরাদ। আর মুফরাদ এর কোন বিপরীত পক্ষ হয় না।

অপরদিকে অন্যরা বলেন, تصورات এর نقيض হয়। প্রথমতঃ একারণে যে, মান্তেকীরা বলেন, نقيض المتساوين متساويان। এখানে متساوين বলতে দুই كلى কে বুঝানো হয়েছে। আর কুল্লীসমূহ তো মুফরাদের অন্তর্ভুক্ত। বুঝা গেল, مفردات এরও نقيض বা বিপরীত পক্ষ হয়।

দ্বিতীয়তঃ تصور আসলে علم এর প্রকার হওয়ার কারণেই তা ইলম। যদি তার نقيض একেবারেই না থাকে, তাহলে প্রত্যেক تصور ই ইলম হওয়া আবশ্যক হবে। অথচ বাস্তবতা এমন নয় বরং বাস্তব পরিপন্থী তাসাওউরগুলো علم নয়; তা জাহ্ল ও মূর্খতা।

لايشتمل غير اليقينيات من التصديقات ঃ উপরিউক্ত সংজ্ঞাটি غير يقيني تصديقات এর মধ্যে হতে ظن কে শামিল করে না। কারণ, তা বর্তমানে نقيض তথা বিপরীত পক্ষের সম্ভাবনা রাখে। কেননা ঐ تصديق কেও ظن বলা হয়, যা نقيض বা বিপরীত পক্ষের সম্ভাবনা রাখে। আর تقليد এবং جهل مركب কেও এ কারণে শামিল করে না যে, এদুটি বর্তমানে যদিও نقيض তথা বিপরীত পক্ষের সম্ভাবনা রাখে না। কারণ, এদুটি اعتقاد এর প্রকার। যার মধ্যে نقيض এর সম্ভার না থাকে না। কিন্তু এতদুভয়ের মধ্যে ভবিষ্যতে نقيض এর সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন, কোন সন্দেহ সৃষ্টিকারীর সন্দেহ সৃষ্টি ইত্যাদির কারণে جهل ও تقليد পর্যায়ের اعتقاد দূর হয়ে যাবে এবং نقيض এর সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে।

ইলমের সংজ্ঞা নিয়ে প্রশ্নোত্তর

قوله: ولكن ينبغى ঃ এটি একটি প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্নটি হল, تصديقات غير يقينيه যদি ইলম হয়, তাহলে দ্বিতীয় সংজ্ঞাটি তাকে শামিল না করায় جامع বা পূর্ণাঙ্গ নয়। আর যদি ইলম না হয়, তাহলে প্রথম সংজ্ঞাটি তাকে শামিল না করায় সেটি مانع নয়। অথচ সংজ্ঞা جامع ও مانع হওয়া উচিৎ।

শারিহ রহ. এখানে উক্ত প্রশ্নের উত্তরসহ দ্বিতীয় সংজ্ঞাটি গ্রহণযোগ্য হওয়ার প্রতি ইংগিত করেছেন। যার সারমর্ম হল, تصديقات غير يقينيه علم নয়। কেননা আশায়েরাদের মতে علم হল, ظن এর বিপরীত। আর ظن ঐ تصديق কে বলে, যার মধ্যে نقيض তথা বিপরীত পক্ষের সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং তার বিপরীত علم দ্বারা ঐ

تصديق উদ্দেশ্য হবে, যার মধ্যে বর্তমানে ও ভবিষ্যতে কোন نقيض বিপরীত পক্ষের সম্ভাবনা নেই। আর এমন تصديق হল ইয়াকীন। সুতরাং ইলম ইয়াকীনের অর্থে হল। আর تصديقات غير يقينيه ইলমের সংজ্ঞায় تجلى শব্দটি (যা مطلق বা শর্তবিহীন) কে انكشاف تام এর অর্থে নিতে হবে। ফলে বস্তুটি এমনভাবে উদ্ভাসিত হয় এবং অন্যান্য জিনিস থেকে এমনভাবে পৃথক হয় যে, তাতে বর্তমান ও ভবিষ্যতে কোন প্রকার تقيض (বিপরীত পক্ষের) সম্ভাবনা থকে না। এক্ষেত্রে উভয় সংজ্ঞাই ভবিষ্যতের দিক থেকে এক হয়ে যায়। অর্থাৎ উভয়টি تصديقات غير يقينه কে শামিল করে না।

ইলমের পছন্দনীয় সংজ্ঞা

দ্বিতীয় সংজ্ঞাটি পছন্দনীয় হওয়ার প্রতি নিম্নরূপে ইংগিত হয় অর্থাৎ শারিহ রহ. প্রথমোক্ত সংজ্ঞায় تاويل করে একে দ্বিতীয় সংজ্ঞার দিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং যেমনিভাবে দ্বিতীয় সংজ্ঞাটি تضديقات غير يقينيه কে শামিল করে না, তদ্রূপ উপরিউক্ত تاويل (ব্যাখ্যার) পর প্রথম সংজ্ঞাটিও দ্বিতীয়টির মত হয়ে যাবে। এতে বুঝা গেল, শারিহ রহ. এর নিকট দ্বিতীয় সংজ্ঞাটি গ্রহণযোগ্য ও পছন্দনীয়। অবশ্য বাকি রইল تجلى শব্দটি শুধু انكشاف বুঝায় কেন? সুতরাং কোন قرينه বা নিদর্শন ছাড়া তাকে انكشاف تام এর অর্থে নেওয়া عام বলে خاص বুঝানোর মত হবে। অথচ তা জায়েয নেই। এর উত্তর হল, শব্দ যদি مطلق বা শর্তাবিহীন হয়, তাহলে বিবেক তার فرد كامل উদ্দেশ্য হওয়ার প্রতি ধাবিত হয়। انكشاف এর فرد كامل হল انكشاف تام তথা পরিপূর্ণ বিকশিত ও প্রতিভাত হওয়া। আর এখানে বিবেক ধাবিত হওয়াই উক্ত قرينه ও নিদর্শন সংজ্ঞার ক্ষেত্রে নিয়ম হল, শব্দের যে অর্থের প্রতি বিবেক ধাবিত হয়, শব্দকে সে অর্থে নেওয়াই আবশ্যক।

لِلْخَلْقِ اَىِ الْمَخْلُوْقِ مِنَ الْمَلَكِ وَالْاِنْسِ وَالْجِنِّ بِخِلَافِ عِلْمِ الْخَالِقِ تَعَالٰى فَاِنَّهٗ لِذَاتِهٖ لَايَسْتَبَبُ مِنَ الْاَسْبَابِ ثَلٰثَةٌ اَلْحَوَاسُّ السَّلِيْمَةُ وَالْخَبَرُ الصَّادِقُ وَالْعَقْلُ بِحُكْمِ الْاِسْتِقْرَاءِ وَوَجْهُ الضَّبْطِ اَنَّ السَّبَبَ اِنْ كَانَ مِنْ خَارِجٍ فَالْخَبَرُ الصَّادِقُ وَاِلَّا فَاِنْ كَانَ اٰلَةً غَيْرُ مُدْرِكٍ فَالْحَوَاسُّ وَاِلَّا فَالْعَقْلُ.

সহজ তরজমা

জ্ঞানার্জনের মাধ্যম তিনটি কেন ? (ইলম হাসিলের মাধ্যম) মাখলূক তথা ফিরিশতা, মানুষ, জ্বীনেদের জন্য অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তিনটি– সুস্থ পঞ্চইন্দ্রিয়, সত্য সংবাদ এবং আক্বল-বিবেক। তবে স্রষ্টার জ্ঞান এর বিপরীত। কারণ, আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান তার সত্ত্বাগত কারণেই অর্জিত হয়; কোন উপকরণের মাধ্যমে নয়। আর (জ্ঞানার্জনের মাধ্যম এ তিনটিতে) সীমাবদ্ধতার কারণ হল, মাধ্যমটি যদি (অনুধাবন কারী হতে) বহির্ভূত হয়, তাহলে তা خبر صادق (সত্য সংবাদ) অন্যথায় সেটি যদি অনুধাবনের اله (মাধ্যম) হয়, যা مدرك (অনুধাবনকারীর) ভিন্ন অন্য কিছু, তাহলে তা হল حواس (পঞ্চইন্দ্রিয়)। অন্যথায় তা হবে আকল-বিবেক।

সহজ তাহকীক তাশরীহ

للخلق ঃ এটা علم এর সিফাত, যা গ্রন্থকার রহ. উক্তি اسباب العلم এর মধ্যে مضاف اليه হয়েছে। পরোক্ষ বাক্য হল, وَاَسْبَابُ الْعِلْمِ الْحَاصِلُ لِلْخَلْقِ ثَلٰثَةٌ তথা সৃষ্টি জীবের ইলম হাসিলের মাধ্যম তিনটি।

এখানে মাখলুক মানে কি ?

من الملك ঃ এটা مخلوق এর ব্যাখ্যা। অবশ্য এখানে প্রশ্ন থেকে যায় যে, ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কিছু জিনিস উল্লেখ করে নীরবতা অবলম্বন তার সীমাবদ্ধতা বুঝায়। সুতরাং مخلوق এর বিবরণের ক্ষেত্রে ফিরিশতা, মানুষ এবং জ্বীনদের কথা বলে নীরবতা অবলম্বনের ফলে বুঝা যায়, مخلوق এ তিনটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অথচ আরও অনেক مخلوق রয়েছে। এর উত্তর হল, এখানে مخلوق বলতে ذوى العقول বিবেকবান মাখলূক উদ্দেশ্য। আর নিসন্দেহে ذوى العقول মাখলূক মানুষ, জ্বীন ও ফিরিশতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

فانه لذاته ঃ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সত্ত্বাই তার علم অর্জনের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ বিভিন্ন বস্তুর জ্ঞান অর্জন ও জ্ঞানের গুণে গুণান্বিত হতে তার জাতি সত্ত্বা ভিন্ন অন্য কিছুর দখল নেই।

ইলমের মাধ্যম তিনটি হওয়ার দলীল

لحكم الاستقراء ॥ ইলমের মাধ্যম তিনটি হওয়ার দলীল অনুসন্ধান ও গবেষণা। যা ظن এর فائده দেয়। কেননা تقسيم استقرائی এর দলীল হল, قياس استثنائی যার মুকাদ্দামাগুলোর মধ্যে আবশ্যকতা সুনিশ্চিত নয়। যেমন, এখানে قياس استثنائی হবে নিম্নরূপ অর্থাৎ যদি তিনটি ব্যতিত علم এর আরও কোন মাধ্যম থাকত তাহলে استقراء। তথা অনুসন্ধানের মাধ্যমে তা পাওয়া যেত। কিন্তু খোঁজাখোঁজি ও অনুসন্ধানের পর তিনটি ব্যতিত আর কোন মাধ্যম পাওয়া যায়নি। সুতরাং বুঝা গেল, এ তিনটি ব্যতিত আর কোন মাধ্যম নেই। উল্লেখ্য যে, এখানে مقدم অর্থাৎ তিনটি ব্যতিত علم এর অন্য কোন মাধ্যম হওয়া এবং تالی অর্থাৎ "খোঁজাখোঁজি ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে তা পাওয়া যাওয়া" –এর মধ্যে কোন সুনিশ্চয়তা নেই। কাজেই অনুসন্ধানের পর তিনটি ব্যতিত অন্য কোন মাধ্যম না পাওয়া যাওয়ায় বাস্তবে তিনটি ব্যতিত অন্য কোন মাধ্যম না থাকাকে আবশ্যক করে না। অবশ্য ধারণা হয় যে, علم এর মাধ্যম এ তিনটি। এছাড়া অন্য কোন মাধ্যম নেই।

দলীলে হসরের সারমর্ম

ইলমের মাধ্যম দুই অবস্থা থেকে খালী নয়। হয়ত এটি مدرك (অনুধাবনকারী) থেকে খারিজ হবে অথবা হবে না। যদি مدرك থেকে খারিজ হয়, তাহলে সেটি خبر صادق তথা সত্য সংবাদ। আর যদি مدرك থেকে খারিজ না হয়, তাহলে আবার দুই সুরাত। হয়ত তা ادراك (অনুধারনের) মাধ্যম হবে অথবা مدرك (অনুধাবন কারী) হবে। প্রথমটি অর্থাৎ الله ادراك (অনুবাবনের মাধ্যম) হলে তা حواس বা পঞ্চইন্দ্রয়। আর দ্বিতীয়টি হলে তা হবে عقل বা বিবেক। অতএব বুঝা গেল, عقل হল, মুদরিক বা অনুধাবনকারী। অথচ পূর্বে বলা হয়েছে, عقل হল الله ادراك বা অনুধাবনের মাধ্যমে। যেমন, পঞ্চইন্দ্রিয় অনুধাবনের মাধ্যম। আর مدرك হল نفس ناطقه বা মানুষ। এটাই হল কালাম শাস্ত্রবিদদের মতামত। কিন্তু যেহেতু কোন জিনিস অনুধাবন করতে সম্পূর্ণ عقل এর ভূমিকাই থাকে, এ কারণে যেন আকলই মুদরিক বা অনুধাবনকারী। ফলে শারিহ রহ. আকলকে على سبيل التسامح মুদরিক বলে সাব্যস্ত করেছেন।

فَاِنْ قِيْلَ السَّبَبُ الْمُؤَثِّرُ فِى الْعُلُوْمِ كُلِّهَا هُوَاللّٰهُ تَعَالٰى لِاَنَّهَا بِخَلْقِهٖ وَاِيْجَادِهٖ مِنْ غَيْرِ تَاثِيْرٍ لِلْحَاسَّةِ وَالْخَبَرِ وَالْعَقْلِ وَالسَّبَبُ الظَّاهِرِىُّ كَالنَّارِ لِلْاِحْرَاقِ هُوَ الْعَقْلُ لَاغَيْرُ وَاِنَّمَا الْحَوَاسُّ وَالْاَخْبَارُ اٰلَاتٌ وَطُرُقٌ فِى الْاِدْرَاكِ وَالسَّبَبُ الْمُفْضِىُّ فِى الْجُمْلَةِ بِاَنْ يَخْلُقَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْنَا الْعِلْمَ مَعَهٗ بِطَرِيْقِ جَرَى الْعَادَةُ لِيَشْمَلَ الْمُدْرِكُ كَالْعَقْلِ وَالْاٰلَةُ كَالْحِسِّ وَالطَّرِيْقِ كَالْخَبَرُ لَايَنْحَصِرُ فِى الثَّلٰثَةِ بَلْ هٰهُنَا اَشْيَاءُ اُخَرُ مِثْلُ الْوِجْدَانِ وَالْحَدْسِ وَالتَّجْرِبَةِ وَنَظْرِ الْعَقْلِ بِمَعْنٰى تَرْتِيْبِ الْمَبَادِىْ وَالْمُقَدَّمَاتِ.

সহজ তরজমা

উক্ত সীমাবদ্ধতা নিয়ে একটি প্রশ্ন

সুতরাং যদি বলা হয়, সমস্ত জ্ঞানের প্রকৃত মাধ্যম তো হলেন আল্লাহ তা'আলা। কেননা সব ধরনের ইলমই পঞ্চইন্দ্রিয়, সত্য সংবাদ ও عقل এর প্রভাব ছাড়া শুধু আল্লাহ তা'আলার সৃজনের ফলেই হয়ে থাকে। আর বাহ্যিক কারণ যেমন, জ্বালানোর জন্য আগুন তা তো নিছক আকল; ভিন্ন কিছু নয়। পঞ্চইন্দ্রিয় ও সংবাদ হল অনুধাবনের পথ ও মাধ্যম। পক্ষান্তরে সাধারণ মাধ্যম এ হিসিবে যে, আল্লাহ তা'আলা আপন অভ্যাস অনুযায়ী তার উপস্থিতিতে কোন বস্তুর علم সৃষ্টি করেন। যাতে (মাধ্যম এ অর্থে) مدرك (অনুধাবন কারী) যেমন عقل বা বিবেককে এবং الہ (মাধ্যম) যেমন حواس বা ইন্দ্রিয় শক্তিকে এবং طريق বা পথ যেমন সংবাদকে শামিল করে। তাহলে তো জ্ঞানার্জনের মাধ্যম ঐ তিনটিতে সীমাবদ্ধ হবে না বরং এখানে আরও অন্যান্য জিনিসও রয়েছে। যেমন, وجدان , حدس , نظر عقل অর্থাৎ প্রাথমিক উপকরণ ও মুকাদ্দামাগুলি বিন্যস্ত করণ।

সহজ তাহকীক তাশরীহ

প্রশ্নটির সারকথা

فَاِنْ قِيْلَ ঃ এটা ইলমের মাধ্যম তিনটিতে সীমাবদ্ধ হওয়ার উপর একটি প্রশ্ন। সারকথা হল, ইলম অর্জনের মাধ্যম তিনটি সাব্যস্ত করা সঠিক নয়। কারণ, ইলমের سبب এর অর্থে তিনটি সম্ভাবনা রয়েছে। (১) سبب বলতে سبب حقيقى তথা প্রকৃত কারণ ও মাধ্যম উদ্দেশ্য। (২) سبب ظاهرى তথা বাহ্যিক কারণ উদ্দেশ্য অর্থাৎ যার প্রতি ওরফ এবং অভিধানে কোন কাজ সংঘঠিত হওয়ার নিসবত করা হয়। যেমন, জ্বালানোর বাহ্যিক কারণ আগুন। কেননা ওরফ এবং অভিধানে আগুনের দিকেই জ্বালানোর নিসবত করা হয়। (৩) ব্যাপক কারণ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ যা থাকাবস্থায় ইলম সৃষ্টি করা আল্লাহর অভ্যাস। এখানে তিনটি সম্ভাবনাই আছে। তন্মধ্যে যে কোন একটি সম্ভাবনা ধরে নিলেই গ্রন্থকারের জন্য ইলমের মাধ্যম তিনটি সাব্যস্ত করা সঠিক নয়। প্রথমতঃ এজন্য যে, সব ধরনের علم এর প্রকৃত মাধ্যম তো হলেন আল্লাহ তা'আলা। কারণ, যাবতীয় ইলম আল্লাহ তা'আলার সৃজন ও অস্তিত্ব দানের ফলেই হয়ে থাকে। কাজেই উল্লেখিত মাধ্যম তিনটির কোনটিই প্রকৃত মাধ্যম হতে পারবে না। দ্বিতীয় সম্ভাবনা অনুসারেও ইলম অর্জনের মাধ্যম তিনটি সাব্যস্ত করা ঠিক নয়। কারণ, علم এর বাহ্যিক কারণ বা মাধ্যম তো عقل বা বিবেক। ওরফ ও অভিধানে علم এর নিসবত সাধারণতঃ عقل এর দিকেই হয়ে থাকে। তৃতীয় সম্ভাবনা অনুপাতেও জ্ঞানার্জনের মাধ্যম তিনটি হওয়া শুদ্ধ নয়। কেননা ব্যাপক কারণ ও মাধ্যম অর্থাৎ যা থাকাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা আপন অভ্যাস অনুযায়ী ইলম সৃষ্টি করেন, তা তিনটি নয় বরং তিনটি ছাড়া আরও রয়েছে। যেমন, وجدان , حدس , تجربه ইত্যাদি। এগুলোর উপস্থিতিতেও আল্লাহ তা'আলা ইলম সৃষ্টি করেন। সুতরাং এগুলোও জ্ঞানার্জনের মাধ্যমের অন্তর্ভুক্ত হল। মোটকথা, سبب এর তিন অর্থের কোন অর্থ হিসেবেই علم এর মাধ্যম তিনটি সাব্যস্ত করা বিশুদ্ধ নয়।

اَلسَّبَبُ الْمُؤَثِّرُ ঃ এখানে سبب حقيقى উদ্দেশ্য। যা কোন বস্তুকে কোন মাধ্যম ছাড়াই অস্তিত্ব দান করে।

اِنَّمَا الْحَوَاس ঃ এতে الـه। এর সম্পর্ক হল, حَوَاس এর সাথে। আর طُرُق এর সম্পর্ক হল, اَخْبَار এর সাথে। تقديرى عبارت হল اِنَّمَا الْحَوَاسُّ اٰلَةٌ وَالْاَخْبَارُ طُرُقٌ।

আল্লাহর স্বভাবরীতি

بِطَرِيْقِ جَرْيِ الْعَادَةِ ঃ আল্লাহ তা'আলার সাধারণ অভ্যাস হল, سبب বা কারণ পাওয়া গেলেই তিনি علم সৃষ্টি করেন। যেমন, কোন বস্তুর গরমের জ্ঞান লাভের মাধ্যম হল, বস্তুটি কোন প্রাণীর চামড়ায় বিদ্যমান ত্বকের সংস্পর্শে আসা। সুতরাং যখন কোন উষ্ণ জিনিস কোন প্রাণীর ত্বকে স্পর্শ করবে তখন আল্লাহ তা'আলা ঐ প্রাণীর মধ্যে বস্তুটির উষ্ণতার জ্ঞান দান করেন। এটা কেবল আল্লাহর অভ্যাস। অন্যথায় হতে পারে আল্লাহ তা'আলা ব্যতিক্রমভাবে, 'কারণ' পাওয়া যাওয়া স্বত্ত্বেও ইলম সৃষ্টি করবেন না। সুতরাং এতে দার্শনিকদের নিম্নোক্ত উক্তিটি খণ্ডিত হয়ে যায় যে ইল্‌ম কখনও তার মাধ্যম থেকে পিছিয়ে থাকে না তথা এমন হতে পারে না যে,ইল্‌ম এর মাধ্যম থাকবে আর ইল্‌ম অর্জন হবে না।

স্বাভাবিকতা ও আলৌকিকতা ?

اَلْعَادَةُ ঃ কোন বস্তু থেকে কোন কাজ বারবার প্রকাশিত হওয়া, এমনকি দর্শকদের এ ব্যাপারে কোন বিস্ময় না থাকা, তাহলে একে বস্তুটির স্বভাবরীতি বলে। যেমন, মানুষ থেকে খাওয়া দাওয়া, পান করা, চলাফেরা, বলা, হাসা ইত্যাদি প্রকাশ পাওয়া। আর যদি এর বিপরীত হয়, তাহলে তাকে خَرق عَادَت বা অলৌকিক বলে। যেমন, মানুষের আকাশে উড়া।

بِاَنْ يَشْتَمِلَ الْمُدْرِك ঃ অর্থের দিক থেকে এর সম্পর্ক سبب فى الجملة এর ব্যাখ্যায় শারিহ রহ. এর উক্তি يَخْلُق এর সাথে। অর্থাৎ আমরা سبب فى الجملة এর ব্যাখ্যায় যে বলেছি– "যা পাওয়া গেলে আল্লাহ তা'আলা ইলম সৃষ্টি করে দেন" তার কারণ হল, যাতে مُدْرِك অনুধাবনকারী বিবেক الة তথা মাধ্যম যেমন পঞ্চইন্দ্রিয় এবং পথ যেমন সত্য সংবাদ ইত্যাদিকে শামিল করে। কেননা عَقَل , حَوَاس এবং خَبَر صَادِق –সবগুলোই এমন জিনিস, যেগুলোর উপস্থিতিতে আল্লাহ তা'আলা ইলম সৃষ্টি করেন। যেমন, কোন ব্যক্তি রাসূল ﷺ এর নিম্নোক্ত

সংবাদ শুনেছে, اَلْمُؤْمِنُ لَا يَكْذِبُ তাহলে আল্লাহ তা'আলা উল্লেখিত সংবাদ, শ্রবণশক্তি এবং বিবেক এ তিনটি পাওয়া যাওয়ার সাথে সাথে উল্লেখিত সংবাদের বিষয়বস্তু "মিথ্যা বলা মুমিনের বৈশিষ্ট্য না হওয়া" এর ইলম সৃষ্টি করে দিবেন।

كَالْعَقْلِ ঃ পূর্বেই বলা হয়েছে, مُدْرِك মূলতঃ অনুধাবনকারী ব্যক্তি। আর বিবেক হল, اٰلَه বা মাধ্যম। কিন্তু যেহেতু অনুধাবনের ক্ষেত্রে عَقْل ও বিবেকের পূর্ণ দখল থাকায় যেন বিবেকই مُدْرِك ও অনুধাবনকারী হয়। তাই শারিহ রহ. عَقْل কে রূপকভাবে مُدْرِك বলে দিয়েছেন।

كَالْوِجْدَان ঃ وِجْدَان হল শরীরে বিদ্যমান এক সুপ্ত শক্তি। এটি বাহ্যিক ইন্দ্রিয় দ্বারা অনানুভূত অবস্থাকে অনুধাবন করে। যেমন, একজন ব্যক্তির চেহারা দেখে কখনও কখনও আমরা বলে দেই, লোকটা পেরেশান ও চিন্তিত অথবা ক্ষুধার্ত ও পিপাসিত। যে শক্তি দ্বারা এসব অবস্থা অনুধাবন করা যায়, তাকেই وِجْدَان বলে।

وَالْحَرس ঃ এমন শক্তি, যা কোন প্রকার চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই স্মৃতিকে দ্রুত উদ্দেশ্যের দিকে নিয়ে যায়।

وَالتَّجْرِبَة ঃ سَبَب বা মাধ্যম পাওয়ার সাথে সাথে مُسَبَّب বা কৃত বস্তু পাওয়ার বারবার প্রত্যক্ষ করণকে تَجْرِبَه বলে। যেমন বিষ পানের ফলে মৃত্যু হওয়া বারবার প্রত্যক্ষ করায় এটাকে تَجْرِبَه অভিজ্ঞতা বলা হবে।

قَوْلُهٗ بِمَعْنٰى ঃ এখানে نظر عقل এর অর্থ বর্ণনা করেছেন অর্থাৎ نظر عقل দ্বারা এখানে نظر এর পারিভাষিক অর্থ উদ্দেশ্য। আর منطقى পরিভাষায় نظر বলে, জানা تَصَوُّر কে এমনভাবে বিন্যস্ত করা, যাতে অজানা تصور এর জ্ঞান লাভ হয়। তদ্রূপ জানা تَصْدِيْقَات কে এমনভাবে বিন্যস্ত করা, যাতে অজানা تصديقات এর জ্ঞান লাভ হয়। যেসব জানা تصور কে বিন্যস্ত করে অজানা تصديق এর علم লাভ হয়, সেগুলোকে دليل বলে। আর শুধু دَلِيْل এর اَجْزَاء (অংশসমূহ) কে مُقَدَّمَات বলা হয়। কাজেই اَلْمُقَدَّمَات শব্দটিকে اَلْمَبَادِىْ এর উপর আতফ করণ عَطْفُ الْخَاصِّ عَلَى الْعَالِم পর্যায়ভুক্ত।

قُلْنَا هٰذَا عَلٰى عَادَةِ الْمَشَائِخِ فِى الْاِقْتِصَارِ عَلَى الْمَقَاصِدِ وَالْاَعْرَاضِ عَنْ تَدْقِيْقَاتِ الْفَلَاسِفَةِ فَاِنَّهُمْ لَمَّا وَجَدُوْا بَعْضَ الْاِدْرَاكَاتِ حَاصِلَةٌ عَقِيْبَ اِسْتِعْمَالِ الْحَوَّاسِ الظَّاهِرَةِ الَّتِىْ لَاشَكَّ فِيْهَا سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ ذَوِى الْعُقُوْلِ اَوْ غَيْرِهِمْ جَعَلُوا الْحَوَاسَّ اَحَدَ الْاَسْبَابِ وَلَمَّا كَانَ مُعْظَمُ الْمَعْلُوْمَاتِ الدِّيْنِيَّةِ مُسْتَفَادًا مِنَ الْخَبَرِ الصَّادِقِ جَعَلُوْا سَبَبًا اٰخَرَ وَلَمَّا لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُمُ الْحَوَاسُّ الْبَاطِنَةُ الْمُسَمَّاةُ بِالْحِسِّ الْمُشْتَرِكِ وَالْخَيَالِ وَالْوَهْمِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ وَلَمْ يَتَعَلَّقْ لَهُمْ غَرَضٌ بِتَفَاصِيْلِ الْحَدْسِيَّاتِ وَالتَّجْرِبِيَّاتِ سَبَبًا ثَالِثًا يُفْضِىْ اِلَى الْعِلْمِ بِمُجَرَّدِ الْاِلْتِفَاتِ اَوْ بِاِنْضِمَامِ حَدْسٍ اَوْ تَجْرِبَةٍ اَوْ تَرْتِيْبِ مُقَدَّمَاتٍ فَجَعَلُوا السَّبَبَ فِى الْعِلْمِ بِاَنَّ لَنَا جُوْعًا وَعَطْشًا وَاَنَّ الْكُلَّ اَعْظَمُ مِنَ الْجُزْءِ وَاَنَّ نُوْرَ الْقَمَرِ مُسْتَفَادٌ مِنَ الشَّمْسِ وَاَنَّ السَّقْمُوْنِيَا مُسْهِلٌ وَاَنَّ الْعَالَمَ حَادِثٌ هُوَ الْعَقْلُ وَاِنْ كَانَ فِى الْبَعْضِ بِاِسْتِعَانَةٍ مِنَ الْحِسِّ

সহজ তরজমা

উপরিউক্ত প্রশ্নের জবাব

আমরা বলব, জ্ঞানের মাধ্যম তিনটি হওয়া মাশায়িখে আহলে হকদের সাধারণ অভ্যাসের উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ তারা শুধু লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে যথেষ্ট মনে করেন; তারা দার্শনিক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় থেকে নিরাসক্ত। কেননা তারা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত পঞ্চইন্দ্রিয় ব্যবহার করার পর এমন কিছু বিষয় অনুধাবন করতে দেখেছেন, তা বিবেকবানদের জ্ঞান হোক চাই অবোধদেরই হোক, তখন তারা পঞ্চইন্দ্রিয়কে عِلْم এর মাধ্যম সাব্যস্ত করেছেন। তদ্রূপ যেহেতু ধর্মীয় জ্ঞানের সিংহভাগ অর্জিত হয় خَبَر صَادِق দ্বারা, তাই একে দ্বিতীয় মাধ্যম সাব্যস্ত করেছেন।

আর যেহেতু হকপন্থী মাশায়েদের নিকট حِسّ مُشْتَرِك , خَيَال , وَهْم ইত্যাদি নামক সুপ্ত ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব প্রমাণিত নেই এবং حَدْسِيَّات , تَجْرِبِيَّات , بَدِيهِيَّات , نَظْرِيَّات এর সাথে তাদের কোন লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পৃক্ত নয়, তাছাড়া এসবের মূলে হল আক্বল ও বিবেক। তাই তারা عَقْل কে তৃতীয় মাধ্যম সাব্যস্ত করেছেন। যা শুধু اِلْتِفَات অথবা حَدْس অথবা تَجْرِبَه এর সম্পৃক্ততা অথবা মুকাদ্দামাগুলো বিন্যস্ত করণের মাধ্যমে ইলমের মাধ্যম হয়। ফলে আমাদের ক্ষুধ-পিপাসা, পূর্ণ জিনিস অংশ থেকে বড়, চাঁদের আলো সূর্য থেকে গৃহীত, সুকমূনীয়া (উদর পরিষ্কার কারী প্রতিষেধক বিশেষ) দস্ত আনয়ণ কারী ইত্যাদির জ্ঞান লাভের মাধ্যম আকলকেই নিরূপন করেছেন। অথচ এগুলোর কোন কোনটির জ্ঞান লাভ করতে ইন্দ্রিয়ের সাহায্য প্রয়োজন।

সহজ তাহকীক তাশরীহ

জবাবের সারমর্ম

قُلْنَا ঃ এটা পূর্বের প্রশ্নের উত্তর। এর সারমর্ম হল, আমরা তৃতীয় পন্থা গ্রহণ করি এবং বলি, سَبَب বলতে سَبَب فِى الْجُمْلَه উদ্দেশ্য। সুতরাং যদি সূক্ষ্ম বিষয় ধরা হয়, তাহলে ইলমের মাধ্যম তিনটিতে সীমাবদ্ধ থাকে না। তবে গ্রন্থকার রহ. এর আলোচনা দার্শনিকদের অনর্থক এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ের উপর নির্ভরশীল নয় বরং মাশায়েখদের অভ্যাসের উপর নির্ভরশীল। আর প্রবীন মাশাইখদের অভ্যাস ছিল, যেসব জিনিসের অস্তিত্ব অকাট্যভাবে প্রমাণিত, বিষয়টিও মৌলিক এবং সমাজে প্রসিদ্ধই, তারা সেগুলোই যথেষ্ট মনে করতেন।

فَاِنَّهُمْ لَمَّا وَجَدُوْا ঃ এটা মাশাইখেদের অভ্যাস অনুযায়ী عِلْم এর মাধ্যম তিনটিতে সীমাবদ্ধ হওয়ার বিস্তারিত বিবরণ অর্থাৎ মাশাইখগণ যখন দেখলেন, উক্ত পঞ্চইন্দ্রিয় ব্যবহারের পর, যার অস্তিত্বের ব্যাপারে সন্দেহের লেশ মাত্র নেই, কোন কোন জিনিসের জ্ঞান লাভ হয়, তখন তারা বাহ্যিক পঞ্চইন্দ্রিয়কে عِلْم অর্জনের মাধ্যম নির্ণয় করলেন। অতঃপর তারা দেখলেন, দ্বীনী জ্ঞাতব্য বিষয়াদির বেশীর ভাগই আমরা خَبَر صَادِق এর মাধ্যমে অর্জন করি। যদিও এক্ষেত্রে عَقْل কেই মাধ্যম সাব্যস্ত করা যায়। কিন্তু خَبَر صَادِق যেমন خَبَر مُتَوَاتِر দ্বারা কোন জিনিসের عِلْم এর يَقِيْن অর্জিত হয়। কেননা خَبَر مُتَوَاتِر এর অসংখ্য বর্ণনাকারীদের মিথ্যার উপর একমত হওয়াকে আকল অসম্ভব মনে করে। তাই خَبَر صَادِق (সত্য সংবাদ) এর গুরুত্ব ও মর্যাদার কারণে তাকে দ্বিতীয় মাধ্যম সাব্যস্ত করেছেন।

আর যেহেতু আভ্যন্তরীন গোপন ইন্দ্রিয় যেমন– وَهْم ، حِسّ مُشْتَرِك ، خَيَال ইত্যাদির অস্তিত্ব। দার্শনিকগণের নিকট স্বীকৃত বটে। কিন্তু মাশাইখদের নিকট এগুলো নিশ্চিত কোন দলীল-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত নয়। আর حَدْسِيَّات , تَجْرِبِيَّات , بَدِيهِيَّات এবং نَظْرِيَّات এর বিস্তারিত বর্ণনা দ্বারা তাদের না কোন ফায়দা আছে, না আছে এগুলোর প্রতি কোন আকর্ষণ। তাছাড়া এগুলোর উৎসস্থল হল বিবেক। তাই তারা عَقْل কে জ্ঞানার্জনের তৃতীয় মাধ্যম সাব্যস্ত করেছেন। যা بَدِيهَات এর মধ্যে শুধু اِلْتِفَات দ্বারা, حَدْسِيَّات এর মধ্যে اِلْتِفَات এর সাথে حَدْس মিলিত হওয়ার দ্বারা, تَجْرِبِيَّات এর মধ্যে تَجْرِبَه আর نَظْرِيَّات এর মধ্যে মুকাদ্দামাগুলোর বিন্যাসের দরুন عِلْم এর سَبَب বা মাধ্যম সৃষ্টি হয়ে থাকে।

قَوْلُهٗ فَجَعَلُوْا لِسَبَب ঃ এটা শারিহ রহ. এর পূর্বোক্ত ইবারত لَمَّا لَمْ يَثْبُتْ শর্তের جَزَاء। হয়েছে। এখান থেকে শারিহ রহ. উক্ত جَزَاء। এর বিস্তারিত বিবরণ দিচ্ছেন। এতে প্রথম উদাহরণ হল, وِجْدَانِى এর, দ্বিতীয়টি بَدِيهِى এর; তৃতীয়টি حَدْسِى এর, চতুর্থটি تَجْرِبِى এর আর পঞ্চমটি হল, نَظْرِى এর।

فَالْحَوَاسُّ جَمْعُ حَاسَّةٍ بِمَعْنَى الْقُوَّةِ الْحَاسَّةِ خَمْسٌ بِمَعْنَى اَنَّ الْعَقْلَ حَاكِمٌ بِالضَّرُوْرَةِ بِوُجُوْدِهَا وَاَمَّا الْحَوَاسُّ الْبَاطِنَةُ الَّتِى تُثْبِتُهَا الْفَلَاسِفَةُ فَلَا تَتِمُّ دَلَائِلُهَا عَلَى الْاُصُوْلِ الْاِسْلَامِيَّةِ اَلسَّمْعُ وَهِىَ قُوَّةٌ مُوْدَعَةٌ فِى الْعَصَبِ الْمَفْرُوْشِ فِىْ مُقْعَرِ الصِّمَاخِ تُدْرَكُ بِهَا الْاَصْوَاتُ بِطَرِيْقِ وُصُوْلِ الْهَوَاءِ الْمُتَكَيِّفِ بِكَيْفِيَّةِ الصَّوْتِ اِلَى الصِّمَاخِ بِمَعْنَى اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَخْلُقُ الْاِدْرَاكَ فِى النَّفْسِ عِنْدَ ذٰلِكَ

সহজ তরজমা

আসবাবে ইলমের বিস্তারিত বিবরণ

সুতরাং حَوَاسٌّ শব্দটি حَاسَّةٌ এর বহুবচন। حَاسَّه অর্থ, ইন্দ্রিয়শক্তি। তা পাঁচটি। এ অর্থে যে, عَقْل (বিবেক) স্পষ্টভাবে পঞ্চইন্দ্রিয়ের অস্তিত্বের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেয়। দার্শনিকগণ যে গোপন পঞ্চইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তার (অস্তিত্বের) প্রমাণাদি ইসলামী মূলনীতি অনুসারে পূর্ণাঙ্গ নয়। (উক্ত বাহ্যিক পঞ্চইন্দ্রিয়ের মধ্যে প্রথম) শ্রবণশক্তি। এটি হল, কর্ণের ছিদ্রের অভ্যন্তরে বিছানো শিরায় (খোদা প্রদত্ত) এক শক্তি। তার মাধ্যমে কানের ছিদ্রে শব্দের ধরন সম্বলিত বাতাস পৌঁছলে আওয়াজ অনুভূত হয়। অর্থাৎ তখন মহান আল্লাহ তা'আলা (শ্রবণকারী) ব্যক্তির মধ্যে আওয়াজের অনুভূতি সৃষ্টি করে দেন।

সহজ তাহকীক তাশরীহ

এক. পঞ্চইন্দ্রিয় ঃ ইতোপূর্বে মুসান্নিফ রহ. সংক্ষেপে বলেছেন, ইলমের মাধ্যম তিনটি। (১) সুস্থ ও নিরাপদ পঞ্চইন্দ্রিয়। (২) সত্য সংবাদ। (৩) আকল ও বিবেক। এখন ধারাবাহিকভাবে প্রত্যেকটির বিবরণ দিচ্ছেন। সুতরাং তিনি বলেন, ইন্দ্রিয় মোট পাঁচটি। (১) শ্রবণশক্তি (২) দৃষ্টিশক্তি (৩) ঘ্রাণশক্তি। (৪) আস্বাদন শক্তি। (৫) স্পর্শ শক্তি। এক কথায় কান, চোখ, নাক, জিহ্বা ও ত্বক।

ইন্দ্রিয়শক্তি কি ?

قَوْلُهٗ: بِمَعْنَى الْقُوَّتِ الْحَاسَّةِ ঃ যেহেতু সাধারণ ব্যবহার রীতি অনুসারে মানুষ حَوَاس বলতে শরীরের সেব বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বুঝায়, যার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা বিচিত্র রকমের শক্তি গচ্ছিত রেখেছেন। যেমন– চোখ, নাক-কান ইত্যাদি। কাজেই এখানে ব্যাখ্যাতা সতর্ক করে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছেন যে, حَوَاس শব্দটি حَاسَّة তথা قُوَّةٌ حَاسَّةٌ অর্থাৎ অনুভূতি শক্তির বহুবচন। এর প্রমাণ হল, যতগুলো ইন্দ্রিয় আছে প্রত্যেকটির সংজ্ঞা দেওয়া হয় قُوَّةٌ (শক্তি) দ্বারা। বলা বাহুল্য যে, নাক, কান, চোখ ইত্যাদি বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো মূলতঃ শক্তি নয় বরং নানা ধরনের শক্তির স্থান।

ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা

قَوْلُهٗ : بِمَعْنَى اَنَّ الْعَقْلَ حَاكِمٌ ঃ মুসান্নিফ রহ. এর فَالْحَوَاسُّ خَمْسٌ এর উপর একটি প্রশ্ন হয় অর্থাৎ حَوَاس শব্দটি مُطْلَق তথা শর্তহীন। ফলে বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ সব ধরনের ইন্দ্রিয় এর আওতাভুক্ত। কাজেই ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা পাঁচটিরও বেশী। সুতরাং কোন শর্ত ছাড়াই ইন্দ্রিয়কে পাঁচটিতে সীমাবদ্ধ করা শুদ্ধ হয়নি।

শারিহ রহ. এর উত্তরে বলেন, মুসান্নিফ রহ. এর উদ্দেশ্য এই নয় যে, বাস্তবেই ইন্দ্রিয় পাঁচটি; ততোধিক নয় বরং তার উদ্দেশ্য হল, আমাদের জানা ইন্দ্রিয় এবং বিবেকও স্পষ্টভাবে যেসব ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্বের সিদ্ধান্ত দেয়, সেগুলো কেবল পাঁচটি। বাকী রইল গোপন ইন্দ্রিয়ের কথা। দার্শনিকগণ সে সবের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। অবশ্য তার অস্তিত্ব সম্ভবও বটে। কিন্তু দার্শনিকগণ যেসব দলীল-প্রমাণ দ্বারা ঐ গোপন ও আভ্যন্তরীন ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব প্রমাণ করেন, সেগুলো ইসলামী মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক। বিধায় সেগুলোর অস্তিত্বের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায় না।

১. শ্রবণশক্তি

قَوْلُهُ : وَهُوَ قُوَّةٌ مُوْدَعَةٌ ঃ এর সারমর্ম হল, কানের ছিদ্র একটি শূন্য ও কিছুটা প্রশস্ত জায়গায় গিয়ে সমাপ্ত হয়। যা বাতাসে পরিপূর্ণ। তার অভ্যন্তরে একটি শিরা বিছানো আছে। যাতে আল্লাহ তা'আলা আওয়াজ অনুধাবনের শক্তি নিহীত রেখেছেন। যেমন– পানিতে পাথর বা অন্য কিছু নিক্ষেপ করলে ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়, তেমনি কোন দেহের সংঘর্ষের কারণে ঐ স্থলের বাতাসে ঢেউয়ের উদ্ভব হয় এবং ঐ ঢেউয়ের ফলে বাতাসে এক বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি হয় যাকে আওয়াজ বলে। এরপর ঐ বাতাসের পার্শ্ববর্তী মিলিত বাতাসেও একই অবস্থার সৃষ্টি হয়। এ ঢেউ যখন কানের অভ্যন্তরের প্রসস্ত জায়গার বাতাস পর্যন্ত গিয়ে পৌছে, তখন তার অভ্যন্তরে বিছানো শিরায় নিহীত শক্তি আওয়াজ অনুভব করে।

اَلْعَصَبُ ঃ এটাকে বাংলায় শিরা বলে। এটি সাধারণতঃ সাদা হয়। রাবারের মত এদিক ওদিক ঘুরানো যায় অনায়েসে। তবে কাটা খুবই কঠিন।

قَوْلُهُ: بِكَيْفِيَّةِ الصَّوْتِ ঃ বাতাসে ঢেউ সৃষ্টি হলে যে বিশেষ অবস্থায় সৃষ্টি হয়, তাকেই আওয়াজ বলে। এ হিসেবে كيفية الصوت এর মধ্যকার ইযাফতটি إضافت بيانيه এর অন্তর্ভুক্ত।

আওয়াজ অনুভবের মূলতত্ত্ব

قَوْلُهُ: بِمَعْنٰى اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى ঃ পূর্বেই বলা হয়েছে, আওয়াজ সম্বলিত বহিরাগত বাতাস যখন কানের গভীরে পৌছে তখন সেখানে আওয়াজ অনুভব হয়। এতে ধারণা হতে পারে যে, আওয়াজ সম্বলিত বহিরাগত বাতাস কানের গভীরে পৌছাই হল, আওয়াজ অনুভবের মূল ইল্লত বা কারণ।

শারিহ রহ. এ সন্দেহ দূরীকরণার্থে বলেন, বহিরাগত বাতাস কানের গভীরে পৌছার পর আওয়াজ অনুভূত হওয়ার অর্থ হচ্ছে, যখন বহিরাগত বাতাস কানের মধ্যে পৌছে তখন আল্লাহ তা'আলা তার নীতি অনুসারে কানের মধ্যে আওয়াজের অনুভূতি সৃষ্টি করে দেন। এমন নয় যে, বাতাস কানের গভীরে পৌছাই আওয়াজ অনুভবের মূল কারণ।

وَالْبَصَرُ وَهِيَ قُوَّةٌ مُوْدَعَةٌ فِي الْعَصَبَتَيْنِ الْمُجَوَّفَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَتَلَاقَيَانِ فِي الدِّمَاغِ ثُمَّ تَتَفَرَّقَانِ فَتَتَأَدَّيَانِ اِلَى الْعَيْنَيْنِ تُدْرَكُ بِهَا الْاَضْوَاءُ وَالْاَلْوَانُ وَالْاَشْكَالُ وَالْمَقَادِيْرُ وَالْحَرَكَاتُ وَالْحَسَنُ وَالْقُبْحُ وَغَيْرُ ذٰلِكَ مِمَّا يَخْلُقُ اللّٰهُ تَعَالٰى اِدْرَاكَهَا فِي النَّفْسِ عِنْدَ اِسْتِعْمَالِ الْعَبْدِ تِلْكَ الْقُوَّةَ

সহজ তরজমা

২. দৃষ্টিশক্তি ঃ (পঞ্চইন্দ্রিয়ের দ্বিতীয়টি হল) দৃষ্টিশক্তি বা চোখ। তা এমন এক শক্তি, যা ভেতর শূন্য এমন দুটি শিরায় নিহীত, যে শিরা দুটি মস্তিস্কে গিয়ে পরস্পর মিলিত হয়েছে। তারপর একটি অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দুই চোখ পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে। এ শক্তি দ্বারা আলো, রং, আকৃতি, পরিমাণ, গতি, ভাল-মন্দ ইত্যাদি অনুভূত হয়। বান্দা এ শক্তি ব্যবহারের মুহূর্তে আল্লাহ তা'আলা সেসবের অনুভূতি সৃষ্টি করে দেন।

সহজ তাহকীক তাশরীহ

দৃষ্টিশক্তির বিস্তারিত ব্যাখ্যা ঃ মস্তিস্কের অগ্রভাগ হতে অন্তঃশূন্য দুটি শিরা একত্রে চোখ পর্যন্ত এসেছে। ঐ দুই শিরায় আল্লাহ তা'আলা বিচিত্র রং, আকার-আকৃতি ইত্যাদি অনুভবের এক শক্তি নিহীত রেখেছেন, যাকে দৃষ্টিশক্তি বলে। এ শিরা দুটি দুই পলকের মিলন স্থলের উপরিভাগে গিয়ে একত্রিত হয়ে যায় এবং উভয়টির অভ্যন্তরীণ প্রাচীর শেষ হয়ে একটি শিরায় পরিণত হয়। যাকে مجمع النورين বলে। তারপর সেখান থেকে শিরা দুটি পুনরায় পৃথক হয়ে উভয় চোখে গিয়ে মিলিত হয়। তবে এর ধরন নিয়ে চিকিৎসাবিদদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, প্রতিটি শিরা আপন আপন দিকের চোখে গিয়ে পৌছে অর্থাৎ ডান শিরাটি ডান চোখে আর বাম শিরাটি বাম চোখে। আবার কেউ বলেন, উভয়টির মাঝে ক্রসিং হয় অর্থাৎ ডান শিরা বাম চোখে আর বাম শিরা ডান চোখে গিয়ে পৌছে।

وَالشَّمُّ وَهِىَ قُوَّةٌ مُوْدَعَةٌ فِى الزَّائِدَتَيْنِ النَّابِتَتَيْنِ فِىْ مُقَدَّمِ الدِّمَاغِ الشَّبِيْهَتَيْنِ بِحُلْمَتَىِ الثَّدْيِ تُدْرَكُ بِهَا الرَّوَائِحُ بِطَرِيْقِ وُصُوْلِ الْهَوَاءِ الْمُتَكَيِّفِ بِكَيْفِيَّةِ ذِى الرَّائِحَةِ إِلَى الْخَيْشُوْمِ وَالذَّوْقُ وَهِىَ قُوَّةٌ مُنْبَثَّةٌ فِى الْعَصَبِ الْمَفْرُوْشِ عَلٰى جِرْمِ اللِّسَانِ يُدْرَكُ بِهَا الطُّعُوْمُ بِمُخَالَطَةِ الرُّطُوْبَةِ اللُّعَابِيَّةِ الَّتِىْ فِى الْفَمِ بِالْمَطْعُوْمِ وَوُصُوْلِهَا إِلَى الْعَصَبِ وَاللَّمْسُ وَهِىَ قُوَّةٌ مُنْبَثَّةٌ فِىْ جَمِيْعِ الْبَدَنِ تُدْرَكُ بِهَا الْحَرَارَةُ وَالْبُرُوْدَةُ وَالرُّطُوْبَةُ وَالْيُبُوْسَةُ وَنَحْوُ ذَالِكَ عِنْدَ التَّمَاسِّ وَالْاِتِّصَالِ بِهٖ

সহজ তরজমা

৩. ঘ্রাণ শক্তি ৪. রসন শক্তি ৫. ত্বক

৩. ঘ্রাণশক্তিঃ এ শক্তি মস্তিষ্কের অগ্রভাগে স্তনের দুই বোটার মত সৃষ্ট দুটি গোস্তের টুকরায় নিহীত আছে। যার মাধ্যমে ঘ্রাণযুক্ত জিনিসের ধরন সম্বলিত বাতাস নাকের বাঁশিতে পৌছলে সব ধরনের ঘ্রাণ অনুভূত হয়।

৪. রসন শক্তি। এটি এরূপ এক শক্তি, যা জিহ্বার উপর বিছানো শিরায় গচ্ছিত রাখা হয়েছে। এর মাধ্যমে খাদ্য অথবা স্বাদযুক্ত দ্রব্যের সাথে মুখাভ্যন্তরের সিক্ত লালা মিশ্রিত হওয়া এবং তা উপরিউক্ত শিরা পর্যন্ত পৌছার ফলে সব ধরনের স্বাদ অনুভব করা যায়।

৫. স্পর্শশক্তি (ত্বক)। এটি এরূপ এক শক্তির নাম,যা গোটা সমস্ত দেহে বিস্তৃত। এর মাধ্যমে দেহের সাথে স্পর্শকালে উষ্ণতা, ঠাণ্ডা, আর্দ্রতা, শুষ্কতা ইত্যাদি অনুভব করা যায়।

সহজ তাহকীক তাশরীহ

حُلْمَتَى الثَّدْيِ ঃ শব্দটি حُلْمَةٌ ("হা" বর্ণে পেশ, ل সাকিন) এর দ্বিবচন। অর্থ, মহিলাদের স্তনের দুটি বোটা।

بِكَيْفِيَّةِ ذِى الرَّائِحَةِ ঃ মূল ইবারত হল بِمَا يُشَاكِلُ كَيْفِيَّةَ ذِى الرَّائِحَةِ। কেননা كيفية দ্বারা ঘ্রাণ উদ্দেশ্য। আর ঘ্রাণযুক্ত জিনিসের ঘ্রাণ সরাসরি বাতাসে স্থানান্তরিত হয়। অন্যথায় একটি আরয বা আকস্মিক বস্তু একই মুহূর্তে দুই স্থান তথা ঘ্রাণযুক্ত জিনিসে ও বাতাসে বিদ্যমান হওয়া আবশ্যক হবে। আর এটা বাতিল। কোন কোন সংস্করণে بِكَيْفِيَّةِ ذِى الرَّائِحَةِ এর স্থলে بِكَيْفِيَّةِ الرَّائِحَةِ রয়েছে। এমতাবস্থায় ইযাফতটি بَيَانِيَّه হবে।

فِىْ جَمِيْعِ الْبَدَنِ ঃ এখানে مُضَافٌ উহ্য আছে। অর্থাৎ فِىْ جَمِيْعِ جِلْدِ الْبَدَنِ –শরীরের সমস্ত চামড়া জুড়ে।

وَبِكُلِّ حَاسَّةٍ مِنْهَا اَىْ مِنَ الْحَوَاسِّ الْخَمْسِ يُوْقَفُ اَىْ يُطَّلَعُ عَلٰى مَاوُضِعَتْ هِىَ اَىْ تِلْكَ الْحَاسَّةُ لَهٗ يَعْنِىْ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَدْخَلَقَ كُلًّا مِّنَ الْحَوَاسِّ لِاِدْرَاكِ اَشْيَاءَ مَخْصُوْصَةٍ كَالسَّمْعِ لِلْاَصْوَاتِ وَالذَّوْقِ لِلطُّعُوْمِ وَالشَّمِّ لِلرَّوَائِحِ لَايُدْرَكُ بِهَا مَايُدْرَكُ بِالْحَاسَّةِ الْاُخْرٰى وَاَمَّا اِنَّهٗ هَلْ يَجُوْزُ ذٰلِكَ فَفِيْهِ خِلَافٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ وَالْحَقُّ اَلْجَوَازُ لِمَا اَنَّ ذٰلِكَ بِمَحْضِ خَلْقِ اللّٰهِ تَعَالٰى مِنْ غَيْرِ تَاثِيْرٍ لِلْحَوَاسِّ فَلَا يُمْتَنَعُ اَنْ يَخْلُقَ اللّٰهُ عَقِيْبَ صَرْفِ الْبَاصِرَةِ اِدْرَاكَ الْاَصْوَاتِ مَثَلًا فَاِنْ قِيْلَ اَ لَيْسَتِ الذَّائِقَةُ تُدْرِكُ حَلَاوَةَ الشَّيْئِ وَحَرَارَتَهٗ مَعًا قُلْنَا لَا بَلِ الْحَلَاوَةُ تُدْرَكُ بِالذَّوْقِ وَالْحَرَارَةُ بِاللَّمْسِ الْمَوْجُوْدِ فِى الْفَمِ وَاللِّسَانِ

সহজ তরজমা

প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ই বিশেষ উদ্দেশ্যে সৃষ্ট

এ সব ইন্দ্রিয়ের প্রত্যেকটির মাধ্যমে সেসব জিনিসই অবগত হওয়া যায়, যার জন্য ঐ ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ঐসব ইন্দ্রিয়ের প্রত্যেকটিকে বিশেষ বস্তুর অনুধাবনের জন্য সৃষ্টি করেছেন। যেমন, শ্রবণশক্তিকে আওয়াজ (অনুধাব) এর জন্য, রসনশক্তিকে স্বাদ (অনুধাবন) এর জন্য এবং ঘ্রাণশক্তিকে সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ (অনুধাবন) এর জন্য (সৃষ্টি করেছেন।) এগুলোর (কোনটি) দ্বারা এমন জিনিস অনুভূত হয় না, যার অনুভূতি অন্য ইন্দ্রিয় দ্বারা হয়। বাকী থাকল আসলে এটা সম্ভব কিনা ? এ ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের মাঝে মতবিরোধ আছে। বিশুদ্ধ কথা হল, এটা সম্ভব। কেননা এটা তো শুধু আল্লাহ তা'আলার সৃজনের ফলেই হয়ে থাকে; ইন্দ্রিয়গুলোর ক্রিয়াশীল তার কারণে নয়। কাজেই দৃষ্টিশক্তিকে মনোযোগী করার পরে উদাহরণতঃ আওয়াজের অনুভূতি সৃষ্টি করা আল্লাহ তা'আলার পক্ষে অসম্ভব নয়। অতঃপর যদি কেউ প্রশ্ন করে, রসনশক্তি (জিহ্বা) কি একই সময়ে একই বস্তুর উষ্ণতা ও তার স্বাদ অনুভব করে না ? আমরা উত্তর দেব– না ? বরং রসনশক্তি দ্বারা স্বাদ অনুভব হয়। আর উষ্ণতা অনুভূত হয় মুখ ও জিহ্বায় বিদ্যমান স্পর্শশক্তি বা ত্বকের মাধ্যমে।

সহজ তাহকীক তাশরীহ

وَبِكُلِّ حَاسَّةٍ ঃ ইতোপূর্বেই আমরা পঞ্চইন্দ্রিয়ের প্রতিটির সংজ্ঞা ও তার দ্বারা অনুভূত জিনিসসমূহ সম্পর্কে জানতে পেরেছি। যেমন, দৃষ্টিশক্তি দ্বারা রং-রূপ, শ্রবণশক্তি দ্বারা শব্দসমূহ আর রসনশক্তি দ্বারা মিষ্টতা ও তিক্ততা ইত্যাদি অনুভূত হয়। মোটকথা, প্রতিটি ইন্দ্রিয়কে কিছু বিশেষ জিনিসের অনুভূতি লাভের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হয়, এক ইন্দ্রিয় দ্বারা সেসব জিনিস অনুভব করা সম্ভব কিনা ? যেমন, শ্রবণশক্তি দ্বারা আওয়াজ অনুভূত হয়। এখন কি দৃষ্টিশক্তি দ্বারা আওয়াজ অনুভব করা সম্ভব ? যা কিনা শুধু রং-রূপ অনুধাবনের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। নাকি সম্ভব নয় ? আবার সম্ভব হলে বাস্তবেও কি এমনটি হয় অর্থাৎ এক ইন্দ্রিয় দ্বারা যা অনুভূত হয়, অন্য ইন্দ্রিয় দ্বারাও কি তা অনুভূত হয়? মুসান্নিফ রহ. এর বক্তব্যে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর রয়েছে। সারকথা, প্রত্যেক ইন্দ্রিয় দ্বারা ঐ সব জিনিস অনুভব হয়, যার জন্য ঐ ইন্দ্রিয়কে সৃষ্টি করা হয়েছে। যেমন দর্শনশক্তি দ্বারা রং-রূপ অনুভব হয়; আওয়াজ অনুভব হয় না। আর শ্রবণশক্তি (কান) দ্বারা আওয়াজ অনুভব হয়, রূপ-রং অনুভব হয় না।

বস্তুতঃ এক ইন্দ্রিয় দ্বারা অন্যটির উপলব্ধি সম্ভব

وَاَمَّا اِنَّهٗ هَلْ يَجُوْزُ ذٰلِكَ ঃ এটা শারিহ রহ. এর পক্ষ থেকে প্রথম প্রশ্ন অর্থাৎ এক ইন্দ্রিয় দ্বারা যা অনুভব হয় অন্য ইন্দ্রিয় দ্বারা তা অনুভব করা সম্ভব কিনা –এর জবাব। যার সারকথা হল, বিষয়টি বিতর্কিত। দার্শনিকগণ বলেন, এটা সম্ভব নয়। আর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বলেন, এটা সম্ভব। কারণ, ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব যোগ্যতা আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিরই ফল; ঐ ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া নয়। অর্থাৎ কান দ্বারা শোনার শক্তি আল্লাহ দিয়েছেন। এতে কানের স্বক্রিয়তা নেই। কাজেই দৃষ্টিশক্তির মাধ্যমে আওয়াজ আর শ্রবণশক্তির মাধ্যমে রং-রূপের অনুভূতি সৃষ্টি করা আল্লাহ তা'আলার পক্ষে অসম্ভব নয়।

জিব্হা দিয়ে উষ্ণতা অনুভব

فَاِنْ قِيْلَ ঃ এ অভিযোগটি মুসান্নিফ রহ. এর ওপর অর্থাৎ আমরা যখন গরম মিষ্টি দ্রব্য মুখে দেই, তখন জিহ্বায় নিহীত রসনশক্তি তার মিষ্টতা অনুভব করি। পাশাপাশি বস্তুটির উষ্ণতাও অনুভব করি। ফলে আমরা একই মুহূর্তে বস্তুটির মিষ্টতা ও উষ্ণতা জানতে পারি। অথচ এ ইন্দ্রিয় (রসনশক্তি) টি উষ্ণতা অনুভবের জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। তথাপি আপনারা বললেন, যে ইন্দ্রিয় যে অনুভূতির জন্য তৈরী, তা দ্বারা কেবল সে অনুভূতি অর্জিত হয়– একথা কিভাবে বিশুদ্ধ হতে পারে ?

উত্তরের সারমর্ম হল, জনাব আপনি ভুল বুঝেছেন যে, রসনশক্তি দ্বারা উষ্ণতা অনুভব হয়েছে বরং আসল কথা হল, জিহ্বার চামড়ায় যেমন রসনশক্তি রয়েছে, তেমনিভাবে তাতে স্পর্শশক্তি বা ত্বকও বিস্তৃত রয়েছে। ফলে রসনশক্তি দ্বারা যখন দ্রব্যটির মিষ্টতা অনুভব করি, ঠিক তখনিই ত্বক দ্বারা ঐ দ্রব্যটির উষ্ণতা অনুভব করি।

وَالْخَبَرُ الصَّادِقُ اَىِ الْمُطَابِقُ لِلْوَاقِعِ فَاِنَّ الْخَبَرَ كَلَامٌ يَكُوْنُ لِنِسْبَتِهٖ خَارِجٌ تُطَابِقُهٗ تِلْكَ النِّسْبَةُ فَيَكُوْنُ صَادِقًا اَوْلَا تُطَابِقُهٗ فَيَكُوْنُ كَاذِبًا فَالصِّدْقُ وَالْكِذْبُ عَلٰى هٰذَا مِنْ اَوْصَافِ الْخَبَرِ وَ قَدْ يُقَالَانِ بِمَعْنَى الْاِخْبَارِ عَنِ الشَّيْئِ عَلٰى مَاهُوَ بِهٖ اَوْ لَا عَلٰى مَاهُوَ بِهٖ اَىِ الْاِعْلَامُ بِنِسْبَةٍ تَامَّةٍ تُطَابِقُ الْوَاقِعَ اَوْ لَا تُطَابِقُهٗ فَيَكُوْنَانِ مِنْ صِفَاتِ الْمُخْبِرِ فَمِنْ هٰهُنَا يَقَعُ فِىْ بَعْضِ الْكُتُبِ الْخَبَرُ الصَّادِقُ بِالْوَصْفِ وَفِىْ بَعْضِهَا خَبَرُ الصَّادِقِ بِالْاِضَافَةِ ـ

সহজ তরজমা

দুই. সত্য সংবাদ

আর সত্য সংবাদ অর্থাৎ যা বাস্তব সম্মত সংবাদ। কেননা খবর এমন একটি বাক্য, বাস্তবে যার একটি نِسْبَت আছে। বাক্যের نِسْبَت যদি বাস্তবসম্মত হয়, তাহলে খবরটি সত্য হবে। আর যদি বাস্তবসম্মত না হয়, তাহলে খবরটি মিথ্যা হবে। কাজেই উক্ত ব্যাখ্যা অনুসারে সত্য এবং মিথ্যা হওয়া خَبَر এর সিফাত হবে। আবার কখনও صِدْق ও كِذْب এর ব্যবহার বস্তুর (نِسْبَت تَامَّه) এর এমন ধরন (سَلْب ও اِيْجَاب বা ইতিবাচক ও নেতিবাচক) এর সাথে সংবাদ দেওয়ার ক্ষেত্রেও হয়, যে ধরন (سَلْب ও اِيْجَاب) এর সাথে এটি আসলেই গুণান্বিত অর্থাৎ এমন نِسْبَت تَامَّه এর সংবাদ দেওয়া যা বাস্তবসম্মত (তাহলে এটা صدق) অথবা বাস্তব সম্মত নয় (এটা كِذْب)। এমতাবস্থায় সিদ্ক ও কিয্ব সংবাদ দাতার সিফাত হবে। এ কারণেই (প্রথম ব্যাখ্যা অনুসারে صِدْق এবং কিয্ব) خَبَر এর বৈশিষ্ট্য। আর দ্বিতীয় ব্যাখ্যা অনুসারে সংবাদদাতার বৈশিষ্ট্য হবে। কোন কোন গ্রন্থে اَلْخَبَرُ الصَّادِقُ রূপে আর কোন কোন গ্রন্থে خَبَرُ الصَّادِقِ এযাফতের সাথে এসেছে।

সহজ তাহকীক তাশরীহ

খবরে সাদিকের সংজ্ঞা

اَلْمُطَابِقُ لِلْوَاقِعِ ঃ এটা خَبَر صَادِق সংজ্ঞা। আর وَاقِع বলতে نِسْبَت خَارِجَة উদ্দেশ্য অর্থাৎ সত্য সংবাদ এরূপ একটি خبر যা হয় বাস্তবসম্মত। আর বিশদভাবে বুঝা যায়, শারিহ রহ. এর উক্তি فَاِنَّ الْخَبَرَ كَلَامٌ يَكُوْنُ لِنِسْبَة خَارِج দ্বারা।

এর সারমর্ম হল, বাক্যের মধ্যে যেরূপভাবে একটি বস্তুর ইতিবাচক ও নৈতিবাচক সম্পর্ক অপর একটি জিনিসের সাথে হয়ে থাকে, যাকে نِسْبَت كَلَامِيَه বলে, তেমনি বাস্তবেও ঐ বস্তুটির ইতিবাচক বা নিতিবাচক সম্পর্ক অন্য আরেকটি জিনিসের সাথে হয়, যাকে نِسْبَت خَارِجِيَّه বলে। সুতরাং نِسْبَت كَلَام যদি نِسْبَت خَارِجِيَّه এর মুতাবিক হয় অর্থাৎ বাক্যে যদি এক বস্তুর সাথে অপর বস্তুর নিসবত ইতিবাচক হয়। আবার বাস্তবেও ঐ বস্তুর সাথে অপর বস্তুর নিসবত ইতিবাচক হয়, তাহলে তাকে صَادِق বলা হবে। যেমন, "আসমান বড়।" এ কথাটিতে আসমানের দিকে বড় হওয়ার ইতিবাচক সম্বন্ধ রয়েছে। আবার বাস্তবেও আসমান বড়। ফলে আসমানের প্রতি এ

সম্পর্ক ইতিবাচক। কাজেই বাক্যের অন্তবর্তী সম্বন্ধ বাস্তবিক সম্বন্ধের অনুকূল হওয়ায় "আসমান বড়" বাক্যটিকে خَبَر صَادِق বলা হবে। কিন্তু যদি বলা হয়,"আসমান বড় নয়।" তাহলে এতে বাক্যের নিসবত হবে سَلْبِىْ (নিতিবাচক)। অথচ বাস্তবে আসমানের দিকে বড় হওয়ার নিসবত ইতিবাচক। অর্থাৎ বাস্তবে আসমান বড়। কাজেই তখন "আসমান বড় নয়" বাক্যটিকে خَبَر كَاذِب বলা হবে।

সিদ্‌ক ও কিয্‌বের ব্যাখ্যা

উপরিউক্ত ব্যাখ্যা অনুসারে صِدْق ও كِذْب এ খবরেরই একটি গুণ বলে গণ্য হবে এবং খবরকেই صَادِق বা كَاذِب বলা হবে।

قَوْلُهٗ: قَدْ يُقَالَانِ بِمَعْنَى الْاِخْبَار এটা صِدْق ও كِذْب এর দ্বিতীয় ব্যাখ্যা। এখানে اَلشَّيْ দ্বারা نِسْبَت تَامَّه উদ্দেশ্য। ما শব্দটি দ্বারা ধরন অর্থাৎ ইতিবাচক বা নেতিবাচক হওয়া উদ্দেশ্য। আর هُوَ যমীরটি ফিরেছে اَلشَّيْ এর দিকে। সারকথা হল, صِدْق বলে কোন نِسْبَت تَامَّه সম্পর্কে ঐ ইতিবাচক বা নিতিবাচক অবস্থার উপর হওয়ার সংবাদ দেওয়া, যে ধরনের ইতিবাচক বা নৈতিববাচক অবস্থার সাথে সেটি বাস্তবে গুণান্বিত। আর كِذْب বলে, কোন نِسْبَت تَامَّه সম্পর্কে ইতিবাচক বা নৈতিবাচক অবস্থার বাস্তব বিরোধী সংবাদ দেওয়া। যেমন বাস্তবে আগুনের দিকে উষ্ণতার নিসবত হল ইতিবাচক। এমতাবস্থায় কারও আগুন গরম হওয়ার সংবাদ দেওয়া এবং বলা, "আগুন গরম" এটা সিদক। কিন্তু এর বিপরীত "আগুন গরম নয়" বলা كِذْب (মিথ্যা)। উক্ত ব্যাখ্যায় صِدْق এবং كِذْب বলা হয়েছে اِخْبَار (সংবাদ দেওয়া) কে। আর اِخْبَار হল مُخْبِر তথা সংবাদ দাতার গুণ। একারণে এ ব্যাখ্যা অনুসারে صِدْق এবং كِذْب বস্তুতঃ সংবাদ দাতার গুণ বলে গণ্য হয় এবং এর شِكْل হবে صِدْق ও كِذْب বাস্তবসম্মত বা বাস্তবসম্মত নয়, এমন نِسْبَت এর সংবাদ দেওয়া। আর সংবাদ দেওয়া হল, সংবাদ দাতার গুণ।

عَلٰى نَوْعَيْنِ اَحَدُهُمَا اَلْخَبَرُ الْمُتَوَاتِرُ سُمِّىَ بِذٰلِكَ لِمَا اَنَّهٗ لَايَقَعُ دُفْعَةً بَلْ عَلَى التَّعَاقُبِ وَالتَّوَالِىْ وَهُوَ الْخَبَرُ الثَّابِتُ عَلٰى اَلْسِنَةِ قَوْمٍ لَايُتَصَوَّرُ تَوَاطُؤُهُمْ اَىْ لَايُجَوِّزُ الْعَقْلُ تَوَافُقَهُمْ عَلَى الْكِذْبِ وَمِصْدَاقُهٗ وُقُوْعُ الْعِلْمِ مِنْ غَيْرِ شُبْهَةٍ وَهُوَ بِالضَّرُوْرَةِ مُوْجِبٌ لِلْعِلْمِ الضَّرُوْرِىِّ كَالْعِلْمِ بِالْمُلُوْكِ الْخَالِيَةِ فِى الْاَزْمِنَةِ الْمَاضِيَةِ وَالْبُلْدَانِ النَّائِيَةِ يَحْتَمِلُ الْعَطْفَ عَلَى الْمُلُوْكِ وَعَلَى الْاَزْمِنَةِ وَالْاَوَّلُ اَقْرَبُ وَاِنْ كَانَ اَبْعَدَ فَهٰهُنَا اَمْرَانِ اَحَدُهُمَا اَنَّ الْمُتَوَاتِرَ مُوْجِبٌ لِلْعِلْمِ وَذٰلِكَ بِالضَّرُوْرَةِ فَاِنَّا نَجِدُ مِنْ اَنْفُسِنَا الْعِلْمَ بِوُجُوْدِ مَكَّةَ وَبَغْدَادَ وَاَنَّهٗ لَيْسَ اِلَّا بِالْاَخْبَارِ وَالثَّانِىْ اَنَّ الْعِلْمَ الْحَاصِلَ بِهٖ ضَرُوْرِىٌّ وَذٰلِكَ لِاَنَّهٗ يَحْصُلُ لِلْمُسْتَدِلِّ وَغَيْرِهٖ حَتَّى الصِّبْيَانِ الَّذِيْنَ لَااهْتِدَاءَ لَهُمْ اِلَى الْعِلْمِ بِطَرِيْقِ الْاِكْتِسَابِ وَتَرْتِيْبِ الْمُقَدَّمَاتِ۔

সহজ তরজমা

সত্য সংবাদের শ্রেণীভাগ

(আর সত্য সংবাদ) দুই প্রকার। তার একটি হল, খবরে মুতাওয়াতির। এ নাম করণের কারণ হল, এ খবরটি একবারেই আসে না বরং একের পর এক ক্রমান্বয়ে আসে। এটি এমনই এক সংবাদ, যা এতোধিক সংখ্যক লোকের মুখ থেকে প্রমাণিত, যাদের মিথ্যার উপর একমত হওয়ার ধারণা করা যায় না। অর্থাৎ তাদের মিথ্যার উপর এমকমত হওয়ার কথা বিবেক বৈধ সাব্যস্ত করে না। এর সত্যায়ণকারী হল, কোন প্রকার সন্দেহ ব্যতিত জ্ঞান লাভ হওয়া। এর দ্বারা সাধারণতঃ ইলমে জরুরী অর্জন হয়। যেমন, অতীত কালের রাজা-বাদশাহ ও দূরদূরান্তের শহর সমূহের জ্ঞান। اَلْبُلْدَان النَّائِيَه বাক্যটি اَلْمُلُوْك শব্দের ওপর এবং اَلْاَزْمِنَه এর উপর عَطْف হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। প্রথমটি সঠিকতার বেশী নিকটবর্তী; যদিও শব্দগতভাবে তা দূরবর্তী। সুতরাং এখানে দুটি বিষয় রয়েছে। একটি হল, খবরে মুতাওয়াতির নিশ্চয়তার ফায়দা দেয়। আর তা সুস্পষ্ট। কেননা আমরা মক্কা ও বাগদাদের

অস্তিত্বের ব্যাপারে নিশ্চিত। নিঃসন্দেহে এ নিশ্চয়তা উক্ত সংবাদগুলোর মাধ্যমেই অর্জিত হয়েছে। দ্বিতীয়টি হল, এর দ্বারা অর্জিত ইলম হল জরুরী। আর তাই যিনি দলীল পেশ করার যোগ্য এবং যিনি যোগ্য নন, উভয়েরই এতে يَقِيْن (নিশ্চয়তা) লাভ হয়। এমনকি যেসব শিশুরা দলীলের পদ্ধতি ও ভূমিকা বিন্যাসের কোন অনুভূতিই রাখে না, তাদেরও এমন নিশ্চয়তা লাভ হয়।

সহজ তাহকীক তাশরীহ

নামকরণের কারণ

سُمِّيَ بِذَالِكَ ঃ এ ইবারত দ্বারা শারিহ রহ. খবরে মুতাওয়াতিরের নামকরণের কারণ বর্ণনা করতে চান। সারকথা, تَوَاتُر অর্থ হল, কোন একটি কাজ বিরতীসহ ধারাবাহিকভাবে হতে থাকা। যেহেতু এ খবর বিরতীসহ একের পর এক ধারাবাহিকভাবে পৌছতে থাকে, তাই একে খবরে মুতাওয়াতির বলে।

১. খবরে মুতাওয়াতিরের সংজ্ঞা

وَهُوَ الْخَبَرُ الثَّابِتُ ঃ অর্থাৎ مُتَوَاتِر এমন খবরকে বলে, যা এতোধিক সংখ্যক মানুষের মুখে বর্ণিত হয় যে, তাদের মিথ্যার উপর একমত হওয়ার ধারণাই আসে না। অবশ্য এর উপর প্রশ্ন হবে যে, বড়জোর এখানে তাদের মিথ্যার উপর একমত হওয়াটা অসম্ভব। আর অসম্ভব জিনিসের তো ধারণা করা যায়। এ প্রশ্ন নিরসনের জন্য শারিহ রহ. لَايُتَصَوَّرُ এর ব্যাখ্যা لَايُجَوِّزُ الْعَقْلُ দ্বারা করেছেন। অর্থাৎ তাদের সকলের মিথ্যার উপর ঐক্যমত হওয়ার বিষয়টি বিবেকগ্রাহ্য নয়।

খবরে মুতাওয়াতিরের মূখ্য বিষয়

قَوْلُهُ: مِصْدَاقُهُ وُقُوْعُ الْعِلْمِ ঃ আসল ব্যাপার হল, কোন خَبَر মুতাওয়াতির হতে হলে তার বর্ণনাকারীদের নির্দিষ্ট কোন সংখ্যার প্রয়োজন আছে কি না ? অনেকেই সংখ্যা নির্ধারণ করেছেন। যেমন– কেউ তো চার আবার কেউ বার, কেউ বিশ, কেউ চল্লিশ, কেউ সত্তরজন হওয়াকে জরুরী বলেছেন। তবে মুহাক্কিকদের মতে খবর বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। কখনও চার-ছয় জনের সংবাদেও ইয়াকীন হয়। আবার কোন কোন সংবাদ এমনই গুরুত্বপূর্ণ হয় যে, ৪/৬ জনের সংবাদ প্রদানের পরও খবরটি বিশুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায় না। একারণে خَبَر মুতাওয়াতির হওয়ার জন্য বর্ণনাকারীর কোন সংখ্যা নির্ধারণ করা বিশুদ্ধ নয় বরং যদি উদাহরণতঃ ১০জনের সংবাদেই নিশ্চয়তা লাভ হয়, তাহলে ঐ খবরটি مُتَوَاتِر হবে। আর নিশ্চয়তা লাভ না হলে তা مُتَوَاتِر নয়। যদিও বর্ণনাকারী ২০ জনই হোক না কেন। শারিহ রহ. এর অভিমতও তা-ই।

খবরে মুতাওয়াতিরের বিধান

قَوْلُهُ : وَهُوَ بِالضَّرُوْرَةِ مُوْجِبٌ لِلْعِلْمِ الضَّرُوْرِيِّ ঃ এ عِبَارَت দ্বারা মুসান্নিফ রহ. خَبَر مُتَوَاتِر এর হুকুম বর্ণনা করছেন। অর্থাৎ খবরে মুতাওয়াতির দ্বারা ضَرُوْرِى তথা দলীল-প্রমাণ পেশ এবং চিন্তা-গবেষণা ছাড়াই নিশ্চিত জ্ঞান লাভ হয়। যেমন, অতীত কালের রাজা-বাদশাহ এবং দূর-দূরান্তের শহরসমূহের ব্যাপারে আমাদের নিশ্চিত জ্ঞান রয়েছে। আর একথা সুস্পষ্ট যে, আমাদের এ জ্ঞান শুধু خَبَر مُتَوَاتِر এর মাধ্যমেই অর্জিত হয়েছে। বুঝা গেল, خَبَر مُتَوَاتِر ইল্ম এবং يَقِيْن তথা নিশ্চয়তার ফায়দা দেয়।

قَوْلُهُ : بِالضَّرُوْرَةِ ঃ خَبَر مُتَوَاتِر ইলমে জরুরীর ফায়দা দেয় জরুরীভাবে; কোন দলীলের অপেক্ষা রাখে না।

উত্তম আত্ফ

قَوْلُهُ : يَحْتَمِلُ الْعَطْفَ ঃ শারিহ রহ. এখানে বুঝাতে চান, اَلْبُلْدَانُ النَّائِيَةُ বাক্যটিকে اَلْمُلُوْك এর উপরও عَطْف করা যায়, যা শব্দগতভাবে দূরে আছে। আবার اَلْاَزْمِنَة এর উপরও عَطْف করা যায়, যা শব্দগতভাবে নিকটে। তবে مُلُوْك এর عَطْف করা অর্থগতদিক বিবেচনায় বেশী নিকটবর্তী ও উত্তম। যদিও তা শব্দগত দিক থেকে اَزْمِنَة থেকে দূরে অবস্থিত। তখন এখানে উদাহরণ হবে দুটি। ইবারতের অর্থ দাঁড়াবে, অতীত কালের রাজা-বাদশাহদের জ্ঞান এবং দূর দূরান্তের শহরসমূহের জ্ঞান। পক্ষান্তরে اَزْمِنَة এর উপর عَطْف করলে উদাহরণ হবে একটি। অর্থ হবে, অতীতকালের দূর দূরান্তের শহরসমূহের রাজা-বাদশাদের জ্ঞান। আর ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এক উদাহরণের চেয়ে দুই উদাহরণ অতিউত্তম।

মূলপাঠের ব্যাখ্যায় এখানে শারিহ রহ. যা বলেন

قَوْلُهُ: فَهٰهُنَا اَمْرَانِ ঃ শারিহ রহ. মুসান্নিফ রহ. এর উক্তির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন, মুসান্নিফ রহ. এখানে দুটি কথা বলেছেন। **এক.** خَبَر مُتَوَاتِر দ্বারা নিশ্চয়তা লাভ হয়। **দুই.** خَبَر مُتَوَاتِر দ্বারা যে দৃঢ়তা ও নিশ্চয়তা লাভ হয়, তা জরুরী; দলীল-প্রমাণ পেশ করা ও ভূমিকা বিন্যাসের উপর নির্ভরশীল নয়। যেমন, আরববদেশে অবস্থিত মক্কা-মদীনা নামক দুটি শহরের অস্তিত্বের ব্যাপারে না দেখা সত্ত্বেও আমাদের সুনিশ্চিত জ্ঞান আছে। এ জ্ঞান কেবলমাত্র خَبَر مُتَوَاتِر এর মাধ্যমেই আমরা লাভ করেছি। অবশ্য বাকী রইল خَبَر مُتَوَاتِر দ্বারা অর্জিত জ্ঞান জরুরী এবং দলীল নির্ভর না হওয়ার কারণ কি ? এর জবাব হল, যদি مُتَوَاتِر দ্বারা জ্ঞান লাভ হওয়া দলীলনির্ভর হত, তাহলে কেবল দলীল পেশ করার যোগ্য ব্যক্তিদেরই এ জ্ঞান লাভ হত। অথচ مُتَوَاتِر দ্বারা অনেক জিনিসের জ্ঞান এমন বাচ্চাদেরও অর্জিত হয়, যারা দলীল পেশ এবং মুকাদ্দামা বিন্যাসের যোগ্যতা রাখে না। বুঝা গেল, مُتَوَاتِر দ্বারা অর্জিত ইল্‌ম জরুরী; তা দলীল নির্ভর নয়।

> وَاَمَّا خَبَرُ النَّصَارٰى بِقَتْلِ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْيَهُوْدِ بِتَابِيْدِ دِيْنِ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَتَوَاتُرُهٗ مَمْنُوْعٌ فَاِنْ قِيْلَ خَبَرُ كُلِّ وَاحِدٍ لَايُفِيْدُ اِلَّا الظَّنَّ وَضَمُّ الظَّنِّ اِلَى الظَّنِّ لَايُوْجِبُ الْيَقِيْنَ وَاَيْضًا جَوَازُ كِذْبِ كُلِّ وَاحِدٍ يُوْجِبُ جَوَازَ كِذْبِ الْمَجْمُوْعِ لِاَنَّهٗ نَفْسُ الْاٰحَادِ ، قُلْنَا رُبَمَا يَكُوْنُ مَعَ الْاِجْتِمَاعِ مَالَايَكُوْنُ مَعَ الْاِنْفِرَادِ كَقُوَّةِ الْحَبْلِ الْمُؤَلَّفِ مِنَ الشَّعْرَاتِ ـ

সহজ তরজমা

খবরে মুতাওয়াতিরের হুকুমের উপর আপত্তি

বাকী রইল খ্রিস্টান কর্তৃক ঈসা (আ.) নিহত হওয়ার সংবাদ এবং ইয়াহুদী কর্তৃক মূসা আ. এর দ্বীন স্থায়ী হওয়ার সংবাদ। এ দুটোর মুতাওয়াতির হওয়া স্বীকৃত নয়। পুনরায় যদি প্রশ্ন করা হয়, প্রত্যেক ব্যক্তির পৃথক সংবাদ তো ظَنّ বা প্রবল ধারণারই ফায়দা দেয়। আর ظَنّ কে ظَنّ এর সাথে মিলালে তো يَقِيْن অর্জিত হয় না। তাছাড়া পৃথক পৃথকভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির মিথ্যাবাদীতার সম্ভাবনা সমষ্টিগত মিথ্যাবাদীতার সম্ভাবনাকে প্রমাণিত করে। কারণ, ঐ কতগুলি এককের সমন্বয়েই তো সমষ্টিরূপ হয়। আমরা উত্তর দেব, অনেক ক্ষেত্রে সমষ্টিগত অবস্থায় এমন শক্তি সৃষ্টি হয়, যা স্বতন্ত্রাবস্থায় হয় না। যেমন, অনেকগুলো পশম দ্বারা তৈরী রশির শক্তি।

সহজ তাহকীক তাশরীহ

ঈসা আ. কে হত্যা ও ইয়াহুদী ধর্মের স্থায়ীত্বের সংবাদ ?

وَاَمَّا خَبَرُ النَّصَارٰى ঃ উপরে শারিহ রহ. তার উক্তি فَهٰهُنَا اَمْرَانِ দ্বারা বলেছেন, خَبَر مُتَوَاتِر এর حُكْم এর ব্যাপারে মুসান্নিফ রহ. দুটি বিষয় বর্ণনা করেছেন। একটি হল, خَبَر مُتَوَاتِر দ্বারা জ্ঞান লাভ হয়। দ্বিতীয়টি হল, خَبَر مُتَوَاتِر দ্বারা অর্জিত জ্ঞান জরুরী। প্রথম কথা অর্থাৎ خَبَر مُتَوَاتِر দ্বারা নিশ্চিত জ্ঞান লাভ হয়– এর উপর একটি প্রশ্ন হয় অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ.) কে হত্যার ব্যাপারে খ্রিস্টানরা এবং হযরত মূসা (আ.) এর দ্বীন স্থায়ী হওয়ার ব্যাপারে ইয়াহুদীরা মুতাওয়াতিররূপে সংবাদ দিয়ে আসছে। অধিকন্তু তারা বলছে, تَمَسَّكُوْا بِالسَّبْتِ مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত শনিবার দিবসের সম্মান প্রদর্শনের উপর দৃঢ়তার সাথে আমল করতে থাক। তাদের উক্ত বক্তব্যে সুস্পষ্ট বুঝা যায়, মূসা (আ.) এর দ্বীন স্থায়ী এবং তা রহিত হওয়ার মত নয়। অথচ আমরা তাদের উক্ত خَبَر মুতাওয়াতির হওয়া সত্ত্বেও নিশ্চিতরূপে মিথ্যা বলে বিশ্বাস করি। বুঝা গেল, خَبَر مُتَوَاتِر দ্বারা নিশ্চয়তা লাভ হয় না।

প্রথম জবাব

قَوْلُهُ : مُتَوَاتِرُهٗ مَمْنُوْعٌ ঃ এখানে উল্লেখিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। উল্লেখিত খবর দুটি মুতাওয়াতির হওয়া সর্বসম্মত নয়। কেননা خَبَر مُتَوَاتِر এর শর্তাবলীর মধ্যে একটি শর্ত আছে, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক স্তরে এবং প্রত্যেক যুগে তার বর্ণনা কারীর সংখ্যা এত বেশী হতে হবে, যাদের মিথ্যার উপর একমত হওয়া

অসম্ভব। অথচ ঈসা (আ.) এর হত্যার ব্যাপারে খ্রিস্টানদের সংবাদ যদিও পরবর্তী কালে مُتَوَاتِر এর স্তরে পৌঁছেছে। কিন্তু প্রথম পর্যায়ে তা تَوَاتُر এর স্তরে পৌঁছেনি। কেননা প্রথমাবস্থায় তাদের সংখ্যা এক বর্ণনা মতে চারজন অপর বর্ণনা মতে ৬ অথবা ৭জন ছিল। আর এ সংখ্যা একারেরই কম। যাদের মিথ্যার উপর একমত হওয়া অসম্ভব নয়। তদ্রূপ মূসা (আ.) এর দ্বীন স্থায়ী হওয়ার ব্যাপারে ইয়াহুদীদের সংবাদ প্রথম ও শেষ পর্যায়ে تَوَاتُر এর স্তরের পৌছলেও মাঝে তা তাওয়াতুর পর্যায়ে বিদ্যমান ছিল না। কেননা প্রসিদ্ধ অগ্নিপূজক বাদশা বুখ্‌তেনছর বাইতুল মুকাদ্দাস আক্রমণ করে ইয়াহুদীদেরকে এমনভাবে হত্যা করেছে যে, তাদের কোন সংখ্যাই আর বাকী ছিল না বললেই চলে। কোথাও দু'চারজন থেকে থাকলেও তাদের সকলের মিথ্যার উপর একমত হওয়া মোটেও অসম্ভব ছিল না। অধিকন্তু এত বড় বিপদের পর কোন সংবাদ তাদের স্মরণ থাকা এবং তা বর্ণনা করা একেবারেই অসম্ভব।

ইয়াহুদীদের সংবাদের ব্যাপারে দ্বিতীয় জবাবঃ মূসা (আ.) এর দ্বীন স্থায়ী হওয়ার ব্যাপারে ইয়াহুদীদের সংবাদ তখনই কেবল مُتَوَاتِر হত, যদি এত সংখ্যক লোক হযরত মূসা (আ.) থেকে বর্ণনা করত, যাদের মিথ্যার উপর একমত হওয়া সম্ভব নয়। অতঃপর প্রত্যেক যুগে তত সংখ্যক বর্ণনাকারী পাওয়া যেত। কিন্তু মূসা (আ.) এর যুগে এ সংবাদের কোন অস্তিত্ব ছিল না। এমনকি ইসলামের পূর্ব পর্যন্তও এর কোন অস্তিত্ব ছিল না বরং ইসলাম আগমনের পর ইবনে রাবেন্দী নামক এক যিন্দীক এ সংবাদ তৈরী করে ইয়াহুদীদেরকে উত্তেজিত করেছিল। যাতে তারা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে দলীলস্বরূপ বলতে পারে যে, যখন মূসা (আ.) ইয়াহুদী ধর্মকে স্থায়ী ঘোষণা দিয়েছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত যদি অন্য কোন ধর্ম না আসে তাহলে ইসলাম কিভাবে সত্য ধর্ম হতে পারে ?

যৌথ জবাব

উপরিউক্ত দুটি সংবাদের ব্যাপারে আরোপিত প্রশ্নের যৌথ একটি জবাবও দেওয়া যায়, যা আমার মতে বেশী মজবুত মনে হয়। জবাবের সার সংক্ষেপ হল, যদি আমরা উপরিউক্ত খবর দুটিকে مُتَوَاتِر বলে ধরেও নেই, তথাপি কোন প্রশ্ন থাকবে না। কেননা مُتَوَاتِر দ্বারা জ্ঞান লাভের জন্য শর্ত হল, তার বিরুদ্ধে কোন অকাট্য দলীল না থাকতে হবে। যেমন, হাজার হাজার মানুষ এসে যদি বলে, "আগুন ঠাণ্ডা এবং আসমান নিচে", তাহলে উক্ত খবর যদিও تَوَاتُر এর স্তরে পৌঁছেছে, কিন্তু তার বিরুদ্ধে অকাট্য দলীল বিদ্যমান থাকায় তাতে আমাদের অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাবে না। সে অকাট্য দলীল হল, আমাদের প্রত্যক্ষ দর্শন।

অনুরূপভাবে নাসারা কর্তৃক হযরত ঈসা (আ.) কে হত্যার সংবাদ আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত ইরশাদ পরিপন্থীও বটে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ "তারা তাকে হত্যাও করেনি এবং শূলিতে চড়ায় নি।" আর ইয়াহুদী কর্তৃক মূসা (আ.) এর দ্বীন স্থায়ী হওয়ার বিরুদ্ধে রয়েছে কুরআনের অকাট্য দলীল إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ। কাজেই উল্লেখিত সংবাদ দুটি مُتَوَاتِر হওয়া সত্ত্বেও তা দ্বারা সুনিশ্চিত জ্ঞান লাভ হবে না। خَبَر مُتَوَاتِر সুনিশ্চিত জ্ঞানের ফায়দা দেয় না সেজন্য নয় বরং مُتَوَاتِر এর শর্ত উক্ত খবরে অনুপস্থিত।

চ্যালেঞ্জরূপে আরেকটি জবাব দেওয়া যায় অর্থাৎ মুসলমানগণ ব্যতিত অন্য কেউ তাদের নবী থেকে তাওয়াতুররূপে কোন খবর প্রমাণিত করতে পারে না। যদি কেউ তা দাবী করে তাহলে সে তার বিবরণ দিবে।

সমষ্টির হুকুম ও এককের হুকুম

قَوْلُهٗ: فَإِنْ قِيْلَ خَبَرُ كُلِّ وَاحِدٍ : প্রশ্নের সারসংক্ষেপ হল, مُتَوَاتِر তো কতগুলি خَبَرِوَاحِد এর সমষ্টিরূপ। এর প্রতিটি خَبَر واحد তো ظَن এর ফায়দা দেয়। সুতরাং সমষ্টিও ظَن (প্রবল ধারণার) এর ফায়দা দিবে। তাছাড়া প্রতিটি ব্যক্তির পৃথকভাবে মিথ্যাবাদী হওয়ার সংশয়ও আছে। এমতাবস্থায় নিশ্চিত জ্ঞান লাভ হতে পারে না। কাজেই خَبَر مُتَوَاتِر দ্বারা নিশ্চিত জ্ঞান লাভ হয়- বলা শুদ্ধ নয়।

জবাবের সারমর্ম হল, সমষ্টির হুকুম এককের হুকুম হতে ভিন্ন হয়। যেমন, একটি পশম ছিড়া অতি সহজ। কিন্তু অনেকগুলি পশম দ্বারা তৈরী একটি রশি ছিড়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

فَاِنْ قِيْلَ اَلضَّرُوْرِيَّاتُ لَايَقَعُ فِيْهَا التَّفَاوُتُ وَالْاِخْتِلَافُ وَنَحْنُ نَجِدُ الْعِلْمَ بِكَوْنِ الْوَاحِدِ نِصْفَ الْاِثْنَيْنِ اَقْوٰى مِنَ الْعِلْمِ بِوُجُوْدِ اِسْكَنْدَرَ وَالْمُتَوَاتِرُ قَدْ اَنْكَرَتْ اِفَادَتَهُ الْعِلْمَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُقَلَاءِ كَالسُّمَنِيَّةِ وَالْبَرَاهِمَةِ قُلْنَا هٰذَا مَمْنُوْعٌ بَلْ قَدْ يَتَفَاوَتُ اَنْوَاعُ الضَّرُوْرِيِّ بِوَاسِطَةِ التَّفَاوُتِ فِى الْاِلْفِ وَالْعَادَةِ وَالْمُمَارَسَةِ وَالْاِخْطَارِ بِالْبَالِ وَتَصَوُّرَاتِ اَطْرَافِ الْاَحْكَامِ وَقَدْ يُخْتَلَفُ فِيْهِ مُكَابَرَةً وَعِنَادًا كَالسُّوْفَسْطَائِيَّةِ فِىْ جَمِيْعِ الضَّرُوْرِيَّاتِ ـ

সহজ তরজমা

খবরে মুতাওয়াতিরের হুকুমের উপর আরেকটি প্রশ্ন

পুনরায় যদি বলা হয় ضَرُوْرِيَّات এর মধ্যে তো ব্যতিক্রম এবং বিরোধ হয় না। অথচ আমরা এক দুইয়ের অর্ধেক এর জ্ঞান আলেকজাণ্ডারের অস্তিত্বের জ্ঞানের চেয়ে বেশী শক্তিশালী মনে করি। আর খবরে মুতাওয়াতির নিশ্চিত জ্ঞান প্রদান করে –একথাটি জ্ঞানীদের একটি দল, যেমন সুমানিয়্যা এবং ব্রাহ্মণ্যবাদ অস্বীকার করে। আমরা তার জবাব দেব, ضَرُوْرِيَّات এর মধ্যে তারতম্য না হওয়ার বিষয়টি স্বীকৃত নয় বরং ضَرُوْرِىْ এর বিভিন্ন প্রকারের পরিচিতি, স্বভাব, ব্যবহার, মনের ভাবনা এবং বাক্যের দুই প্রান্ত তথা مَوْضُوْع ও مَحْمُوْل এর ধারণায় পার্থক্য হওয়ার কারণে তারতম্য হয়। আবার কখনও অহংকার এবং সত্যকে অস্বীকার করার মনমানসিকতা থেকে জরুরী বা স্বতঃসিদ্ধ বিষয়ে বিরোধ হয়। যেমন, সকল بَدْهِيَّات এর ব্যাপারে সূফাস্তাইয়্যাহদের মতবিরোধ।

সহজ তাহকীক তাশরীহ

খবরে মুতাওয়াতির দ্বারা অর্জিত জ্ঞান কি জরুরী ?

فَاِنْ قِيْلَ ঃ এটা مُتَوَاتِر এর حُكْم এর দ্বিতীয় অংশের উপর আরোপিত প্রশ্ন অর্থাৎ مُتَوَاتِر দ্বারা অর্জিত জ্ঞান জরুরী হওয়ার কথাটি বিশুদ্ধ নয়। কেননা ضَرُوْرِيَّات এর মধ্যে পরস্পর তারতম্য এবং বিরোধ হতে পারে না। অথচ এখানে তো তারতম্য ও বিরোধ উভয়টি রয়েছে। কেননা এক দুইয়ের অর্ধেক হওয়ার জ্ঞান জরুরী হওয়া সত্ত্বেও আলেকজাণ্ডারের অস্তিত্বের জ্ঞান, যা خَبَر مُتَوَاتِر দ্বারা অর্জিত –এর চেয়ে বেশী শক্তিশালী। সুতরাং এখানে তারতম্য পাওয়া গেল। অপর দিকে জ্ঞানীদের একটি দল مُتَوَاتِر দ্বারা নিশ্চিত জ্ঞান লাভ হওয়ার বিষয়টিকে অস্বীকার করেছেন। সুতরাং মতবিরোধ পাওয়া গেল। কাজেই এ مُتَوَاتِر দ্বারা অর্জিত জ্ঞানকে জরুরী বলা বিশুদ্ধ নয়।

উপরিউক্ত প্রশ্নের ব্যাখ্যা শারিহগণ এভাবেই দিয়ে থাকেন। তবে উক্ত ব্যাখ্যাটি সঠিক বলে মনে হয় না। কেননা مُتَوَاتِر নিশ্চয়তার ফায়দা দেয়– এ ব্যাপারে কোন দল অস্বীকৃতি জানালে তা مُتَوَاتِر এর নিশ্চিত জ্ঞানের ফায়দা দেওয়ার ব্যাপারে বিরোধী হয়। আর যে জিনিসে বিরোধ হয় তা জরুরী হতে পারে না। বুঝা গেল, مُتَوَاتِر সুনিশ্চিত জ্ঞান লাভের ফায়দা দেওয়া জরুরী নয়। আর উপরে প্রশ্নকারীর এ উদ্দেশ্যেই বলা হয়েছে, مُتَوَاتِر দ্বারা অর্জিত জ্ঞান জরুরী নয়। সুতরাং প্রশ্নের উক্ত ব্যাখ্যা দ্বারা যে ফলাফল বেরিয়ে আসে তা মূলতঃ প্রশ্নকারীর উদ্দেশ্য নয়। তা প্রমাণিতও হয় না।

এ কারণে আমার মতানুসারে প্রশ্নের ব্যাখ্যা হবে, مُتَوَاتِر এর হুকুম সম্পর্কে শারিহ রহ. فَهٰهُنَا اَمْرَان দ্বারা দুটি বিষয় আলোচনা করেছেন। অথচ মূলতঃ এখানে ৩টি বিষয় রয়েছে। (১) خَبَر مُتَوَاتِر নিশ্চিত জ্ঞান সৃষ্টি করে। (২) خَبَر مُتَوَاتِر দ্বারা জ্ঞান লাভ হওয়া জরুরী। শারিহ রহ. وَذٰلِكَ بِالضَّرُوْرَةِ বলে সেদিকে ইংগিত করেছেন। (৩) مُتَوَاتِر দ্বারা অর্জিত জ্ঞান জরুরী। প্রশ্নকারী এখানে একটি মূলনীতির কথা বলেছেন অর্থাৎ ضَرُوْرِيَّات এর মধ্যে তো তারতম্য বা বিরোধ হয় না। একথা বলে তিনি প্রথমতঃ তৃতীয় অংশকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন। যেমন, এক দুইয়ের অর্ধেক হওয়ার জ্ঞানটি জরুরী। অপরদিকে আলেকজাণ্ডারের অস্তিত্বে জ্ঞান যেটি خَبَر مُتَوَاتِر দ্বারা অর্জিত, এদুটির মাঝে ব্যবধান রয়েছে। কেননা প্রথম জ্ঞানটি বেশী মজবুত। আর দ্বিতীয়টি তুলনামূলক দুর্বল। অথচ ضَرُوْرِيَّات এর মাঝে কোন ব্যবধান হয় না। কাজেই বুঝা গেল, خَبَر مُتَوَاتِر দ্বারা অর্জিত আলেকজাণ্ডারের অস্তিত্বের জ্ঞান" জরুরী নয় বরং নযরী ও ইসতিদলালী বা প্রমাণ নির্ভর।

অতঃপর প্রশ্নকারী তার উক্তি قَدْ أَنْكَرَتْ إِفَادَتَهُ الْعِلْمَ جَمَاعَةٌ দ্বারা দ্বিতীয় অংশকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন। এভাবে একদল জ্ঞানী خَبَر مُتَوَاتِر দ্বারা নিশ্চিত জ্ঞান লাভ হওয়ার বিষয়টিকে অস্বীকার করেছেন। ফলে مُتَوَاتِر দ্বারা নিশ্চিত জ্ঞান লাভ হওয়ার বিষয়ে বিরোধ প্রমাণিত হল। আর যে জিনিসে বিরোধ থাকে তা কখনও জরুরী হয় না। কাজেই مُتَوَاتِر দ্বারা সুনিশ্চিত জ্ঞান লাভ হওয়ার বিষয়টি জরুরী নয় বরং নযরী ও ইস্তিদলালী।

কারা এই সোমানিয়া ?

قَوْلُهُ: كَالسُّمَنِيَّةِ ঃ শব্দটির সীনে পেশ ও মীমে যবরসহ পঠিত। সংস্কৃতি ভাষায় شُمَن বলে দুনিয়া ত্যাগিকে। প্রাচীনকালে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এক দুনীয়াত্যাগী বলেকে شُمَنِي বলা হত। পরবর্তীতে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী সকলকেই شُمَنِي বলা শুরু হয়। তারপর আরবরা শব্দটিকে سُمَنِي রূপে পরিবর্তন করে ফেলেছে। আর মধ্য এশিয়ায় শব্দটি شَامَانِي নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। যাকারিয়া রাযী আল বেরুনী বৌদ্ধ ধর্মানুসারীদেরকে سُمَنِيَّة নামে বর্ণনা করেছেন। কারও কারও মতে এটি ভারতের প্রসিদ্ধ মন্দির সোমনাথ এর দিকে সম্বন্ধিত। এ হিসেবে সোমনাথ মন্দিরের পুজারী ও ভক্তদেরকে سُمَنِيَّة বলা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, سُمَن ভারতীয় হিন্দুদের একটি মূর্তির নাম। সে দিকে সম্বন্ধ করে তাদেরকে سُمَنِيَّة বলা হয়।

বারাহিমা কারা ?

قَوْلُهُ وَالْبَرَاهِمَةِ ঃ বারাহিমা বলতে হিন্দুস্থানের একটি কাফির সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে। এরা তাদের জনৈক নেতা ব্রাক্ষণ এর সংশ্লিষ্টতায় বারাহিমা নামে আখ্যায়িত হয়েছে। কারও কারও মতে بَرْهَام একটি মূর্তির নাম। যার পুজারীদেরকে بَرَاهِمَة বলা হত। এরা نُبُوَّت কে অস্বীকার করে। আত্মপক্ষ সমর্থনে দলীল স্বরূপ বলে, نُبُوَّت এর দলীল হল, مُعْجِزَه যা প্রত্যাক্ষ করেছে নবী যুগের লোকেরা। কাজেই مُعْجِزَه কেবল তাদের বেলায় نبوت এর দলীল হতে পারে। আর অনুপুস্থিত অর্থাৎ পরবর্তী লোক যারা কোন مُعْجِزَه প্রত্যক্ষ করেন নি, তাদের জন্য মু'জিযা نبوت এর দলীল হতে পারে না। এখন যদি তাদেরকে বলা হয়, পরবর্তী যুগের লোকেরা مُعْجِزَه প্রত্যক্ষ না করলেও তারা مُعْجِزَه সংঘটিত হওয়ার সুনিশ্চিত জ্ঞান خَبَر مُتَوَاتِر এর মাধ্যমে লাভ করেছে। তারা তখন এ বলেই উড়িয়ে দেয় যে, خَبَر مُتَوَاتِر দ্বারা সুনিশ্চিত জ্ঞান লাভ হয় না। কিন্তু مُتَوَاتِر এর সুনিশ্চিত জ্ঞান সৃষ্টি করার বিষয়টি বস্তুতঃ দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। এমন স্পষ্ট বিষয় কেবল অহংকার, বিদ্বেষ ও শত্রুতাবশতঃ অস্বীকার করে। বস্তুতঃ এদেরকে আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে অহংকার ও শত্রুতা দূর করে বুঝানো ছাড়া আর কোন পথ নেই।

স্বতঃসিদ্ধ বিষয়েও বিরোধ হয়

قَوْلُهُ: قُلْنَا هٰذَا مَمْنُوعٌ ঃ এখানে উপরিউল্লেখিত প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ ضَرُورِيَّاتٌ এর মধ্যে তফাৎ ও বিরোধ হয় না– একথা আমরা মানি না বরং ضَرُورِيَّاتٌ এর তারতম্য ও বিরোধ উভয়টি পাওয়া যায়। উক্ত তারতম্যের বিভিন্ন কারণও থাকে। একটি কারণ তো সুসম্পর্ক, স্বভাব, অনুশীলন ও ব্যবহারে তারতম্য থাকা। যেমন এক ও দুই সংখ্যা দুটি অধিক ব্যবহারের ফলে আমাদের মনের সাথে এর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। এমনিভাবে এ দুটির মাঝে অর্ধেক ও দ্বিগুণ হওয়ার সম্পর্কটিও বেশ পরিচিত। পক্ষান্তরে আলেকজাণ্ডারের নামের ব্যবহার ও আলোচনা কম হওয়ায় আমরা তার সাথে বেশী পরিচিত নই। "কাজেই এক দুইয়ের অর্ধেক" হওয়ার জ্ঞান এবং "আলেকজাণ্ডারের অস্তিত্বের" জ্ঞান উভয়টি জরুরী হওয়া সত্ত্বেও ঘনিষ্ঠতার ব্যবধানের কারণে উভয়টির জ্ঞানের মধ্যেও তারতম্য হয়েছে। ফলে আমরা "এক দুইয়ের অর্ধেক" হওয়ার জরুরী জ্ঞানকে আলেকজাণ্ডারের অস্তিত্বের জরুরী জ্ঞানের তুলনায় বেশী শক্তিশালী পেয়ে থাকি।

অনুরূপভাবে কখনও বাক্যের দুই প্রান্ত তথা مَوْضُوع ও مَحْمُول অনুধাবনে তারতম্য থাকায় ضَرُورِيَّات এর মধ্যে তফাৎ হয়। কারণ, একটি জরুরী হুকুমের مَوْضُوع ও مَحْمُول উভয়টি بَدِيْهِي হয়ে থাকে। আবার অপর জরুরী হুকুমের مَوْضُوع ও مَحْمُول নযরী ও গবেষণালব্ধ হয়ে থাকে। যেমন, اَلشَّمْسُ مُضِيْئَةٌ বাক্যটিতে সূর্যের ব্যাপারে আলোকিত হওয়ার হুকুম আর وَاجِبُ الْوُجُوْدِ لَيْسَ بِعَرْضٍ বাক্যটিতে وَاجِبُ الْوُجُوْد এর ব্যাপারে عَرْض না হওয়ার হুকুম জরুরী হলেও প্রথমটিতে مَوْضُوع ও مَحْمُول উভয়টি বদীহী ও স্বতঃসিদ্ধ। আর দ্বিতীয়টিতে مَوْضُوع ও مَحْمُول উভয়টি নযরী। এ তারতম্যের ফলে আমরা প্রথম বাক্যে সূর্যের ব্যাপারে আলোকিত হওয়ার জরুরী হুকুমটি দ্বিতীয় বাক্যের وَاجِبُ الْوُجُوْب এর ব্যাপারে عَرْض না হওয়ার জরুরী হুকুম

হতে বেশী স্পষ্ট অনুভব করি। এমনকি যদি وَاجِبُ الْوُجُوْدِ এর অর্থ সাধিষ্ঠ-চির-অপরিহার্য এবং عَرَض এর অর্থ যৌগিক-পরাধীন এ দুটি কথা অধিক অনুশীলনের ফলে কারও মনে সূর্যরশ্মির জ্ঞানের মত মজবুত হয়ে যায়, তাহলে তার নিকট বাক্যদ্বয়ের জ্ঞানে আর কোন তারতম্য থাকবে না।

মুকাবারা ও ইনাদ কি ?

قَوْلُهُ: وَقَدْ يَخْتَلِفُ فِيْهِ مُكَابَرَةً وَعِنَادًا ঃ নিজের বড়ত্ব প্রকাশের লক্ষ্যে অন্যায় তর্কবিতর্ককে مُكَابَرَةً আর শত্রুতা ও বিদ্বেষের কারণে সত্যকে অস্বীকার করার নাম ইনাদ।

শারিহ রহ. বলেন, ضَرُوْرِيَّات এর মধ্যে বিরোধ না হওয়াও সর্বসম্মত নয় বরং ضَرُوْرِيَّات এর মধ্যেও বিরোধ হয়। তবে এ বিরোধ অহংকার ও শত্রুতা বশতঃ হয়ে থাকে। যা কোন জরুরী হুকুম জরুরী হওয়ার পথে আদৌ অন্তরায় নয়।

قَوْلُهُ كَالسُّوْفَسْطَائِيَّة ঃ আসল عِبَارَة এমন اِخْتِلَافُ السُّمَنِيَّةِ فِيْ كَوْنِ الْمُتَوَاتِرِ مُفِيْدًا لِلْعِلْمِ مُكَابَرَةً وَعِنَادًا كَاخْتِلَافِ السُّوْفُسْطَائِيَّةِ فِيْ جَمِيْعِ الضَّرُوْرِيَّاتِ অর্থাৎ خَبَر مُتَوَاتِر সুনিশ্চিত জ্ঞানের ফায়দা দেয় –এ ব্যাপারে সুমানিয়া ও বারাহিমাদের বিরোধ ও অস্বীকৃতি অহংকার এবং হিংসা বশতঃ। যেমন সকল بَدِيْهِيَات এর ব্যাপারে সূফাস্তাইয়্যাদের বিরোধ অযথাই অহংকার ও শত্রুতাজনিত। অথচ সূফাস্তাইয়্যাদের বিরোধ ও অস্বীকৃতি সর্বসম্মতিক্রমে কোন ক্ষতিকারক নয়। অন্যথায় সব بَدِيْهِيَات বাতিল হওয়া আবশ্যক হবে। অনুরূপভাবে مُتَوَاتِر সুনিশ্চিত জ্ঞান অর্জনের ব্যাপারে সুমানিয়া ও বারাহিমাদের বিরোধ মোটেও ক্ষতিকারক নয় এবং مُتَوَاتِر এর দ্বারা সুনিশ্চিত জ্ঞান অর্জনের বিষয়টি জরুরীই থাকবে نَظَرِيْ ও প্রমাণ নির্ভর হবে না।

وَالنَّوْعُ الثَّانِيْ خَبَرُ الرَّسُوْلِ الْمُؤَيَّدِ اَيِ الثَّابِتُ رِسَالَتُهُ بِالْمُعْجِزَةِ وَالرَّسُوْلُ اِنْسَانٌ بَعَثَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى اِلَى الْخَلْقِ لِتَبْلِيْغِ الْاَحْكَامِ وَقَدْ يُشْتَرَطُ فِيْهِ الْكِتَابُ بِخِلَافِ النَّبِيِّ فَاِنَّهُ اَعَمُّ وَالْمُعْجِزَةُ اَمْرٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ قُصِدَ بِهِ اِظْهَارُ صِدْقِ مَنْ اِدَّعٰى اَنَّهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى وَهُوَ اَيْ خَبَرُ الرَّسُوْلِ يُوْجِبُ الْعِلْمَ الْاِسْتِدْلَالِيَّ اَيِ الْحَاصِلُ بِالْاِسْتِدْلَالِ اَيِ النَّظَرِ فِى الدَّلِيْلِ وَهُوَ الَّذِيْ يُمْكِنُ التَّوَصُّلُ بِصَحِيْحِ النَّظَرِ فِيْهِ اِلَى الْعِلْمِ بِمَطْلُوْبٍ خَبَرِيٍّ وَقِيْلَ قَوْلٌ مُؤَلَّفٌ مِنْ قَضَايَا يَسْتَلْزِمُ لِذَاتِهِ قَوْلًا اٰخَرَ فَعَلَى الْاَوَّلِ الدَّلِيْلُ عَلٰى وُجُوْدِ الصَّانِعِ هُوَ الْعَالَمُ وَعَلَى الثَّانِيْ قَوْلُنَا اَلْعَالَمُ حَادِثٌ وَكُلُّ حَادِثٍ فَلَهُ صَانِعٌ وَاَمَّا قَوْلُهُمُ الدَّلِيْلُ هُوَ الَّذِيْ يَلْزَمُ مِنَ الْعِلْمِ بِهِ الْعِلْمُ بِشَيْءٍ اٰخَرَ فَبِالثَّانِيْ اَوْفَقُ ـ

সহজ তরজমা

খবরে সাদিকের দ্বিতীয় প্রকার

আর তার দ্বিতীয় প্রকার হল রাসূলের সংবাদ, যাকে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) শক্তি প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ যার رِسَالَت মুজিযা দ্বারা প্রমাণিত। রাসূল ঐ মানবকে বলে, যাকে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির প্রতি শরী'আতের আহকাম পৌঁছানোর জন্য পাঠিয়েছেন। (কারও কারও পক্ষ থেকে) রাসূল হওয়ার জন্য কিতাব (অবতীর্ণ হওয়ার) শর্তারোপ করা হয়। তবে নবী এর বিপরীত। কেননা নবী আম শব্দ। আর মুজিযা হল, অভ্যাস বিরোধী অলৌকিক বিষয়। যা এমন ব্যক্তির সত্যতা প্রকাশের নিমিত্তে প্রকাশ পায়, যিনি নিজেকে আল্লাহর রাসূল বলে দাবী করেন। খবরে রাসূল এমন জ্ঞান সৃষ্টি করে, যা দলীল-প্রমাণে চিন্তা-ভাবনা করা (মুকাদ্দামা বিন্যাসের) দ্বারা অর্জিত হয়। দলীল এমন বিষয়কে বলে, যার মধ্যে সঠিক চিন্তা-গবেষণার ফলে مَطْلُوْب خَبَرِيْ এর জ্ঞান পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব হয়। কেউ কেউ বলেন, যা দলীল-প্রমাণে চিন্তা-ভাবনা করা (মুকাদ্দামা বিন্যাসের) দ্বারা অর্জিত হয়। আবার কেউ কেউ বলেন, (দলীল) কয়েকটি قَضِيَّة দ্বারা গঠিত এমন বাক্যের নাম, যা সরাসরি অন্য একটি বাক্যকে আবশ্যক

করে। সুতরাং প্রথম সংজ্ঞা অনুসারে স্রষ্টার অস্তিত্বের দলীল শুধু عَالَم (সৃষ্টি জগত) আর দ্বিতীয় সংজ্ঞানুসারে তার দলীল হল اَلْعَالَمُ مُتَغَيِّرٌ وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ মোটকথা, মান্তিক শাস্ত্রবিদদের উক্তি "যার জ্ঞানের ফলশ্রুতিতে অন্য বস্তুর জ্ঞান আবশ্যক হয়"– এটা দ্বিতীয় সংজ্ঞার সাথে বেশী সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সহজ তাহকীক তাশরীহ

২. খবরে রাসূলের বর্ণনা

قَوْلُهُ اَلنَّوْعُ الثَّانِيْ ঃ خَبَر صَادِق (সত্য সংবাদ) এর প্রথম প্রকার শেষ করে দ্বিতীয় প্রকার তথা خَبَرُ الرَّسُوْل এর আলোচনা করতে শুরু করেছেন। শারিহ রহ. এখানে রাসূল এর দুটি সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। সংজ্ঞা দুটি জানার পূর্বে আবশ্যই স্মরণ রাকতে হবে যে, নবী-রাসূলের মধ্যকার نِسْبَت নিয়ে বিরোধ রয়েছে।

নবী-রাসূলের মধ্যে কি নিসবত ?

১. কারও কারও মতে উভয়টির মাঝে বৈপরিত্য রয়েছে। সুতরাং **রাসূল** বলে, যাকে নতুন শরী'আত দিয়ে পাঠানো হয়েছে। আর **নবী** বলে, যাকে পূর্বের শরী'আতের উপর লোকজনকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে পাঠানো হয়েছে।

এ বক্তব্যের প্রত্যুত্তরে বলা হয়েছে, হযরত ঈসমাঈল (আ.) নতুন শরী'আতসহ প্রেরিত হননি। তথাপি আল্লাহ তা'আলা তাঁর ব্যাপারে বলেছেন, اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُوْلًا نَبِيًّا ।

২. কেউ কেউ বলেছেন, رَسُوْل আম আর نَبِى খাস। কেননা রাসূল মানুষ ও ফিরিশতা উভয়ই হতে পারেন। যেমন, কুরআন শরীফে ইরশাদ হচ্ছে, اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ এখানে রাসূল বলে অহীবাহক ফিরিশতা জীবরাঈল উদ্দেশ্য। কিন্তু নবী এর বিপরীত। কেননা নবী শুধু মানুষই হন।

৩. জমহুর উলামায়ে কিরাম বলেন, নবী আম; আর رَسُوْل খাস। কাজী বায়যাবী রহ. এর মতে এটাই পছন্দনীয়। কেননা তিনি وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلَانَبِيٍّ এর تَفْسِيْر প্রসঙ্গে বলেছেন, রাসূল বলে যাকে নতুন শরী'আতের প্রচারার্থে পাঠানো হয়েছে। আর যিনি নতুন শরী'আত নিয়ে প্রেরিত তিনিও নবী, যিনি পূর্বের শরী'আতের উপর লোকজনকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে প্রেরিত তিনিও নবী।

৪. উভয়টির মাঝে রয়েছে تَسَاوِى এর নিসবত অর্থাৎ উভয়টি একই। মুসান্নিফ ও শারিহ রহ. এর নিকট এটিই পছন্দনীয় মত। কারণ, মুসান্নিফ রহ. এর মতে যদি নবী ও রাসূল ﷺ এর মাঝে تَسَاوِى এর নিসবত না হত, তাহলে خَبَر صَادِق দুই প্রকারে সীমাবদ্ধ হত না বরং তিন প্রকার হত। (১) خَبَر رَسُوْل (২) خَبَر مُتَوَاتِر (৩) خَبَر النَّبِيّ । কিন্তু মুসান্নিফ রহ. خَبَر صَادِق দুই প্রকারেরই সীমাবদ্ধ রেখেছেন। এতে বুঝা যায়, মুসান্নিফ রহ. মতে "নবী-রাসূল" এর মাঝে কোন পার্থক্য নেই বরং উভয়টি এক।

আর শারিহ রহ. شَرح مَقَاصِد এর মধ্যে বলেছেন– اَلنَّبِيُّ اِنْسَانٌ بَعَثَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى لِتَبْلِيْغِ مَا اُوْحِىَ اِلَيْهِ وَكَذَا الرَّسُوْلُ . । এতে বুঝা যায়, শারিহ রহ. এর মতে নবী ও রাসূলের মাঝে تَسَاوِى এর নিসবত। তাছাড়া তিনি এখানে রাসূল এর সংজ্ঞাটি مُطْلَق রেখেছেন; কিতাব বা নতুন শরী'আতের শর্তারোপ করেননি। এতেও বুঝা যায়, তার মতে নবী-রাসূল উভয়টি এক ও অভিন্ন।

জমহুরের মতে "নবী-রাসূল"

قَوْلُهُ: قَدْ يُشْتَرَطُ ঃ এটা জমহূরের মতামত অর্থাৎ রাসূলের উপর কিতাব নাযিল হওয়া শর্ত। নবী এর বিপরীত। কেননা নবীকে। চাই তার উপর কিতাব নাযিল হোক বা না হোক। শারিহ রহ. يُشْتَرَطُ সীগাটি مَجْهُوْل এনে মতামতটির দুর্বলতার প্রতি ইংগিত করেছেন। কারণ, যদি রাসূলের জন্য কিতাব থাকা শর্ত হত, তাহলে রাসূল এবং কিতাবের সংখ্যা সমান হত। অথচ বিষয়টি এমন নয়। কেননা রাসূলের সংখ্যা ৩১৩ জন বলে বর্ণিত আছে। আর অবতীর্ণ কিতাব মোট ১১৪ টি, যার মধ্যে কুরআন শরীফ তাওরাত, যবুর ও ইঞ্জীল– এ চারটি বড়; বাকিগুলো সহীফা। বুঝা গেল, রাসূলের উপর কিতাব নাযিল হওয়া শর্ত নয়।

কেউ কেউ এর উত্তরে বলেন, হতে পারে একই কিতাব একাধিক নবীর উপর অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন, সুরায়ে ফাতিহা কয়েকবার অবতীর্ণ হয়েছে। তবে এ উত্তরটি একেবারেই দুর্বল। কেননা শরী'আতের ক্ষেত্রে বিষয়টি প্রমাণিত হতে হবে। শুধু সম্ভাবনা যথেষ্ট নয়।

মু'জিযা কি ?

قَوْلُهٗ: وَالْمُعْجِزَةُ ঃ মুজিযা হল, ঐ জিনিস যা আল্লাহ তা'আলা সাধারণ নিয়ম বহির্ভূতভাবে নবুয়তের দাবী সত্য প্রমাণ করার জন্য নবীর হাতে প্রকাশ করেন। "শরহে মাকাসিদ" গ্রন্থে শারিহ রহ. مُعْجِزَه এর সংজ্ঞায় লিখেছেন, اَمْرٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ مَقْرُوْنٌ بِالتَّحَدِّىْ مَعَ عَدَمِ الْمُعَارَضَةِ অর্থাৎ مُعْجِزَه হল, নবীর হাতে প্রকাশিত ঐ নিয়ম বহির্ভূত জিনিস, যা চ্যালেঞ্জ করা সত্ত্বেও নবী বিহীন কেউ অনুরূপ পেশ করতে পারে না।

যেমন, নবী কারীম ﷺ কুরআন শরীফ আকারে যে মুজিযা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত হয়েছেন, এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও অদ্যাবটি কেউ তার দৃষ্টান্ত পেশ করতে পারেনি আর কিয়ামত পর্যন্ত পারবেও না। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হচ্ছে–

وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ

মুজিযার উক্ত সংজ্ঞানুসারে যাদু-ভেলকীবাজি বের হয়ে যায়। কেননা এগুলো অভ্যাস পরিপন্থী নয় বরং কিছু বিশেষ কাজের অনুশীলন ও চর্চার ফলে এসব প্রকাশ পায়। সুতরাং যে কোন ব্যক্তিই ঐ অনুশীলন করে এগুলোর দেখাতে পারে। তদ্রুপ ওলিদের কারামতও এর থেকে বেরিয়ে যায়। কেননা সেখানে নবুওয়াতের দাবী থাকে না। মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীদার থেকে অভ্যাস পরিপন্থী কোন কিছু প্রকাশ পাওয়ার বিষয়টি অলিক কল্পনা মাত্র। এমনটি অদ্যাবধি হয়নি; কিয়ামত পর্যন্ত হবেও না।

খবরে রাসূলের বিধান

قَوْلُهٗ : وَهُوَ اَىْ خَبَرُ الرَّسُوْلِ ঃ এটা خَبَرِ رَسُوْل এর حُكْم এর বিবরণ অর্থাৎ خَبَرِ رَسُوْل এমন নিশ্চিত জ্ঞান দান করে, যা اِسْتِدْلَالِىْ তথা দলীলের ভূমিকাসমূহ বিন্যাসের ফলে অর্জিত হয়।

দলীল কাকে বলে ?

وَهُوَ الَّذِىْ الخ ঃ কালাম শাস্ত্রবিদদের মতে দলীল ঐ জিনিসকে বলে, যার মধ্যে সঠিক চিন্তা-গবেষণার ফলে এমন ফলাফল পর্যন্ত পৌছা সম্ভব হয়, যা جُمْلَه خَبَرِيَّه আকারে প্রকাশ পায়। যেমন, যদি সৃষ্টিজগতের মধ্যে সঠিকভাবে চিন্তা-গবেষণা করা হয়, তাহলে অবশ্যই ব্রেনে ধরা পড়বে যে, নিশ্চয়ই কেউ একজন এর স্রষ্টা আছেন। আর এ ফলাফল অর্থাৎ নিশ্চয়ই কেউ এর স্রষ্টা আছে جُمْلَه خَبَرِيَّه। বুঝায় গেল, সৃষ্টিজগত তার স্রষ্টার অস্তিত্বের দলীল।

ফলাফল পর্যন্ত পৌছা জরুরী নয়

অতঃপর শারিহ রহ. يُمْكِنُ اَنْ يَّتَوَصَّلَ বলে ইংগিত করেছেন, কার্যতঃ ফল প্রকাশ পাওয়া এবং ফলাফল পর্যন্ত পৌছতে পারা জরুরী নয় বরং পৌছার সম্ভাবনাই যথেষ্ট। এমনকি যদি কেউ সৃষ্টিজগতের মধ্যে চিন্তা-গবেষণা করে এবং সে কার্যতঃ ফলাফল পর্যন্ত পৌছতে না পারে তবুও শুধু সম্ভাবনার কারণে তা স্রষ্টার অস্তিত্বের দলীল।

মান্তিকীদের মতে দলীল?

وَقِيْلَ ঃ মান্তিকীগণ দলীলের সংজ্ঞায় বলেন, দলীল এমন কতকগুলি জানা বাক্যের সমষ্টি, যা অপর একটি কার্জকে আবশ্যক করে অর্থাৎ যার ফলে অবশ্যই মেধাশক্তি অন্য একটি বাক্যের প্রতি ধাবিত হয়।

দলীরের সংজ্ঞা দুটির পার্থক্য

১. **قَوْلُهٗ: فَعَلَى الْاَوَّلِ** ঃ উভয় সংজ্ঞার মাঝে পার্থক্য বর্ণনা করে বলেন, প্রথম সংজ্ঞা অনুসারে দলীল মুফরাদ। শুধু আলম বা সৃষ্টিজগতই স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ; اَلْعَالَمُ حَادِثٌ وَكُلُّ حَادِثٍ فَلَهٗ صَانِعٌ নয়। কেননা বিশ্ব জগৎ এমন জিনিস, যার মধ্যে যথার্থ চিন্তা-গবেষণার ফলে ধারণা জন্মে যে, নিশ্চয় তার কোন স্রষ্টা আছেন। আর যে জিনিসে যথার্থ চিন্তা-গবেষণার ফলে কোন ফলাফল অর্জিত হয়, সে জিনিসটি উক্ত ফলাফলের দলীল। বুঝা গেল, বিশ্ব জগৎ স্রষ্টার অস্তিত্বের দলীল।

২. **قَوْلُهٗ: وَعَلَى الثَّانِىْ** ঃ দ্বিতীয় সংজ্ঞানুপাতে দলীল مُرَكَّب বা যৌগিক বিষয়। উদাহরণতঃ স্রষ্টার অস্তিত্বের দলীল হল, আমাদের উক্তি اَلْعَالَمُ حَادِثٌ وَكُلُّ حَادِثٍ فَلَهٗ صَانِعٌ কেননা এ দুটি বাক্যের সমন্বয়ে গঠিত। আবশ্যিক ফলাফল হল, اَلْعَالَمُ لَهٗ صَانِعٌ এ সংজ্ঞানুপাতে ঐ কয়েকটি বাক্যের সমন্বয়ে গঠিত বাক্যটি (যার দ্বারা

আবশ্যিকভাবে অপর একটি কথা বুঝা যায়) এই অপর কথাটির উপর প্রমাণ হয়। সুতরাং اَلْعَالَمُ حَادِثٌ وَكُلُّ حَادِثٍ فَلَهُ صَانِعٌ. এ সংযুক্ত উক্তিটি স্রষ্টার অস্তিত্বের দলীল অতএব দলীলটি مُرَكَّب হলো।

দলীলের আরেকটি সংজ্ঞা

قَوْلُهُ: وَاَمَّا قَوْلُهُمْ ঃ দলীল শব্দটি صِيْغَه صِفَت যা دَلَالَت মাসদার হতে নির্গত। আর মান্তিক শাস্ত্রবিদগণ دلالت এর সংজ্ঞায় বলেন, কোন একটি জিনিস এমন হওয়া যে, তার জ্ঞান লাভের ফলে অন্য আরেকটি জিনিসের জ্ঞান অর্জন আবশ্যক হয়ে পড়ে। دَلَالَت এর এ অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে বলা যায় যে, দলীল ঐ জিনিসকে বলে, যার জ্ঞান অপর বস্তুর জ্ঞানকে আবশ্যক করে। যেমন, ধোঁয়া এমন জিনিস, যার জ্ঞানের ফলে আগুনের জ্ঞান অবশ্যই হয়ে যায়। অতএব ধোঁয়া আগুনের দলীল।

দলীলের তৃতীয় সংজ্ঞার সামঞ্জস্যতা

قَوْلُهُ: فَبِا لثَّانِى اَوْفَقُ ঃ এ তৃতীয় সংজ্ঞাটি দ্বিতীয় সংজ্ঞার সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল। কেননা এ সংজ্ঞায় যেভাবে ফলাফল সংক্রান্ত জ্ঞানকে আবশ্যক সাব্যস্ত করা হয়েছে, তদ্রূপ দ্বিতীয় সংজ্ঞায়ও ফলাফলের জ্ঞানকে আবশ্যক সাব্যস্ত করা হয়েছে। কিন্তু প্রথম সংজ্ঞায় ফলাফলের জ্ঞান পর্যন্ত পৌছাকে সম্ভব বলা হয়েছে।

অতঃপর اَوْفَقُ শব্দটি اِسْم تَفْضِيْل আনায় এ দিকে ইংগিত রয়েছে যে, এ তৃতীয় সংজ্ঞাটিকে প্রথম সংজ্ঞার সাথে সংগতিপূর্ণও বলা যায়। যদিও তা দ্বিতীয় সংজ্ঞার সাথেই বেশী সংগতিপূর্ণ। প্রথম সংজ্ঞার সাথে সংগতিপূর্ণ বলার পন্থা হল, বলবে– যখন সৃষ্টিজগতের অবস্থা তথা নশ্বরতার ব্যাপারে গবেষণা করা হবে এবং এমনভাবে বিন্যাস করা হবে, যাতে নশ্বরতা ও সম্ভাব্যতা حَدِّ اَوْسَط -এ পরিণত হয়, তখন অবশ্যই বিন্যস্ত মুকাদ্দামা অস্তিত লাভ করবে এবং তা সৃষ্টিকর্তার জ্ঞানকে আবশ্যক করবে। তাহলে এ সংজ্ঞানুসারেও عَالَم - মুফরাদ হওয়া সত্ত্বেও স্রষ্টার অস্তিত্বের দলীল গণ্য হবে। যেমন বলা হল, اَلْعَالَمُ مُمْكِنٌ وَكُلُّ مُمْكِنٍ فَلَهُ صَانِعٌ فَالْعَالَمُ لَهُ صَانِعٌ অথবা বলা হল, اَلْعَالَمُ حَادِثٌ وَكُلُّ حَادِثٍ فَلَهُ صَانِعٌ فَالْعَالَمُ لَهُ صَانِعٌ ইত্যাদি।

وَاَمَّا كَوْنُهُ مُوْجِبًا لِلْعِلْمِ فَلِلْقَطْعِ بِاَنَّ مَنْ اَظْهَرَ اللّٰهُ تَعَالٰى الْمُعْجِزَةَ عَلٰى يَدِهٖ تَصْدِيْقًا لَهُ فِىْ دَعْوَى الرِّسَالَةِ كَانَ صَادِقًا فِيْمَا اَتٰى بِهٖ مِنَ الْاَحْكَامِ وَاِذَا كَانَ صَادِقًا يَقَعُ الْعِلْمُ بِمَضْمُوْنِهَا قَطْعًا وَاَمَّا اَنَّهُ اِسْتِدْلَالِىٌّ فَلِتَوَقُّفِهٖ عَلَى الْاِسْتِدْلَالِ وَاِسْتِحْضَارِ اَنَّهُ خَبَرُ مَنْ ثَبَتَ رِسَالَتُهُ بِالْمُعْجِزَاتِ وَكُلُّ خَبَرٍ هٰذَا شَانُهُ فَهُوَ صَادِقٌ وَمَضْمُوْنُهُ وَاقِعٌ.

সহজ তরজমা

মোটকথা, খবরে রাসূল নিশ্চিত জ্ঞান লাভের মাধ্যম হওয়ার কারণ হল, আল্লাহ তা'আলা যার রাসূল হওয়ার দাবীর সত্যায়ণে তার হাতে অলৌকিক বিষয় প্রকাশ করেছেন, তিনি তার আনিত বিধানাবলীতে অবশ্যই সত্যাবাদী হবেন। যখন তিনি সত্যবাদী (প্রমাণিত) হবেন, তখন তার আনিত বিধানবলীর বিষয়বস্তুর সম্পর্কে সুনিশ্চিত জ্ঞান লাভ হবে। বাকী রইল খবরে রাসূল দ্বারা অর্জিত জ্ঞান اِسْتِدْلَالِى কেন ? এর কারণ হল, এটা নিম্নোক্ত বিষয়ের উপস্থাপনের উপর নির্ভরশীল যে, এটি এমন এক সত্ত্বার সংবাদ, যার রিসালাত মুজিযা দ্বারা প্রমাণিত। আর এ ধরনের সংবাদ সত্য হয় এবং এর বিষয়বস্তু বাস্তবসম্মত হয়।

সহজ তাহকীক তাশরীহ

ইতোপূর্বে মুসান্নিফ রহ. خَبَر رَسُوْل এর হুকুম প্রসঙ্গে বলেছেন, هُوَ يُوْجِبُ الْعِلْمَ الْاِسْتِدْلَالِى এখানে তিনি দুটি কথা বলেছেন। (১) خَبَر رَسُوْل সুনিশ্চিত জ্ঞান সৃষ্টি করে। (২) خَبَر رَسُوْل দ্বারা অর্জিত জ্ঞান اِسْتِدْلَالِىْ হয়; জরুরী নয়। শারিহ রহ. প্রত্যেকটির পৃথক পৃথক দলীল বর্ণনা করেছেন।

সুনিশ্চিত জ্ঞান হওয়ার প্রমাণ

(১) خَبَر رَسُوْل সুনিশ্চিত জ্ঞান সৃষ্টি করে একথার দলীল সংক্ষিপ্ত ভূমিকাসহ নিম্নরূপ অর্থাৎ যদি কোন ব্যক্তি এসে আমাদেরকে বলে– যায়েদ মারা গেছে, তখন সংবাদদাতার সত্যবাদী হওয়ার ব্যাপারে যদি আমাদের নিশ্চিত জ্ঞান থাকে, তাহলে তার দেওয়া সংবাদ সত্য বলে দৃঢ় বিশ্বাস হবে। আর خَبَر সত্য হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস বলতে ঐ

خَبَر এর বিষয়বস্তু অর্থাৎ যায়েদের মৃত্যুর ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস হবে। ঠিক তেমনি যখন আমাদের জানা আছে যে, রাসূল এমন ব্যক্তি, যার রিসালাতের দাবীর সত্যতা প্রমাণ ও তার সত্যতা প্রকাশের জন্য দলীল হিসেবে আল্লাহ তা'আলা তার হাতে মুযিজা প্রকাশ করেছেন, তখন ঐ রাসূলের আনিত যাবতীয় সংবাদে তিনি সত্যবাদী বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হবে। আর যখন ঐ রাসূল ও তার সংবাদসমূহের সত্যতার ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস হবে, তখন তার সংবাদসমূহের বিষয়বস্তু সম্পর্কেও দৃঢ় বিশ্বাস হবে।

জ্ঞানটি প্রমাণনির্ভর হওয়ার দলীল

২. বাকি রইল خَبَر رَسُوْل দ্বারা অর্জিত ইলম اِسْتِدْلَالِى হওয়ার বিষয়টি। তার কারণ হল, উক্ত জ্ঞান দলীল পেশ ও মুকাদ্দমা বিন্যস্ত করার উপর নির্ভরশীল। যদিও বর্ণিত মুকাদ্দামাগুলোর বিন্যাস মনে উপস্থিত থাকাই যথেষ্ট। যেমন, রাসূলের খবরের ব্যাপারে আমারা জানি যে, এ خَبَر এমন সত্তার খবর, যার রিসালত দলীল তথা মুজিযা দ্বারা প্রমাণিত। আমরা আরও জানি, যে খবরে এমন সত্তার দেওয়া হয়, যার রিসালত দলীল তথা মুজিযা দ্বারা প্রমাণিত, তা সত্য হয় এবং তার বিষয়বস্তু নিশ্চিত হয়। সুতরাং বিন্যস্ত মুকাদ্দামাগুলো হতে এ ফল বেরিয়ে আসবে যে, خَبَرِرَسُوْل এর বিষয়বস্তু নিশ্চিত ও বাস্তবসম্মত।

وَالْعِلْمُ الثَّابِتُ بِهِ اَىْ بِخَبَرِ الرَّسُوْلِ يُضَاهِىْ اَىْ يُشَابِهُ الْعِلْمَ الثَّابِتَ بِالضَّرُوْرَةِ كَالْمَحْسُوْسَاتِ وَالْبَدِيْهِيَّاتِ وَالْمُتَوَاتِرَاتِ فِى التَّيَقُّنِ اَىْ عَدَمِ اِحْتِمَالِ النَّقِيْضِ وَالثَّبَاتِ اَىْ عَدَمِ اِحْتِمَالِ الزَّوَالِ بِتَشْكِيْكِ الْمُشَكِّكِ فَهُوَ عِلْمٌ بِمَعْنَى الْاِعْتِقَادِ الْمُطَابِقِ الْجَازِمِ الثَّابِتِ وَاِلَّا لَكَانَ جَهْلًا اَوْ ظَنًّا اَوْ تَقْلِيْدًا

সহজ তরজমা

আর যে জ্ঞান خَبَر رَسُوْل দ্বারা অর্জিত হয়, তা নিশ্চিত হওয়া অর্থাৎ বিপক্ষের সম্ভাবনা না রাখার এবং প্রমাণিত হওয়া অর্থাৎ সন্দেহ সৃষ্টিকারীর সন্দেহ সৃষ্টির ফলে দূরীভূত হওয়ার সম্ভাবনা না রাখার দিক থেকে ঐ জ্ঞান তুল্য, যা জরুরীভাবে (অর্থাৎ দলীল উপস্থাপন ও মুকাদ্দামা বিন্যাস ব্যতিত) অর্জিত হয়। যেমন, ইন্দ্রিয়ালব্ধ বিষয়াদির জ্ঞান, স্বতঃসিদ্ধ বিষয়াবলির জ্ঞান এবং مُتَوَاتِر বিষয়সমূহের জ্ঞান। সুতরাং এর (خَبَر رَسُوْل দ্বারা অর্জিত) জ্ঞান মানে এমন ইতিকাদ যা বাস্তবসম্মত, নিশ্চিত এবং প্রমাণিত। অন্যথায় তা হবে جَهْل (মুর্খতা) কিংবা ظَن (প্রবল ধারণা) কিংবা তাকলীদ।

সহজ তাহকীক তাশরীহ

ইয়াকীনের দিক থেকে যে জ্ঞান জরুরী সমতুল্য

পূর্বে মুসান্নিফ রহ. পঞ্চইন্দ্রিয় এবং خَبَر مُتَوَاتِر দ্বারা অর্জিত ইলমকে জরুরী বলেছেন। ফলে সন্দেহ হতে পারে, যেহেতু خَبَر رَسُوْل দ্বারা অর্জিত জ্ঞান نَظَر ও اِسْتِدْلَال এর উপর নির্ভরশীল আর نَظَر ও اِسْتِدْلَال তথা মুকাদ্দামা বিন্যাসে ভ্রান্তির সম্ভাবনা রয়েছে। একারণে হয়ত خَبَر رَسُوْل দ্বারা অর্জিত জ্ঞান ظَن (প্রবল ধারণার) এর অর্থে হবে অথবা ইয়াকিন তথা নিশ্চয়তার অর্থেই হবে। কিন্তু ঐ ইয়াকিনের তুলনায় নিম্নমানের হবে, মুতাওয়াতিরাত, পঞ্চইন্দ্রিয় ও بَدْهِيَّات এর ক্ষেত্রে যে ইয়াকিন অর্জিত হয়ে থাকে। এ সন্দেহ দূর করার লক্ষ্যে মুসান্নিফ রহ. বলেন, خَبَر رَسُوْل দ্বারা অর্জিত জ্ঞান نَظَرِىْ ও اِسْتِدْلَالِى হলেও তা ইয়াকীন তথা নিশ্চয়তার দিক থেকে জরুরী এর সমতূল্য।

ফাওয়ায়েদে কুয়ূদ

قَوْلُهُ: كَالْمَحْسُوْسَات ঃ মুসান্নিফ রহ. এর এ উক্তিটি اَلْعِلْمُ الثَّابِتُ بِالضَّرُوْرَةِ এর উদাহরণ। মূল ইবারত হবে كَالْعِلْمِ بِالْمَحْسُوْسَاتِ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ানুভূত বিষয়াদি, بَدِيْهِيَّات (স্বতঃসিদ্ধ বিষয়াদি) এবং মুতাওয়াতিরাতে জরুরী জ্ঞান ইয়াকীন (নিশ্চয়তার) এর অর্থে, তেমনি خَبَر رَسُوْل দ্বারা জ্ঞানও ইয়াকীন এর অর্থে।

قَوْلُهُ فِى الْيَقِيْنِ ঃ ইয়াকীন বলে, কোন জিনিসকে এমন দৃঢ়ভাবে জানা যে, বিপরীত দিকের কোন সম্ভাবনা না থাকে। সাথে সাথে তা বাস্তবসম্মত এবং প্রমাণিতও হবে। অর্থাৎ সন্দেহ সৃষ্টিকারীর সন্দেহ সৃষ্টি করার কারণে তা দূরীভূত হবে না। এর বিস্তারিত বিবরণ উদাহরণসহ মুসান্নিফ উক্তি أَسْبَابُ الْعِلْمِ এর বিবরণে অতিবাহিত হয়েছে। সারকথা হল, يَقِيْن এর অর্থে তিনটি জিনিস লক্ষণীয়। (১) দৃঢ়তা অর্থাৎ বিপরীত দিকের সম্ভাবনা না থাকা। (২) বাস্তবসম্মত হওয়া। (৩) প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত হওয়া অর্থাৎ সন্দেহ সৃষ্টি কারীর সন্দেহ সৃষ্টির ফলে তা দূরীভূত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকা। সুতরাং যখন يَقِيْن এর অর্থে দৃঢ়তার অর্থ শামিল রয়েছে, তাই মুসান্নিফ রহ. এর জন্য يَقِيْن এর পর ثُبَات শব্দটি না আনাই উচিৎ ছিল। শব্দটি অনর্থক উল্লেখ করা হয়েছে।

শারিহ রহ. এ নিরর্থকতার অভিযোগ থেকে পরিত্রানের জন্য عَدَمُ إِحْتِمَالِ التَّشْكِيْكِ দ্বারা এর ব্যাখ্যা করেছেন। এখন যেহেতু تَقْلِيْد যার মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টিকারীর সন্দেহ সৃষ্টির কারণে দূরীভূত হওয়ার সম্ভাব থাকে না এবং সেটিও বিপরীত পক্ষের সম্ভাবনা রাখে না। বিধায় تَقْلِيْد কে বের করার জন্য মুসান্নিফ রহ. ثُبَات শব্দটি উল্লেখের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন। বুঝা গেল, ثُبَات শব্দটি নিরর্থক নয় বরং প্রয়োজনীয়। কিন্তু এরপরও প্রশ্ন থেকে যায় যে, جَهْل مُرَكَّب এখনও يَقِيْن থেকে বের হয়নি। অবশ্য কোন কোন টীকাকার এর উত্তর দিয়েছেন, মুসান্নিফ রহ. এর অভিপ্রায় হল, خَبَر رَسُوْل দ্বারা অর্জিত জ্ঞানকে ইয়াকীনের দিক থেকে ইলমে জরুরীর নিকটবর্তী বলা; ইয়াকীনের অর্থে সাব্যস্ত করা নয়। একারণে تَصْدِيْقِيَّات غَيْر يَقِيْنِيَّه এর সব প্রকার বের করা জরুরী নয়। কিন্তু উত্তরটি বিশুদ্ধ নয়। কারণ, পূর্বে শারিহ রহ. বলেছেন, فَهُوَ عِلْمٌ بِمَعْنَى الْاِعْتِقَادِ الْجَازِم الثَّابِت আর বাস্তবসম্মত হওয়া, সুদৃঢ় হওয়া এবং সন্দেহের কারণে দূরীভূত না হওয়া, এগুলোর সমষ্টি কেবল ইয়াকীনই হতে পারে। কাজেই সরল কথা হল, শারিহ রহ. এর একটু পদস্খলন ঘটেছে। উচিৎ ছিল اَلْجَزْمُ الْمُطَابِق দ্বারা تَيَقُّن এর ব্যাখ্যা করা। এমতাবস্থায় جَزْم শব্দের কারণে ظَن (প্রবল ধারণা) এবং পূর্বে বর্ণিত ثُبَات (প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হওয়া) দ্বারা تَقْلِيْد বের হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ فَهُوَ عِلْمٌ ঃ অর্থাৎ خَبَر رَسُوْل দ্বারা অর্জিত জ্ঞান ইয়াকীনের দিক থেকে بَدِيْهِيَّات (স্বতঃসিদ্ধ বিষয়াদি) مَحْسُوْسَات (ইন্দ্রিয়ানুভূত বিষয়াদি) এবং মুতাওয়াতির সমূহের জ্ঞানের মত জরুরী। তখন এ عِلْم শব্দটি إِعْتِقَاد এর অর্থে ব্যবহৃত হবে। যা তিনটি গুণে তথা (১) مُطَابِقَةٌ لِلْوَاقِع (বাস্তব সম্মত হওয়া) (২) جَزْم (দৃঢ়তা) (৩) ثُبَات (প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হওয়া) এর সমষ্টি। আর যদি ঐ إِعْتِقَاد উল্লেখিত তিনটি গুণের সমষ্টি না হয়, তাহলে তা তিন অবস্থা থেকে খালি নয়। হয়ত مُطَابِقٌ لِلْوَاقِع (বাস্তব সম্মত) হবে না। তাহলে তা جَهْل مُرَكَّب হবে। অথবা جَازِم তথা দৃঢ় হবে না। তখন ظَن (প্রবল ধারণা) হবে। অথবা ثَابِت তথা প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হবে না বরং সন্দেহ সৃষ্টিকারীর সন্দেহ সৃষ্টির ফলে তা দূরীভূত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রাখবে। তাহলে তা হবে তাকলীদ।

فَإِنْ قِيلَ هٰذَا اِنَّمَا يَكُوْنُ فِى الْمُتَوَاتِرِ فَقَطْ فَيُرْجِعُ إِلَى الْقِسْمِ الْاَوَّلِ قُلْنَا اَلْكَلَامُ فِيْمَا عُلِمَ اَنَّهُ خَبَرُ الرَّسُوْلِ بِاَنْ سُمِعَ مِنْ فِيْهِ اَوْ تَوَاتَرَ عَنْهُ ذٰلِكَ اَوْ بِغَيْرِ ذٰلِكَ اِنْ اَمْكَنَ وَاَمَّا خَبَرُ الْوَاحِدِ فَاِنَّمَا لَمْ يُفِدِ الْعِلْمَ لِعُرُوْضِ الشُّبْهَةِ فِىْ كَوْنِهِ خَبَرَ الرَّسُوْلِ فَاِنْ قِيلَ فَاِذَا كَانَ مُتَوَاتِرًا اَوْمَسْمُوْعًا مِنْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَانَ الْعِلْمُ الْحَاصِلُ بِهِ ضُرُوْرِيًّا كَمَا هُوَ حُكْمُ سَائِرِ الْمُتَوَاتِرَاتِ وَالْحِسِّيَّاتِ لَا اِسْتِدْلَالِيًّا قُلْنَا اَلْعِلْمُ الضَّرُوْرِيُّ فِى الْمُتَوَاتِرِ هُوَ الْعِلْمُ بِكَوْنِهِ خَبَرَ الرَّسُوْلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِاَنَّ هٰذَا الْمَعْنٰى هُوَ الَّذِىْ تَوَاتَرَ الْاِخْبَارُ بِهِ وَفِى الْمَسْمُوْعِ مِنْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ هُوَ اِدْرَاكُ الْاَلْفَاظِ وَكَوْنُهَا كَلَامَ الرَّسُوْلِ ﷺ وَالْاِسْتِدْلَالِىُّ هُوَ الْعِلْمُ بِمَضْمُوْنِهِ وَثُبُوْتِ مَدْلُوْلِهِ مَثَلًا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِىْ وَالْيَمِيْنُ عَلٰى مَنْ اَنْكَرَ عُلِمَ بِالتَّوَاتُرِ اَنَّهُ خَبَرُ الرَّسُوْلِ ﷺ وَهُوَ ضَرُوْرِىٌّ ثُمَّ عُلِمَ مِنْهُ اَنَّهُ يَجِبُ اَنْ تَكُوْنَ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِىْ وَهُوَ اِسْتِدْلَالِىٌّ ـ

সহজ তরজমা

খবরে রাসূল কিভাবে খবরে সাদিকের দ্বিতীয় প্রকার ?

এবার যদি বলা হয়, সেটি (তথা খবরে রাসূল দ্বারা নিশ্চিত জ্ঞান লাভ তো) শুধু তখনই হবে যখন খবরটি মুতাওয়াতির হবে। তাহলে তো এটি প্রথম প্রকার (খবরে মুতাওয়াতির) এর দিকেই ফিরে যাবে। আমরা জবাব দেব, আমাদের আলোচনা ঐ খবরে রাসূল সম্পর্কে, যার ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে জানা আছে যে, সেটি খবরে রাসূল। অর্থাৎ ঐ খবর (সরাসরি) তার কাছ থেকে তাওয়াতুররূপে বর্ণিত হয়েছে। অথবা এছাড়া অন্য কোন্ পন্থায়, যদি তা সম্ভব হয়। মোটকথা, خَبَرِ وَاحِد শুধু খবরে রাসূল হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ায় তা জ্ঞান সৃষ্টি করে না। পুনরায় যদি প্রশ্ন করা হয়, যখন সেটি (খবরে রাসূল) মুতাওয়াতির হবে অথবা নবীর মুখ থেকে শ্রুত হবে, তখন তা দ্বারা অর্জিত জ্ঞান হবে জরুরী। যেমন, মুতাওয়াতির ও ইন্দ্রিয়ানুভূত বিষয়াদির হুকুম; তা اِسْتِدْلَالِى তথা দলীলনির্ভর হবে না। আমরা এর উত্তর দেব, যে খবর রাসূল ﷺ থেকে মুতাওয়াতির রূপে বর্ণিত হয়েছে, তাতে ইলমে জরুরী হল রাসূলের খবর হওয়ার জ্ঞান। কেননা এটাই সে জিনিস, যা খবরে মুতাওয়াতির দ্বারা বাস্তবায়িত হয়েছে। আর রাসূল ﷺ থেকে সরাসরি শোনা খবরে ইলমে জরুরী হল, কেবল শব্দরাজি (কান দ্বারা) অনুভব করা এবং ঐ শব্দরাজি আল্লাহর রাসূলের বাণী হওয়া। যেমন, নবী কারীম ﷺ এর বাণী اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِىْ وَالْيَمِيْنُ عَلٰى مَنْ اَنْكَرَ এ সম্পর্কে মুতাওয়াতির ভাবে জানা গেছে যে, এটি খবরে রাসূল আর এ জ্ঞান জরুরী। অতঃপর এটি (খবরে রাসূল হওয়ার) দ্বারা এ জ্ঞান লাভ হয়েছে যে, مُدَّعِى (বাঁদী) এর উপর প্রমাণ পেশ করা জরুরী। আর এ জ্ঞান হল, اِسْتِدْلَالِى তথা দলীলনির্ভর।

সহজ তাহকীক তাশরীহ

প্রশ্নের বিবরণ ঃ এখানে শারিহ এর উক্তি فَهُوَ عِلْمٌ بِمَعْنَى الْاِعْتِقَادِ الْمُطَابِقِ الْجَازِمِ এর উপর একটি আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে অর্থাৎ এমন জ্ঞান, যা উল্লেখিত গুণ সম্বলিত অর্থাৎ যা يَقِيْن এর অর্থে, ঐ খবরে রাসূল তো خَبَر مُتَوَاتِر এর পর্যায়ভুক্ত হয়ে যাবে। খবরে মুতাওয়াতির এর قَسِيْم বা বিপরীত এবং خَبَر صَادِق এর দ্বিতীয় প্রকার হবে না। কাজেই মুসান্নিফ রহ. কর্তৃক খবরে সাদিককে দু ভাগে বিভক্ত করা শুদ্ধ হয়নি।

قُلْنَا ঃ এটা উল্লেখিত প্রশ্নের জবাব অর্থাৎ খবরে রাসূল দ্বারা অর্জিত ইলম উপরিউক্ত তিনটি গুণ সম্বলিত হওয়ার কথাটি ঐ খবরে রাসূলের ব্যাপারে প্রযোজ্য, যার খবরে রাসূল হওয়ার ব্যাপারটি নিশ্চিতভাবে জানা আছে। আর খবরে রাসূল হওয়ার জ্ঞান শুধু تَوَاتُر এর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং খবরে রাসূল হওয়ার জ্ঞান تَوَاتُر দ্বারাও

অর্জিত হয়। আবার সরাসরি নবীর মুখ থেকে শুনেও অর্জিত হয়। যেমন, যে সকল সাহাবী সরাসরি নবীজীর পবিত্র জবান থেকে কোন কথা শুনেছেন, ফলে তাদের কাছে ঐ বাণীটি খবরে রাসূল হওয়ার নিশ্চিত জ্ঞান লাভ হয়েছে। এমনি স্বপ্ন ও ইলহামের মাধ্যমেও খবরে রাসূল হওয়ার জ্ঞান লাভ হতে পারে। তদ্রূপভাবে বিভিন্ন সময় আল্লাহ তা'আলা তার কোন কোন বান্দাকে নবী কারীম ﷺ এর বাণীসমূহের ভাষালংকার ও বাচনভঙ্গি অনুভব করার এমন যোগ্যতা দান করেন, যার ফলে সে খবরে রাসূলকে নিশ্চিতভাবে চিনতে পারে। যেমন, হাদীস শাস্ত্রের কোন ইমাম হতে বর্ণিত আছে, তারা শুধু আপন মেধা দ্বারাই শুদ্ধকে অশুদ্ধ হতে خَبَر رَسُول কে غَيْر خَبَرِرَسُوْل হতে পৃথক করে দিতেন। তবে হ্যাঁ যদি تَوَاتُر ব্যতিত অন্য কোনভাবে কেউ কোন খবর সম্পর্কে খবরে রাসূল হওয়ার জ্ঞান লাভ করে, তাহলে ঐ খবরে রাসূল কেবল তার জন্যই নিশ্চিত জ্ঞান সৃষ্টি করবে, অন্যের বেলায় তা দলীল হতে পারবে না।

খবরে রাসূল কি নিশ্চিত জ্ঞান সৃষ্টি করে ?

قَوْلُهُ: وَاَمَّا خَبَرُ الْوَاحِدِ ঃ খবরে রাসূল ﷺ এর হুকুমে দুটি অংশ রয়েছে। (১) খবরে রাসূল সুনিশ্চিত জ্ঞান সৃষ্টি করে। (২) খবরে রাসূল দ্বারা অর্জিত জ্ঞান اِسْتِدْلَالِى তথা দলীলনির্ভর হয়। প্রথম অংশের উপর একটি প্রশ্ন জাগে যে, خَبَر وَاحِد অর্থাৎ যাতে تَوَاتُر এর শর্তাবলী অনুপুস্থিত, সেটিও তো খবরে রাসূল। তথাপি তা সুনিশ্চিত জ্ঞান সৃষ্টি করে না বরং ظَنّ (প্রবল ধারণা) সৃষ্টি করে। তাহলে মুসান্নিফ রাযি. কর্তৃক খবরে রাসূলকে مُطْلَقًا (বিনাশর্তে) সুনিশ্চিত জ্ঞান সৃষ্টিকারী বলা কিভাবে ঠিক হল ?

খবরে রাসূলকে দলীল নির্ভর জ্ঞান কিভাবে বলা যায় ?

قَوْلُهُ: فَاِنْ قِيْلَ فَاِذَا كَانَ مُتَوَاتِرًا ঃ এখানে خَبَر رَسُوْل এর হুকুমের দ্বিতীয় অংশের উপর প্রশ্ন তোলা হয়েছে। উক্ত প্রশ্নের সারসংক্ষেপ হল, مُتَوَاتِر এর মাধ্যমে যেখবর খবরে রাসূল হওয়ার কথা জানা যায়, তা خَبَر مُتَوَاتِر হবে এবং যে খবরে রাসূল সরাসরি নবীর মুখ থেকে শ্রুত, সেটি শ্রবণশক্তি তথা কানের সাথে সম্পৃক্ত বিধায় সেটি مَحْسُوْس তথা ইন্দ্রিয়লব্ধ বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যেহেতু مُتَوَاتِر ও ইন্দ্রিয় দ্বারা অর্জিত জ্ঞান জরুরী হয়, তাই এমন খবরে রাসূল দ্বারা অর্জিত জ্ঞানও ضَرُوْرِى হবে; اِسْتِدْلَالِى (দলীলনির্ভর) হবে না। সুতরাং মুসান্নিফ রহ. এর هُوَ يُوْجِبُ الْعِلْمَ الْاِسْتِدْلَالِى বলা ঠিক হয়নি?

প্রথম প্রশ্নের জবাব

قُلْنَا ঃ এটা পূর্বের প্রশ্নের জবাব। জবাবের সারমর্ম হল, এখানে ভিন্ন ভিন্ন দুটি জিনিস রয়েছে। (১) কোন খবর সম্পর্কে খবরে রাসূল হওয়ার জ্ঞান লাভ করা। (২) খবরে রাসূল হওয়ার জ্ঞান দ্বারা তার বিষয়বস্তু সত্য হওয়ার জ্ঞান লাভ করা। তন্মধ্যে প্রথমটি জরুরী ও স্বতঃসিদ্ধ। আর দ্বিতীয়টি اِسْتِدْلَالِى বা দলীলনির্ভর। যেমন, খবরে রাসূল مُتَوَاتِر হলে তার খবরে রাসূল হওয়ার জ্ঞানটি হবে জরুরী। কেননা تَوَاتُر হিসেবে একথাই কেবল প্রমাণিত হয়েছে যে, এমন এক দল লোক যাদের মিথ্যার উপর একমত হওয়া সম্ভব নয়। তারা এ খবরকে قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الخ বলে বর্ণনা করেছেন। বাকী রইল উক্ত খবরের বিষয়বস্তু সত্য হওয়ার জ্ঞানের কথা। এটা تَوَاتُر দ্বারা অর্জিত হয়নি। কেননা বিষয়বস্তু সত্য হওয়া مُتَوَاتِر এর জন্য আবশ্যক নয়। যেমন, مُسَيْلَمَةُ الْكَذَّاب এর নবুওয়াতের দাবী মুতাওয়াতির। তদুপরি তার দাবীর বিষয়বস্তু মিথ্যা।

এমনিভাবে সরাসরি নবীর মুখ থেকে শ্রুত সংবাদের ক্ষেত্রে তার শব্দাবলী অনুধাবন ও সেসব শব্দ নবীজীর কথা হওয়ার জ্ঞান তা থেকে অর্জিত হয় না। কেননা কোন খবর কারও কাছ থেকে সরাসরি শ্রবণের অর্থ এই নয় যে, তার বিষয়বস্তু সত্য হতে হবে। যেমন, যায়েদ সরাসরি তোমাকে বলল, 'আগুন ঠাণ্ডা', তাহলে সরাসরি শোনার কারণে উল্লেখিত বাক্যটি যায়েদের কথা বলে নিশ্চিত হতে পেরেছ। কিন্তু তার বিষয়বস্তু মিথ্যা। মোটকথা, تَوَاتُر এর মাধ্যমে অথবা সরাসরি নবীর মুখ থেকে শ্রুত ঐ مُتَوَاتِر শব্দাবলী এবং শোনা শব্দাবলী খবরে রাসূল হওয়ার জ্ঞান জরুরী।

দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব

قَوْلُهُ وَالْاِسْتِدْلَالِىُّ ঃ আর ঐ খবরে রাসূলের বিষয়বস্তু সত্য হওয়া জ্ঞান হল, اِسْتِدْلَالِى বা দলীলনির্ভর। যেমন, নবী কারীম ﷺ বলেছেন, اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِى وَالْيَمِيْنُ عَلَى مَنْ اَنْكَرَ মুতাওয়াতিরের মাধ্যমে

এটি খবরে রাসূল হওয়ার জ্ঞান অর্জিত হয়েছে। আর এ জ্ঞানটি জরুরী। অধিকন্তু এটি খবরে রাসূল হওয়ায় জানা গেছে যে, বাদীর উপর بينه তথা প্রমাণ পেশ করা আবশ্যক। আর এটিই দলীলনির্ভর জ্ঞান। এ জ্ঞান অর্জিত হয়েছে দলীলের মাধ্যমে। কেননা اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِىْ হল خَبَر رَسُوْل আর প্রত্যেক খবরে রাসূলের বিষয়বস্তু সহীহ। কাজেই اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِىْ এর বিষয়বস্তুও সহীহ।

فَاِنْ قِيْلَ اَلْخَبَرُ الصَّادِقُ الْمُفِيْدُ لِلْعِلْمِ لَايَنْحَصِرُ فِى النَّوْعَيْنِ بَلْ قَدْ يَكُوْنُ خَبَرَ اللّٰهِ تَعَالٰى اَوْ خَبَرَ الْمَلِكِ اَوْ خَبَرَ اَهْلِ الْاِجْمَاعِ اَوِ الْخَبَرَ الْمَقْرُوْنَ بِمَا يَرْفَعُ اِحْتِمَالَ الْكِذْبِ كَالْخَبَرِ بِقُدُوْمِ زَيْدٍ عِنْدَ تَسَارُعِ قَوْمِهٖ اِلٰى دَارِهٖ قُلْنَا اَلْمُرَادُ بِالْخَبَرِ خَبَرٌ يَكُوْنُ سَبَبًا لِلْعِلْمِ لِعَامَّةِ الْخَلْقِ بِمُجَرَّدِ كَوْنِهٖ خَبَرًا مَعَ قَطْعِ النَّظْرِ عَنِ الْقَرَائِنِ الْمُفِيْدَةِ لِلْيَقِيْنِ بِدَلَالَةِ الْعَقْلِ فَخَبَرُ اللّٰهِ تَعَالٰى اَوْ خَبَرُ الْمَلِكِ اِنَّمَا يَكُوْنُ مُفِيْدًا لِلْعِلْمِ بِالنِّسْبَةِ اِلٰى عَامَّةِ الْخَلْقِ اِذَا وَصَلَ اِلَيْهِمْ مِنْ جِهَةِ الرَّسُوْلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَحُكْمُهٗ حُكْمُ الرَّسُوْلِ وَخَبَرُ اَهْلِ الْاِجْمَاعِ فِى حُكْمِ الْمُتَوَاتِرِ وَقَدْ يُجَابُ بِاَنَّهٗ لَايُفِيْدُ بِمُجَرَّدِهٖ بَلْ بِالنَّظْرِ اِلَى الْاَدِلَّةِ الدَّالَّةِ عَلٰى كَوْنِ الْاِجْمَاعِ حُجَّةً قُلْنَا وَكَذٰلِكَ خَبَرُ الرَّسُوْلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلِهٰذَا جُعِلَ اِسْتِدْلَالِيًّا ـ

সহজ তরজমা

খবরে সাদিক দুই প্রকারে সীমাবদ্ধ কিনা ?

সুতরাং যদি বলা হয়, সত্য সংবাদ সুনিশ্চিত জ্ঞান সৃষ্টি করে, সেটি উক্ত দুই প্রকারে সীমাবদ্ধ নয় বরং আল্লাহ তা'আলার খবর এবং ফিরিশতাদের খবর, আহলে ইজমা তথা মুজতাহিদগণের ইজমা, এমন নিদর্শন যুক্ত খবর, যাতে মিথ্যার সম্ভাবনা নেই। যেমন, যায়েদের বাড়িমুখে লোকজন ছুটে যাওয়ার সময় তার আগমনের খবর– এসব খবরই নিশ্চিত জ্ঞান সৃষ্টি করে। আমরা বলব, مقسم اَلْخَبَر الصَّادِق এর মধ্যে خَبَر صَادِق দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য এমন সংবাদ, যা বিবেকের মাধ্যমে ইয়াকীন সৃষ্টিকারী নিদর্শনাবলী ছাড়াই শুধু খবর হওয়ার কারণে জনসাধারণের জন্য জ্ঞানের মাধ্যম হয়। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার খবর অথবা ফিরিশতার খবর জনসাধারণের জন্য তখনই জ্ঞানের মাধ্যম হবে, যখন তা রাসূলের মাধ্যমে তাদের কাছে পৌঁছাবে। এমতাবস্থায় তার হুকুম খবরে রাসূলের হুকুম হবে। আহলে ইজমার খবর مُتَوَاتِر এর হুকুমে। আবার কখনও এ জবাবে বলা হয়, আহলে ইজমার খবর শুধু খবর হওয়ার কারণে নিশ্চিত জ্ঞান সৃষ্টি করে না বরং ঐ সব প্রমাণের প্রতি লক্ষ্য করে, যা ইজমা দলীল হওয়ার উপর ইংগিত করে। আমরা বলব, তাহলে খবরে রাসূলও তো অনুরূপ হবে। আর এ কারণেই (তা দ্বারা অর্জিত জ্ঞানকে) اِسْتِدْلَالِى দলীলনির্ভর সাব্যস্ত করা হয়েছে।

সহজ তাহকীক তাশরীহ

উক্ত সীমাবদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন

قَوْلُهٗ فَاِنْ قِيْلَ : প্রশ্নের সারসংক্ষেপ হল, خَبَر صَادِق জ্ঞানের মাধ্যমে, তা শুধু দুই প্রকার তথা خَبَر مُتَوَاتِر এবং খবরে রাসূলের মধ্যে সীমিত নয় বরং এছাড়াও আরও এমন কিছু খবর রয়েছে, যা জ্ঞানের মাধ্যম হয়। যেমন, আল্লাহ তা'আলার খবর। আল্লাহ তা'আলা তূর পর্বতে মূসা (আ.) কে এবং মিরাজের রাত্রিতে জনাব রাসূলুল্লাহ ﷺ কে যা কিছু খবর দিয়েছেন, ঐ খবর দ্বারা এ দুই মহান নবীর সে খবর সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞান লাভ হয়েছে। তেমনিভাবে ফিরিশতাদের খবর দ্বারাও নিশ্চিত জ্ঞান লাভ হয়। কেননা হযরত জিবরাঈল (আ.) আম্বিয়ায়ে কিরামকে যে সংবাদই দিতেন, তা দ্বারা তাদের নিশ্চিত জ্ঞান লাভ হত। এমনিভাবে ঐ খবরে ওয়াহিদ, যার সাথে তার সত্যতা প্রমাণকারী এবং তার মিথ্যার সম্ভাবনা দূরকারী নিদর্শনও থাকে, সেটিও নিশ্চিত জ্ঞান সৃষ্টি করে। যেমন, যায়েদ হজ্বে গেল। একথা তোমার জানা আছে। আর এখন হাজীদের ফিরার সময় তুমি অনেক লোকজনকে যায়েদের বাড়িমুখে দৌড়াতে দেখে একজনকে জিজ্ঞাসা করলে, এসব লোক কোথায় যাচ্ছে? সে

তোমাকে বলল, যায়েদ হজ্ব থেকে এসেছে। লোকজন তার সাথে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছে। এ খবরটি যদিও خَبَر وَاحِد কিন্তু নিদর্শন থাকায় এ খবর দ্বারাও তার বিষয়বস্তুর অর্থাৎ যায়েদের আগমণের ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি হবে। এমনিভাবে আহলে ইজমার খবরও নিশ্চিত জ্ঞান সৃষ্টি করে। মোটকথা, খবরে সাদিককে উক্ত দুই প্রকারে সীমাবদ্ধ করা শুদ্ধ নয়।

قَوْلُهُ اَلْمُفِيْدُ لِلْعِلْمِ ঃ এ শর্ত এজন্য আরোপ হয়েছে যে, নিশ্চিত জ্ঞান সৃষ্টি করে এমন خَبَر صَادِق ঐ দুই প্রকারেই সীমাবদ্ধ; সাধারণ خَبَر صَادِق চাই নিশ্চিত জ্ঞান সৃষ্টি করুক বা না করুক দুই প্রকারে সীমাবদ্ধ নয়। যেমন, যায়েদের মৃত্যু হল। কিন্তু তার মৃত্যু সংবাদ তোমাকে এমন একজন ব্যক্তি দিল, যার মিথ্যাবাদীতা প্রসিদ্ধ। তাহলে তার খবরটি সত্য হওয়া সত্ত্বেও তোমার বিশ্বাস হবে না। বুঝা গেল, এমন খবরে সাদিক ও আছে, যা নিশ্চিত জ্ঞান সৃষ্টি করে না। আর যে خَبَر صَادِق নিশ্চিত জ্ঞান সৃষ্টি করে, তা দুই প্রকারেই সীমাবদ্ধ।

قَوْلُهُ اَلْخَبَرُ الْمَقْرُوْنُ ঃ এখানে خَبَر বলে خَبَر وَاحِد বুঝানো হয়েছে। কেননা خَبَر مُتَوَاتِر তো কোন নিদর্শন ছাড়াই নিশ্চিত জ্ঞান সৃষ্টি করে।

قَوْلُهُ: اَهْلُ الْاِجْمَاعِ ঃ উম্মতে মুহাম্মদিয়ার মুজতাহিদগণ শরী'আতের কোন বিধানের ব্যাপারে একমত হওয়াকে ইজমা বলে। কুরআন এবং হাদীসে মুতাওয়াতির দ্বারা প্রমাণিত আছে, যে বিষয়ে মুজতাহিদগণ একমত হবেন তা সত্য।

قَوْلُهُ: كَالْخَبَرِ بِقُدُوْمِ زَيْدٍ ঃ এটা ঐ خَبَر وَاحِد এর উদাহরণ, যা নিদর্শনযুক্ত হওয়ায় নিশ্চিত জ্ঞান সৃষ্টি করে। কেউ কেউ এ উদাহরণকে অশুদ্ধ মনে করে বলেছেন, এ খবরও ইয়াকীন সৃষ্টি করবে না। কেননা হতে পারে কেউ কৌতুক করে যায়েদ আসার ভুয়া সংবাদ প্রচার করে দিয়েছে। আর তাকে দেখতে আগ্রহীরা ঐ খবরের উপর নির্ভর করে ছুটেছে। কেউ কেউ এরূপ নিদর্শনযুক্ত খবরে ওয়াহিদ, যা নিশ্চিত জ্ঞান সৃষ্টি করে তার আরও স্পষ্ট উদাহরণ দিয়েছেন। যেমন, যায়েদ অনেক দিন যাবৎ মুমূর্ষ অবস্থায় শয্যাশায়ি। লোকজন বিষয়টি পূর্ব থেকেই জানে। এমতাবস্থায় তার স্ত্রী-সন্তান ও স্বজনদের কান্নার আওয়াজ শুনে এবং দরজায় মানুষের ভীড় ও দাফন কাফনের সামানপত্র দেখে তুমি কোন একজনকে জিজ্ঞাসা করলে, ভাই কি হয়েছে ? সে বলল, যায়েদ মারা গেছে। তাহলে এ خَبَرِوَاحِد দ্বারা তার বিষয়বস্তু অর্থাৎ যায়েদের মৃত্যুর সংবাদের (উল্লেখিত নিদর্শনাবলী থাকায়) তোমার ইয়াকিন হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য, যে خَبَر وَاحِد এমন নিদর্শনযুক্ত হয়, যা তার সত্যতার প্রমাণ বহন করে। জমহূরের মতে তা নিশ্চয়ত জ্ঞান সৃষ্টি করে না বরং প্রবল ধারণা সৃষ্টি করে। নিযাম মুতাযিলী, ইমামুল হারামাইন হুজ্জাতুল ইসলাম আবু হামেদ গাযালী এর মতে নিশ্চিত জ্ঞান সৃষ্টি করে। শারিহ রহ. এরও একই মত। যা উল্লেখিত প্রশ্নের জবাবে শারিহ রহ. এর উক্তি مَعَ قَطْعِ النَّظْرِ عَنِ الْقَرَائِنِ الْمُفِيْدَةِ لِلْيَقِيْنِ দ্বারা বোধগম্য।

উক্ত সীমাবদ্ধতা বিশুদ্ধ

قَوْلُهُ قُلْنَا اَلْمُرَادُ بِالْخَبَرِ ঃ এটা পূর্বোক্ত প্রশ্নের জবাব। জবাবের সারমর্ম হল, নিশ্চিত জ্ঞান সৃষ্টিকারী خَبَر صَادِق মুতাওয়াতির এবং খবরে রাসূলের মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়া বিশুদ্ধ। আর নিদর্শনযুক্ত খবরে ওয়াহিদ مقسم তথা خَبَر صَادِق এর বাইরে। বাকি থাকল আল্লাহর খবর, ফিরিশতাদের খবরও আহলে ইজমার খবর। এগুলো উল্লেখিত দুই প্রকারের কোন একটির মধ্যে শামিল রয়েছে। কারণ, নিশ্চিত জ্ঞান সৃষ্টিকারী খবরে সাদিক বলতে এমন খবর উদ্দেশ্য, যা নিদর্শনযুক্ত হওয়া ছাড়াই শুধু খবর হওয়ার কারণে জনসাধারণের জন্য নিশ্চিত জ্ঞান সৃষ্টি করে। এমতাবস্থায় খবরে সাদিক মুতাওয়াতির এবং খবরে রাসূল এই দুই প্রকারই হবে। কেননা এ হিসেবে তো খবরে ওয়াহিদ مقسم এর বাইরে। কারণ, তা শুধু খবর হওয়ার কারণে নিশ্চিত জ্ঞান সৃষ্টি করে না বরং তার সত্যতা প্রমাণকারী নিদর্শনাবলী যুক্ত হওয়ায় তা নিশ্চিত জ্ঞান সৃষ্টি করে। আর আল্লাহ তা'আলা এবং ফিরিশতাদের খবরও এ হিসেবে বেরিয়ে যায়। কারণ, তারাসরি জনসাধারণের জন্য নিশ্চিত জ্ঞান সৃষ্টি করে না বরং এগুলো যখন নবীর মাধ্যমে জনসাধারণের নিকট পৌছাবে তখন নিশ্চিত জ্ঞান সৃষ্টি করবে। তখন তো সেগুলো আল্লাহ এবং ফিরিশতার খবর থাকবে না বরং তা রাসূলের খবর হিসেবে গণ্য হয়ে যাবে। বাকি রইল আহলে ইজমার খবর। এটিও পৃথক কোন প্রকার নয় বরং মুতাওয়াতিরের আওতাভুক্ত। কেননা خَبَر مُتَوَاتِر এমন একটি বড় দলের সংবাদ, যাদের মিথ্যার উপর একমত হওয়া অসম্ভব। তেমনিভাবে আহলে ইজমার খবরও এমন লোকেদের খবর,

যাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা যায় না। তবে পার্থক্য এতটুকু যে, خَبَر مُتَوَاتِر এর মধ্যে সংবাদ দাতাদের সত্যতার ইয়াকীন স্বতঃসিদ্ধ। আর আহলে ইজমার খবরে সংবাদ দাতাদের সত্যতার ইয়াকীন দলীলনির্ভর। দলীলটি হল, নবী কারীম ﷺ এর বাণী لَاتَجْتَمِعُ اُمَّتِىْ عَلَى الضَّلَالَةِ তথা আমার উম্মত পথভ্রষ্টতার উপর একমত হবে না।

আহলে ইজমার খবর কি খবরে রাসূল না খবরে মুতাওয়াতির ?

قَوْلُهُ : وَقَدْ يُجَابُ عَنْهُ اَىْ عَنِ النَّقْضِ بِخَبَرِ اَهْلِ الْاِجْمَاعِ ঃ আহলে ইজমার খবর দ্বারা যে প্রশ্ন আরোপিত হয়েছিল, তা হল, এটিও নিশ্চিত জ্ঞান সৃষ্টি করে। কাজেই নিশ্চিত জ্ঞান সৃষ্টিকারী খবরে সাদিককে দুই প্রকারে সীমাবদ্ধ নয়। এর এক উত্তর তো পূর্বে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ এটি পৃথক কোন প্রকার নয় বরং খবরে মুতাওয়াতিরেরই একটি প্রকার। কেউ কেউ এ উত্তরও দিয়েছেন যে, আহলে ইজমার খবর مقسم তথা خَبَر صَادِق থেকে বাইরে। কারণ, مقسم হল এমন خَبَرصَادِق যা নিদর্শনই নয় বরং নিছক দলীলাদির প্রতি লক্ষ্য করা ছাড়াই শুধু খবর হওয়ার কারণে জনসাধারণের জন্য নিশ্চিত জ্ঞানের মাধ্যম। আর আহলে ইজমার খবর সেসব প্রমাণাদির কারণে নিশ্চিত জ্ঞান সৃষ্টি করে, যা তার সত্যতার প্রমাণ বহন করে। যেমন, নবী কারীম ﷺ এর বাণী لَا تَجْتَمِعُ اُمَّتِىْ عَلَى الضَّلَالَةِ–ভুলের উপর আমার উম্মতের ঐকমত্য হবে না।

قَوْلُهُ: وَكَذَالِكَ خَبَرُ رَسُوْلٍ ঃ শারিহ রহ. উল্লেখিত জবাবটিকে প্রত্যাখ্যান করে তিনি বলেন, খবরে রাসূলও তো খবরে রাসূল হিসেবে নিশ্চিত জ্ঞান সৃষ্টি করে না। কারণ, সেটি এমন এক সত্ত্বার সংবাদ যার নবুওয়াত মুজিযা দ্বারা প্রমাণিত। এরই ভিত্তিতে তার দ্বারা অর্জিত জ্ঞানকে اِسْتِدْلَالِى সাব্যস্ত করা হয়েছে। যদি তোমাদের জবাব সহীহটি বলে ধরেও নেওয়া হয় অর্থাৎ তা শুধু খবর হওয়ার কারণে নয় বরং ইজমা দলীল হওয়ার প্রমাণাদির কারণে নিশ্চিত জ্ঞান সৃষ্টি করে। তাহলে তো خَبَر رَسُوْل কেও مقسم থেকে বের করতে হবে। অথচ তা বাইরে নয়। তেমনি আহলে ইজমার খবরও مقسم এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে مُتَوَاتِر এর আওতাভুক্ত হয়ে পড়বে। যেমন, প্রথম উত্তরে বলা হয়েছে।

কিন্তু বাস্তব কথা হল, শারিহ রহ. উত্তরদাতার উদ্দেশ্য বুঝতে পারেননি। উত্তর দাতার উদ্দেশ্য আহলে ইজমার খবরকে مقسم থেকে বের করা নয় বরং مُتَوَاتِر এর পরিবর্তে খবরে রাসূলের আওতাভুক্ত করা অর্থাৎ আহলে ইজমার খবর ঐ দলীলের কারণে নিশ্চিত জ্ঞান সৃষ্টি করে, যা ইজমা দলীল হওয়ার প্রমাণ বহন করে। আর ইজমা দলীল হওয়ার প্রমাণ হল, খবরে রাসূল لَايَجْتَمِعُ اُمَّتِىْ عَلَى الضَّلَالَةِ । এ হিসেবে আহলে ইজমার খবর খবরে রাসূলের অন্তর্ভুক্ত।

وَاَمَّا الْعَقْلُ وَهُوَ قُوَّةٌ لِلنَّفْسِ بِهَا تَسْتَعِدُّ لِلْعُلُوْمِ وَالْاِدْرَاكَاتِ وَهُوَ الْمَعْنٰى بِقَوْلِهِمْ غَرِيْزَةٌ يَتْبَعُهَا الْعِلْمُ بِالضَّرُوْرِيَّاتِ عِنْدَ سَلَامَةِ الْاٰلَاتِ وَقِيْلَ جَوْهَرٌ تُدْرَكُ بِهِ الْغَائِبَاتُ بِالْوَسَائِطِ وَالْمَحْسُوْسَاتُ بِالْمُشَاهَدَةِ ـ

সহজ তরজমা

আকল প্রসঙ্গ ঃ আর আক্বল বা বিবেক এমন একটি মানবিক শক্তি, যার ফলে মানুষ জ্ঞান ও অনুভূতির যোগ্যতা লাভ করে। নিম্নোক্ত বক্তব্য অর্থাৎ আকল এমন একটি স্বভাবজাত শক্তি, যার ফলে অনুধাবনের মাধ্যমগুলি সুস্থ থাকাবস্থায় (কোন কোন) ضَرُوْرِيَّات এর জ্ঞান লাভ হয় –এর উদ্দেশ্য এটাই। আর কেউ কেউ বলেছেন, আকল এমন একটি মূলধাতু যা দ্বারা ইন্দ্রিয় বহির্ভূত বিষয়াদি দলীল-প্রমাণ ও সংজ্ঞার মাধ্যমে এবং ইন্দ্রিয়ানুভূত বিষয়াদি প্রত্যক্ষ দর্শনের মাধ্যমে অনুভূত হয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

আকল বলতে কি বুঝায় ?

قَوْلُهُ وَاَمَّا الْعَقْلُ ঃ দার্শনিকদের পরিভাষায় عَقْل দ্বারা عُقُوْل عَشْرَه কে বুঝানো হয়। যা তাদের বক্তব্যানুসারে جَوْهَرْ مُجَرَّدَه قَدِيْمَه এবং আল্লাহ তা'আলার হুকুমে সৃষ্টি জগতের উপর প্রভাবশীল; শরীরের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। এ ছাড়াও তাদের মতে এরাই হল مَلَائِكَه مُقَرَّبِيْن (নিকটতম ফিরিশতা) আর عَقْل عَاشِر (দশম

আকল) হলেন জিবরাঈল, যিনি উপাদান জগতের নিয়ন্ত্রণ করেন। তবে এখানে عَقْل বলতে উল্লেখিত عَقْل বুঝানো হয়নি বরং عَقْل نَظَرِی বুঝানো হয়েছে। যাকে قُوَّة نَظَرِيَّة এবং قُوَّة عَمَلِيَّه বলে আমরা ছাত্রদের সহজে বোধগম্য করার জন্য একটি উদাহরণ দ্বারা বুঝিয়ে থাকি।

প্রথমেই জেনে রাখতে হবে, কোন জিনিস অন্য কোন জিনিসে প্রতিক্রিয়াশীল হওয়া এবং তাতে কোন প্রকার পরিবর্তন সাধন করাকে تَاَثُّر ও تَغْيِيْر এবং فِعْل বলে। অপর জিনিস কর্তৃক তার প্রতিক্রিয়া গ্রহণ করাকে تَغَيُّر এবং اِنْفِعَال বলে। দ্বিতীয়তঃ জেনে রাখতে হবে, কোন জিনিসের عِلَّت কে مُبْتَدَا বলে। উক্ত ভূমিকার পর এবার উদাহরণ লক্ষ্য কর!

যখন তুমি একটি পাত্রে পানি দিয়ে তা আগুনের উপর রেখে দাও, তখন আগুন তাতে প্রভাব সৃষ্টি করে এবং তার অবস্থার পরিবর্তন করে তার স্বভাবগত শীতলতা দূর করে তাতে উষ্ণতার গুন সৃষ্টি করে। এটাকে আগুনের تَاثِيْر এবং تَغَيُّر এবং اِنْفِعَال বলা হয় । এর বিপরীত যখন আপনি যদি আগুনের উপর পানি রেখে দেন, তখন পানি তাতে প্রভাব সৃষ্টি করে এবং আগনের অবস্থার পরিবর্তন করে তার স্বভাবগত উষ্ণতা দূর করে তাতে শীতলতার গুন সৃষ্টি করে। এটাকে আগুনের تَاثِيْر এবং تَغَيُّر এবং اِنْفِعَال বলা হয় ।

বুঝা গেল, আগুনের মধ্যে প্রভাব ফেলা এবং পরিবর্তন সৃষ্টি করার ক্ষমতা আছে। আবার কখনও অন্যের প্রভাব গ্রহণও করে। ঠিক তেমনি মানুষের মধ্যেও এমন এক শক্তি আছে, যা تَاثِيْر مُبْتَدَا ও تَغَيُّر তথা অন্যের মধ্যে প্রভাব ফেলা ও পরিবর্তন সাধন করার কারণ হয়। আবার কখনও تَاثُر مُبْدَا ও تَغَيُّر তথা অন্যের ক্রিয়া গ্রহণের ক্ষেত্র হয়। উক্ত শক্তি ইলমের গুণে গুণান্বিত হওয়ার জন্য উর্ধ্বজগতের শক্তিসমূহের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অথবা দার্শনিকদের মতানুসারে عَقْل فعال এর পক্ষ থেকে তার উপর জ্ঞানের যে ঝরণা প্রবাহিত হয়, তা গ্রহণ করার দিক থেকে তাকে عَقْل نَظَرِی বা قُوَّة نَظَرِيَّة বলে। আবার উক্ত শক্তিকে শরীরে প্রভাব ও পরিবর্তন সৃষ্টির দিক থেকে عَقْل عَمَلِی বা قُوَّة عَمَلِيَّه বলে। যেমন, কাঠমিস্ত্রী কাঠের মধ্যে প্রভাব এবং পরিবর্তন সৃষ্টি করে। কখনও তারা টেবিল আবার কখনও চেয়ার ইত্যাদি তৈরী করে। কেমন যেন শরীর قُوَّة عَمَلِيَّه এর জন্য مَادَّة বা মূল ধাতু।

অতঃপর عَقْل نَظَرِی এর চারটি স্তর রয়েছে। ঐ চার স্তর হিসেবে তার চারটি নামও রয়েছে। প্রথম স্তর اِسْتِعْدَاد مَحْض বা নিখুঁত যোগ্যতা। এ স্তরে একজন ব্যক্তি কার্যতঃ সর্ব ধরনের জ্ঞান শূন্য হয়। তবে জ্ঞান ধারনের যোগ্যতা থাকে। যেমন, নবজাতকের মধ্যে তা পরিলক্ষিত হয়। এ স্তরের عَقْل نَظَرِی কে عَقْل هَيُوْلَانِی বলে। এ নামে নামকরণের কারণ হল, প্রত্যেক জিনিসের প্রথম هَيُوْلِی ও কার্যতঃ প্রত্যেক আকৃতি শূন্য হয়। তবে আকৃতি গ্রহণের যোগ্যতা থাকে। দ্বিতীয় স্তর হল, কার্যতঃ ضَرُوْرِيَّات এর জ্ঞান থাকবে। আর ضَرُوْرِيَّات এর মাধ্যমে نَظَرِيَّات কে লাভ করার مَلْكَه তথা যোগ্যতা আছে।

তৃতীয় স্তর হল, মনের মনিকোঠায় نَظَرِيَّات এমনভাবে জমা আছে যে, মন চাইলেই কোন নতুন চিন্তা-গবেষণা ব্যতিত শুধু মনোনিবেশের মাধ্যমে তা স্মৃতিতে আনা যায়। عَقْل نَظَرِی এর এ স্তরকে عَقْل بِالْفِعْل বলে। চতুর্থ স্তর হল, نَظَرِيَّات সর্বদা স্মৃতিতে উপস্থিত থাকে; নতুন করে তাকে উপস্থিত করার কোন প্রয়োজন হয় না। قُوَّة نَظَرِيَّه এ স্তরে পৌছালে তাকে عَقْل مُسْتَفَاد বলে।

এ বর্ণনার দ্বারা আপনি অবশ্যই অবগত হয়েছেন যে, উপরিউক্ত চারটি স্তরের চারটি নামই قُوَّة نَظَرِيَّه এর (গবেষণা শক্তি)। কিন্তু قُوَّة نَظَرِيَّه এর সাথে নফ্‌স গুণান্বিত হয়, বিধায় কেউ কেউ নফ্‌সকেই قُوَّة نَظَرِيَّه এর উল্লোখিত নামসমূহ দ্বারা অবিহিত করেছেন। সুতরাং ইমাম রাযী রহ. শরহে মাওয়াকিফ গ্রন্থে عَقْل نَظَرِی এর স্তর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, نَفْس যদি কার্যতঃ সব ধরনের عِلْم শূন্য না হয় বরং ضَرُوْرِيَّات এর عِلْم তার মধ্যে কার্যতঃ থাকে তাহলে তখন তাকে عَقْل بِالْمَلَكَه বলে। আর যদি نَظَرِيَّات এর জ্ঞানও থাকে, তবে উপস্থিত নয় বরং একটু মনোনিবেশ করলে স্মৃতিতে তা উপস্থিত হয়ে যায়, তাহলে তাকে عَقْل بِالْفِعْل বলে। আর যদি نضريات হাযিরও থাকে এবং তা সর্বদা স্মৃতিতে উপস্থিত থাকে কখনও হারিয়ে যায় না। ফলে তা স্মৃতিতে উপস্থিত করার প্রয়োজনই হয় না। তখন তাকে عَقْل مُسْتَفَاد বলে। শাইখ বু আলী ইবনে সীনা তার কিতাব اَلْمَبْدَأ وَالْمَعَاد এর মধ্যে অনুরূপ কথাই বলেছেন অর্থাৎ নফ্‌স عَقْل بِالْمَلَكَه হয়। অতঃপর عَقْل بِالْفِعْل হয়। তারপর عَقْل مُسْتَفَاد হয়।

নযরে আকলীর সংজ্ঞা

قَوْلُهٗ وَهُوَ قُوَّةٌ لِلنَّفْسِ : এটা عَقْل نَظْرِى এর সংজ্ঞা। কেউ তো عَقْل نَظْرِى এর সংজ্ঞা جَوْهَر (মূলধাতু) দ্বারা করেছেন। যা عَرَض এবং এটিই অগ্রগণ্য। মোটকথা বিভিন্নজন বিভিন্ন শব্দ দ্বারা عَقْل نَظْرِى এর সংজ্ঞা দিয়ে থাকলেও সব কটির সারকথা একই। আমি ধারাবাহিকভাবে অভিন্ন হওয়ার কারণ করছি।

(১) যে সংজ্ঞাটি শারিহ রহ. উল্লেখ করেছেন, তার সারমর্ম হল عَقْل نَظْرِى নফ্‌স বা আত্মার ঐ শক্তি, যার ফলে তার মধ্যে نَظْرِى (গবেষণা লব্ধ) জ্ঞান লাভ করা এবং গোপন যোগ্যতাকে কাজে পরিণত করার সামর্থ সৃষ্টি হয়।

(২) এটি শারিহ রহ. তার উক্তি وَهُوَ الْمَعْنٰى بِقَوْلِهِمْ غَرِيْزَةٌ يَتْبَعُهَا الْعِلْمُ بِالضَّرُوْرِيَّاتِ দ্বারা উল্লেখ করেছেন। যা বিখ্যাত চিন্তাবিদ হারছ ইবনে আসাদ মুহাসিবীর বক্তব্য। যিনি হাসান বসরী রহ. এর যুগে জন্মগ্রহণ করেছেন আর ইন্তেকাল করেছেন ২৪৩ হিজরী সনে। তিনি প্রথম সারীর সূফীগণের একজন। সংজ্ঞাটির মূল কথা হল, عَقْل এমন একটি স্বভাবজাত শক্তি, যার ফলে কার্যতঃ কিছু ضَرُوْرِيَّات এর জ্ঞান লাভ হয়। এ সংজ্ঞাটিই আসল। প্রথম সংজ্ঞাটি এর ফলাফল। কারণ, কার্যতঃ যখন ضَرُوْرِيَّات এর জ্ঞান থাকবে তখন অবশ্যই সে সব ضَرُوْرِيَّات দ্বারা نَظْرِيَّات এর জ্ঞান লাভের যোগ্যতা সৃষ্টি হবে। ঐ কারণেই শারিহ রহ. তার উক্তি وَهُوَ الْمَعْنٰى بِقَوْلِهِمْ غَرِيْزَةٌ الخ দ্বারা সংজ্ঞা দুটির সারমর্ম এক বলে সাব্যস্ত করেছেন। সুতরাং আপনি সংজ্ঞা দুটির ইবারত একত্রিত করে একই সংজ্ঞা হিসেবে বলতে পারেন–

هُوَ قُوَّةٌ غَرِيْزَه لِلنَّفْسِ يَتْبَعُهَا الْعِلْم بِالضَّرُوْرِيَّاتِ وَتَسْعِدُ النَّفْسُ بِهَا اَىْ بِتِلْكَ الضَّرُوْرِيَاتِ لِلْعُلُوْمِ الْاِدْرَاكَاتِ

অর্থাৎ عَقْل মানুষের ঐ স্বভাবজাত শক্তিকে বলে, যার দ্বারা কার্যতঃ ضَرُوْرِيَّات এর জ্ঞান লাভ হয় এবং সে সব ضَرُوْرِيَّات দ্বারা মানুষের মধ্যে عُلُوْم نَظْرِيَّة (গবেষণা লব্ধ জ্ঞান) গ্রহণ করার শক্তি সৃষ্টি হয়। তখন স্তর হিসেবে তাকে عَقْل بِالْمَلَكَه বলে। এ কারণে এটা عَقْل بِالْمَلَكَه এর সংজ্ঞা হল।

(৩) কিছু بَدِيْهِيَّات (স্বতঃসিদ্ধ) বিষয়ের জ্ঞানকে عَقْل বলে। উক্ত সংজ্ঞাটিও দ্বিতীয় সংজ্ঞার শাখা। কেননা بَدِيْهِيَّات (স্বতঃসিদ্ধ) এর জ্ঞান ঐ স্বভাবজাত শক্তির ফলে অর্জিত হয়, যাকে দ্বিতীয় সংজ্ঞায় عَقْل বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

(৪) দৈনন্দিন অবস্থা ও অভিজ্ঞতা দ্বারা অর্জিত জ্ঞানকে عَقْل বলে। কেননা অভিজ্ঞতা সম্পন্ন লোককেই জ্ঞানী বলা হয়। আর অনভিজ্ঞকে নির্বোধ এবং মুর্খ বলে। এ অর্থে عَقْل কে عَقْل مَعَاشِى -ও বলা হয়, যা বার্ধক্যে গিয়ে পূর্ণতা লাভ করে। উক্ত সংজ্ঞাটি দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংজ্ঞার শাখা। কেননা দ্বিতীয় সংজ্ঞায় বর্ণিত عَقْل তথা স্বভাবজাত শক্তির ফলেই তৃতীয় সংজ্ঞায় বর্ণিত عَقْل তথা بَدِيْهِيَّات (স্বতঃসিদ্ধ বিষয়াবলী) এর জ্ঞান লাভ হয়। আর بَدِيْهِيَّات এর জ্ঞান দ্বারাই অভিজ্ঞতা লাভ হয়।

(৫) عَقْل বলে স্বভাবজাতশক্তি এমন শক্তিশালী হওয়া যে, সব বিষয়ের পরিণামের প্রতি তার লক্ষ্য থাকে এবং দুনিয়াবী ভোগ বিলাসের চাহিদাকে দমন করতে পারে।

এ সংজ্ঞাটিও দ্বিতীয় সংজ্ঞার ফলাফল এবং উপকারীতা। আর কোন বস্তুকে তার ফলাফল দ্বারা পরিচয় দেওয়ার ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। যেমন, বলা হয়, আল্লাহর ভয়কেই জ্ঞান বলে। অথচ আল্লাহর ভয়ই জ্ঞান নয় বরং তার ফলাফল। মোটকথা, দ্বিতীয় সংজ্ঞাটিই প্রকৃত সংজ্ঞা। আর বাকিগুলো তারই ফলাফল। বলা বাহুল্য যে, উপরোল্লিখিত সংজ্ঞাসমূহের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংজ্ঞায় عَقْل কে فِطْرِى জন্মগত ও طَبْعِى (স্বভাবগত) বলা হয়েছে। কারণ, দ্বিতীয় সংজ্ঞায় তো স্বভাবজাত শক্তিকেই عَقْل বলা হয়েছে। আর প্রথমটি তো দ্বিতীয় সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। যেমন, আমি উভয় সংজ্ঞার শব্দ একত্রিত করে উভয়টিকে একই সংজ্ঞা সাব্যস্ত করেছি। তৃতীয় সংজ্ঞায় بَدْهِيَّات এর জ্ঞানকে عَقْل বলা হয়েছে। আর بَدْهِيَّات এর জ্ঞান তো فِطْرِى (জন্মগত) হয়ে থাকে। শেষোক্ত দুই প্রকার হল كَسْبِى যাকে শ্রুতও বলে। কাজেই হযরত আলী রাযি. ইরশাদ করেছেন,

رَاَيْتُ الْعَقْلَ عَقْلَيْنِ ۔ فَمَطْبُوْعٌ وَمَسْمُوْعٌ

وَلَا يَنْفَعُ مَسْمُوْعٌ ۔ اِذَا لَمْ يَكُنْ مَطْبُوْعٌ

كَمَا لَاتَنْفَعُ الشَّمْسُ ۔ وَضَوْءُ الْعَيْنِ مَمْنُوْعٌ

"আমার মতে عَقَل দু'প্রকার। এক. ফিত্‌রী। দুই. কাস্‌বী। যাবৎ না ফিত্‌রী আকল হবে ততক্ষণ কাসবী আকল কোন উপকারে আসবে না। যেমন চোখের জ্যোতি ব্যতিত সূর্যের আলো কোন কাজে আসে না।"

কুওয়াত ও যু'উফ কি ?

قَوْلُهُ قُوَّةٌ ঃ قُوَّةٌ বলতে কখনও প্রাণীদের ঐ গুণ বুঝানো হয়, যার ফলে তারা কষ্টকর কাজকর্ম সম্পাদন করে থাকে। আর তার বিপরীত গুণকে অর্থাৎ যার কারণে কষ্টকর কাজ সম্পাদন করতে অক্ষম হয়, তাকে ضُعف (দুর্বলতা) বলে। আবার কখনও قُوَّةٌ বলতে مبدأ فعل ও افعال (যা দ্বারা সে অন্যের প্রভাব গ্রহণ করে) এবং مَبْدَأُ تَغَيُّرٍ وَتَغَيُّرٍ (যা দ্বারা সে অন্যের মধ্যে প্রভাব সৃষ্টি করে) এখানে قُوَّةٌ বলতে এ অর্থই বুঝানো হয়েছে।

নফ্‌স দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে ?

قَوْلُهُ لِلنَّفْسِ ঃ দার্শনিকদের মতে দেহতীত একটি মূলবস্তুকে نَفْس বলে, যা শরীর হতে পৃথক এবং বাইরে। এ কারণে তাকে جَوْهَر مُفَارِق ও বলা হয়। তবে সে দেহের বাইরে থেকেও তা দেহের মধ্যে প্রক্রিয়াশীল। যেমন, তোমার মুখের দিকে কেউ ধূলা নিক্ষেপ করলে তৎক্ষণাৎ চোখ বন্ধ হয়ে যায়তখন আত্মরক্ষার এ ব্যবস্থাপনাটি নফ্‌স ই করে থাকে। তেমনি কেউ যদি কোন সুন্দর একটি শিশুর দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকায়, তাতে বাচ্চা দুধপান ছেড়ে দেয়। বিরামহীনভাবে কাঁদতে থাকে। এটাও দর্শকের নফ্‌সের কাজ। যাকে চোখলাগা বলে।
আর কালাম শাস্ত্রবিদদের কেউ কেউ نَفْس বলতে মানুষের ঐ বৈশিষ্ট্য উদ্দেশ্য নেন, যা ক্রোধ এবং প্রবৃত্তির সমন্বয়কারী। তাসাওউফপন্থীদের নিকট এটিই বহুল ব্যবচহৃত। কেননা তারা নিন্দনীয় গুণাবলীর সমন্বয়কারী শক্তিকেই نَفْس বলেন। এ কারণেই তারা نَفْس এর বিরুদ্ধে জিহাদ করতে উৎসাহিত করেন।

হাদীস শরীফে আছে, أَعْدَى عَدُوِّكَ نَفْسُكَ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْكَ –এ হাদীসে نَفْس বলতে এ অর্থই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তোমার নফ্‌সই তোমার প্রধান শত্রু। অধিকাংশ আহলে শরার পছন্দনীয় এবং মুতাআখ্‌খীরীনে আশায়ারিয়াদের নিকট নির্ভরযোগ্য মত হল, نَفْس এমন একটি সূক্ষ্ম দেহাতীত আত্মিক বস্তু, যা مُدْرِك (অনুধাবনকারী) عَالِم (প্রজ্ঞাসম্পন্ন) শরী'আতের বিধানাবলী এবং শাস্তি ও প্রতিদানের দায়িত্ব প্রাপ্ত। আমি ও তুমি এর বাস্তবরূপ। তা-ই প্রকৃত মানুষ। কিতাবে نَفْس বলতে তাই বুঝানো হয়েছে। এ কারণে আমি তার অর্থ করেছি 'মানুষ'। বস্তুগত এ দেহ তার বাহন এবং আরোহন। এটা কোন প্রকৃত মানুষ নয়। কথাটি একটি উদাহরণের মাধ্যমে বুঝে নাও। যেমন, রাশেদ নামক এক ব্যক্তির মৃত্যু হল। এখনও তার লাশ দাফন করা হয়নি বরং ঘরেই আছে। তবুও বলা হয়, রাশেদের ইন্তেকাল হয়েছে। সে দুনিয়া ত্যাগ করে চলে গেছে। সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু আল্লাহ সাথে মিলিত হয়েছে ইত্যাদি। অথচ তার দেহটি ঘরেই আছে। তার ইন্তেকাল হয়নি এবং দেহ মূলতঃ রাশেদ নয় বরং ঐ দেহের অন্তরে লুকায়িত অন্য কোন জিনিস ছিল। যাকে রাশেদ বলে ডাকা হত।

অতঃপর উক্ত نَفْس যা প্রকৃত মানুষ, তা বিভিন্ন সময় ও বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত হয়। যদি সে আল্লাহর আদেশাবলির অধীন সুশান্ত থাকে, প্রবৃত্তির সাথে অবিরাম লড়াই করে তার অস্থিরতা দূর করে এবং আল্লাহর আদেশ পালনে কোন প্রকার কষ্ট, অস্থিরতা ও সংকট সৃষ্টি না হয়, তাহলে তাকে نَفْسٌ مُطْمَئِنَّةٌ বলে, যার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي -

আর যদি সে আল্লাহর আদেশের অধীনে নীরব না থাকে বরং আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধে কুপ্রবৃত্তি বিদ্যমান থাকায় কিছুটা অস্থির এবং সংকোচবোধ করে। কিন্তু نَفْس সেই কুপ্রবৃত্তিকে দমন করতে থাকে এবং তার সাথে লড়াই করতে থাকে। যেমন, নামাযের সময় কুপ্রবৃত্তি শুয়ে থাকতে চায় এবং নামায পড়তে চায় না। কিন্তু نَفْس ঐ প্রবৃত্তির সাথে লড়াই করে বলে, এটা সঠিক নয় বরং ভুল। এ পর্যায়ে نَفْس কে لَوَّامَة বলে। এটিও প্রশংসনীয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা তার মহান কালামে পাকে এর শপথ করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন, لَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ। (এখানে لَا অতিরিক্ত) এ কথা স্পষ্ট যে, শপথ সাধারণতঃ প্রশংসনীয় ও সম্মানিত জিনিসেরই করা হয়। আর যদি আল্লাহ তা'আলার আদেশের অধীনে প্রশান্ত না থাকে এবং আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের বিরুদ্ধে ভাবে ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করে চলে, তাহলে এ পর্যায়ে نَفْس কে أَمَّارَه বলে। এটি নিন্দনীয়। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন – إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ.

উলূম ও ইদ্‌রাকাতের মর্মার্থ

قَوْلُهٗ لِلْعُلُوْمِ وَالْاِدْرَاكَاتِ ঃ عُلُوْم ও اِدْرَكَات উভয়টি দ্বারা যদি تَصَوُّرَات এবং تَصْدِيْقَات উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তখন اِدْرَكَات কে عِلْم এর উপর عَطْف করা হবে, একটি মুরাদিফকে অপর মুরাদিফ (সমার্থবোধক) এর উপর عَطْف করার নামান্তর। আর যদি عُلُوْم দ্বারা শুধু تَصْدِيْقَات উদ্দেশ্য হয়, তবে اِدْرَاكَات দ্বারা শুধু تَصَوُّرَات উদ্দেশ্য হবে। মোটকথা, تَصَوُّرَات এবং تَصْدِيْقَات দ্বারা نَظْرِىْ (গবেষণা লব্ধ) تَصَوُّرَات এবং تَصْدِيْقَات উদ্দেশ্য। আর সংজ্ঞার সারমর্ম দাঁড়াবে, عَقْل ঐ শক্তিকে বলে, যার ফলে নফ্‌স نَظْرِىْ تَصَوُّرَات এবং تَصْدِيْقَات কে অর্জনের যোগ্যতা লাভ করে। عَقْل এর স্তর হিসেবে এটি عَقْل بِالْمَلَكَه এর স্তরে। আবার কেউ কেউ عُلُوْم এবং اِدْرَكَات কে بَدِيْهِىْ এবং نَظْرِىْ হিসেবে আম (ব্যাপক) সাব্যস্ত করেছেন। এমতাবস্থায় সংজ্ঞার সারাংশ হবে, عَقْل ঐ শক্তিকে বলে, যার ফলে নফ্‌স عُلُوْم نَظْرِيَّة এবং ضَرُوْرِيَّة এর জ্ঞান লাভে সক্ষম হয়। অর্থাৎ কার্যতঃ সে ضَرُوْرِيَّات এবং نَظْرِيَّات থেকে শূন্য, তবে তাতে উভয়টি গ্রহণের যোগ্যতা বিদ্যমান রয়েছে।

عَقْل এর স্তর বর্ণনায় তুমি নিশ্চয় জেনেছে যে, اِسْتِعْدَاد مَحْض (শুধু যোগ্যতা) এর পর্যায়ে عَقْل কে عَقْل هَيُوْلَانِىْ বলে। কাজেই এ ক্ষেত্রে উক্ত সংজ্ঞাটি عَقْل هَيُوْلَانِىْ এর সংজ্ঞা হবে। অতঃপর শারিহ রহ. কর্তৃক তৃতীয় বক্তব্য وَهُوَ الْمَعْنٰى بِقَوْلِهِمْ غَرِيْزَةٌ الخ দ্বারা উভয় সংজ্ঞার সারমর্মকে এক সাব্যস্ত করা শুদ্ধ হবে না। কারণ, দ্বিতীয় সংজ্ঞায় কার্যতঃ কিছু কিছু ضَرُوْرِيَّات এর জ্ঞান লাভের কথা বলা হয়েছে। এ স্তরের عَقْل কে عَقْل بِالْمَلَكَه বলে। এ কারণে আমার মতে সর্বোত্তম হল, عُلُوْم এবং اِدْرَكَات দ্বারা শুধু نَظْرِيَّات উদ্দেশ্য হবে। যাতে পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা অনুসারে উভয় সংজ্ঞার সারমর্ম এক সাব্যস্ত হয়। তাছাড়া শরী'আতের বিধানাবলীর দায়িত্ব عَقْل بِالْمَلَكَه এর উপর প্রবর্তিত হয়।

قَوْلُهٗ وَهُوَ الْمَعْنٰى ঃ অর্থাৎ উভয় সংজ্ঞার সারমর্ম একই। اَلْمَعْنٰى শব্দটি عَنٰى يَعْنٰى عِنَايَةٌ অর্থ– ইচ্ছা করা থেকে চয়িত। اِسْم مَفْعُوْل এর অর্থে।

এখানে জরুরিয়্যাত দ্বারা উদ্দেশ্য ?

قَوْلُهٗ اَلْعَالِمُ بِالضَّرُوْرِيَّاتِ ঃ ضَرُوْرِيَّات দ্বারা কিছু ضَرُوْرِيَّات কে বুঝানো হয়েছে। যেমন, وَاجِب (আবশ্যক) এর ওয়াজিব হওয়া এবং مُمْكِنَه (সম্ভব্য) এর مُمْكِنَه হওয়ার জ্ঞান। কেননা অনেক সময় মানুষ অনেক ضَرُوْرِيَّات এর জ্ঞান শূন্য হয় তথাপি তাকে জ্ঞানী বলে। বুঝা গেল, কার্যতঃ সকল ضَرُوْرِيَّات এর জ্ঞান থাকা জরুরী নয়।

قَوْلُهٗ: عِنْدَ سَلَامَةِ الْاٰلَاتِ ঃ অনুধাবনের উপকরণ তথা পঞ্চইন্দ্রিয় নিরাপদ ও সুস্থ থাকা একান্ত জরুরী। কারণ, আকল যতই থাকুক না কেন, ইন্দ্রিয় সুস্থ ও সবল না থাকেল জ্ঞান লাভ হয় না। যেমন, একজন জ্ঞানী মানুষ ঘুমন্ত অবস্থায় তার ইন্দ্রিয়গুলো কার্যকর না থাকায় সে তখন জ্ঞানহীন।

কারও কারও মতে আকল

قَوْلُهٗ وَقِيْلَ جَوْهَرٌ ঃ অর্থাৎ عَقْل এমন একটি মৌলিক জিনিস, যার ফলে দলীল-প্রমাণ ও সংজ্ঞার মাধ্যমে নয্‌রিয়্যাত আর ইন্দ্রিয়ানুভূত হওয়ার যোগ্য বিষয়াদি প্রত্যক্ষ দর্শনের মাধ্যমে অনুধাবন করা যায়। উক্ত সংজ্ঞায় غَائِبَات বলতে নয্‌রিয়্যাতকে বুঝানো হয়েছে। চাই তা تَصَوُّرَات হোক বা تَصْدِيْقَات হোক। যেহেতু নয্‌রী তাসাব্বুরকে যেসব বদীহী তাসুব্বুরাতের মাধ্যমে অর্জন করা হয়, সেগুলোর সমষ্টিকে তা'রীফ বা সংজ্ঞা আর নযরী তাসদীককে যেসব বদীহী তাসদীকাতের মাধ্যমে অর্জিত হয়, সেগুলোর সমষ্টিকে دَلِيْل বলে। এ কারণে وَسَائِط শব্দ দ্বারা দলীল এবং تَعْرِيْف উদ্দেশ্য হবে।

আশায়েরাগণ সাধারণতঃ লিখেন, উক্ত সংজ্ঞানুসারে আকল হুবহু নফসে নাতিকা বা মানবআত্মাকেই বলে। কিন্তু এখানে জটিলতা হল, সংজ্ঞায় চয়িত يُدْرَكُ بِهٖ শব্দ দ্বারা عَقْل অনুধাবনের মাধ্যম সাব্যস্ত হয়। নফসে নাতিকা তো অনুধাবনের মাধ্যম নয় বরং অনুধাবনকারী। কাজেই সংজ্ঞা দুটি কিভাবে এক হবে? হ্যাঁ كَفٰى بِاللّٰهِ এর মত এখানেও يُدْرَكُ بِهٖ এর ب কে زَائِدَه ধরে يُدْرَكُ কে معرف এর সীগারূপে পড়া হলে এটি নফসে নাতিকার সংজ্ঞা হবে।

قَوْلُهٗ جَوْهَرٌ ঃ আকলের সংজ্ঞায় قُوَّة শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে, যা عَرَض। এ কারণে প্রথম সংজ্ঞানুসারে عَقْل হল আরয আর উক্ত সংজ্ঞানুপাতে عَقْل হল جَوْهَر বা মৌলিক বস্তু।

فَهُوَ سَبَبٌ لِلْعِلْمِ صَرَّحَ بِذٰلِكَ لِمَا فِيْهِ مِنْ خِلَافِ السُّمْنِيَّةِ وَالْمَلَاحِدَةِ فِىْ جَمِيْعِ النَّظَرِيَّاتِ وَبَعْضِ الْفَلَاسِفَةِ فِى الْاِلٰهِيَّاتِ بِنَاءً عَلٰى كَثْرَةِ الْاِخْتِلَافِ وَتَنَاقُضِ الْآرَاءِ وَالْجَوَابُ اَنَّ ذٰلِكَ لِفَسَادِ النَّظَرِ فَلَا يُنَافِىْ كَوْنُ النَّظَرِ الصَّحِيْحِ مِنَ الْعَقْلِ مُفِيْدًا لِلْعِلْمِ عَلٰى اَنَّ مَا ذَكَرْتُمْ اِسْتِدْلَالٌ بِنَظَرِ الْعَقْلِ فَفِيْهِ اِثْبَاتُ مَانَفَيْتُمْ فَيَتَنَاقَضُ فَاِنْ زَعَمُوْا اَنَّهُ مُعَارَضَةٌ لِلْفَاسِدِ قُلْنَا اِمَّا اَنْ يُفِيْدَ شَيْئًا فَلَا يَكُوْنُ فَاسِدًا اَوْ لَايُفِيْدُ فَلَا يَكُوْنُ مُعَارَضَةً ـ

সহজ তরজমা

স্পষ্টভাবে আকলের কথা বললেন কেন ?

সুতরাং আকলও জ্ঞানের একটি মাধ্যম। মুসান্নিফ রহ. বিষয়টি স্পষ্টভাবে এজন্য বলেছেন যে, সুমানিয়্যা ও মুলহিদ ফিরকাগুলো সকল নযরিয়্যাতের ব্যাপারে আর দার্শনিকগণ ইলাহিয়্যাত তথা আল্লাহ তা'আলার সত্ত্বা ও গুণাবলী সংক্রান্ত বিষয়গুলোতে প্রচুর মতানৈক্য ও পারস্পরিক মতবিরোধ এর কারণে দ্বিমত পোষণ করে। এর জবাব হল, অধিক মতানৈক্য ও পারস্পারিক বিরোধ সৃষ্টি হয় নযর ফাসিদ বা ভুল হওয়ার কারণে। কাজেই এতে বিশুদ্ধ নযর জ্ঞানার্জনের মাধ্যম হওয়ার পরিপন্থী নয়। তাছাড়া তোমাদের (ইলাহিয়াতে বেশী মতবিরোধ হয় বিধায় নযর জ্ঞানের মাধ্যমে নয়) উক্তিটি ও তো নয্‌রে আকলের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। ফলে এতে তোমাদের প্রত্যাখ্যাত বিষয় প্রমাণিত করা হল। সুতরাং যদি তারা মনে করে, তা (ইলাহিয়্যাতে অধিক বিরোধ থাকায় নয্‌রে আকল ইলমের ফায়দা দেয় না– এটা ইসতিদলাল নয় বরং) আপনাদের ফাসিদ উক্তি (বিশুদ্ধ নয্‌র ইলমের ফায়দা দেয়) এর মুকাবিলা করা হল, আমাদের ফাসিদ উক্তি দ্বারা। তাহলে আমরা বলব, নয্‌রে ফাসিদ দ্বারা আপনাদের মুকাবিলা করায় কোন উদ্দেশ্য সফল হবে কি? যদি হয় তাহলে আর ফাসিদ হবে না। আর না হলে তো মুকাবিলাই হবে না। অতএব তখন আমাদের উক্তি "নয্‌রে আকল দ্বারা জ্ঞান লাভ হয়" মুকাবিলা হতে নিরাপদ থেকে গেল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ صَرَّحَ بِهٖ ঃ এটি মূলতঃ একটি প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্নটি হল, মুসান্নিফ রহ. প্রথমেই তার উক্তি وَاَسْبَابُ الْعِلْمِ ثَلَاثَةٌ اَلْحَوَاسُّ السَّلِيْمَةُ وَالْخَبَرُ الصَّادِقُ وَالْعَقْلُ এর মধ্যে পঞ্চইন্দ্রিয়, খবরে সাদিক এবং عَقْل কে علم এর মাধ্যম হওয়ার কথা স্পষ্টভাবে বলেননি। কিন্তু عَقْل এর বিবরণের ক্ষেত্রে এসে عَقْل ইলমের سَبَب হওয়ার কথা سَبَب শব্দ দ্বারা পুনরায় ব্যক্ত করেছেন কেন?

জবাবের সারমর্ম হল, আকল জ্ঞান লাভের মাধ্যমে হওয়ার বিষয়টি জ্ঞানীদের মাঝে বিরোধপূর্ণ হওয়ায় দৃঢ়ভাবে বলার প্রয়োজন ছিল। এ কারণে মুসান্নিফ রহ. কথাটি পুনরায় পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন। পঞ্চইন্দ্রিয় জ্ঞানের মাধ্যমে হওয়ার ব্যাপারে যদিও কারও কারও দ্বিমত রয়েছে, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান লাভের মাধ্যম হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করা একটি بَدِيْهِى (স্বতঃসিদ্ধ) বিষয়কে অস্বীকার করার নামান্তর, যা গ্রহণযোগ্য নয়। এ কারণে সেখানে تَاكِيْد এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব হয়নি।

সুমানিয়া মুলহিদ প্রমূখের বিভ্রান্তি

قَوْلُهٗ مِنْهُ مِنْ خِلَافٍ ঃ অর্থাৎ সুমানিয়্যাহ এবং মুলহিদরা সকল نَظَرِيَّات এর ক্ষেত্রে عَقْل এবং نَظَر (চিন্তা-গবেষণা) জ্ঞানের মাধ্যমে হওয়াকে অস্বীকার করে। আর দার্শনিকদের কেউ কেউ ইলাহিয়্যাত তথা আল্লাহ তা'আলার সত্ত্বা ও তার গুণাবলী সংক্রান্ত বিষয়াবলীতে عَقْل এবং نَظَر জ্ঞানের মাধ্যম হওয়াকে অস্বীকার করে। কারণ, ইলাহিয়্যাত মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির বহু উর্ধে। এ ক্ষেত্রে عَقْل ও نَظَر দ্বারা বড়জোর ظَنّ তথা প্রবল ধারণা হতে পারে; ইলমে ইয়াকিন হাসিল হতে পারে না। সুমানিয়্যারা نَظَرِيَّات এর ক্ষেত্রে عَقْل ও نَظَر জ্ঞানের মাধ্যম না হওয়ার স্বপক্ষে দলীল দিয়ে বলে, চিন্তা-গবেষণার পর অর্জিত বিশ্বাসের সত্যতার জ্ঞান যদি জরুরী এবং বদীহী (স্বতঃসিদ্ধ) হয়, তাহলে তো তাতে কোন প্রকার ভুল না হওয়ার কথা। অথচ প্রচুর ভুল-ভ্রান্তি দেখা দেয়। ফলে আমরা দেখি, মতামত পরিবর্তন হতেই থাকে। কোন বিষয়ে একজন, আপন চিন্তা-গবেষণার ফলে এক রকম

অভিমত প্রকাশ করে। অতঃপর তার ভ্রান্ততা প্রকাশ পায় এবং সে দ্বিতীয় মতামত গ্রহণ করে। আর যদি চিন্তা-ভাবনার ফলে অর্জিত বিশ্বাসের সত্যতার জ্ঞান نَظَرِى হয়, তাহলে সেটি দ্বিতীয় نَظَر এর মুখাপেক্ষী হয় বিধায় তাতে دَوْر এবং تَسَلْسُل কে আবশ্যক হয়।

আমরা তাদেরকে উত্তরে বলব, فِكْر ও نَظَر এর পর অর্জিত বিশ্বাসে ভুল হওয়া যখন প্রমাণিত হল, তখন তো এটাও প্রমাণিত হয়, যে نَظَر দ্বারা এ বিশ্বাস সৃষ্টি হয়ে ছিল, তা ফাসিদ ও ভুল ছিল। তাহলে এতে তো ফাসিদ ও ভুল نَظَر জ্ঞানের মাধ্যমে না হওয়া প্রমাণিত হল; সঠিক نَظَر জ্ঞানের মাধ্যম হওয়ার কথাটি নয়। আমরা তো সঠিক نَظَر জ্ঞানের মাধ্যম হওয়ার কথা বলেছি। আর মুলহিদরা দলীল দেয়– আমরা দেখতে পাই যে, জ্ঞানীরা আকাইদপর্বে বড় ধরনের বিরোধে লিপ্ত। যদি عَقْل জ্ঞানের মাধ্যম হত, তাহলে তো আর বিরোধ থাকত না।

এর জাবাব হল ঃ বিরোধ সৃষ্টি হয় মূলতঃ نَظَر ফাসিদ হওয়ার কারণে, যা সহীহ نَظَر জ্ঞানের মাধ্যমে হওয়ার পরিপন্থী নয়।

মূলহিদ করা ?

قَوْلُهٗ وَالْمَلَاحِدَةُ ঃ এখানে مُلَاحِدَه বলতে ফিরকায়ে বাতেনিয়া উদ্দেশ্য। দর্শনের প্রভাবে এ বাতেনী ফিৎনার উৎপত্তি হয়েছে। এরা ইসলামের ব্যাপারে দার্শনিকদের চেয়েও বেশী ভয়ানক ছিল। এ দলটি বড় তোড়জোরে এ মতবাদ প্রচার করেছে যে, কুরআন ও হাদীসের কিছু যাহের রয়েছে। আর কিছু হল حَقِيْقَت বা নিগূঢ় তত্ত্ব। সে হাকীকতের সাথে যাহেরের সম্পর্ক তেমনি যেমন হাড্ডির সাথে মগজের, চামড়া এবং ছালের। মুর্খরা শুধু যাহেরই বুঝে। তাদের হাতে কেবল চামড়াই চামড়া। জ্ঞানীরা حَقِيْقَت জানে। তাদের হাতে রয়েছে মগজ। তারা জানেন, এসব শব্দবলী মূলতঃ حَقِيْقَت এর ইশারা-ইংগিত; জনসাধারণ যা বুঝে, সেগুলোর উদ্দেশ্য সেটা নয় বরং সেগুলোর উদ্দেশ্যে অন্য কিছু। যা কেবল রহস্যবীদগণই জানেন। ফলে তারা নবুওয়াত, ফিরিশতা, ওহী এবং শরী'আতের অন্যান্য পরিভাষার মনগড়া ব্যাখ্যা দিতে শুরু করেছে। যার কিছু দুর্লভ নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হল।

নবী ঐ সত্ত্বাকে বলে, যার উপর قُوَّة قُدْسِيَّة তথা পবিত্র শক্তির অজস্র দান রয়েছে। জিবরাঈল কোন সত্ত্বার নাম নয়; শুধু অনুগ্রহ বা দানের নাম। مَعَاد বলতে প্রত্যেক জিনিস তার হাকীকতের দিকে প্রত্যাবর্তন করা বুঝানো হয়েছে। জানাবত দ্বারা গোপন রহস্য ফাঁস করা উদ্দেশ্য। গোসল বলতে চুক্তি নবায়ণ করা উদ্দেশ্য। যিনা দ্বারা ইলমে বাতেনের বীর্যকে এমন সত্ত্বার দিকে স্থানান্তর করা, যারা চুক্তিতে শরীক ছিল না। তাহারাত বলতে বাতেনী মাযহাব ব্যতিত অন্যান্য মাযহাব হতে মুক্ত হওয়া। সালাত বলতে যুগের ইমামের প্রতি আহ্বান করা। যাকাত বলতে গোপন রহস্য প্রকাশ করা থেকে বেঁচে থাকা। হজ্ব বলতে এমন জ্ঞান অন্বেষণ করাকে বুঝায়, যা عَقْل এর কিবলা এবং গন্তব্য স্থল। জান্নাত হল বাতেনী ইলম। আর জাহান্নাম হল যাহেরী ইলম। কাবা হল স্বয়ং নবী। কাবার দরজা বলতে হযরত আলী রাযি. উদ্দেশ্য। কুরআন শরীফে নূহ (আ.)-এর তুফান বলতে জ্ঞানের তুফান উদ্দেশ্য। আর নমরুদের আগুন বলতে নমরুদের গোস্বা উদ্দেশ্য; বাস্তব আগুন নয় ইত্যাদি। (তথ্যঃ তারীখে দাওয়াত ও আযীমত–, ১)

قَوْلُهٗ بِنَاءً عَلٰى كَثْرَةِ الْخِلَافِ ঃ অর্থাৎ সুমানিয়া, মুলহিদ এবং দার্শনিকদের কেউ কেউ عَقْل কে জ্ঞানের মাধ্যম বলে স্বীকার করে না। কারণ, অধিক মতবিরোধ। আর এ দলীলটি قِيَاس اِسْتِثْنَائِى হবে এবং বলা হবে,

لَوْكَانَ الْعَقْلُ سَبَبًا لِلْعِلْمِ فِى النَّظَرِيَّاتِ لَمْ يَقَعْ فِيْهَا اِخْتِلَافُ الْعُقَلَاءِ لٰكِنَّ اِخْتِلَافَ الْعُقَلَاءِ فِيْهَا كَثِيْرٌ. فَعُلِمَ اَنَّ الْعَقْلَ لَيْسَ سَبَبًا لِلْعِلْمِ.

অর্থাৎ عَقْل যদি نَظَرِيَّات এর মধ্যে জ্ঞানের মাধ্যম হত, তাহলে তাতে জ্ঞানীদের মাঝে মতবিরোধ দেখা দিত না। কিন্তু এতে জ্ঞানীদের প্রচুর বিরোধ রয়েছে। বুঝা গেল, عَقْل জ্ঞানের মাধ্যম নয়।

মুলহিদ ও সুমানিয়ার জবাব

قَوْلُهٗ : اَلْجَوَابُ اَنَّ ذٰلِكَ ঃ সুমানিয়া ও মুলহিদদের প্রশ্নের উত্তর হল, عَقْل জ্ঞানের মাধ্যম বলতে আমাদের উদ্দেশ্য হল عَقْل এর সঠিক নযর-ফিকির ও চিন্তা-ভাবনা জ্ঞানের মাধ্যম। আর نَظَرِيَّات এর সর্বপ্রকার বিরোধ তো আহলে নযর (চিন্তাবিদদের) এর نَظَر সঠিক না হওয়ার কারণে সৃষ্টি হয়। কাজেই সঠিক নযর জ্ঞানের মাধ্যম হওয়াতে অন্তরায় নেই।

قَوْلُهُ عَلٰى اَنَّ مَاذَكَرْتُمْ ঃ এটা সুমানিয়া ও মুলহিদদের দলীলের আক্রমণাত্মক জবাব। সারমর্ম হল, তোমরা তো বলেছ, نَظْرِيَّات এর মধ্যে অধিক বিরোধ থাকাই তা জ্ঞানের মাধ্যমে না হওয়ার দলীল। এখানেও তো نَظَر দ্বারাই দলীল দেওয়া হল। কেননা তোমরা যখন নিম্নোক্ত মুকাদ্দমাগুলি সাজিয়ে বলেছ,

لَوْكَانَ نَظْرُ الْعَقْلِ سَبَبًا لِلْعِلْمِ فِى النَّظْرِيَّاتِ لِمَا وَقَعَ فِيْهَا اِخْتِلَافُ الْعُقَلَاءِ. لٰكِنَّ اِخْتِلَافَ الْعُقَلَاءِ فِيْهَا كَثِيْرٌ.

অর্থাৎ নযরে আকল যদি نَظْرِيَات এর মধ্যে জ্ঞানের মাধ্যম হত, তাহলে তাতে জ্ঞানীদের বিরোধ সৃষ্টি হত না। অথচ এক্ষেত্রে জ্ঞানী-গুণিদের প্রচুর বিরোধ রয়েছে। উক্ত মুকাদ্দমাগুলো বিন্যাস করেও نَظَر এর মাধ্যম নয় আর মুকাদ্দমা সাজানোই হল নযর, তাহলে কেমন যেন একটি نَظَر এর মাধ্যমেই জানা গেল, نَظَر জ্ঞানের মাধ্যম নয়। আর যে জিনিস দ্বারা কোন না কোন জিনিসের জ্ঞান লাভ হয়, তা জ্ঞানের মাধ্যম। বুঝা গেল, নযরও জ্ঞানের মাধ্যম। فِيْهِ اِثْبَاتُ مَانَفَيْتُمْ সুতরাং তোমরা যা অস্বীকার করেছিলে, তোমাদের দলীল দ্বারা তা প্রমাণিত হয়ে গেল। কাজেই তোমাদের দাবী ও দলীলের মাঝে বৈপরিত্য সৃষ্টি হল এবং তোমরা নিজেররাই শিকারীর ফাঁদে আটকে গেলে।

قَوْلُهُ فَاِنْ زَعَمُوْا ঃ অর্থাৎ যদি সুমানিয়া ও মুলহিদরা বলে, আমরা যা বলেছি এটা اِسْتِدْلَال নয় বরং জমহুরের ফাসিদ উক্তি اَلنَّظْرُ يُفِيْدُ الْعِلْمَ কে আমাদের ফাসিদ উক্তি كَثْرَةُ الْاٰلَاتِ تَدُلُّ عَلٰى عَدَمِ كَوْنِ النَّظْرِ مُفِيْدًا لِلْعِلْمِ দ্বারা মুকাবিলা করা মাত্র। আর বিরোধী পক্ষকে নিস্তব্ধ করার জন্য মুনাযিরদের বক্তব্যে ফাসিদকে ফাসিদ দ্বারা মুকাবিলা করার প্রচলন আছে। সুতরাং আমরা এর উত্তর দেব যে, আচ্ছা বলতো তোমাদের বক্তব্য

لَوْكَانَ النَّظْرُ سَبَبًا لِلْعِلْمِ فِى النَّظْرِيَّاتِ لَمَا وَقَعَ اِخْتِلَافُ الْعُقَلَاءِ فِيْهَا . لٰكِنَّ الْاِخْتِلَافَ وَاقِعٌ

আমাদের মতামত বাতিল করনে উপকারী কিনা? যদি উপকারী হয় তাহলে ফাসিদ বলা ভুল হবে। আর যদি উপকারী না হয়, তাহলে তো কোন মুকাবিলাই হল না এবং আমাদের উক্তি اَلنَّظْرُ يُفِيْدُ الْعِلْمَ মুকাবিলা থেকে নিরাপদ রইল। সুতরাং সঠিক نَظَر জ্ঞানের মাধ্যমে হওয়ার ব্যাপারের আমাদের দাবী প্রমাণিত হল।

فَاِنْ قِيْلَ كَوْنُ النَّظْرِ مُفِيْدًا لِلْعِلْمِ اِنْ كَانَ ضَرُوْرِيًّا لَمْ يَقَعْ فِيْهِ خِلَافٌ كَمَا فِىْ قَوْلِنَا الْوَاحِدُ نِصْفُ الْاِثْنَيْنِ وَاِنْ كَانَ نَظْرِيًّا يَلْزَمُ اِثْبَاتُ النَّظْرِ بِالنَّظْرِ فَاِنَّهُ دَوْرٌ قُلْنَا الضَّرُوْرِىُّ قَدْ يَقَعُ خِلَافٌ اِمَّا لِعِنَادٍ اَوْ لِقُصُوْرٍ فِى الْاِدْرَاكِ فَاِنَّ الْعُقُوْلَ مُتَفَاوِتَةٌ بِحَسْبِ الْفِطْرَةِ بِاتِّفَاقٍ مِنَ الْعُقَلَاءِ وَاسْتِدْلَالٍ مِنَ الْاٰثَارِ وَشَهَادَةٍ مِنَ الْاَخْبَارِ وَالنَّظْرِىُّ قَدْ يَثْبُتُ بِنَظْرٍ مَخْصُوْصٍ لَايُعَبَّرُ عَنْهُ بِالنَّظْرِ كَمَا يُقَالُ قَوْلُنَا اَلْعَالَمُ مُتَغَيِّرٌ وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ يُفِيْدُ الْعِلْمَ بِحُدُوْثِ الْعَالَمِ بِالضَّرُوْرَةِ وَلَيْسَ ذٰلِكَ بِخُصُوْصِيَّةِ هٰذَا النَّظْرِ بَلْ لِكَوْنِهِ صَحِيْحًا مَقْرُوْنًا بِشَرَائِطِهِ فَيَكُوْنُ كُلُّ نَظْرٍ صَحِيْحٍ مَقْرُوْنٍ بِشَرَائِطِهِ مُفِيْدًا لِلْعِلْمِ وَفِىْ تَحْقِيْقِ هٰذَا الْمَنْعِ زِيَادَةُ تَفْصِيْلٍ لَايَلِيْقُ بِهٰذَا الْكِتَابِ

সহজ তরজমা

অতঃপর যদি বলা হয়, نَظَر জ্ঞানের মাধ্যম হওয়া যদি জরুরী হয়, তাহলে তো তাতে বিরোধ না হওয়া উচিৎ। যেমন, আমাদের উক্তি اَلْوَاحِدُ نِصْفُ الْاِثْنَيْنِ এর মধ্যে (কারও বিরোধ নেই)। আর যদি نَظْرِى (গবেষণা লব্ধ) হয়, তাহলে نَظَر কে نَظَر দ্বারা প্রমাণ করা আবশ্যক হবে। আর এটা দাওর। আমরা জবাব দেব, জরুরী এর মাঝে কখনও বিরোধ হয় শত্রুতার কারণে অথবা (বাক্যের প্রান্তসমূহের) অনুধাবনে ত্রুটি থাকার কারণে। কেননা জ্ঞানীদের ঐক্যমত এবং (জ্ঞান প্রসূত) নিদর্শাবলী ও ঘটনবালীর প্রমাণ, হাদীসসমূহের সাক্ষ্যের মাধ্যমে সৃষ্টিগতভাবে আকলের তারতম্য প্রমাণিত। আর نَظْرِى কখনও এমন বিশেষ نَظَر দ্বারা প্রমাণিত হয়, যাকে نَظَر বলে ব্যক্ত করা হয় না। যেমন, বলা হয়, اَلْعَالَمُ مُتَغَيِّرٌ وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ নিশ্চয়তার সাথে জগৎ ধ্বংসশী-

হওয়ার জ্ঞান দান করে। আর এ বিষয়টি যে প্রমাণিত হল, তা এ নযরের কোন বিশেষত্বের কারণে নয় বরং এ নযরটি সহীহ এবং نَظَر এর শর্তাবলীর উপর সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে। সুতরাং যে কোন সঠিক نَظَر যা نَظَر এর শর্তাবলীর উপর সম্পৃক্ত হবে, তা জ্ঞান সৃষ্টি করবে। উক্ত প্রশ্নের বিশ্লেষণে বিশদব্যাখ্যা রয়েছে। এই (ছোট) কিতাবে সেসব আনা সমীচীন নয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

নযরে আক্ল বিরোধীদের প্রসিদ্ধ অভিযোগ

قَوْلُهُ فَإِنْ قِيْلَ : এটি نَظَرعَقْل কে জ্ঞানের মাধ্যম বলে অস্বীকার কারীদের পক্ষ থেকে প্রসিদ্ধ অভিযোগ। প্রশ্নের সারমর্ম হল, نَظَر عَقْل জ্ঞানের মাধ্যম হওয়া দুই অবস্থা থেকে খালি নয়। হয়ত তা জরুরী হবে অথবা নযরী হবে। উভয় অংশই বাতিল। কাজেই نَظَر জ্ঞানের মাধ্যম হওয়াও বাতিল। কারণ نَظَر জ্ঞানের মাধ্যম হওয়ার বিষয়টি জরুরী হলে তাতে এমন বিরোধ হত না। যেমন, এক দুইয়ের অর্ধেক হওয়ার ব্যাপারে কারও কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু نَظَر জ্ঞানের মাধ্যম হওয়ার ব্যপারে বিরোধ রয়েছে। ফলে বুঝা গেল, نَظَر জ্ঞানের মাধ্যম হওয়া জরুরী নয়। আর দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ نَظَر জ্ঞানের মাধ্যম হওয়ার বিষয়টি نظرى হওয়াও বাতিল। কারণ, তখন نَظَر জ্ঞানের মাধ্যম হওয়ার কথাটি অপর একটি نَظَر দ্বারাই প্রমাণ করতে হবে। আর তা نَظَر দ্বারা কেবল তখনই প্রমাণিত হবে, যখন نَظَر জ্ঞানের মাধ্যম হবে। কাজেই نَظَر জ্ঞানের মাধ্যম হওয়ার বিষয়টি نَظَر জ্ঞানের মাধ্যম হওয়ার উপর নির্ভরশীল হল। আর এটাতো দাওর ও তাসামসুল। কাজেই نَظَر জ্ঞানের মাধ্যম হওয়ার বিষয়টি نَظَرِىْ হওয়াও বাতিল। সুতরাং উপরিউক্ত দুটি সুরাতই যখন বাতিল হল, তখন نَظَر জ্ঞানের মাধ্যম হওয়াও বাতিল গণ্য হবে।

قَوْلُهُ قُلْنَا ضَرُوْرِىٌّ : উত্তরটি প্রথম সুরাত অবলম্বন করে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ نظر জ্ঞানের মাধ্যম হওয়া জরুরী। এ ব্যাপারে আমরা তোমাদেরকে বলতে পারি যে, "জরুরী এর মধ্যে বিরোধ হয় না" কথাটাই ঠিকানা নয় বরং জরুরী এর মাঝে অনেক সময় শত্রুতাবশত বিরোধ হয়। যেমন, সুফাসতাইয়্যারা সকল ضَرُوْرِيَّات এবং بَدِيْهِيَّات এর অস্তিত্ব অস্বকীর করে। আবার কখনও একটি বাক্যের প্রান্তসমূহ তথা مَحْمُوْل ও مَوْضُوْع এর সঠিক অনুধাবনের অভাবেও বিরোধ হয়। কেননা সকলের জ্ঞান সমান নয়। মানুষের জ্ঞানের তারতম্যের ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের জ্ঞানীদের ঐক্যমত রয়েছে এবং عَقْل প্রসূত নিদর্শনাবলী ও ঘটনাবলীও জ্ঞানের তারতম্যের প্রমাণ। যেমন, নিম্নের ঘটনাতে লক্ষ্য করুন!

ইমাম আবু হানীফা রহ. একবার তার সফরসঙ্গীর নিকট পান করার জন্য পানি চাইলেন। সে বিনামূল্যে পানি দিতে রাজি হল না। ইমাম সাহেব রহ. নামমাত্র মূল্য দশ দিরহামের বিনিময়ে তার সব পানি কিনে নিলেন। পরবর্তীতে ইমাম সাহেব রহ. ছাতু গুলিয়ে সফর সঙ্গীকেও খাবারে শরীক করে নিলেন। যখন তার পিপাসা লাগল আর সে পানি চাইল। ইমাম সাহেব রহ. বললেন, প্রতি পেয়ালার মূল্য দশ দিহাম। বেচারাকে অগত্যা নিরুপায় হয়ে দশ দিরহামে এক পিয়ালা পানি ক্রয় করতে হল। এভাবে ইমাম সাহেব রহ. তার টাকাও ফেরৎ নিলেন, এ দিকে পানিও রয়ে গেল।

অপর এক ব্যক্তির জ্ঞানের অবস্থা লক্ষ্য করুন। সে চুল কাটিয়ে নাপিতের মজুরী দিল। কিন্তু সে আট আনা ফেরৎ পাবে। নাপিতের কাছে ভাংতি না থাকায় বলল, আট আনা পরে নিয়ে নিবেন। কিন্তু লোকটি নাছোড়বান্দা, আট আনা নিবে সে নগদই নিবে। অতঃপর নাপিত তাকে বলল, এ সমস্যার চমৎকার এক সমাধান আছে। তা হল, আমি আট আনায় তোমার মাতা মুণ্ডন করেছি। বাকি আট আনায় তোমার স্ত্রীর মাথা মুণ্ডন করে দেই। লোকটি এ সমাধান পেয়ে অতি আনন্দিত হয়ে তার স্ত্রীকে টেনে হেঁছড়ে নিয়ে আসল্ স্ত্রী তো অবিরাম কাঁদছে। কিন্তু সে অতি শক্ত করে তার মাথা ধরে রাখল। আর নাপিত তার মাথা মুণ্ডন করে দিল। বেচারী লজ্জায় মাথায় রোমাল পেচিয়ে ঘরে চলে গেল। এদিকে নাপিত মহিলার পৃত্রালয়ে সংবাদ পাঠিয়ে দিল যে, তোমাদের জামাতা তোমাদের মেয়ের এ দুর্গতি ঘটিয়েছে। খবর পেয়ে তারা এল এবং লোকটির হতবুদ্ধিতার উপর মাতম করে মেয়েকে নিয়ে গেল। মাথায় পুনঃচুল উঠা পর্যন্ত তাকে তাদের কাছে রাখল।

উভয় ঘটনা সামনে রেখে আপনি নিজেই এখন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন যে, জ্ঞানের মধ্যে কিরূপ তারতম্য রয়েছে। তাছাড়া হাদীস দ্বারাও জ্ঞানের তারতম্য প্রমাণিত। যেমন, নবীজী ﷺ মহিলাদের সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন, هُنَّ نَاقِصَاتُ الْعَقْل এ ছাড়া শরী'আত কর্তৃক মহিলাদের দুজনের সাক্ষকে পুরুষের একজনের সাক্ষ্যের সমতূল্য সাব্যস্ত করাও জ্ঞানের মাঝে তারতম্য থাকার স্পষ্ট প্রমাণ।

প্রশ্নের দ্বিতীয়াংশের জবাব

قَوْلُهٗ اَلنَّظَرِىُّ قَدْيُثْبَتُ ঃ এটি দ্বিতীয় সুরাত অবলম্বনের দ্বিতীয় জবাব। অর্থাৎ সঠিক نظر জ্ঞানের মাধ্যমে হওয়ার বিষয়টি নযরী। তাই তোমাদের প্রশ্ন হল, نظر কে نظر দ্বারা প্রমাণ করা আবশ্যক হচ্ছে। বস্তুতঃ এ কথাটিই সঠিক নয়। কেননা অনেক সময় نظرى এমন বিশেষ نظر (মুকাদ্দমা বিন্যাসের মাধ্যমে) দ্বারা প্রমাণিত হয়, যাকে بديهى (স্বতঃসিদ্ধ) মুকাদ্দমা সংশ্লিষ্ট হওয়ায় نظر বলা হয় না। যেমন, আমরা যখন বলি, اَلْعَالَمُ مُتَغَيِّرٌ وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ তখন উক্ত نظر এবং তারতীব দ্বারা স্পষ্টতঃ اَلْعَالَمُ حَادِثٌ এর জ্ঞান লাভ হয়। তাহলে عَالَم (সৃষ্টিজগৎ) ধ্বংশশীল হওয়ার বিষয়টি যা ছিল نظرى তা উপরোল্লিখিত نظر দ্বারা প্রমাণিত হল। কিন্তু উল্লেখিত نظر টির উভয় মুকাদ্দমা প্রত্যক্ষ দর্শনের উপর নির্ভরশীল হওয়ায়, তা بديهى (স্বতঃসিদ্ধ)। যা প্রমাণ করা অন্য কোন نظر এর উপর নির্ভরশীল নয়।

অতএব نظر জ্ঞানের মাধ্যমে হওয়ার দাবীটি ইমাম রাযী রহ. এর মতে একটি قَضِيَّه مُهْمَلَه -যা উল্লেখিত نظر জ্ঞানের মাধ্যম হওয়ার কারণে প্রমাণিত হয়েছে। কেননা قَضِيَّه مُهْمَلَه হয় مُوجِبَه جُزْئِيَّه এর হুকুমে, যা বাস্তবায়িত হওয়ার জন্য একটি দৃষ্টান্ত যথেষ্ট। কিয়াসের তৃতীয় شكل টি হবে নিম্নরূপঃ

(مَحْمُول) (مَوْضُوع)

اَلْعَالَمُ مُتَغَيِّرٌ وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ نظر

مَحْمُولٌ مَوْضُوعٌ

اَلْعَالَمُ مُتَغَيِّرٌ وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ يُفِيْدُ الْعِلْمَ

হদ্দে আওসাতটি সুগরা ও কুবরা উভয়টিতেই مَوْضُوع । একে বাদ দিলে ফলাফল দাঁড়াবে اَلنَّظَرُ يُفِيْدُ الْعِلْمَ

আর আল্লামা আমিদী রহ. এর মতে نَظَر জ্ঞানের মাধ্যম হওয়ার দাবী হল,

كُلُّ نَظَرٍ صَحِيْحٍ مُفِيْدٌ لِلْعِلْمِ- (قَضِيَّه مُوجِبَه كُلِّيَّه)

শারিহ রহ. আপন উক্তি وَلَيْسَ ذَالِكَ بِخُصُوْصِيَّةِ هٰذَا النَّظَرِ الخ দ্বারা এরই বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। যার সারমর্ম হল, উল্লেখিত نَظَر (اَلْعَالَمُ مُتَغَيِّرٌ وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ) এর ভিত্তিতে ফলাফল اَلْعَالَمُ حَادِثٌ এর জ্ঞান এজন্য সৃষ্টি করে না যে, তা একটি বিশেষ نَظَر বরং এ কারণে উক্ত ফলাফলের জ্ঞান দান করে যে, نَظَر টি সঠিক অর্থাৎ شِكْل اَوَّل এর শর্তাবলী (অর্থাৎ صُغْرٰى মুজিবা হওয়া এবং كُبْرٰى কুল্লিয়া হওয়া। আর যখন উল্লেখিত হুকুম জ্ঞানের জন্য উপকারী হওয়ার কারণ নযরটি সহীহ হওয়া এবং নযর এর জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলী পাওয়া যাওয়া। তখন এ শর্তাবলী যেখানে পাওয়া যাবে সেখানে নযরটি জ্ঞানের জন্য উপকারী হবে। অতএব আমাদের দাবী كُلُّ نَظَرٍ صَحِيْحٍ مُفِيْدٌ لِلْعِلْمِ প্রমাণিত হল।

وَمَاثَبَتَ مِنْهُ أَيْ مِنَ الْعِلْمِ الثَّابِتِ بِالْعَقْلِ بِالْبَدَاهَةِ أَيْ بِأَوَّلِ التَّوَجُّهِ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ إِلَى تَفَكُّرٍ فَهُوَ ضَرُورِيٌّ كَالْعِلْمِ بِأَنَّ كُلَّ الشَّيْءِ أَعْظَمُ مِنْ جُزْئِهِ فَإِنَّهُ بَعْدَ تَصَوُّرِ مَعْنَى الْكُلِّ وَالْجُزْءِ وَالْأَعْظَمِ لَايَتَوَقَّفُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ تَوَقَّفَ فِيهِ حَيْثُ زَعَمَ أَنَّ جُزْءَ الْإِنْسَانِ كَالْيَدِ مَثَلًا قَدْيَكُونُ أَعْظَمَ مِنْهُ فَهُوَلَمْ يَتَصَوَّرْ مَعْنَى الْجُزْءِ وَالْكُلِّ وَمَاثَبَتَ مِنْهُ بِالْاِسْتِدْلَالِ أَيْ بِالنَّظَرِ فِي الدَّلِيلِ سَوَاءٌ كَانَ اِسْتِدْلَالًا مِنَ الْعِلَّةِ عَلَى الْمَعْلُولِ كَمَا إِذَا رَأَىٰ نَارًا فَعُلِمَ أَنَّ لَهَا دُخَانًا أَوْ مِنَ الْمَعْلُولِ عَلَى الْعِلَّةِ كَمَا إِذَا رَأَىٰ دُخَانًا فَعُلِمَ أَنَّ هُنَاكَ نَارًا وَقَدْ يُخَصُّ الْأَوَّلُ بِاسْمِ التَّعْلِيلِ وَالثَّانِي بِالْاِسْتِدْلَالِ فَهُوَ اِكْتِسَابِيٌّ أَيْ حَاصِلٌ بِالْكَسْبِ وَهُوَ مُبَاشَرَةُ الْأَسْبَابِ بِالْاِخْتِيَارِ كَصَرْفِ الْعَقْلِ وَالنَّظَرِ فِي الْمُقَدَّمَاتِ فِي الْاِسْتِدْلَالِيَّاتِ وَالْإِصْغَاءِ وَتَقْلِيبِ الْحَدَقَةِ وَنَحْوِ ذٰلِكَ فِي الْحِسِّيَّاتِ فَالْاِكْتِسَابِيُّ أَعَمُّ مِنَ الْاِسْتِدْلَالِيِّ لِأَنَّهُ الَّذِيْ يَحْصُلُ بِالنَّظَرِ فِي الدَّلِيلِ فَكُلُّ الْاِسْتِدْلَالِيِّ اِكْتِسَابِيٌّ وَلَا عَكْسَ كَالْإِبْصَارِ الْحَاصِلِ بِالْقَصْدِ وَالْاِخْتِيَارِ.

সহজ তরজমা

আর যে জ্ঞান بَدِيهِي তথা স্বতঃসিদ্ধরূপে অর্থাৎ প্রথম মনোনিবেশের ফলে কোন প্রকার চিন্তা-গবেষণার প্রয়োজন ছাড়াই অর্জিত হয়, তা হল জরুরী। যেমন,"পূর্ণ বস্তু তার অংশ অপেক্ষা বড়"–এর জ্ঞান। কারণ, পূর্ণ বস্তু, অংশ এবং বড় (এ তিনটি) এর অর্থ জানার পর অন্য কোন জিনিসের উপর উক্ত বিষয়টির জ্ঞান নির্ভরশীল থাকে না। আর যে এ ব্যাপারে এজন্য মন্তব্য থেকে বিরত থাকে যে, সে মনে করে– অনেক সময় মানুষের অংশ যেমন হাত পূর্ণ মানুষ হতে বড় হয়, তাহলে মূলতঃ সে كُل এবং جُزْء এর অর্থই বোঝেনি। আর যে জ্ঞান اِسْتِدْلَال তথা দলীলের মধ্যে চিন্তা-ভাবনার ফলে অর্জিত হয়। চাই উক্ত اِسْتِدْلَال ইল্লত দ্বারা মালুলের উপর হোক যেমন যখন আগুন দেখা যাবে, তখন তা দ্বারা এ জ্ঞান লাভ হবে যে, সেখানে ধোঁয়া আছে। অথবা মালূল দ্বারা ইল্লতের ওপর; যেমন– যখন ধোঁয়া দেখা যাবে তখন তা দ্বারা এ জ্ঞান লাভ হবে যে, সেখানে আগুন আছে, তাহলে জ্ঞান ইলমে ইকতিসাবী তথা চেষ্টালব্ধ জ্ঞান হবে। আর كَسْب বলে নিজ ইচ্ছায় উপকরণকে কাজে লাগানো। যেমন, اِسْتِدْلَالِيَّات তথা দলীলনির্ভর বিষয়ে عَقْل কে ধাবিত করা এবং মুকাদ্দামাগুলোকে সাজানো। আর حِسِّيَّات বা ইন্দ্রিয়ানুভূত বিষয়ে কান লাগানো, দৃষ্টি দেওয়া ইত্যাদি। সুতরাং اِكْتِسَابِى টা اِسْتِدْلَالِى এর তুলনায় ব্যাপক। কারণ, اِسْتِدْلَالِى তো কেবল ঐ ইলম, যা দলীলে চিন্তা-ভাবনার ফলে অর্জিত হয়। তাহলে প্রত্যেক اِسْتِدْلَالِى ইলমই اِكْتِسَابِى হবে। কিন্তু বিপরীতটি হবে না। যেমন, ইচ্ছাকৃতভাবে দেখা।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

মুসানান্নিফ রহ. যেভাবে عِلْم এর অন্যান্য উপকরণ যেমন, ইন্দ্রিয়, খবরে মুতাওয়াতির এবং খবরে রাসূল ইত্যাদির জ্ঞানের মাধ্যম হওয়ার কথা বর্ণনা করার পাশাপাশি সেটি দ্বারা অর্জিত জ্ঞানের ধরণ অর্থাৎ সেটি কি ضَرُورِى না اِسْتِدْلَالِى কিংবা اِكْتِسَابِى তা নির্ধারণ করেছেন, তেমনি তিনি عَقْل জ্ঞানের মাধ্যম হওয়ার কথা বর্ণনা শেষে তা দ্বারা অর্জিত জ্ঞানের ধরণও বর্ণনা করছেন।

সারমর্ম হল, عَقْل দ্বারা অর্জিত জ্ঞান দু ধরনের। যদি কোন জিনিসের জ্ঞান চিন্তা-ভাবনা ছাড়া শুধু عَقْل সে দিকে মনোনিবেশ করলেই বোধগম্য হয়ে যায় তা হল জরুরী। যেমন, كُل (পূর্ণ বস্তু) جُزْء (অংশ) এবং أَعْظَمُ (বড়) এর অর্থ জানার পর পূর্ণ বস্তু অংশ থেকে বড় হওয়ার জ্ঞান عَقْل সে দিকে একটু মনোযোগ দিলেই অর্জিত হয়। অন্য কোন জিনিসের উপর নির্ভরশীল থাকে না। যদি কোন ব্যক্তি "পূর্ণ বস্তু অংশ অপেক্ষা বড় " এ ব্যাপারে এ ধারণা করে নীরব থাকে যে, অনেক সময় মানুষের একটি جُزْء (অংশ) যেমন– হাত তার পূর্ণদেহ থেকেও বড়

হয়। কাজেই প্রত্যেক كُل (পূর্ণ বস্তু) তার جُزْء (অংশ) অপেক্ষা বড় হওয়া জরুরী নয়। তাহেল সে মূলতঃ كُل (পূর্ণ বস্তু) এবং جُزْء (অংশ) এর অর্থ সঠিকভাবে বুঝতে পারেনি। কেননা كُل তো হাতসহ সব অঙ্গ মিলে হয়। আর جُزْء তো শুধু হাত এ মতাবস্থায় যদি হাত পূর্ণ দেহ (যার মধ্যে স্বয়ং হাত রয়েছে) থেকে বড় হয়, তাহলে কোন জিনিস তার নিজের চেয়ে বড় আবশ্যক হবে। যা স্পষ্টভাবে বাতিল। আর যে জ্ঞান عَقل দ্বারা اِسْتِدْلَالِى মাধ্যমে অর্জিত হয়, তা اِكْتِسَابِى। চাই عِلَّت দ্বারা مَعْلُول এর উপর প্রমাণ দেওয়া হোক, যেমন বলা হল, ওখানে ধোঁয়া আছে। কেননা সেখানে আগুন জ্বলছে অথবা বলা হল, "এখন দিন"। কেননা এখন সূর্য উদিত হয়েছে। প্রথম উদাহরণে عِلَّت তথা আগুনকে مَعْلُول তথা ধোঁয়ার উপর দলীল বানানো হয়েছে। আর দ্বিতীয় উদাহরণে عِلَّت (সূর্য উদয়কে) مَعْلُول তথা দিন বিদ্যমান হওয়ার দলীল সাব্যস্ত করা হয়েছে। এ জাতীয় দলীলকে দলীলে لِمِّى বলে অথবা উক্ত প্রামাণ্যটি مَعْلُول দ্বারা عِلَّت এর উপর হোক। যেমন বলা হল, ওখানে আগুন আছে। কেননা ওখানে ধোঁয়া উড়ছে। এ উদাহরণে مَعْلُول তথা ধোঁয়া দ্বারা عِلَّت তথা আগুনের উপর দলীল দেওয়া হয়েছে। এ জাতীয় দলীলকে দলীলে اِنِّى বলে।

قَوْلُهٗ وَمَا ثَبَتَ مِنْهُ ঃ এখানে مَا বর্ণটির ব্যাখ্যামূলক। শারিহ রহ. উক্তি اَىْ مِنَ الْعِلْمِ الثَّابِتِ الخ কথাটি مِنْهُ এর যমীরে মাজরূরের مَرْجِع এর বর্ণনা।

قَوْلُهٗ بِاَوَّلِ التَّوَجُّهِ ঃ এটি بَدَاهَت এর আভিধানিক অর্থ। আর শারিহ রহ. এর উক্তি مِنْ غَيْرِ اِحْتِيَاجٍ اِلَى الْفِكْرِ " এটা এখানে بَدَاهَت দ্বারা কি উদ্দেশ্য তার বিবরণ।

قَوْلُهٗ وَقَدْ يَخُصُّ الْاَوَّلَ ঃ অর্থা কখনও পার্থক্য করার জন্য اَوَّل অর্থাৎ ইল্লত দ্বারা مَعْلُول এর উপর প্রমাণ পেশ করাকে تَعْلِيل আর ثَانِى অর্থাৎ مَعْلُول দ্বারা عِلَّت এর উপর প্রমাণ পেশ করাকে اِسْتِدْلَال বলা হয়।

ইকতিসাব ও ইকতিসাবী এবং ইস্তিদলাল ও ইস্তিদলালীর অর্থ

قَوْلُهٗ وَهُوَ مُبَاشَرَةُ الْاَسْبَابِ ঃ এখানে اِكْتِسَاب এর অর্থের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সারমর্ম হল, স্বেচ্ছায় কোন বস্তুর জ্ঞান অর্জনের উপকরণ কাজে লাগানোকে اِكْتِسَاب বলে। সুতরাং যেহেতু اِسْتِدْلَالِى এবং نَظْرِى জিনিসসমূহের জ্ঞানের মাধ্যম হচ্ছে, مَعْلُومَات এবং مُقَدَّمَات এর মধ্যে চিন্তা-ভাবনা অর্থাৎ তারতীব দেওয়া, এ কারণে اِسْتِدْلَالِيَات এর মধ্যে مُقَدَّمَات কে তারতীব দেওয়াই اِكْتِسَاب হবে। আর مَحْسُوسَات এর জ্ঞানের মাধ্যম হল, حَوَاس তথা পঞ্চইন্দ্রিয়। সুতরাং ইন্দ্রিয় যে ইন্দিয়ানুভূত বস্তুর জ্ঞানের মাধ্যম হবে, ঐ ইন্দ্রিয়কে ব্যবহার করাই হবে اِكْتِسَاب। যেমন, আওয়াজ অনুধাবনের মাধ্যম হল কান। সুতরাং আওয়াজের প্রতি কান লাগানোই হবে اِكْتِسَاب। আবার রং ও আকার-আকৃতির প্রতি দৃষ্টি দেওয়াই হবে اِكْتِسَاب। সারকথা হল, اِسْتِدْلَال তো কেবল দলীলে চিন্তা-ভাবনা করা তথা মুকাদ্দমা সাজানোকে বলে। যেমন, উপরে اِسْتِدْلَال এর ব্যাখ্যায় শারিহ রহ. উক্তি اَىْ بِالنَّظْرِ فِى الدَّلِيْلِ দ্বারা বুঝা গেছে। আর اِكْتِسَاب দলীলে চিন্তা-ভাবনা করাকেও বলে এবং حِسِّيَات তথা ইন্দ্রিয়ানুভূত বিষয়াবলীতে যেমন, শ্রবণযোগ্য বিষয়াবলীর দিকে কান লাগানো এবং দর্শনযোগ্য বিষয়াদির দিকে চোখ ফিরানো এবং গরম ও ঠাণ্ডা জিনিসের সাথে স্পর্শ শক্তিকে (ত্বক) কাজে লাগানোকেও اِكْتِسَاب বলবে। বুঝা গেল, اِكْتِسَابِى বিষয়টি اِسْتِدْلَال অপেক্ষা ব্যাপক। কাজেই যা اِسْتِدْلَالِى হবে তা اِكْتِسَابِى ও হবে। কেননা ঐ اِسْتِدْلَالِى তো দলীলের মধ্যে চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে অর্জিত হবে। আর نَظْرٌ فِى الدَّلِيْلِ দলীলে চিন্তা-ভাবনা করাকে যেহেতু ইকতিসাবী ও বলে, এ কারণে সেটি ইকতিসাবী ও হবে। তবে যা اِكْتِسَابِى হবে তা আবার اِسْتِدْلَالِى হওয়া জরুরী নয়। যেমন, কোন বস্তুর প্রতি তাকানোর ফলে তার আকৃতির জ্ঞান লাভ হল। তাহলে উক্ত বস্তুর আকৃতির জ্ঞান اِكْتِسَابِى হল। কিন্তু তা اِسْتِدْلَالِى নয়। কেননা এতে দলীলে চিন্তা-ভাবনা করা এবং মুকাদ্দমা বিন্যাসের কিছুই নেই।

وَاَمَّا الضَّرُوْرِيُّ فَقَدْ يُقَالُ فِيْ مُقَابَلَةِ الْاِكْتِسَابِيِّ وَيُفَسَّرُ بِمَا لَايَكُوْنُ تَحْصِيْلُهُ مَقْدُوْرًا لِلْمَخْلُوْقِ اَيْ يَكُوْنُ حَاصِلًا مِنْ غَيْرِ اِخْتِيَارٍ لِّلْمَخْلُوْقِ وَقَدْ يُقَالُ اَلضَّرُوْرِيُّ فِيْ مُقَابَلَةِ الْاِسْتِدْلَالِيِّ وَيُفَسَّرُ بِمَا يَحْصُلُ بِدُوْنِ فِكْرٍ وَنَظْرٍ فِي الدَّلِيْلِ فَمِنْ هٰهُنَا جَعَلَ بَعْضُهُمُ الْعِلْمَ الْحَاصِلَ بِالْحَوَاسِّ اِكْتِسَابِيًّا اَيْ حَاصِلًا بِمُبَاشَرَةِ الْاَسْبَابِ بِالْاِخْتِيَارِ وَبَعْضُهُمْ ضَرُوْرِيًّا اَيْ حَاصِلًا بِدُوْنِ الْاِسْتِدْلَالِ فَظَهَرَ اَنَّهُ لَاتَنَاقُضَ فِيْ كَلَامِ صَاحِبِ الْبِدَايَةِ حَيْثُ قَالَ اِنَّ الْعِلْمَ الْحَادِثَ نَوْعَانِ ضَرُوْرِيٌّ وَهُوَ مَايُحْدِثُهُ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْ نَفْسِ الْعَبْدِ مِنْ غَيْرِ كَسْبِهِ وَاخْتِيَارِهِ كَالْعِلْمِ بِوُجُوْدِهِ وَتَغَيُّرِ اَحْوَالِهِ وَاكْتِسَابِيٌّ وَهُوَ مَايُحْدِثُهُ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْهِ بِوَاسِطَةِ كَسْبِ الْعَبْدِ وَهُوَ مُبَاشَرَةُ اَسْبَابِهِ وَاَسْبَابُهُ ثَلٰثَةٌ اَلْحَوَاسُّ السَّلِيْمَةُ وَالْخَبَرُ الصَّادِقُ وَنَظْرُ الْعَقْلِ ثُمَّ قَالَ وَالْحَاصِلُ مِنْ نَظْرِ الْعَقْلِ نَوْعَانِ ضَرُوْرِيٌّ يَحْصُلُ بِاَوَّلِ النَّظْرِ مِنْ غَيْرِ تَفَكُّرٍ كَالْعِلْمِ بِاَنَّ الْكُلَّ اَعْظَمُ مِنْ جُزْئِهِ وَاسْتِدْلَالِيٌّ يَحْتَاجُ فِيْهِ اِلٰى نَوْعِ تَفَكُّرٍ كَالْعِلْمِ بِوُجُوْدِ النَّارِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الدُّخَانِ .

সহজ তরজমা

মোটকথা, জরুরী কখনও اِكْتِسَابِىْ এর বিপরীত ব্যবহৃত হয় এবং এর ব্যাখ্যা দেওয়া হয় তথা এর দ্বারা এমন জ্ঞান উদ্দেশ্য হয়, যা অর্জন করা মানুষের ক্ষমতাধীন। আবার কখনও اِسْتِدْلَالِىْ এর বিপরীত ব্যবহৃত হয়। এর দ্বারা এমন জ্ঞান উদ্দেশ্য হয়, যা দলীলে চিন্তা-ভাবনা করা ছাড়াই অর্জিত হয়। এ কারণেই অনেকে ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানকে اِكْتِسَابِىْ সাব্যস্ত করেছেন অর্থাৎ যা স্বেচ্ছায় (ইলমের) উপকরণকে কাজে লাগানোর দ্বারা অর্জিত হয়। আর অনেকে জরুরী সাব্যস্ত করেছেন। অর্থাৎ যা اِسْتِدْلَال (তথা দলীলে চিন্তা-ভাবনা) বিহীন অর্জিত হয়। সুতরাং এখন এ কথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, বিদায়া গ্রন্থকারের কথায় কোন বৈপরিত্য নেই। কেননা তিনি বলেছেন, عِلْم حَادِث দুই প্রকার। একটি হল, জরুরী। আর তা এমন عِلْم যা কোন ইচ্ছা ও উপার্জন ছাড়াই আল্লাহ তা'আলা বান্দার অন্তরে সৃষ্টি করে দেন। যেমন, আপন অস্তিত্ব ও অবস্থার পরিবর্তনের জ্ঞান। দ্বিতয়িটি হল ইকতিসাবী। আর اِكْتِسَابِى ঐ عِلْم কে বলে, যা আল্লাহ তা'আলা বান্দার মধ্যে তার উপার্জনের মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন। আর كَسْب বলে عِلْم এর উপকরণগুলো কাজে লাগানোকে। عِلْم এর উপকরণ হল, তিনটি। সুস্থ পঞ্চইন্দ্রিয়, খবরে সাদিক ও নযরে আকল। তারপর বলেছেন, نَظْر عَقْل দ্বারা অর্জিত জ্ঞান দুই প্রকার। একটি হল, জরুরী, যা প্রথম মনযোগের সাথে সাথে কোন চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই অর্জিত হয়। যেমন, كُل (পূর্ণ বস্তু) তার جُزْء (অংশ) অপেক্ষা বড় হয় –এ জ্ঞান। আর দ্বিতীয়টি হল, اِسْتِدْلَالِى যাতে চিন্ত-ভাবনার প্রয়োজন হয়। যেমন, ধোঁয়া দেখার সময় আগুনের অস্তিত্বের জ্ঞান।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

জরুরী -এর অর্থ

قَوْلُهُ الضَّرُوْرِى ঃ এখান থেকে শারিহ রহ. জরুরী এর দুটি অর্থ বর্ণনা করে দুটি বিরোধের অবসান করছেন। সারসংক্ষেপ হল, ইতোপূর্বে আপনি জানতে পেরেছেন, اِكْتِسَاب ঐ عِلْم কে বলে, যা আপন ইচ্ছায় عِلْم এর উপকরণকে কাজে লাগানোর মাধ্যমে অর্জিত হয় অর্থাৎ অর্জন করা বান্দার ক্ষমতাধীন। বান্দা তার ইচ্ছামত عِلْم এর উপকরণকে কাজে লাগিয়ে তা অর্জন করবে। আর اِسْتِدْلَالِى ঐ عِلْم কে বলে, যা দলীলের মধ্যে চিন্তা-ভাবনা ও মুকাদ্দামাগুলোকে বিন্যাসের ফলে অর্জিত হয়। বাকি রইল জরুরী। এটি কখনও اِكْتِسَاب এর বিপরীতে ব্যবহার হয়। যেমন, মুসান্নিফ রহ. এই মাত্র نَظْر عَقْل দ্বারা অর্জিত জ্ঞানের এক প্রকারকে জরুরী এবং তার বিপরীত প্রকারকে اِكْتِسَابِىْ বলেছেন। আবার কখনও জরুরী শব্দ اِسْتِدْلَالِىْ এর বিপরীতে ব্যবহৃত হয়। এ ব্যবহার এবং মোকাবিলার বৈপরিত্বের কারণে জরুরী এর ব্যাখ্যায় উলামায়ে কিরামের পরিভাষা বিভিন্ন রকম হয়ে

গেছে। কেউ এটাকে إِكْتِسَابِى এর বিপরীত মনে করে তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন, জরুরী ঐ عِلْم কে বলে, যা অর্জন করা বান্দার ক্ষমতাধিন নয়। আবার অনেকে اِسْتِدلالى এর বিপরীত মনে করে বলেছেন, ضَرُوْرِى ঐ عِلْم কে বলে, যা দলীলের মধ্যে চিন্তা-ভাবনা অর্থাৎ মুকাদ্দামা বিন্যাস ছাড়াই অর্জিত হয়।

"জরুরী" -এর ব্যবহার

قَوْلُهُ وَمِنْ هٰهُنَا ঃ অর্থাৎ জরুরী এর ব্যাখ্যা বিভিন্ন ধরনের হওয়ায় পঞ্চইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের ব্যাপারে বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। যারা জরুরীর প্রথম ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন (অর্থাৎ যা অর্জন করা বান্দার সাধ্যের বাইরে) তারা পঞ্চইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানকে إِكْتِسَابِى সাব্যস্ত করেছেন। কেননা পঞ্চইন্দ্রিয় আসবাবে ইলমের অন্তর্ভূক্ত। আর যে عِلْم উপকরণের মাধ্যমে অর্জিত হয়, তা বান্দার ক্ষমতাধীন হয়। পক্ষান্তরে যারা ضَرُوْرِى এর দ্বিতীয় ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন (অর্থাৎ যা দলীলের মধ্যে চিন্তা-গবেষণা এবং মুকাদ্দামা বিন্যাস ব্যতিত অর্জিত হয়) তারা পঞ্চইন্দ্রিয় দ্বারা অর্জিত عِلْم কে জরুরী সাব্যস্ত করেছেন। এতে বুঝা গেল, ইন্দ্রিয় লব্ধ জ্ঞান জরুরী দ্বিতীয় অর্থে, প্রথম অর্থে নয় বরং ইকতিসাবী। জরুরী সাব্যস্ত করা এবং না করার দিক যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন, তাই উভয়ের মধ্যে কোন বৈপরিত্ব্য নেই।

قَوْلُهُ فَظَهَرَ ঃ এখানে দ্বিতীয় বিরোধের নিরসন করা হয়েছে। আর إِنَّ الْعِلْمَ حَادِثٌ থেকে নিয়ে عِنْدَ رُؤْيَةِ الدُّخَانِ পর্যন্ত বিদায়া গ্রন্থকারের কথা। সারকথা হল, ইমাম সাবুনী নামে প্রসিদ্ধ ইমাম নুরুদ্দীন বুখারী স্বরচিত بِدَايَةُ الْكَلَامِ গ্রন্থে عِلْم حَادِث কে দুই প্রকারে বিভক্ত করেছেন। (১) জরুরী। (২) إِكْتِسَابِىْ। এখানে জরুরীকে إِكْتِسَابِىْ এর বিপরীত সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু সামনে গিয়ে তিনি نَظَرِ عَقْل দ্বারা অর্জিত عِلْم إِكْتِسَابِى কে দুভাগে বিভক্ত করেছেন তথা জরুরী ও ইস্তিদলালী। তিনি প্রথমে যে জরুরীকে إِكْتِسَابِى এর বিপরীত সাব্যস্ত করেছিলেন, সেই জরুরীকেই সামনে গিয়ে তিনি إِكْتِسَابِىْ এর প্রকার সাব্যস্ত করলেন। ফলে قَسِيْمُ الشَّيْئِ (বস্তুর বিপরীত জিনিস) তার قِسْم (প্রকার) হওয়া আবশ্যক হল। আর এটা تَنَاقُض (বৈপরিত্ব্য) কে আবশ্যক করে। কেননা জরুরী إِكْتِسَابِىْ এর قَسِيْمٌ হওয়ার অর্থ হল, এটি إِكْتِسَابِىْ এর বিপরীত হবে। আবার قِسْم হওয়ার অর্থ হল, তা إِكْتِسَابِىْ এর বিপরীত হবে না। এটা তো স্পষ্ট বৈপরিত্ব। শারিহ রহ. উক্ত বৈপরিত্ব অবসানে বলেন, জরুরী এর সংজ্ঞায় উল্লেখিত বিরোধ জানার পর বিদায়া গ্রন্থকারের কথায় কোন বৈপরিত্ব্য থাকে না। কেননা قَسِيْم হল, ঐ জরুরী যা إِكْتِسَابِىْ এর বিপরীত। আর ইতোপূর্বে জানতে পেরেছে, إِكْتِسَابِىْ এর বিপরীতে যে জরুরী, তার অর্থ একটি। আর ইস্তিদলালী এর বিপরীতে যে জরুরী, তার অর্থ আরেকটি। সুতরাং পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হল যে, বিদায়া গ্রন্থকারের কথায় কোন বৈপরিত্ব্যে নেই।

قَوْلُهُ اَلْعِلْمُ الْحَادِثُ نَوْعَانِ ঃ জরুরী ও إِكْتِسَابِىْ কে عِلْم حَادِث এর প্রকার সাব্যস্ত করায় বুঝা গেল, আল্লাহ পাকের ইলম জরুরীও নয়; আবার ইকতিসাবীও নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলার عِلْم তো নশ্বর নয় বরং অবিনশ্বর

وَالْإِلْهَامُ الْمُفَسَّرُ بِإِلْقَاءِ مَعْنًى فِى الْقَلْبِ بِطَرِيْقِ الْفَيْضِ لَيْسَ مِنْ اَسْبَابِ الْمَعْرِفَةِ بِصِحَّةِ الشَّيْئِ عِنْدَ اَهْلِ الْحَقِّ حَتّٰى يَرِدَ بِهِ الْإِعْتِرَاضُ عَلٰى حَصْرِ الْاَسْبَابِ فِى الثَّلٰثَةِ وَكَانَ الْاَوْلٰى اَنْ يَّقُوْلَ لَيْسَ مِنْ اَسْبَابِ الْعِلْمِ بِالشَّيْئِ اِلَّا اَنَّهٗ حَاوَلَ التَّنْبِيْهَ عَلٰى اَنَّ مُرَادَنَا بِالْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ وَاحِدٌ لَا كَمَا اصْطَلَحَ عَلَيْهِ الْبَعْضُ مِنْ تَخْصِيْصِ الْعِلْمِ بِالْمُرَكَّبَاتِ اَوِ الْكُلِّيَّاتِ وَالْمَعْرِفَةِ بِالْبَسَائِطِ اَوِ الْجُزْئِيَّاتِ اِلَّا اَنَّ تَخْصِيْصَ الصِّحَّةِ بِالذِّكْرِ مِمَّا لَاوَجْهَ لَهٗ ثُمَّ الظَّاهِرُ اَنَّهٗ اَرَادَ اَنَّ الْاِلْهَامَ لَيْسَ سَبَبًا يَّحْصُلُ بِهِ الْعِلْمُ لِعَامَّةِ الْخَلْقِ وَيَصْلُحُ لِلْاِلْزَامِ عَلَى الْغَيْرِ وَاِلَّا فَلَاشَكَّ اَنَّهٗ قَدْ يَحْصُلُ بِهِ الْعِلْمُ وَقَدْ وَرَدَ الْقَوْلُ بِهِ فِى الْخَبَرِ وَهُوَ قَوْلُهٗ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اَلْهَمَنِىْ رَبِّىْ وَحُكِىَ عَنْ كَثِيْرٍ مِّنَ السَّلَفِ وَاَمَّا خَبَرُ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ وَتَقْلِيْدُ الْمُجْتَهِدِ فَقَدْ يُفِيْدَانِ الظَّنَّ وَالْاِعْتِقَادَ الْجَازِمَ الَّذِىْ يَقْبَلُ الزَّوَالَ فَكَاَنَّهٗ اَرَادَ بِالْعِلْمِ مَالَا يَشْمُلُهُمَا وَاِلَّا فَلَاوَجْهَ لِحَصْرِ الْاَسْبَابِ فِى الثَّلٰثَةِ ـ

সহজ তরজমা

ইলহাম ঃ ফয়েযের ভিত্তিতে (অনুগ্রহ স্বরূপ) বান্দার অন্তরে কোন (কল্যাণকর) বিষয় প্রক্ষিপ্ত করার দ্বারা যে ইলহামের ব্যাখ্যা করা হয়, সেটি হকপন্থী উলামায়ে কিরামের মতে কোন বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম নয়। যার ফলে (অর্থাৎ ইলহাম জ্ঞানের মাধ্যম না হওয়ার ফলে) জ্ঞানের মাধ্যম তিনটিতে সীমাবদ্ধ করায় কোন প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। মুসান্নিফ রহ. এর জন্য উচিৎ ছিল, এখানে مِنْ اَسْبَابِ الْعِلْمِ بِالشَّيْئِ বলা। কিন্তু তিনি এ বিষয়ে সতর্ক করতে চেয়েছেন যে, عِلْم এবং مَعْرِفَة দ্বারা আমাদের একই উদ্দেশ্য; এমন নয় যেমন কেউ কেউ عِلْم কে مُرَكَّبَات এবং كُلِّيَّات এর সাথে আর مَعْرِفَت কে بَسَائِط এবং جُزْئِيَّات এর সাথে নির্দৃষ্ট করে নিয়ে পরিভাষা তৈরী করেছে। তবে صِحَّة শব্দটি উল্লেখ করার বিশেষ কারণ জানা যায়নি। অতঃপর বাহ্যতঃ মনে হয়, মুসান্নিফ রহ.এর উদ্দেশ্য হল, اِلْهَام এমন سَبَب (মাধ্যম) নয় যে, তা দ্বারা জনসাধারণ জ্ঞান লাভ করবে এবং অন্যের উপর (কোন জিনিস) চাপিয়ে দেওয়ার যোগ্যতা রাখবে। অন্যথায় এতে কোন সন্দেহ নেই যে, অনেক সময় এটি দ্বারা জ্ঞান লাভ হয়; হাদীসেও এ সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে। যেমন, নবী করীম ﷺ এর বাণী اَلْهَمَنِىْ رَبِّىْ (আমাকে আমার প্রভু ইলহাম করেছেন) এবং অনেক বুযুর্গদের ব্যাপারেও বর্ণিত হয়েছে (তাদের নিকট ইলহাম হত)। বাকী রইল, একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সংবাদ এবং মুজতাহিদদের তাকলীদ (এর বিষয়)। এ দুটি ظن (প্রবল ধারণা) এবং এমন দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি করে, যা দূরীভূত হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। সুতরাং মুসান্নিফ রহ. কেমন যেন عِلْم দ্বারা এ অর্থ বুঝিয়েছেন, যা এ দুটিকে শামিল করে না। অন্যথায় ইলমের মাধ্যম তিনটিতে সীমাবদ্ধ হওয়ার কোন কারণ নেই।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

ইলহাম কি জ্ঞানের মাধ্যম ?

কেউ কেউ عِلْم এর মাধ্যম তিনটিতে সীমাবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ করে বলেন, ইলহামও জ্ঞানের মাধ্যম। অতএব ইলমের মাধ্যম তিনটিতে সীমিত করা ঠিক নয়। কেউ কেউ এ অভিযোগকে সঠিক মনে করে উত্তর দিয়েছেন, ইলহাম বস্তুতঃ পৃথক কোন মাধ্যম নয় বরং عَقْل এরই অন্তর্ভূক্ত। মুসান্নিফ রহ. মূল অভিযোগকেই স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, হকপন্থীদের নিকট ইলহাম জ্ঞানের মাধ্যম নয়। অতএব عِلْم এর মাধ্যম তিনটিতে সীমাবদ্ধ হওয়ায় কোন অভিযোগ উঠতে পারে না।

ইলহামের অর্থ

قَوْلُهُ اَلْمُفَسَّرُ بِالْقَاءِ مَعْنًى ঃ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক স্বীয় বান্দার অন্তরে ফয়েযের পদ্ধতিতে অর্থাৎ কোন যোগ্যতা ও উপার্জন ব্যতিত শুধু আপন অনুগ্রহে কোন কল্যাণকর বিষয় প্রক্ষিপ্ত করাকে ইলহাম বলে। এ অর্থে ইলহাম জ্ঞানের মাধ্যম নয়। ইলহামের আরেকটি অর্থ হচ্ছে, اِعْلَامٌ بِاِنْزَالِ الْكُتُبِ وَاِرْسَالِ الرُّسُلِ তথা কিতাব অবতীর্ণ করে এবং রাসূল প্রেরণ করে কোন বিষয়কে অবহিত করা। যেমন, আল্লাহ তা'আলার আরেকটি বাণী– فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوَاهَا অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিকে কিতাব নাযিল ও রাসূল প্রেরণের মাধ্যমে ভাল-মন্দ সম্পর্কে অবহিত করেছেন। এ অর্থে اِلْهَام নিঃসন্দেহে জ্ঞানের মাধ্যম এবং ইয়াকীন লাভের উপায়।

গ্রন্থকার لَيْسَ مِنْ اَسْبَابِ الْمَعْرِفَةِ বললেন কেন ?

قَوْلُهُ كَانَ الْاَوْلٰى ঃ একটি প্রশ্ন হয় যে, পূর্বে মুসান্নিফ রহ. স্বীয় বক্তব্য وَاَسْبَابُ الْعِلْمِ ثَلَاثَةٌ এবং اَمَّا الْعَقْلُ فَهُوَ سَبَبٌ لِلْعِلْمِ এর মধ্যে عِلْم শব্দ উল্লেখ করেছেন। তদ্রুপ এখানেও যদি وَالْاِلْهَامُ لَيْسَ مِنْ اَسْبَابِ الْمَعْرِفَةِ এর পরিবর্তে مِنْ اَسْبَابِ الْعِلْمِ বলতেন, তাহলে পূর্বাপর সামঞ্জস্যপূর্ণ হত। কিন্তু তিনি এরূপ করেননি কেন? শারিহ রহ. এর জবাব দিচ্ছেন, আসলে এমন বলাই সঙ্গত ছিল অর্থাৎ لَيْسَ مِنْ اَسْبَابِ الْمَعْرِفَةِ এর পরিবর্তে لَيْسَ مِنْ اَسْبَابِ الْعِلْمِ বলতেন। কিন্তু এরূপ না করার কারণ হল, কেউ কেউ عِلْم ও مَعْرِفَت এর মাঝে পার্থক্য করে বলেছেন, عِلْم বলা হয় مُرَكَّبَات এর জ্ঞানকে; পক্ষান্তরে بَسَائِط অর্থাৎ غَيْرِ مُرَكَّبَات এর জ্ঞানকে مَعْرِفَت বলে। এমনিভাবে كُلِّيَّات এর জ্ঞানকে عِلْم বলে। পক্ষান্তরে جُزْئِيَّات এর জ্ঞানকে مَعْرِفَت বলে। মুসান্নিফ রহ. عِلْم এর স্থলে مَعْرِفَت শব্দ উল্লেখ করে সতর্ক করেছেন যে, عِلْم ও مَعْرِفَت দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য একই। উভয়টির মাঝে কোন পার্থক্য নেই। তবে মুসান্নিফ রহ. এর مِنْ اَسْبَابِ مَعْرِفَةِ الشَّيْئِ এর পরিবর্তে بِصِحَّةِ الشَّيْئِ বলার কোন কারণ দেখছি না বরং এতে উদ্দেশ্যের বিপরীত অর্থের ধারণাও সৃষ্টি হয়। তা হল, اِلْهَام কোন বস্তুর বিশুদ্ধতা জানার মাধ্যম নয় তবে فَسَاد বা ভ্রষ্টতা জানার মাধ্যম। অথচ উদ্দেশ্য হল, স্বভাবতই ইলহাম عِلْم এর মাধ্যম হওয়ার কথাটি অস্বীকার করা। এর জবাব হল, এখানে শব্দটি ثُبُوْت এর অর্থে ব্যবহৃত।

ইলহাম দ্বারা সাধারণ মানুষ জ্ঞান লাভ করে না

قَوْلُهُ ثُمَّ الظَّاهِرُ اَنَّهُ اَرَادَ ঃ অর্থাৎ পূর্বে মুসান্নিফ রহ. عِلْم এর যে তিনটি মাধ্যম বলেছেন, তা সবকটি জনসাধারণের জন্য জ্ঞানের মাধ্যম এবং এর মাধ্যমে এমন জ্ঞান লাভ হয়, যা অন্যের বিরুদ্ধে দলীল হতে পারে। এতে ইহাই প্রকাশ পায় যে, এখানে মুসান্নিফ রহ. এর উদ্দেশ্য হল اِلْهَام উল্লেখিত পন্থায় ইলমের মাধ্যম না হওয়ার কথা বলা অর্থাৎ ইলহাম এমন মাধ্যম যা দ্বারা সাধারণ মানুষের জ্ঞান লাভ হয় না এবং তা অন্যের বিরুদ্ধে দলীল হওয়ার যোগ্যতা রাখেনা। কিন্তু اَسْبَابِ ثَلَاثَة এমন নয় বরং তা দ্বারা সাধারণ মানুষও জ্ঞান লাভ করে যা অন্যের বিরুদ্ধে প্রমাণ হতে পারে।

قَوْلُهُ وَلَا ঃ অর্থাৎ যদি মুসান্নিফ রহ. এর উক্তি وَالْاِلْهَامُ لَيْسَ مِنْ اَسْبَابِ الْمَعْرِفَةِ দ্বারা "ইলহাম সাধারণ মানুষের জন্য জ্ঞানের মাধ্যম নয়" বলে উদ্দেশ্য না হয়। অথচ নিঃসন্দেহে ইলহাম দ্বারা ইলহাম প্রাপ্ত ব্যক্তির জ্ঞান লাভ হয়। তাই মুসান্নিফ রহ. এর উক্তি اَلْاِلْهَامُ لَيْسَ مِنْ اَسْبَابِ الْمَعْرِفَةِ এর এরূপ অর্থ করা যে, ইলহাম কারও জন্যই জ্ঞানের মাধ্যম নয়– সহীহ হবে না।

ইলমের মাধ্যম তিনটি –এ নিয়ে আরেকটি প্রশ্নোত্তর

قَوْلُهُ وَاَمَّا خَبَرُ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ ঃ এটি ইলমের মাধ্যম তিনটিতে সীমাবদ্ধ হওয়ার উপর দ্বিতীয় অভিযোগ অর্থাৎ ন্যায় পরায়ণ বর্ণনাকারীর সংবাদ যা تَوَاتُر এর স্তরে পৌছেনি। এমনিভাবে মুজতাহিদদের তাকলীদও তো জ্ঞান সৃষ্টি করে। সুতরাং জ্ঞানের মাধ্যম তো পাঁচটি হয়ে গেল। কাজেই একে তিনটিতে সীমাবদ্ধ করা শুদ্ধ হল না।

এর জবাব হচ্ছে, মুসান্নিফ রহ. তার উক্তি اَسْبَابُ الْعِلْمِ ثَلَاثَةٌ এর মধ্যে عِلْم দ্বারা تَصْدِيْق يَقِيْنِىْ উদ্দেশ্য করেছেন। আর خَبَرِوَاحِد দ্বারা দ্বারা ظَن তথা প্রবল ধারণা এবং মুজতাহিদের তাকলীদ দ্বারা এরূপ একটি বিশ্বাস অর্জিত হয়, যা কোন সন্দেহ সৃষ্টিকারীর সংশয় দ্বারা বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মূলতঃ ظَن এবং جَازِم اِعْتِقَاد উভয়টি تَصْدِيْقَات غَيْرِ يَقِيْنِىْ এর অন্তর্গত। কাজেই সীমাবদ্ধতা ঠিক আছে।

قَوْلُهٗ خَبَرُ الْوَاحِدِ : এখানে ঐ خَبَر কে বুঝানো হয়েছে, যার বর্ণনাকারীদের সংখ্যা تَوَاتُر এর স্তরে গিয়ে পৌঁছেনি।

আদিল অর্থ :

قَوْلُهٗ اَلْعَدْلُ : عادل বলতে ঐ জ্ঞান সম্পন্ন প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলমানকে বুঝানো হয়েছে, যিনি ফরয-ওয়াজিব ও সুন্নাতে মুআকাদ্দা আদায়ের পাশাপাশি কবীরা গুনাহ এবং সগীরার পুনরাবৃত্তি হতে বেঁচে থাকেন। এমন কোন কাজও করেন না, যা তার নির্ভরযোগ্যতাকে ক্ষতবিক্ষত করে। যেমন, চলাচলের রাস্তায় বসে পেশাব করা, বাজারে হেঁটে হেঁটে কোন কিছু খাওয়া ইত্যাদি।

মুজতাহিদ

قَوْلُهٗ اَلْمُجْتَهِدُ : مُجْتَهِد ঐ আলিমকে বলে, যিনি শরী'আতের দলীল চতুষ্টয় তথা কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কি্বয়াস দ্বারা বিধি-বিধান বের করতে সক্ষম হন। আর اِجْتِهَاد এর জন্য উসূলে ফিক্বহে বর্ণিত اِسْتِدْلَال পদ্ধতি এবং সর্বসম্মত বিষয়াদি এবং আহকাম সম্বলিত আয়াতের জ্ঞান থাকা শর্ত। তবে আহকাম সম্বলিত আয়াত মুখস্ত থাকা শর্ত নয় বরং প্রয়োজনের সময় দ্রুত মনে করতে পারাই যথেষ্ট।

قَوْلُهٗ يُفِيْدُ اَنَّ الظَّنَّ وَالْاِعْتِقَادَ الخ : এখানে لَفّ نَشْر مُرَتَّب (ক্রমবিকাশের সুবিন্যস্ত ধারা) অবলম্বনে বলা হয়েছে, খবরে ওয়াহিদ প্রবল ধারণা আর তাকলীদে মুজতাহিদ বিশ্বাস সৃষ্টি করে, যা দূরীভূত হতে পারে। কেননা মুকাল্লিদের মনে কখনও অন্য ইমাম এবং মুজতাহিদের عِلْم এর ব্যাপারে বিশ্বাস সৃষ্টি হয়, যার ফলে সে তার তাকলীদ করতে শুরু করে। এভাবে মুকাল্লিদ কখনও মুজতাহিদের স্তরে উন্নীত হয় এবং কোন ইমামের তাকলীদের ভিত্তিতে তার যে বিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছিল, তা তার বিপরীত কোন দলীল পাওয়া যাওয়ার কারণে পূর্বোক্ত তাকলীদ জনিত বিশ্বাস দূরীভূত হয়ে যায়। এখানে এ প্রসঙ্গে ইমাম আবু জাফর তুহাবী রহ. এর হানাফী মাযহাব গ্রহণ করার ব্যাপারে একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। ঘটনা হল, ইমাম তুহাবী রহ. এর মাতা গর্ভাবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন। তাই ইমাম সাহেব রহ. কে তার মায়ের পেট ফেঁড়ে বের করা হয়েছিল। ইমাম সাহেব বংশীয় প্রভাবে শাফেয়ী মাযহাব অবলম্বী হয়ে গেলেন। কিন্তু তিনি যখন ইমাম শাফিঈ রহ. এর কিতাবে এ মাসআলা পড়লেন যে, যদি গর্ভবতী মহিলা মারা যাওয়ার সময় তার পেটের বাচ্চা জীবিত থাকে, তাহলে তার পেট ফাঁড়া যাবে না বরং মায়ের সাথে বাচ্চাকেও দাফন করতে হবে। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা রহ. এর মতে পেট ফেঁড়ে বাচ্চা বের করতে হবে। তখন ইমাম তুহাবী রহ. এ কথা বলে শাফিঈ মাযহাব ছেড়ে দিয়ে হানাফী মাযহাব গ্রহণ করলেন যে, এমন ব্যক্তির মাযহাব পছন্দ করি না, যিনি আমার ধ্বংসের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হন।

وَالْعَالَمُ اَیْ مَاسِوَی اللّٰهِ تَعَالٰی مِنَ الْمَوْجُوْدَاتِ مِمَّا يُعْلَمُ بِهِ الصَّانِعُ يُقَالُ عَالَمُ الْاَجْسَامِ وَعَالَمُ الْاَعْرَاضِ وَعَالَمُ النَّبَاتَاتِ وَعَالَمُ الْحَيَوَانِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ فَتَخْرُجُ صِفَاتُ اللّٰهِ تَعَالٰی لِاَنَّهَا لَيْسَتْ غَيْرَ الذَّاتِ كَمَا اَنَّهَا لَيْسَتْ عَيْنَهَا بِجَمِيْعِ اَجْزَائِهِ مِنَ السَّمٰوَاتِ وَمَا فِيْهَا وَالْاَرْضِ وَمَا عَلَيْهَا مُحْدَثٌ اَیْ مُخْرَجٌ مِنَ الْعَدَمِ اِلَی الْوُجُوْدِ بِمَعْنٰی اَنَّهٗ كَانَ مَعْدُوْمًا فَوُجِدَ خِلَافًا لِلْفَلَاسِفَةِ حَيْثُ ذَهَبُوْا اِلٰی قِدَمِ السَّمٰوَاتِ بِمَوَادِّهَا وَصُوَرِهَا وَاَشْكَالِهَا وَقِدَمِ الْعَنَاصِرِ بِمَوَادِّهَا وَصُوَرِهَا لٰكِنْ بِالنَّوْعِ بِمَعْنٰی اَنَّهَا لَمْ تَخْلُ قَطُّ عَنْ صُوْرَةٍ نَعَمْ اَطْلَقُوا الْقَوْلَ بِحُدُوْثِ مَاسِوَی اللّٰهِ تَعَالٰی لٰكِنْ بِمَعْنَی الْاِحْتِيَاجِ اِلَی الْغَيْرِ لَا بِمَعْنٰی سَبْقِ الْعَدَمِ عَلَيْهِ .

সহজ তরজমা

বিশ্বজগত প্রতিটি অনুকণাসহ ধ্বংসশীলঃ

আর সৃষ্টিজগৎ তথা আল্লাহ তা'আলা ব্যতিত গোটা বস্তু জগৎ, যা দ্বারা স্রষ্টাকে চেনা যায়, ধ্বংসশীল। عَالَم اَجْسَام (দেহ জগৎ) عَالَم اَعْرَاض (আপতন জগৎ) عَالَم النَّبَاتَات (উদ্ভিদ জগৎ) عَالَمُ الْحَيْوَان (প্রাণী জগৎ) ইত্যাদি বলা হয়। অতএব আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী عَالَم তথা সৃষ্টিজগতের অন্তর্ভূক্ত হবে না। কেননা তা আল্লাহ

তা'আলার সত্তা ভিন্ন কিছু নয়; যেমন হুবহু সত্তাও নয়। তার সর্বাংশ অর্থাৎ আসমানসমূহ, আসমানী সৃষ্টি, পৃথিবী ও পার্থিব সৃষ্টিসহ সবই ধ্বংসশীল। অর্থাৎ এগুলোকে অনস্তিত থেকে বের করে অস্তিত্ব দান করা হয়েছে। অর্থাৎ এগুলো পূর্বে ছিল না, পরে অস্তিত্ব লাভ করেছে। তবে দার্শনিকরা এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেন। তারা বলেন, আমসানসমূহ তার মূলধাতু, শারীরিক আকৃতি ও রূপ সহ সুপ্রাচীন। তদ্রুপ عَنَاصِر (মূল উপাদান) ও তার مَادَّة (মূলধাতু) এবং صُوَرت جِسْمِيَّة (শারিরিক আকৃতি) قَدِيْم হওয়ার কথা বলেন। তবে তারা এগুলোকে نَوْع হিসেবে সুপ্রাচীন বলেন। অর্থাৎ عَنَاصِر (উপদানগুলো) কখনও صُوَرت (আকৃতি) থেকে খালি হয়নি। হ্যাঁ দার্শনিকরা আল্লাহ ব্যতিত বাকি সব কিছুর حَادِث হওয়ার কথা বলেছেন। তবে অন্যের দিকে মুখাপেক্ষী হওয়ার দিক থেকে (حَادِث বলেছেন); আগে অস্তিত্ব ছিল না পরে লাভ করেছে এ অর্থে নয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ مَاسِوَى اللّٰهِ تَعَالٰى ঃ এখানে مَا বর্ণটি مَوْصُوْلَه আর سِوٰى শব্দটি غَيْر এর অর্থে হয়ে উহ্য كَانَ فِعْل نَاقِص এর خَبَر হিসেবে نَصَب এর স্থানে রয়েছে। আর مِنَ الْمَوْجُوْدَات এটা مَامَوْصُوْلَه এর বিবরণ। মূল ইবারত এরূপ اَلْعَالَمُ مَا كَانَ غَيْرَ اللّٰهِ تَعَالٰى مِنَ الْمَوْجُوْدَاتِ অর্থাৎ عَالَم ঐ বিদ্যমান বস্তুসমূহের নাম, যা আল্লাহ তা'আলা ভিন্ন অন্য কিছু।

قَوْلُهُ مِمَّا يُعْلَمُ بِهِ الصَّانِعُ ঃ এতে নামকরণের কারণের প্রতি ইংগিত। এর বিবরণ হল, عَالَم শব্দটি فَاعِل এর ওজনে اسم اله –অভিধানে যার মাধ্যমে অন্য বস্তুর জ্ঞান লাভ তাকে عَالَم বলে। পরবর্তীতে শব্দটি এমন বিদ্যমান বস্তুর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে লাগল, যার মাধ্যমে জগতের স্রষ্টার অস্তিত্বের জ্ঞান লাভ হয়। আর যেহেতু আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত যত জ্ঞানসম্পন্ন এবং জ্ঞানহীন বাস্তব জিনিস রয়েছে, সেগুলোর অবস্থা নিয়ে সঠিকভাবে চিন্তা গবেষণা করলে স্রষ্টার অস্তিত্বের জ্ঞান লাভ হয়। এ কারণে আল্লাহ ব্যতিত বাকি সব বিদ্যমান বস্তু, مَايُعْلَمُ بِهِ الصَّانِعُ তথা যা দ্বারা স্রষ্টা জ্ঞান লাভ হয়, সেগুলোকে عَالَم বলা হয়। قِيَاس এর شِكْل হবে নিম্নরূপঃ

مَاسِوَى اللّٰهِ تَعَالٰى مِنَ الْمَوْجُوْدَاتِ يُعْلَمُ بِهِ الصَّانِعُ (সুগরা)

وَكُلُّ مَايُعْلَمُ بِهِ الصَّانِعُ فَهُوَ عَالَمٌ (কুবরা) ফলাফর বের হল مَاسِوَى اللّٰهِ مِنَ الْمَوْجُوْدَاتِ عَالَمٌ

আলম শব্দের তাহকীক

قَوْلُهُ يُقَالُ ঃ عَالَمٌ সম্পর্কে কেউ কেউ বলেন, এর ব্যবহার জ্ঞান সম্পূর্ণ জিনিসের ক্ষেত্রে হয়। আবার কেউ বলেন, জ্ঞানহীন জিনিসের ক্ষেত্রে হয়। উভয় অবস্থায়ই অর্থাৎ চাই তার ব্যবহার জ্ঞান সম্পূর্ণ জিনিসের ক্ষেত্রে হোক বা জ্ঞানহীন জিনিসের ক্ষেত্রেই হোক। কেউ কেউ বলেন, عَالَم আল্লাহ তা'আলা ব্যতিত সব ধরনের বিদ্যমান বস্তুর اَجْنَاس তথা সমপর্যায়ের বস্তুরাজির সমষ্টির নাম। এ হিসেবে সমজাতীয় সব জিনিসের উপরই عَالَم শব্দটি ব্যবহৃত হবে; প্রতিটি অসমজাতীয় বস্তুর ক্ষেত্রে নয়। আবার কেউ কেউ বলেন, আলম হল, مَجْمُوْعَة اَجْنَاس অর্থাৎ সমজাতীয় বস্তুরাজির সমষ্টি এবং جُزْء অর্থাৎ প্রতিটি جِنْس এর মাঝে যৌথভাবে ব্যবহৃত। আর ঐ যৌথ জিনিসটি হল, আল্লাহ তা'আলা ব্যতিত হওয়া। কেননা সামগ্রিক জিন্সের বেলায় যেমন مَاسِوَى اللّٰه ব্যবহৃত হয়, তেমনি প্রতিটি জিন্সের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়। ফলে عَالَم শব্দটি সকল جِنْس এর ক্ষেত্রে যেমন ব্যবহৃত হয় তেমনি جُزْء অর্থাৎ প্রতিটি جِنْس এর ক্ষেত্রেও হবে। এ দ্বিতীয় মতামতটিকে বিশুদ্ধ বলা হয়েছে। কেননা عَالَم এর جَمْع আসে عَالَمِيْنَ এবং عَوَالِم আর عَالَم যদি সকল جِنْس এর সমষ্টির নাম হত, তাহলে তার বহুবচন হত না। কেননা বহুবচন তো তারই হয়, যার বহু একক আছে। আর সমষ্টির তো বহুঅংশ হয়। বহু একক হয় না।

শারিহ রহ. عَالَم শব্দকে বিভিন্ন جِنْس এর দিকে সম্বন্ধ করে এদিকে ইংগিত করেছেন যে, সকল جِنْس এর সমষ্টিকে عَالَم বলে না বরং قدر مشترك কে عالم বলে। এর ব্যবহার প্রতিটি جِنْس এর ক্ষেত্রেই হবে। তাছাড়া عَالَم শব্দকে জিন্‌স সমূহের প্রতি اضافت করে ইংগিত করেছেন, عَالَم শব্দের ব্যবহার শুধু جِنْس এর ক্ষেত্রে হবে; اَفْرَاد এর ক্ষেত্রে হবে না। অতএব عَالَم بَكْر- عَالَم زَيْد ইত্যাদি বলা শুদ্ধ হবে না। এ ছাড়া সে সব جِنْس এর প্রতি عَالَم এর اِضَافَت হয়, তার সবকটিই غَيْر ذَوِى الْعُقُوْل এতে এ দিকে ইশরা করেছেন, عَالَم শব্দের ব্যবহার কেবল জ্ঞানসম্পন্ন বস্তুর ক্ষেত্রেই নয় বরং জ্ঞানহীন জিনিসের ক্ষেত্রেও হয়।

قَوْلُهٗ فَيَخْرُجُ ঃ এটি عَالَم এর ব্যাখ্যা। مَاسِوَى اللّٰهِ এর শাখার বিবরণ অর্থাৎ পূর্বের টীকায় বলা হয়েছে, مَاسِوَى اللّٰهِ এর মধ্যকার سِوَى শব্দটি غَيْر এর অর্থে ব্যবহৃত। ইবারতের উদ্দেশ্য হল, عَالَم ঐ সকল বিদ্যমান জিনিসের নাম, যা আল্লাহ তা'আলা ভিন্ন অন্য কিছু। আর একটি জিনিস অপর একটি জিনিসের غَيْر হওয়ার অর্থ হল, প্রথম জিনিসটি দ্বিতীয় জিনিসটি থেকে পৃথক এবং বিচ্ছিন্ন হওয়া সম্ভব হওয়া। আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী যেমন, عِلْم , قُدْرَت , حَيَات ইত্যাদি এগুলো পৃথক এবং বিচ্ছিন্ন হওয়া সম্ভব নয়। কেননা عِلْم বিচ্ছিন্ন হলে جَهْل (মুর্খতা), قُدْرَت বিচ্ছিন্ন হলে عَجْز (অক্ষমতা) আর حَيَات বিচ্ছিন্ন হলে مَوْت (মৃত্যু) আবশ্যক হয়। অথচ আল্লাহ তা'আলা এসব ত্রুটি হতে সম্পূর্ণ পবিত্র। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী যখন আল্লাহর সত্ত্বা থেকে বিচ্ছিন্ন এবং পৃথক হওয়া অসম্ভব তখন صِفَات (গুণাবলী) আল্লাহর সত্ত্বার غَيْر (ভিন্ন) হল না। আর গুণাবলী যখন আল্লাহর غَيْر নয় তখন তা عَالَم থেকে বের হয়ে যাবে।

قَوْلُهٗ لِمَا اَنَّهَا لَيْسَتْ عَنْهَا ঃ অর্থাৎ সিফাতগুলো আল্লাহ তা'আলার হুবহু সত্ত্বাও নয়। কারণ, আশায়িরাদের মতে একটি জিনিস হুবহু অপর একটি জিনিস হওয়ার অর্থ হল, উভয়টির অর্থ এক হওয়া। আর আল্লাহ তা'আলার সত্ত্বা ও তার গুণাবলীর অর্থ এক নয়। বিধায় গুণাবলী আল্লাহ তা'আলার হুবহু সত্ত্বা নয়।

বিশ্বচরাচরের তাবৎ বস্তুর বিবরণ

قَوْلُهٗ بِجَمِيْعِ اَجْزَائِهٖ ঃ جَمِيْع শব্দটি كُلّ اَفْرَادِى এর অর্থে অর্থাৎ প্রত্যেকটি অংশ উদ্দেশ্য। তাফসীরে কাবীরে ইমাম রাযী রহ. আল্লাহ তা'আলা ব্যতিত বাকি বিদ্যমান বস্তুসমূহের ভাগ করতে গিয়ে বলেন, مَاسِوَى اللّٰهِ যাকে عَالَم বলা হয়, তা তিন অবস্থা থেকে খালি নয়। হয়ত সেগুলো مُتَحَيِّز তথা অনুভূত ইশারা যোগ্য হবে। অথবা مُتَحَيِّز এর صِفَة হবে বা হবে না। প্রথম সুরতে অর্থাৎ যখন مُتَحَيِّز হবে তখন যদি তা বণ্টনযোগ্য না হয়, তাহলে তাকে جَوْهَرفَرْد এবং جُزْء لَايَتَجَزّٰى বলে। আর বণ্টনযোগ্য হলে তাকে جِسْم বলে। তা আবার দুই প্রকার। **এক.** عُلْوِى (উর্ধ্বজগত)। যেমন– আসমান, তারকারাজি, আরশ, কুরসী, লাওহ–ক্বলম, জান্নাত ইত্যাদি। **দুই.** سُفْلِى (নিম্ন জগতের)। চাই তা بَسِيْط হোক। যেমন, চার উপাদান যথা আগুন, পানি, মাটি, বাতাস। কিংবা তা مُرَكَّب হোক। যেমন, مَوَالِيْد ثَلَاثَة (তিন প্রজন্ম) তথা প্রাণী, উদ্ভিদ, জড়বস্তু।

আর مَاسِوَى اللّٰهِ এর দ্বিতীয় প্রকার যা مُتَحَيِّز এর صِفَة তা হল اَعْرَاض বা আপনতন। আর مَاسِوَى اللّٰهِ এর তৃতীয় প্রকার যা مُتَحَيِّز ও নয় আবার مُتَحَيِّز এর সিফাতও নয়, তা হল, আত্মাসমূহ। তা হয়ত عُلْوِى (উর্ধ্ব জগতের) হবে অথবা سُفْلِى (নিম্ন জগতের) হবে। অতঃপর سُفْلِى যদি ভাল হয় তাহল জ্বীন আর মন্দ হলে শয়তান। আর যদি দেহের সাথে সম্পকযুক্ত হয়, তা হলে اَرْوَاح مَلٰئِكَة (ফিরিশতাদের আত্মা)। আর দেহের সাথে সম্পৃক্ত না হলে তাকে اَرْوَاح مُقَدَّسَة (পবিত্রাত্মা) বলে।

قَوْلُهٗ مِنَ السَّمٰوٰتِ ঃ এটি উদাহরণস্বরূপ اَجْزَاء এর বয়ান। উদ্দেশ্য হল, নশ্বরতার হুকুমকে ব্যাপক করা।

এ জগত অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব পেয়েছে

قَوْلُهٗ مُحْدَثٌ اَىْ مُخْرَجٌ مِنَ الْعَدَمِ ঃ অভিধানে প্রত্যেক নব সৃষ্ট জিনিসকে حَادِث বলে। কালাম শাস্ত্রবিদগণ যা অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব লাভ হবে, তাকে حَادِث বলেন। অর্থাৎ যা পূর্বে ছিল না এখন সৃষ্টি হল এবং অনস্তিত্ব হতে অস্তিত্বে এল। কালাম শাস্ত্রবিদদের মতে عَالَم এবং প্রতিটি অংশ চাই তা عَالَم اَعْيَان (স্বাধিষ্ট জগৎ) বা عَالَم جَمَادَات (জড় জগৎ) হোক চাই مَحْسُوْسَات (ইন্দ্রিয়ানুভূত) বা مَعْقُوْلَات (বিবেক লদ্ধ) হোক। চাই جِنْس হোক বা نَوْع । চাই مُرَكَّب হোক বা بَسِيْط । চাই سَمَاوِى (উর্ধ্বজগতের) বা اَرْضِى (মর্তজগতের) মোটকথা, আল্লাহ ভিন্ন যাবতীয় জিনিস حَادِث অনস্তিত্ব হতে অস্তিত্বে এসেছে এবং শুধু আল্লাহর ইচ্ছা এবং ক্ষমতায় কোন মূলধাতু ও উপকরণ ব্যতিত শুধু স্রষ্টার হিকমতের চাহিদা অনুযায়ী অনস্তিত্বে হতে অস্তিত্ব লাভ করেছে। আপন স্রষ্টা ও অস্তিত্ব দাতার অভিনবত্ব ও অতুলনীয় এবং তার সৃষ্টির তামাশা দেখায়। কখনও কখনও বসন্ত। কখনও বিরান, কখনও বাগান, কখনও মেঘ, কখনও বৃষ্টি, কখনও ধূলাবালি, কখনও দিন বড়, কখনও বা রাত। পানির প্রতিটি ফোটা, আগুনের প্রতিটি লেলিহান, বালির প্রতিটি কণা, প্রতিটি ফুল ফোটা, প্রতিটি কলি প্রতিটি পাতা, প্রতিটি গাছ, প্রতিটি পাথর, ছোট হোক চাই বড়, আসমানের প্রতিটি অণু-পরমাণু, মুখে কিংবা অবস্থায় রাত কিংবা দিনের আলোয় কিংবা আঁধারে এ কথাই বলছে, প্রতিটি প্রাণী এ গান গাইছে,

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

দার্শনিকদের মতে বিশ্বজগতের নশ্বরতা

قَوْلُهُ خِلَافًا لِلْفَلَاسِفَةِ ঃ অর্থাৎ عَالَم তার সকল অংশসহ حَادِث হওয়ার কথাটি দার্শনিকদের মতবিরোধপূর্ণ। দার্শনিকদের মতামতের সারাংশ হল, দেহ দুই প্রকার। **এক.** أَجْسَام فَلَكِيَّة (উর্ধ্বগতীয় দেহ সমূহ। যথা আসমান, আরকা, আরশকুরসী ইত্যাদি। **দুই.** أَجْسَام عُنْصُرِيَّة বা বস্তুগত দেহসমূহ। যেমন, চারটি মৌলিক উপাদান। চাই তা بَسِيط হোক তথা আগুন, পানি, মাটি ও বাতাস অথবা مُرَكَّب হোক। যেমন, مَوَالِيد ثَلَاثَة (তিন প্রজন্ম) অর্থাৎ প্রাণী, উদ্ভিদ ও জড় বস্তুসমূহ। সুতরাং أَجْسَام فَلَكِيَّة (উর্ধ্বজগতীয় দেহ) স্পষ্ট তার هَيُولٰى এবং صُوَرت نَوْعِيَّة ও صُوَرت جِسْمِيَّة সহ এমনিভাবে তার أَعْرَاض যেমন– আলো, আকার, গতি, অবস্থা, ইত্যাদিসহ অবিনশ্বর। তবে حَرَكَت (গতি) এবং وَضْع (প্রকৃতি) দ্বারা ব্যাপক حَرَكَت ও وَضْع উদ্দেশ্য। কেননা তারাও حَرَكَات جُزْئِيَّه এবং أَوْضَاع خَبْر نيَّه কে حَادِث বলে থাকেন। কারণ, আসমানের حَرَكَات جُزْئِيَّه এবং أَوْضَاع جُزْئِيَّه যে কোন একটিকে মেনে নেওয়া হলে তা প্রথমে ছিল না। অর্থাৎ ইতোপূর্বে এ গতি ও প্রকৃতি ছিল না বরং অন্য গতি ও প্রকৃতি ছিল। আর যে জিনিসই অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্ব লাভ করে, সেটিই নশ্বর হয়। কাজেই আসমানের حَرَكَات جُزْئِيَّه এবং أَوْضَاع جُزْئِيَّه সবই নশ্বর হবে।

قَوْلُهُ لِلْفَلَاسِفَةِ ঃ এখানে দার্শনিকগণ বলতে এরিষ্টটল ও তার অনুসারীবর্গ উদ্দেশ্য। যেমন, نَشْرُ الطَّوَالِع গ্রন্থে বর্ণিত আছে,

وَزَعَمَ اَرَسْطَاطَالِيس وَاَبُو نَصْرِ الْفَارَابِىُ وَاَبُو عَلِيّ بِنُ سِينَا اَنَّ الْاَفْلَاكَ قَدِيْمَةٌ بِمَوَادِّهَا وَصُوَرِهَا الْجِسْمِيَّةِ بِنَوْعِهَا - وَصُوَرِهَا النَّوْعِيَّةِ بِجِنْسِهَا .

অর্থাৎ এরিষ্টটল, আবু নাসর ফারাবী, আবু আলী ইবনে সীনা মনে করেন, أَفْلَاك তথা আসমানসমূহ মূলাধাতু এবং তার পরিমান ও আকার-আকৃতিসহ কদীম বা অবিনশ্বর; শুধু তার حَرَكَات جُزْئِيَّه কদীম নয়। আর উপাদানসমূহের মূলধাতু, তার صُوَرت جِسْمِيَّه এর نَوْع এবং صُوَرت نَوْعِيَّه এর জিন্সও কদীম।

ثُمَّ اَشَارَ اِلٰى دَلِيْلِ حُدُوْثِ الْعَالَمِ بِقَوْلِهٖ اِذْ هُوَ اَيِ الْعَالَمُ اَعْيَانٌ وَاَعْرَاضٌ لِاَنَّهٗ اِنْ قَامَ بِذَاتِهٖ فَعَيْنٌ وَالَّا فَعَرَضٌ وَكُلٌّ مِنْهُمَا حَادِثٌ لِمَا سَنُبَيِّنُ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ الْمُصَنِّفُ لِاَنَّ الْكَلَامَ فِيْهِ طَوِيْلٌ لَا يَلِيْقُ بِهٰذَا الْمُخْتَصَرِ كَيْفَ وَهُوَ مَقْصُوْرٌ عَلَى الْمَسَائِلِ دُوْنَ الدَّلَائِلِ فَالْاَعْيَانُ مَا اَيْ مُمْكِنٌ يَكُوْنُ لَهٗ قِيَامٌ بِذَاتِهٖ بِقَرِيْنَةِ جَعْلِهٖ مِنْ اَقْسَامِ الْعَالَمِ وَمَعْنٰى قِيَامِهٖ بِذَاتِهٖ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِيْنَ اَنْ يَتَحَيَّزَ بِنَفْسِهٖ غَيْرَ تَابِعٍ تَحَيُّزُهٗ لِتَحَيُّزِ شَيْءٍ اٰخَرَ بِخِلَافِ الْعَرَضِ فَاِنَّ تَحَيُّزَهٗ تَابِعٌ لِتَحَيُّزِ الْجَوْهَرِ الَّذِيْ هُوَ مَوْضُوْعُهٗ اَيْ مَحَلُّهُ الَّذِيْ يُقَوِّمُهٗ وَمَعْنٰى وُجُوْدِ الْعَرَضِ فِى الْمَوْضُوْعِ هُوَ اَنَّ وُجُوْدَهٗ فِيْ نَفْسِهٖ هُوَ وُجُوْدُهٗ فِى الْمَوْضُوْعِ وَلِهٰذَا يَمْتَنِعُ الْاِنْتِقَالُ عَنْهُ بِخِلَافِ وُجُوْدِ الْجِسْمِ فِى الْحَيِّزِ فَاِنَّ وُجُوْدَهٗ فِيْ نَفْسِهٖ اَمْرٌ وَ وُجُوْدَهٗ فِى الْحَيِّزِ اَمْرٌ اٰخَرُ وَلِهٰذَا يَنْتَقِلُ عَنْهُ وَعِنْدَ الْفَلَاسِفَةِ مَعْنٰى قِيَامِهٖ بِشَيْءٍ اٰخَرَ اِخْتِصَاصُهٗ بِهٖ بِحَيْثُ يَصِيْرُ الْاَوَّلُ نَعْتًا وَالثَّانِيْ مَنْعُوْتًا سَوَاءٌ كَانَ مُتَحَيِّزًا كَمَا فِيْ سَوَادِ الْجِسْمِ اَوْلَا كَمَا فِيْ صِفَاتِ اللّٰهِ عَزَّ اسْمُهٗ وَالْمُجَرَّدَاتِ .

সহজ তরজমা

বিশ্বজগতের নশ্বরতার প্রমাণ ঃ অতঃপর মুসান্নিফ রহ. আলম (জগৎ) নশ্বর হওয়ার দলীলের প্রতি তার এ উক্তি "কেননা উহা অর্থাৎ আলম أَعْيَان ও أَعْرَاض এর সমষ্টি" দ্বারা ইংগিত করেছেন। কারণ, তা যদি আপনা আপনিই প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে তা عَيْن অন্যথায় عَرَض আর এ দুয়ের প্রতিটিই নশ্বর ঐ দলীলের কারণে, যা আমরা শীঘ্রই

বর্ণনা করব। মুসান্নিফ রহ. সে দিকে (দলীল প্রমাণের দিকে) যাননি। কেননা তাতে দীর্ঘ আলোচনা রয়েছে। যা এই সংক্ষিপ্ত কিতাবে উপযোগী নয়। কিভাবেই উপযোগী হতে পারে। এ কিতাবটি তো প্রমাণাদি ছাড়া মূল বিষয়ের উপর সীমিত। মোটকথা, أَعْيَان এমন বস্তু যা নিজে নিজে প্রতিষ্ঠিত। এর প্রকার সাব্যস্ত করার প্রমাণ রয়েছে। আর عَيْن এর নিজে নিজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অর্থ কালাম শাস্ত্রবিদদের মতে, সেটি সরাসরি مُتَحَيِّز (স্থানাধিকারী অনুভূত ইশারার যোগ্য) হবে; তার مُتَحَيِّز (অনুভূত ইশারার যোগ্য) হওয়া অন্য কারও مُتَحَيِّز হওয়ার অধীন নয়। তবে عَرَض এর বিপরীত। কারণ, তার مُتَحَيِّز হওয়া ঐ جَوْهَر (মূলবস্তু) এর مُتَحَيِّز হওয়ার অধীন, যা (جَوْهَر) তার (عَرَض) স্থান, যা তাকে স্থীর রাখে। عَرَض কে তার مَوْضُوع বা স্থানে পাওয়া যাওয়ার অর্থ হল, তার প্রকৃত অস্তিত্ব হুবহু সেটিই যা তার স্থানে আছে। আর এ কারণেই তার জন্য সেখান থেকে স্থানান্তরিত হওয়া অসম্ভব। তবে جِسْم (দেহ) এর কোন স্থানে অধিষ্ঠিত হওয়া এর বিপরীত। কারণ, جِسْم (দেহের) এর প্রকৃত অস্তিত্ব ও ভিন্ন জিনিস, এ কারণে جِسْم (দেহ) এর জন্য এক স্থান হতে (অন্যত্র) স্থানান্তরিত হওয়া সম্ভব। আর দার্শনিকদের মতে কোন বস্তু নিজে নিজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অর্থ হল, বস্তুটি তাকে প্রতিষ্ঠিত এবং স্থীর রাখার মত কোন স্থানের অমুখাপেক্ষী হওয়া আর কোন বস্তু অন্যের সাথে প্রতিষ্টিত হওয়ার অর্থ হল, বস্তুটি অপর বস্তুর সাথে এমন বিশেষ সম্পর্ক রাখা যে, প্রথমটি نَعْت (গুণ) এবং দ্বিতীয়টি مَنْعُوْت (গুণের অধিকারী) হতে পারে, চাই তা ইন্দ্রিয় অনুভূত ইংগিতের যোগ্য হোক, যেমন দেহের কাল রং কিংবা مُتَحَيِّز না হোক, যেমন স্রষ্টা ও দেহাতিত জিনিসসমূহের গুণাবলী –এর কোনটিই مُتَحَيِّز নয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

প্রমাণের দিকে ইংগিত

قَوْلُهُ ثُمَّ اَشَارَ ঃ কালাম শাস্ত্রবিদগণ عَالَم حَادِث হওয়ার স্বপক্ষে দলীল হিসেবে বলেন, عَالَم হল أَعْيَان ও أَعْرَاض এর সমষ্টি। আর أَعْيَان ও أَعْرَاضٌ উভয়টি নশ্বর। কাজেই আলমও নশ্বর। মুসান্নিফ রহ. পূর্ণ দলীল উল্লেখ করেননি, যা অনেক মুকাদ্দমা দ্বারা গঠিত বরং শুধু তার প্রথম মুকাদ্দামা اَلْعَالَمُ أَعْيَانٌ وَأَعْرَاضٌ কে উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হয়েছেন। এ কারণে শারিহ রহ. এটাকে দলীলের প্রতি ইংগিত সাব্যস্ত করেছেন। তাছাড়া ইংগিত বলার আরেকটি কারণ সম্ভবতঃ মুসান্নিফ রহ. এর তার উক্তি اِذْهُوَ أَعْيَانٌ وَأَعْرَاضٌ দ্বারা عَالَم এর বিভাজন ও তার প্রকারসমূহ উল্লেখ করা উদ্দেশ্য। আলম নশ্বর হওয়ার দলীল দেওয়া ইচ্ছাই নয়। বিভাজনের উপর ইংগিত উক্তিটি عَالَم এর নশ্বরতার দলীলের একটি মুকাদ্দমা বিধায় এ উক্তিকে দলীলের প্রতি ইশারা সাব্যস্ত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ اِذْ هُوَ ঃ এটি মুসান্নিফ রহ. এর পক্ষ থেকে আলমের নশ্বরতার দলীলের সুগরা।

قَوْلُهُ: لِاَنَّهُ قَامَ بِذَاتِهِ ঃ এটি শারিহ রহ. এর পক্ষ থেকে صُغْرَى অর্থাৎ আলম (জগৎ) أَعْيَان ও أَعْرَاض এর সীমাবদ্ধ হওয়ার দলীল। দলীলের সারমর্ম হল, عَالَم বলা হয় সমস্ত বিদ্যমান বস্তু সমূহকে। আর সমস্ত বিদ্যমান বস্তু দুই অবস্থা থেকে খালি নয়। হয়ত তা قَائِمٌ بِالذَّاتِ বা স্বাধিষ্ঠ হবে, তাহলে তাকে عَيْن বলে অথবা قَائِم بِالْغَيْر (অন্যের উপর প্রতিষ্ঠিত) হবে, যাকে عَرَض বলে। বুঝা গেল, আলম أَعْيَان ও أَعْرَاض এর মধ্যে সীমাবদ্ধ নশ্বর হওয়ার দলীলের كُبْرَى আর উক্ত كُبْرَى অর্থাৎ أَعْيَان ও أَعْرَاض উভয়টি নশ্বর হওয়ার দলীল শারিহ রহ. সামনে উল্লেখ করবেন বলে তার উক্তি لِمَا نُبَيِّنُ দ্বারা ওয়াদা করছেন।

قَوْلُهُ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ ঃ لَهُ এর মধ্যকার যমীর مَرْجِع হল حُدُوْث । অর্থাৎ মুসান্নিফ রহ. أَعْيَان ও أَعْرَاض এর নশ্বরতা এবং তদীয় দলীলের প্রতি লক্ষ্য করেন নি। কেননা এতে অনেক দীর্ঘ আলোচনা রয়েছে। এ সংক্ষিপ্ত কিতাবে তা উপযোগী নয়। কারণ, মুসান্নিফ তার কিতাবে শুধু আকীদাগত মাসআলাসমূহ বর্ণনা করেছেন। সেগুলোর দলীল-প্রমাণের পিছনে পড়েননি।

قَوْلُهُ فَالْاَعْيَانُ مَا اَىْ مُمْكِنٌ ঃ এখন থেকে মুসান্নিফ রহ. عَيْن এর সংজ্ঞা দিচ্ছেন। আর তা হল, ঐ مُمْكِن (সম্ভাব্য বস্তু) কে বলে, যা নিজে নিজে প্রতিষ্ঠিত। মুসান্নিফ রহ. উক্তি فَاَعْيَان مَا এর মধ্যে مَا বর্ণটি مُمْكِن (সম্ভাব্য) وَاجِب (অপরিহার্য) ও مُمْتَنِع (অসম্ভব) সবগুলোকে শামিল ছিল। কিন্তু أَعْيَان কে ব্যাপাক হওয়ায় عَالَم এর প্রকার সাব্যস্ত করার এ কথা প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, এখানে مَا বর্ণটি দ্বারা مُمْكِن (সম্ভাব্য বস্তু)

উদ্দেশ্য। যেমন, শারিহ রহ. স্বয়ং তার ব্যাখ্যা مُمْكِنٌ শব্দ দ্বারা করেছেন। কারণ, عَالَم হল আল্লাহ ব্যতিত সব সম্ভাব্য বস্তুর নাম। আর مُمْكِنٌ (সম্ভাব্য বস্তুর) প্রকারও مُمْكِنٌ ই হয়। কাজেই اَعْيَان আলমের প্রকার হওয়ায় এটিও مُمْكِنٌ (সম্ভাব্য)।

قَوْلُهٗ بِقَرِيْنَةِ جَعْلِهٖ ঃ অর্থাৎ আমরা مَا বর্ণটি দ্বারা مُمْكِن উদ্দেশ্য করেছি এ প্রমাণের ভিত্তিতে যে مُمْكِنَات এর অন্তর্ভুক্ত।

قَوْلُهٗ : وَمَعْنٰى قِيَامِهٖ بِذَاتِهٖ ঃ মুসান্নিফ রহ. عَيْن এর সংজ্ঞা বলেছিলেন, عَيْن ঐ مُمْكِن কে বলে, যা নিজে নিজে প্রতিষ্ঠিত। পক্ষান্তরে যা অন্যের উপর প্রতিষ্ঠিত তাকে عَرَض বলে। যেহেতু قَائِم بِالذَّات (স্বাধিষ্ঠ) ও قَائِم بِالْغَيْر (অন্যের উপর প্রতিষ্ঠিত) এর অর্থ নিয়ে কালাম শাস্ত্রবিদ এবং দার্শনিকদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে, এ কারণে শারিহ রহ. উক্ত বিরোধকে এমনভাবে আলোচনা করেছেন, যাতে বিরোধের ফলাফলও সামনে এসে যায়। মতবিরোধ বুঝার পূর্বে দুটি বিষয় স্মরণে রাখতে হবে।

১. কালাম শাস্ত্রবিদের মতে حَيِّز এবং مَكَان একই জিনিস। تَحَيُّز অর্থ, কোন জিনিস حَيِّز বা مَكَان (স্থানে) সমাসীন হওয়া। আর যে জিনিস নিজে নিজে কোন স্থানে সমাসীন হয়, তা নিশ্চয় অনুভূত ইংগিতযোগ্য হবে। অর্থাৎ তার প্রতি আঙ্গুল ইত্যাদি দ্বারা ইশারা করা সম্ভব হবে। আর এমন ইশারা সাধারণতঃ সে সব বস্তুর ক্ষেত্রেই হয়, যা দেখা যায়। এ কারণে تَحَيُّز এর অর্থে বস্তু কোন স্থানে সমাসীন হওয়া পরিদৃষ্ট হওয়া ও অনুভূত ইংগিতযোগ্য সবই শামিল। তবে স্থানে সমাসীন হওয়া তার প্রকৃত অর্থ আর অনুভূত ইশারাযোগ্য হওয়া তার আবশ্যকীয় অর্থ।

২. দার্শনিকগণ এ জগতে এমন কিছু বিদ্যমান বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন, যা বস্তুও নয় আবার অনুভূত ইশারার উপযুক্তও নয়। সুতরাং তা কোন দেহও নয়। আবার কোন স্থানেও নয়। যেমন বিবেক, মানবাত্মা ইত্যাদি। এমন مَوْجُوْدَات কে তারা مُجَرَّدَات (দেহাতীত) নামে অভিহিত করেন। কালাম শাস্ত্রবিদগণ এসব দেহাতীত তথা مُجَرَّدَات কে স্বীকার করেন না। কারণ, দার্শনিকরা যেসব প্রমাণাদির আলোকে এসব সাব্যস্ত করেন, সে সব পুরাপুরি ইসলামী প্রমাণাদির আলোকে সাব্যস্ত নয়।

উক্ত ভূমিকা স্মরণ রাখার পর এবার মতবিরোধ শুনুন। কালাম শাস্ত্রবিদগণ কোন مُمْكِن (সম্ভাব্য বস্তুর) এর قَائِم بِالذَّات (স্বাধিষ্ঠ) হওয়ার অর্থ প্রসঙ্গে বলেন, যা সরাসরি স্থানাধিকারী এবং অনুভূত ইশারার যোগ্য হয়। তার স্থানাধিকারী এবং অনুভূত ইশারার যোগ্য হওয়া অন্য কোন জিনিসের স্থানাধিকার ও অনুভূত ইশারার যোগ্য হওয়ার অধীনস্থ নয়। যেমন মাটি, পানি, পাথর, খড়ি ইত্যাদি দেহগুলো। আর কোন مُمْكِنٌ (সম্ভাব্য বস্তু) এর قَائِم بِالْغَيْر (অন্যের উপর প্রতিষ্ঠিত) হওয়ার অর্থ হল, তার স্থানাধিকার এবং অনুভূত ইশারার যোগ্য হওয়া এমন جَوْهَر (মূলবস্তু) এর স্থানাধিকার ও ইশারার যোগ্য হওয়ার অধীনস্থ, যা কোন স্থানে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। অর্থাৎ নিজে নিজে প্রতিষ্ঠিত নয় বরং যখনই তাকে পাওয়া যাবে তখন অন্যের সাথে মিলিত অবস্থায় পাওয়া যাবে। যেমন– রূপ, স্বাদ, ঘ্রাণ, দুঃখ, খুশি ইত্যাদি।

قَائِمٌ بِالذَّات এ قَائِمٌ بِالْعَرَض এর উক্ত ব্যাখ্যা দ্বারা কালাম শাস্ত্রবিদদের উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ তা'আলার সত্তা ও তার গুণাবলীকে عَالَم থেকে বের করা, যাতে আলমের নশ্বরতায় সেগুলোর নশ্বরতা আবশ্যক না হয়। উক্ত সংজ্ঞানুপাতে আল্লাহ তা'আলার সত্তা ও তার গুণাবলী عَالَم থেকে বেরিয়ে যায়। কেননা উল্লেখিত সংজ্ঞায় قَائِم بِالذَّات এবং قَائِمٌ بِالْغَيْر উভয় টিকে مُتَحَيِّز (স্থানাধিকারী) বলা হয়েছে। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, প্রথমটি সরাসরি مُتَحَيِّز আর আল্লাহ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলী مُتَحَيِّز بِالذَّات (সরাসরি স্থানাধিকারী) এবং مُتَحَيِّز بِالْغَيْر (অন্যের মাধ্যমের স্থানাধিকারী) এর কোনটি নয়। কারণ, কোন স্থানে সমাসীন হওয়া দেহ এবং দেহবিশিষ্ট জিনিসের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহর তা'আলা দেহ এবং দেহ বিশিষ্ট জিনিস থেকে পবিত্র। যেহেতু আল্লাহ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলী কোনভাবেই مُتحيز নয়। সুতরাং তিনি قَائِمٌ بِالذَّاتِ হয়ে ও عَيْن হবে না। আবার قَائِم بِالْغَيْر হয়েও عَرَضহবে না। যখন এগুলো عَيْن ও عَرَض এর কোনটিই নয়, তখন عَالَم এর আওতাভুক্তও হবে না। কারণ, عَالَم তো اَعْيَان ও اَعْرَاض এ সীমাবদ্ধ।

যদি কেউ বলে, দার্শনিকদের মতে مُجَرَّدَات (দেহাতিত) নামে এমন কিছু জিনিস এ জগতে বিদ্যমান আছে,

যা কোন স্থানাধিকারীও নয় আবার অনুভূত ইশারার যোগ্যতাও নয়। উল্লেখিত সংজ্ঞানুপাতে সেগুলোও عَالَم এর বাইরে চলে যাবে। কারণ, সেগুলো যখন স্থানাধিকারী এবং অনুভূত ইশারার যোগ্য নয়, তখন قَائِم بِالذَّاتِ এর আওতাভূক্ত হয়ে عَيْن হতে পারবে না এবং قَائِم بِالْغَيْر হয়ে আরযও হতে পারবে না। কাজেই এগুলো عَالَم হতে বের হয়ে যাবে। কারণ, عَالَم তো عَيْن ও عَرَض এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। উত্তর হল, কালাম শাস্ত্রবিদগণ مُجَرَّدَات (দেহাতিত) বস্তুসমূহ عَالَم থেকে বের হওয়ার ব্যাপারে কোন পরোয়া করেন না। কারণ, তারা مُجَرَّدَات এর অস্তিত্বই স্বীকার করেন না বরং অসম্ভব নয় যে, সংজ্ঞায় مُتَحَيِّز এর শর্তারোপ করে مُجَرَّدَات কে عَالَم থেকে বের করে দেখাবেন, এ জগতে مُجَرَّدَات এর কোন অস্তিত্বই নেই। আর দার্শনিকদের মতে কোন জিনিস قَائِم بِالذَّاتِ হওয়ার অর্থ হল, বস্তুটি তার অস্তিত্ব লাভের ব্যাপারে কোন স্থানের মুক্ষাপেক্ষী নয় যে, তাতে মিলিত হয়ে সে অস্তিত্ব লাভ করবে এবং তা থেকে বিচ্ছিন্ন হলে অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলবে বরং তার নিজস্ব অস্তিত্ব থাকবে। যেমন, দেয়ালের ইট। ইট বিদ্যমান থাকার জন্য দেয়ালের মুখাপেক্ষী নয় বরং সে দেয়াল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও বিদ্যমান থাকে। قَائِم بِالذَّاتِ এর উক্ত সংজ্ঞা আল্লাহ তা'আলার স্বত্ত্বার ক্ষেত্রেও পাওয়া যায়। কারণ, তিনিও তার অস্তিত্বের জন্য কোন স্থানের মুখাপেক্ষী নন। আর قَائِمٌ بِالذَّاتِ বা স্বাধিষ্ঠ বস্তুই عَيْن। কাজেই উক্ত সংজ্ঞানুপাতে আল্লাহ তা'আলার সত্ত্বাও নশ্বর হওয়া আবশ্যক হয়।

আর দার্শনিকদের মতে কোন বস্তুর قَائِمٌ بِالْغَيْر হওয়ার অর্থ হল, বস্তুটির অন্য বস্তুর সাথে এমন বিশেষ সম্পর্ক ও মিল থাকা যে, প্রথম বস্তুটিকে صِفَة (গুণ) আর দ্বিতীয় বস্তুটিকে مَوْصُوف (গুণের অধিকারী) হতে পারে। যেমন, بَيَاض বা শুভ্রতার جِسْم তথা দেহের সাথে এরূপ একটি বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে, যার কারণে প্রথমটি অর্থাৎ শুভ্রতাকে সিফাত এবং جِسْم তথা দেহকে مَوْصُوف সাব্যস্ত করে جِسْم اَبْيَض বলা শুদ্ধ হবে। قَائِمٌ بِالْغَيْر এর উক্ত সংজ্ঞা আল্লাহ তা'আলার গুণাবলীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। কেননা উদাহরণস্বরূপ আল্লাহ তা'আলার সাথে তার عِلْم গুণটির এমন বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে যে, আল্লাহ مَوْصُوف এর عِلْم কে صِفَة সাব্যস্ত করা এবং একথা বলা যে, اَللّٰهُ الْعَلِيْمُ শুদ্ধ হবে। সুতরাং উক্ত সংজ্ঞানুসারে আল্লাহ তা'আলার গুণাবলীও قَائِمٌ بِالْغَيْر হবে। আর قَائِمٌ بِالْغَيْر কে عَرَض বলে। যা আলমের একটি প্রকার। আর এ কথা জানা আছে যে, কালাম শাস্ত্রবিদদের মতে عَالَم তার সকল جُزْء (অংশ) সহ নশ্বর। তা হলে উপরিউক্ত সংজ্ঞানুপাতে আল্লাহ তা'আলার গুণাবলীও নশ্বর হওয়া আবশ্যক হবে। উপরিউক্ত বিবরণ থেকে বুঝা যায়, বিরোধের কারণ হল, দার্শনিকদের قَائِم بِالذَّات এর সংজ্ঞানুসারে তা আল্লাহ তা'আলার সত্ত্বার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়ায় আল্লাহ তা'আলার সত্ত্বা عَيْن এবং جَوْهَر হওয়া আবশ্যক হয়। আর তাদের قَائِمٌ بِالْغَيْر এর সংজ্ঞা আল্লাহ তা'আলার গুণাবলীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়ায় তা عَرَض হওয়া আবশ্যক হয়। পক্ষান্তরে মুতাকাল্লিমীন তথা কালাম শাস্ত্রবিদদের মতে اَعْيَان ও اَعْرَاض সবই নশ্বর। আর উপরিউক্ত সংজ্ঞায় আল্লাহ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলী নশ্বর হওয়া আবশ্যক হয়। এ কারণে তারা قَائِم بِالذَّات ও قَائِم بِالْغَيْر এর সংজ্ঞায় মতবিরোধ করেছেন এবং তার এমন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন, যাতে আল্লাহ তা'আলার সত্ত্বা ও তার গুণাবলী নশ্বর হওয়া আবশ্যক না হয়। আর দার্শনিকদের মতে যেহেতু সব اَعْيَان নশ্বর নয়। এ কারণে তারা আল্লাহ তা'আলার সত্ত্বার ক্ষেত্রে قَائِم بِالذَّات এবং عَيْن সংজ্ঞা প্রযোজ্য হওয়ায় কোন অসুবিধা বোধ করেন না। বাকি রইল আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী। দার্শনিকরা তো আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী স্বীকারই করে না। সুতরাং গুণাবলীর ক্ষেত্রে قَائِمٌ بِالْغَيْر এবং عَرَض এর সংজ্ঞা প্রযোজ্য হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

قَوْلُهٗ وَلِهٰذَا يَمْتَنِعُ الْاِنْتِقَالُ عَنْهُ ঃ অর্থাৎ যেহেতু عَرَض এর অস্তিত্ব তার مَحَل বা স্থানে আছে, ঐ مَحَل থেকে সরে তার পৃথক কোন অস্তিত্ব নেই। এ কারণেই عَرَض তার مَحَل (স্থান) হতে স্থানান্তরিত হওয়া অসম্ভব। নতুবা তার অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে।

قَوْلُهٗ بِخِلَافِ وُجُوْدِ الْجِسْمِ فِى الْحَيِّزِ ঃ অর্থাৎ কোন স্থানের প্রয়োজন ছাড়াই দেহের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রয়েছে। ফলে দেহ স্থানান্তরিত হতে পারে এবং এক স্থান থেকে সরে গিয়েও তার অস্তিত্ব থাকে।

قَوْلُهٗ مَعْنٰى قِيَامِهٖ ঃ শারিহ রহ. قِيَام শব্দটিকে ضَمِيْر এর দিকে اِضَافَت করেছেন। যার مَرْجِع হল, مُمْكِن

(সম্ভাব্য বস্তু)। যাতে বুঝা যায়, এটা مُمْكِن (সম্ভাব্য বস্তু) এর قَائِم بِالذَّاتِ হওয়ার সংজ্ঞা; যে কোন قَائِمْ بِالذَّاتِ এর সংজ্ঞা নয়। কাজেই প্রশ্ন দেখা দিবে যে, সংজ্ঞাটি جَامِع (পূর্ণাঙ্গ) নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা স্থানাধিকারী এবং অনুভূত ইশারাযোগ্য না হওয়ায় সংজ্ঞাটি তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। অথচ তিনি قَائِمْ بِالذَّاتِ। অবশ্য তাকে عَيْن অথবা جَوْهَر বলা হয় না।

قَوْلُهُ غَيْرُ تَابِعٍ تَحَيُّزِه ঃ এটা مُتَحَيِّز بِنَفْسِه (নিজে নিজে স্থানাধিকারী) এর ব্যাখ্যা অর্থাৎ একটি বস্তু কোন স্থানে সমাসীন হওয়া অথবা অনুভূত ইশারার যোগ্য হওয়া অন্য কোন বস্তু কোন স্থানে সমাসীন হওয়া কিংবা অনুভূত ইশরাযোগ্য হওয়ার অধীনস্থ নয়। যেমন, কোন একটি পাত্রে দুধ আছে। এ দুধের শুভ্রতা (সাদা) এর ব্যাপারে বলা যায়, তা উক্ত পাত্রে দুধের অধীনস্থ হয়ে বিদ্যমান আছে। অর্থাৎ দুধের মধ্যে শুভ্রতা রয়েছে। আর দুধ হল শুভ্রতার স্থল। যা উক্ত পাত্রে বিদ্যমান। এ কারণে শুভ্রতা ও উক্ত পাত্রে বিদ্যমান। এমন বলা যাবে না যে, দুধ উক্ত পাত্রে শুভ্রতার অধিনস্থ হয়ে রয়েছে। বুঝা গেল, দুধ হল قَائِم بِالذَّاتِ আর শুভ্রতা হল قَائِم بِالْغَيْرِ ।

قَوْلُهُ مَوْضُوعُهُ اَىْ مَحَلُّهُ ঃ শারিহ রহ. مَوْضُوع শব্দের ব্যাখ্যা مَحَل (স্থান) দ্বারা করে বুঝিয়েছেন, কালাম শাস্ত্রবিদদের মতে موضوع ও محل (স্থান) একই জিনিস। অর্থাৎ যার সাথে অন্য জিনিস প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যার সাথে মিলে অন্য জিনিস বিদ্যমান হয়। যেমন, দেহ সাদা রং এর একটি مَحَل বা স্থান। তবে দার্শনিকগণ مَوْضُوع এবং مَحَل এর মাঝে পার্থক্য করেন। তারা বলেন, যে স্থানটি আপন অস্তিত্বে অনুপ্রবেশকারী কোন জিনিসের মুখাপেক্ষী তাকে مَحَل ও مَادَّة বলে। যেমন, هَيُوْلٰى স্বীয় অস্তিত্বে অনু প্রবেশকারী صُوْرَت جِسْمِيَّه এর মুক্ষাপেক্ষী। আর যে স্থানটি তার মধ্যে অনুপবেশকারী বস্তুর মুক্ষাপেক্ষী নয় তাকে مَوْضُوع বলে। যেমন, দেহ সাদা রং এর মুখাপেক্ষী নয়। শুভ্রতা ছাড়াও দেহ বিদ্যমান থাকতে পারে। তাই দেহকে শ্রভ্রতার مَوْضُوع বলা হবে।

وَقَوْلُهُ عِنْدَ الْفَلَاسِفَةِ ঃ দার্শনিকদের মতে কোন বস্তু قَائِم بِالذَّاتِ হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হল, বস্তুটি এমন مَحَل থেকে অমুখাপেক্ষী হবে, যা বস্তুটিকে বিদ্যমান রাখে।

قَوْلُهُ : عَنْ مَحَلٍّ يَقُوْمُ ঃ مَحَل কে تَقْوِيْم এর গুণে গুণান্বিত করার কারণ হল, যদি উক্ত গুণ উল্লেখ না করা হত বরং শুধুমাত্র مَحَل উল্লেখ করা হত, তাহলে প্রশ্ন দেখা দিত যে, উক্ত সংজ্ঞানুপাতে صُوْرَت جِسْمِيَّه তো قَائِم بِالذَّاتِ হবে না। কেননা صُوْرَت جِسْمِيَّه এবং هَيُوْلٰى এর মধ্যে একটি অপরটির জন্য আবশ্যক হওয়ায় صُوْرَة جِسْمِيَّه তার مَحَل তথা هَيُوْلٰى থেকে অমুখাপেক্ষী নয়। সুতরাং সেটি قَائِم بِالذَّاتِ না হওয়া আবশ্যক হবে। অথচ তা قَائِم بِالذَّاتِ আর جَوْهَر يَقُوْمُه এর শর্তারোপ করে উক্ত প্রশ্নের নিরসন করা হয়েছে। কেননা এখন قَائِم بِالذَّاتِ এর অর্থ হল, তা এমন জিনিস, যা এমন مَحَل থেকে অমুখাপেক্ষী যা ঐ বস্তুটিকে প্রতিষ্ঠিত এবং বিদ্যমান রাখে। আর هَيُوْلٰى যদিও صُوْرَت جِسْمِيَّه এর مَحَل তবে তা صُوْرَت جِسْمِيَّه কে প্রতিষ্ঠিত এবং বিদ্যমান রাখার গুণে গুণান্বিত নয়। কেননা صُوْرَت جِسْمِيَّه তার অস্তিত্বের ক্ষেত্রে هَيُوْلٰى এর মুখাপেক্ষী নয় বরং কোন تَشْكِيْك তথা আকৃতি ধারণে তার মুখাপেক্ষী।

قَوْلُهُ وَمَعْنٰى قِيَامِه شَىْءٌ اٰخَرُ ঃ দার্শনিকদের মতে একটি জিনিস قَائِم بِالْغَيْرِ হওয়ার অর্থ হল, প্রথম বস্তুর সাথে দ্বিতীয় বস্তুর এমন বিশেষ সম্পর্ক থাকবে যে, প্রথমটি صِفَة দ্বিতীয়টি مَوْصُوْف হতে পারে। চাই প্রথম বস্তুটি مُتَحَيِّز (স্থানাধিকারী) হোক। যেমন, দেহের কালোর রং। এটি দেহের সাথে এমন সম্পর্কযুক্ত, যার ফলে তাকে صِفَة এবং جِسْم (দেহ) কে مَوْصُوْف বানিয়ে جِسْمٌ اَسْوَد (কালো দেহ বা কৃষ্ণকায়) বলা শুদ্ধ হয়। আবার কালো রং স্থানাধিকারীও বটে। যেমন, আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী কালাম শাস্ত্রবিদগণ যার প্রবক্তা। যেমন, قُدْرَت (শক্তি) এটা আল্লাহ তা'আলার সাথে এমন বিশেষ সম্পর্ক যুক্ত, যার ফলে তার صِفَة হওয়া এবং আল্লাহ শব্দটি مَوْصُوْف হওয়া এবং اَللّٰهُ الْقَادِرُ বলা শুদ্ধ আছে। কিন্তু উক্ত صِفَة টি স্থানাধিকারী নয়।

قَوْلُهُ كَمَا فِىْ صِفَاتِ الْبَارِىْ ঃ এ উদহারণ কালাম শাস্ত্র বিদদের মতানুসারে। কারণ, দার্শনিকদের মতে আল্লাহ তা'আলার গুণাবলীই নেই। অতঃপর তা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কোন অর্থই হয় না।

قَوْلُهُ وَالْمُجَرَّدَاتُ ঃ দার্শনিকদের মতে مُجَرَّدَات বলতে এমন দেহাতীত বস্তু বুঝায়, যা অনুভূত ইশারার উপযুক্ত নয়; কোন দেহেও নয় আবার কোন স্থানেও নয়। যেমন– ফিরিশতাগণ, পবিত্রাত্মাসমূহ। পক্ষান্তরে কালাম

শাস্ত্রবিদগণ এসব مُجَرَّدَات (দেহাতীত) বস্তুসমূহ অস্বীকার করেন এবং বলেন, আল্লাহ তা'আলা ব্যতিত যত বিদ্যমান বস্তু রয়েছে, সবগুলো عَرَض এবং جِسْم ও جُزْء لَايَتَجَزّٰى এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। আর ফিরিশতাগণ এবং পবিত্র আত্মা جِسْم এর আওতাভুক্ত।

وَهُوَاَىْ مَالَهٗ قِيَامٌ بِذَاتِهٖ مِنَ الْعَالَمِ اِمَّا مُرَكَّبٌ مِّنْ جُزْئَيْنِ فَصَاعِدًا وَهُوَ الْجِسْمُ وَعِنْدَ الْبَعْضِ لَابُدَّ لَهٗ مِنْ ثَلٰثَةِ اَجْزَاءٍ لِيَتَحَقَّقَ الْاَبْعَادُ الثَّلٰثَةُ اَعْنِى الطُّوْلَ وَالْعَرْضَ وَالْعُمْقَ وَعِنْدَ الْبَعْضِ مِنْ ثَمَانِيَةِ اَجْزَاءٍ لِيَتَحَقَّقَ تَقَاطُعُ الْاَبْعَادِ الثَّلٰثَةِ عَلٰى زَوَايَا قَائِمَةٍ وَلَيْسَ هٰذَا نِزَاعًا لَفْظِيًّا رَاجِعًا اِلَى الْاِصْطِلَاحِ حَتّٰى يُدْفَعَ بِاَنْ لِكُلِّ اَحَدٍ اَنْ يَّصْطَلِحَ عَلٰى مَاشَاءَ بَلْ هُوَ نِزَاعٌ فِىْ اَنَّ الْمَعْنَى الَّذِىْ وُضِعَ لَفْظُ الْجِسْمِ بِاِزَائِهٖ هَلْ يَكْفِىْ فِيْهِ التَّرْكِيْبُ مِنْ جُزْئَيْنِ اَمْ لَا ـ

সহজ তরজমা

স্বাধিষ্ঠ বস্তুর নশ্বরতার প্রমাণ

আর তা অর্থাৎ বিশ্বজগতের স্বাধিষ্ঠ সম্ভাব্য বস্তুসমূহ হয়ত দুই বা ততোধিক অংশ দ্বারা গঠিত হবে। আমাদের অধিকাংশ আশায়িরাদের মতে তা কেবল جِسْم (দেহ) আর কোন আশায়েরার মতে তিনটি অংশ হওয়া আবশ্যক। যাতে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা প্রমাণিত হয়। আর কোন কোন মুতাযিলার মতে আটটি অংশ হওয়া আবশ্যক। যাতে তিনটি সমকোণ আকৃতির উপর ত্রিমাত্রার কর্তন সম্ভব হয়। আর এটি এমন কোন শব্দগত বিতর্ক নয় যে, তার সম্পর্ক পরিভাষার সাথে রয়েছে। এমনকি এ কথা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় যে, প্রত্যেকেরইচ্ছা ইচ্ছামত পরিভাষা বানিয়ে নেওয়ার স্বাধীনতা আছে বরং এ বিতর্ক এ ব্যাপারে যে, جِسْم শব্দটি যে অর্থের বিপরীত গঠিত, তা দুটি অংশ দ্বারা গঠিত হওয়া যথেষ্ট কি না?

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

স্বাধিষ্ঠ বস্তুর শ্রেণীভাগ

قَوْلُهٗ وَهُوَ ঃ গ্রন্থকার এখানে عَيْن এর প্রকারগুলো বর্ণনা করেছেন, عَيْن এর বিভাজন সম্পর্কীয় পূর্ণ ইবারতটি হল, اَوْ غَيْرُ مُرَكَّبٍ كَالْجَوْهَرِ الْفَرْدِ وَهُوَ الْجُزْءُ الَّذِىْ لَايَتَجَزّٰى অর্থাৎ عَيْن যদি مُرَكَّب হয় তাহলে তা جِسْم (দেহ) আর যদি مُرَكَّب না হয় তাহলে جُزْء لَايَتَجَزّٰى তাহলে عَالَم মোট তিন প্রকার হল। (১) عَيْن مُرَكَّب যা শুধু جِسْم (দেহ) (২) عَيْن غَيْر مُرَكَّب (৩) عَرَض (আপতন)।

قَوْلُهٗ هُوَ اَىْ مَالَهٗ قِيَامٌ بِذَاتِهٖ مِنَ الْعَالَمِ ঃ শারিহ রহ. هُوَ যমীরটির مَرْجِع বর্ণনা করে বলেন, এটি দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ সম্ভাব্য বস্তু যা قَائِم بِالذَّات (নিজে নিজে প্রতিষ্ঠিত)। অতঃপর শারিহ রহ. এর উক্তি مِنَ الْعَالَم সম্পর্কে কেউ কেউ উক্ত শর্তটি وَاجِب تَعَالٰى কে বের করার জন্য। কেননা مَا শব্দটি তার ব্যাপকতার কারণে وَاجِب কেও শামিল করে নিয়েছিল। সেটিও مَالَهٗ قِيَام بِذَاتِهٖ (যার নিজস্ব অস্তিত্ব) এর পাত্র। مِنَ الْعَالَم শর্ত দেওয়ায় তা বের হয়ে গেছে। তবে উক্ত উক্তিটি বিশুদ্ধ নয়। কেননা ইতোপূর্বে শারিহ রহ. মুসান্নিফ রহ. এর উক্তি فَالْاَعْيَانُ مَا اَىْ مُمْكِن এর মধ্যে مَا শব্দের ব্যাখ্যা مُمْكِن দ্বারা করেছেন, যাতে বুঝা যায়। এখানেও مَا শব্দটি দ্বারা مُمْكِن উদ্দেশ্য, এ হিসেবে مِنَ الْعَالَم শর্তটি اِحْتِرَازِى নয় বরং ব্যাখ্যামূলক।

দেহ যা দ্বারা গঠিত

قَوْلُهٗ مُرَكَّب ঃ মাশ্যাইয়্যাহ দার্শনিকদের মতে সব দেহই هَيُوْلٰى এবং صُوْرَت দ্বারা গঠিত। আর কালাম শাস্ত্রবিদদের মতে جِسْم (দেহ) গঠিত হয় جُزْء لَايَتَجَزّٰى দ্বারা। একে জওহারে ফরদও বলা হয়। তদুপরি কালাম শাস্ত্রবিদদের মাঝে এ বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে যে, جِسْم এর অস্তিত্বের জন্য কমপক্ষে কয়টি অংশ প্রয়োজন। এ বিরোধ মূলতঃ جِسْم এর সংজ্ঞা বিভিন্নরূপ হওয়ার উপর নির্ভরশীল। অধিকাংশ আশায়েরাগণ جَوْهَر مُرَكَّب দ্বারা দেহের সংজ্ঞা দিয়ে থাকেন। তারা বলেন, مُرَكَّب হওয়ার জন্য দুটি অংশই যথেষ্ট। বিধায় তারা جِسْم এর অস্তিত্বের জন্য দুটি অংশই জরুরী সাব্যস্তা করেছেন। আবার কোন কোন আশায়েরা جِسْم এর সংজ্ঞা جَوْهَر ذُو اَبْعَاد ثَلَاثَة (ত্রিমাত্রাযুক্ত মৌলিক বস্তু) দ্বারা দিয়েছেন। ফলে তারা جِسْم এর অস্তিত্বের জন্য তিনটি অংশ জরুরী

সাব্যস্ত করেছেন। অর্থাৎ প্রথমতঃ দুটি অংশের একটিকে অপরটির সমান রাখা হবে। তখন উভয়টি মিলার কারণে যে بُعْد (মাত্রা) সৃষ্টি হবে তাকে দৈর্ঘ্য বলে। আর এ দুটির মিলন স্থলে তৃতীয় আরেকটি অংশ রাখার ফলে যে মাত্রা উপরের অংশটিকে নিচের মাত্রার ডান দিকে অংশের সাথে কোন রেখা মিলানোর কারণে সৃষ্টি হয়, সেটাই উদাহরণতঃ عَرْض (প্রস্থ)। আর যে মাত্রা মিলন স্থলের উপরের অংশকে নিচে বাম দিকের অংশের সাথে মিলার কারণে সৃষ্টি হবে, সেটিই হল উদাহরণতঃ عُمْق পুরুত্ব বা ঘনত্ব। **চিত্র ঃ বয়ানুল পৃঃ ১১৮**
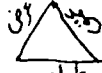
স্মরণ রাখতে হবে, পরিভাষায় যে মাত্রাটি বেশী বড় হয় তাকে طُوْل দৈর্ঘ্য বলে। আর যেটি সবচেয়ে ছোট হয় সেটি হল, عُمْق (গভীরতা)। আর যেটি মধ্যম তা হল عَرْض (প্রস্থ)। তবে এখানে এ অর্থ উদ্দেশ্য নয় বরং طُوْل বলতে ঐ মাত্রা বুঝানো হয়েছে, যা প্রথমে মেনে নেওয়া হয়েছে। عَرْض বলতে দ্বিতীয়বার মেনে নেওয়া মাত্রাকে বুঝানো হয়েছে। আর عمق বলতে তৃতীয়বার মেনে নেওয়া মাত্রাকে বুঝানো হয়েছে।

কোন কোন মুতাযিলা যেমন আবু আলী জুব্বাঈ جِسْم এর সংজ্ঞায় বলেন, جِسْم এমন একটি جَوْهَر (মূলধাতু) যাতে ত্রিমাত্রা সমকোণ তৈরী করে। একটি অপরটিকে ছেদ করে অতিক্রম করা প্রমাণিত হয়। زَاوِيَة অর্থ– কোণ, যখন প্রস্থে বিদ্যমান কোন একটি সরল রেখার উপর অপর একটি সরল রেখা টানা হয়, তখন উভয়টির মিলনস্থলের দুই পাশে যে দুটি কোণ সৃষ্টি হয়, তাকে زَاوِيَة বলে। এখন উপরের রেখটি যদি একেবারে সোজা হয়, কোন দিকে ঝুকে না থাকে, তাহলে কোণ দুটি সমান হবে। এ কোণ দুটিকে زَاوِيَة قَائِمَه বা সমকোণ বলে।
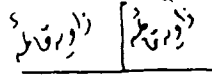
চিত্র ঃ বয়ানুল পৃঃ ১১৮

আর যদি উপরের রেখাটি বাঁকা হয়, তাহলে যেদিকে বাঁকা থাকবে সে দিকের কোণটি ছোট এবং বিপরীত কোণটি বড় হবে। ছোট কোনটিকে زَاوِيَة حَادَّه (সূক্ষ্মকোণ) আর বড়টিকে زَاوِيَة مُنْفَرِجَه (স্থুলকোণ) বলে।

চত্র ঃ বয়ানুল পৃঃ ১১৮
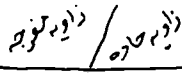
جسم এর উক্ত সংজ্ঞানুসারে তারা جِسْم গঠিত হওয়ার জন্য ৮টি অংশ জরুরী সাব্যস্ত করেছেন। অর্থাৎ দুটি অংশের একটিকে অপরটির বরাবর রাখলে যে মাত্রাটি সৃষ্টি হয় তাকে طُوَال দৈর্ঘ্য বলে। আর উভয় অংশের নিকটে উপরে একটি অংশ ও নিচে একটি অংশ রাখলে যে মাত্রাটি অর্জিত হয় যা প্রথম মাত্রাটি এমনভাবে ছেদ করে চলে যায় যে, তাতে চারটি সমকোণ সৃষ্টি হয়। উক্ত দ্বিতীয় মাত্রাটিকে عَرْض (প্রস্থ) বলে।

চত্র ঃ বয়ানুল পৃঃ ১১৮

অতঃপর এ চারটি অংশের উপর আরও চারটি অংশ মেনে নিলে তৃতীয় যে মাত্রাটি প্রথমোক্ত মাত্রা দুটিকে ছেদ করে, তাকে عمق বলে। যেমন– মানুষ যখন দাঁড়ায় তখন উপর ও নিচের দিকে যে মাত্রা সৃষ্টি হয়, তা হল طول আর طول কে ভেদ করে ডান ও বাম দিকে যে মাত্রাটি অতিক্রম করে তাকে عمق বলে।

এটি কি ধরণের বিরোধ ?

قَوْلُهُ وَلَيْسَ هٰذَا نِزَاعًا ঃ অর্থাৎ উল্লেখিত বিরোধটি এমন কোন শব্দগত বিরোধ নয়, যার সম্পর্ক পরিভাষার সাথে। অর্থাৎ কারও কারও মতে جِسْم শব্দটি দুই অংশের সমষ্টি দ্বারা গঠিত বস্তুর জন্য চয়িত। আর কারও কারও পরিভাষায় তিন অথবা আট অংশের সমষ্টির জন্য গঠিত। যেমন, নাহবীদের পরিভাষায় كلمه বলে যা এক অর্থের জন্য গঠিত। কিন্তু মান্তেকীদের পরিভাষায় কালেমা এমন শব্দকে বলে, যা তিন কালের কোন এক কালে পাওয়া যায়। বস্তুত جِسْم সংক্রান্ত উক্ত বিতর্ক এমন শব্দগত বিতর্ক, যার সম্পর্ক সামাজিক রীতি এবং অভিধানের সাথে অর্থাৎ উক্ত শব্দগত বিরোধ এ অর্থে যে, جِسْم (দেহ) শব্দটি যে অর্থের জন্য গঠিত তার অস্তিত্ব কি শুধু تَرْكِيْب (সংযুক্তি) দ্বারা যথেষ্ট? যার ফলে এ অংশই যথেষ্ট হবে নাকি সংযুক্তির পাশাপাশি দুয়ের অধিক মাত্রাও থাকা জরুরী?

উক্ত বিবরণ থেকে বুঝা গেল, শাব্দিক বিরোধ দুই প্রকার। (১) ঐ শব্দগত বিরোধ যার সম্পর্ক পরিভাষার সাথে। (২) ঐ শাব্দিক বিরোধ যার সম্পর্ক সামাজিক রীতি এবং অভিধানের সাথে। কাজেই جِسْم সংক্রান্ত উক্ত

বিরোধকে مُوَاقِف গ্রন্থকার কর্তৃক শব্দগত সাব্যস্ত করেন এবং শারিহ রহ. কর্তৃক শব্দগত বিরোধকে অস্বীকার করার মাঝে কোন বৈপরিত্য নেই। কেননা مُوَاقِف গ্রন্থকার দ্বিতীয় অর্থে نِزَاع لَفْظِى বলেছেন। আর শারিহ রহ. প্রথম অর্থ হিসেবে তা অস্বীকার করেছেন। শারিহ রহ. رَاجِعًا اِلَى الْاِصْطِلَاحِ উক্তিটিও স্পষ্টভাবে সেকথাই প্রমাণ করে।

اِحْتَجَّ الْاَوَّلُوْنَ بِاَنَّهُ يُقَالُ لِاَحَدِ الْجِسْمَيْنِ اِذَا زِيْدَ عَلَيْهِ جُزْءٌ وَاحِدٌ اِنَّهُ اَجْسَمُ مِنَ الْاٰخَرِ فَلَوْلَا اَنَّ مُجَرَّدَ التَّرْكِيْبِ كَافٍ فِى الْجِسْمِيَّةِ لَمَا صَارَ بِمُجَرَّدِ زِيَادَةِ الْجُزْءِ اَزْيَدَ فِى الْجِسْمِيَّةِ وَفِيْهِ نَظَرٌ لِاَنَّهُ اَفْعَلُ مِنَ الْجَسَامَةِ بِمَعْنَى الضَّخَامَةِ وَعِظَمِ الْمِقْدَارِ يُقَالُ جَسُمَ الشَّيْئُ اَىْ عَظُمَ فَهُوَ جَسِيْمٌ وَجُسَامٌ بِالضَّمِّ وَالْكَلَامُ فِى الْجِسْمِ الَّذِىْ هُوَ اِسْمٌ لَاصِفَةٌ

সহজ তরজমা

প্রথম উক্তির প্রবক্তাগণ দলীলস্বরূপ বলেন, দুটি দেহের মধ্য হতে একটিতে যখন কোন অংশ বৃদ্ধি করা হয়, তখন তাকে বলা হয় অপেক্ষাকৃত বৃহৎ দেহ। অতএব দেহের জন্য যদি শুধু تَرْكِيْب বা সংযুক্তি যথেষ্ট না হত, তাহলে শুধু এক অংশ বৃদ্ধির ফলে আকৃতিগতভাবে একটি অপরটি হতে অতিরিক্ত হত না। তবে এ দলীলের ব্যাপারে আপত্তি আছে। কারণ, اَجْسَمُ শব্দটি হল اِسْمِ تَفْضِيْل এটি جَسَامَت তথা পুরুত্ব পরিমাণ বৃদ্ধি থেকে নির্গত। বলা হয়, جَسُمَ الشَّيْئُ بِمَعْنَى عَظُمَ فَهُوَ جسم وَجُسَام অর্থাৎ বস্তুটি পুরো এবং মোটা হয়েছে। ফলে সেটি পুরো ও মোটা। আর আমাদের আলোচনা ঐ جِسْم (দেহ) সম্পর্কে যা اِسْم صِفَة নয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

দেহ দুটি অংশ দিয়ে গঠিত -এর প্রবক্তাদের দলীল

جِسْم এর অস্তিত্বের জন্য, যারা কেবল সংযুক্তিকেই যথেষ্ট মনে করেন, যার জন্য শুধু দুইটি অংশ হওয়াই যথেষ্ট –তাদের দলীল হল, যদি এমন দুটি সংযুক্ত সমষ্টি হয়, যার প্রতিটি সমষ্টি দুটি অংশ দ্বারা গঠিত –এর একটির সমষ্টিতে যদি এক অংশ বৃদ্ধি করা হয়, তাহলে তাকে অপর সমষ্টির মুকাবিলায় اَجْسَمُ বা দৈহিকভাবে বড় বলা হয়। এর অর্থ দাঁড়াল, শুধু দেহ প্রমাণিত হওয়ার জন্য দুটি جُزْء (অংশ)ই যথেষ্ট। আর এ তৃতীয় অংশ দ্বারা দেহ বড় হয়েছে। কেননা যদি দুই অংশ দ্বারা দেহ প্রমাণিত না হত, তাহলে তৃতীয় অংশ বৃদ্ধির ফলে ঐ সমষ্টি দেহই থাকত। বড় দেহে পরিণত হত না।

قَوْلُهُ بِاَنَّ يُقَالَ لِاَحَدِ الْجِسْمَيْنِ ঃ আমার মতে ইবারতটি নিম্নরূপ হলে উদ্দেশ্য আরও বেশী স্পষ্ট হত يُقَالُ لِاَحَدِ الْمَجْمُوْعَيْنِ الْمُرَكَّبَيْنِ مِنْ جُزْئَيْنِ। অর্থাৎ দুই অংশ দ্বারা গঠিত দুই সমষ্টির কোন একটিতে যখন এক অংশ বৃদ্ধি করা হয়, (তখন সেটিকে) অপরটির তুলনায় اَجْسَمُ (বড় দেহ) বলা হয়।

"জিনিস" শব্দের সঠিক অর্থ

قَوْلُهُ وَفِيْهِ نَظَرٌ ঃ অভিযোগের সারমর্ম হল, جِسْم শব্দটি اَجْسَمُ এর উৎপত্তিস্থল নয় যে, এর অর্থ হবে বড় দেহ বিশিষ্ট। বরং اَجْسَمُ শব্দটি جَسَامت অর্থ মোটা, বৃহদাকার থেকে নির্গত। যা بَاب كَرُمَ হতে আসে। যেমন, جَسُمَ الشَّيْئُ بِمَعْنَى عَظُمَ الشَّيْئُ। ব্যবহৃত হয় এবং এর সিফাতে মুশাব্বাহ جِسْم এবং جُسَام আসে।

মোটকথা, اَجْسَمُ যখন جَسَامَةٌ মূলধাতু থেকে চয়িত, তখন هٰذَا اَجْسَمُ مِنَ الْاٰخَرِ। কথাটির মর্ম হবে, এটি মোটা বা পুরুত্বের দিক থেকে অপরটির তুলনায় বড়, দৈহিক দিক থেকে নয়। এ হিসেবে اَجْسَمُ শব্দটি اِسْم صِفَة হবে। কিন্তু আমাদের আলোচনা ঐ جِسْم সম্পর্কে যা ইসমে যাত; اِسْم صفه নয়।

اَوْ غَيْرُ مُرَكَّبٍ كَالْجَوْهَرِ يَعْنِى الْعَيْنُ الَّذِى لَايَقْبَلُ الْاِنْقِسَامَ لَافِعْلًا وَلَاوَهْمًا وَلَافَرْضًا وَهُوَ الْجُزْءُ الَّذِى لَايَتَجَزّٰى وَلَمْ يَقُلْ وَهُوَ الْجَوْهَرُ اِحْتِرَازًا عَنْ وُرُوْدِ الْمَنْعِ بِاَنَّ مَالَا يَتَرَكَّبُ لَايَنْحَصِرُ عَقْلًا فِى الْجَوْهَرِ بِمَعْنَى الْجُزْءِ الَّذِى لَايَتَجَزّٰى بَلْ لَابُدَّ مِنْ اِبْطَالِ الْهَيُوْلٰى وَالصُّوْرَةِ وَالْعُقُوْلِ وَالنُّفُوْسِ الْمُجَرَّدَةِ لِيَتِمَّ ذٰلِكَ وَعِنْدَ الْفَلَاسِفَةِ لَاوُجُوْدَ لِلْجَوْهَرِ الْفَرْدِ اَعْنِى الْجُزْءَ الَّذِى لَايَتَجَزّٰى وَتَرَكُّبُ الْجِسْمِ اِنَّمَا هُوَ مِنَ الْهَيُوْلٰى وَالصُّوْرَةِ -

সহজ তরজমা

দ্বিতীয় স্বাধিষ্ঠ সম্ভাব্য বস্তু ঃ অথবা ঐ স্বাধিষ্ঠ সম্ভাব্য বস্তু غَيْرِ مُرَكَّبٍ হবে। যেমন, جَوْهر অর্থাৎ ঐ মূলবস্তু যা فِعْلًا (কার্যতঃ) وَهْمًا (কল্পনানুসারে) فَرْضًا (ভাবনায়) কোন ভাবেই বিভক্তি গ্রহণ করে না। আর এটিই جُزْء لَا يَتَجَزّٰى বা পরমাণু। মুসান্নিফ রহ. وَهُوَ الْجَوْهَر বলেন নি, এ প্রশ্ন থেকে বাঁচার জন্য যে, عَيْن غَيْر مُرَكَّب যুক্তি অনুসারে جَوْهر অর্থাৎ جُزْء لَايَتَجَزّٰى এর মধ্যে সীমিত নয়, বরং هَيُوْلٰى (মূলবস্তু) صُوْرَت جِسْمِيَّه (দৈহিক আকার) عُقُوْل مُجَرَّدَه (দেহাতিত প্রজ্ঞাসমূহ) نُفُوْس مُجَرَّدَه (দেহাতিত আত্মাসমূহ) সবগুলোকে বাতিল করা আবশ্যক, যাতে সীমাবদ্ধতা সঠিক হয়। আর দার্শনিকদের মতে جُزْء لَايَتَجَزّٰى এর অস্তিত্ব নেই বরং جِسْم (দেহ) কেবল هَيُوْلٰى (মূলবস্তু) এবং صُوْرَت (আকার) দ্বারা গঠিত।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

وَغَيْرِ مُرَكَّبٍ ঃ এটা عَيْن অর্থাৎ স্বাধিষ্ঠ সম্ভাব্য বস্তুর দ্বিতীয় প্রকার। মুসান্নিফ রহ. عَيْن غَيْرمُرَكَّب এর উদাহরণে جَوْهَر শব্দটি পেশ করেছেন। আর جَوْهَر দ্বারা جَوْهَرفَرْد جُزْء لَايَتَجَزّٰى উদ্দেশ্য শব্দটি।

জওহার কি ?

قَوْلُهُ يَعْنِى الْعَيْن ঃ এটা جوهر এর ব্যাখ্যা। সারমর্ম হল, جَوْهَر বলতে ঐ عَيْن উদ্দেশ্য, যা কোন মতেই বিভাজন গ্রহণ করে না। তাকে কার্যতঃ বিভাজন করা যায় না। কাল্পনিকভাবেও করা যায় না। এমনকি চিন্তায়ও নয়।

বিভাজনের অর্থ ও শ্রেণীভাগ

এখানে কার্যতঃ বিভাজন বলতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিভাজন উদ্দেশ্য। যার ফলে বাস্তবেই বিভিন্ন অংশে সৃষ্টি হয়। সুতরাং বিভাজনটি ধারালো কোন যন্ত্রের সাহায্যে হলে তাকে কর্তিত বলে। আর যদি শক্ত বা কঠিন কোন পদার্থের সাথে সংঘর্ষে হয় তাহলে তাকে ভাঙা বলে। আর যদি ধাক্কা লেগে হয় তাহেল তাকে ফাটা বলে। এতে বুঝা গেল, এ তিন ধরনের বিভাজন কার্যতঃ বিভাজনের অন্তর্ভুক্ত। কেননা এ তিন প্রকার বিভাজনের ফলে বাস্তবে বিভিন্ন অংশের সৃষ্টি হয়। সুতরাং কার্যতঃ বিভাজনের না থাকলে কোন বিভাজনই থাকে না।

আর যদি বিভাজনের ফলে বাস্তবে কোন অংশ সৃষ্টি না হয়, তাহলে তাকে تَقْسِيْم وَهْمِى وَفَرْضِى বা কাল্পনিক বিভাজন বলে। تَقْسِيْم وَهْمِى হয় কল্পনা শক্তির সাহায্যে। আর تَقْسِيْم فَرْضِى হল تَقْسِيْم عَقْلِى বা বিবেক লব্ধ বিভাজন। تَقْسِيْم وَهْمِى এবং تَقْسِيْم فَرْضِى এর মাঝে পার্থক্য হল, تَقْسِيْم وَهْمِى যেহেতু কল্পনা শক্তির কাজ অথচ কাল্পনা শক্তি এক প্রকার দৈহিক শক্তি। আর দৈহিক শক্তির কাজকর্ম সীমিত হয়। ফলে تَقْسِيْم وَهْمِى ও সীমিত হবে। পক্ষান্তরে تَقْسِيْم عَقْلِى এ অর্থে অসীম যে, عَقْل কোন জিনিসের বিভাজন করতে করতে এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে না, যেখানে যেয়ে থেমে যাওয়া আবশ্যক হয়। সামনে অগ্রসর হওয়া অর্থাৎ বস্তুটির আর বিভক্তি সম্ভব হয় না। যদিও عَقْل অসীম বিভাজন ও তার ফলশ্রুতিতে অসীম অংশের বাস্তব অস্তিত্ব হয় না। কিন্তু অসীম বিভাজনকে বাস্তবে বিদ্যমান করতে وَهْم এর মত আকলও অক্ষম। এ কারণে কেউ কেউ تَقْسِيْم وَهْمِى এবং تَقْسِيْم فَرْضِى এর মাঝে কোন পার্থক্য করেন নি।

গ্রন্থকার وَهُوَ الْجَوْهَرُ বলেননি কেন ?

قَوْلُهُ وَلَمْ يَقُلْ : অর্থাৎ মুসান্নিফ রহ. عَيْن مُرَكَّب সম্পর্কে যেমন وَهُوَ الْجِسْمُ বলেছিলেন, তেমনি এখানে عَيْن غَيْر عَيْن غَيْرمُرَكَّب সম্পর্কে وَهُوَ الْجَوْهَر বলেননি বরং كَالْجَوَاهِر বলেছেন। কারণ, وَهُوَ الْجَوْهَر বললে عَيْن غَيْر مُرَكَّب টি جَوْهَرفَرْد তথা جُزْء لَايَتَجَزّٰى এর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ত, তাহলে দার্শনিকদের পক্ষ থেকে প্রশ্ন উত্থাপিত হত, عَيْن غَيْر مُرَكَّب টি جَوْهَرفَرْد এর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং هَيُوْلٰى (মূল বস্তু) عُقُوْل مُجَرَّد (প্রজ্ঞাসমূহ) نُفُوْس مُجَرَّد বা দেহাতীত আত্মাসমূহ عَيْن غَيْر مُرَكَّب কাজেই হয়ত حَصْر এর দাবী প্রত্যাহার নতুবা صُوَرْت (আকার) عُقُوْل ও نُفُوْس এর অস্তিত্ব বাতিল করতে হত। যাতে উক্ত حَصْر (সীমাবদ্ধতার) দাবী সঠিক হয়। মুসান্নিফ রহ. উক্ত প্রশ্ন এবং هَيُوْلٰى ও صُوَرْت ইত্যাদির বাতিল করার চক্রান্তে পতিত হওয়া থেকে বাঁচার জন্য وَهُوَ الْجَوْهَر এর পরিবর্তে كَالْجَوْهَر বলে দিয়েছেন অর্থাৎ جَوْهَر কে তিনি উদাহরণ হিসেবে পেশ করেছেন।

قَوْلُهُ لِيَتِمَّ ذَالِكَ : ذَالِكَ এর مُشَارُ اِلَيْهِ হল উল্লেখিত হসর।

قَوْلُهُ وَعِنْدَ الْفَلَاسِفَةِ : দার্শনিকগণ বলতে এরিষ্টটল ও তার অনুসারীগণ উদ্দেশ্য, যারা جُزْء لَايَتَجَزّٰى কে স্বীকার করেন না বরং বলেন صُوَرْت এবং هَيُوْلٰى দ্বারা جِسْم গঠিত হয়েছে।

পরমাণুর অস্তিত্ব বাতিল কেন?

قَوْلُهُ لَا وُجُوْدَ لِلْجَوْهَرِ : جَوْهَرمُجَرَّد তথা لَايَتَجَزّٰى বাতিল হওয়ার দলীল "হিদায়াতুল হিকমাহ" কিতাবের শারিহ আল্লাম মাইবুযী রহ. قِيَاس اِسْتِثْنَائِى আকারে বলেন, جُزْء لَايَتَجَزّٰى এর অস্তিত্ব থাকত, (এটি মুকাদ্দাম) তাহলে এক جُزْء (অংশ) কে দুটি অংশের মাঝে মেনে নেওয়া সম্ভব হত। (এটি তালী) কিন্তু তালী অর্থাৎ এক অংশকে দুটি অংশের মাঝে মেনে নেওয়া বাতিল। কাজেই مُقَدَّم অর্থাৎ جُزْء لَايَتَجَزّٰى তথা পরমাণুর অস্তিত্বও বাতিল।

তালী বাতিল হওয়ার দলীল হল, যদি একটি جُزْء (অংশকে) দুটি অংশের মাঝে মেনে নেওয়া হয়, তাহলে যুক্তিগতভাবে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে। (১) মধ্যকার অংশটি তার দুই পাশের অংশকে পরস্পর মিলিত হতে প্রতিবন্ধক হবে বা হবে না। যদি প্রতিবন্ধক হয় তাহলে বিভাজন আবশ্যক হল। কারণ, মাঝখানের অংশটি একদিকে যেমন উদাহরণতঃ ডান দিকের (جُزْء لَايَتَجَزّٰى) পরমাণুর সাথে মিলিত হবে। আর দ্বিতীয় দিকটি বাম দিকের (جُزْء لَايَتَجَزّٰى) পরমাণুর সাথে মিলিত হবে। এমনিভাবে উভয় দিকের একটি ভেতরের দিক হবে, যা মধ্যবর্তী অংশের সাথে মিলিত হবে। আর দ্বিতীয় আরেকটি দিক হবে বাইরের, যা কোন অংশের সাথে সম্পর্কযুক্ত হবে না। এভাবে তিনটি جُزْء لَايَتَجَزّٰى (পরমাণু) বিভক্ত হয়ে গেল। অথচ আমরা এগুলো جُزْء لَايَتَجَزّٰى অর্থাৎ বিভাজনের অযোগ্য মনে করে থাকি। এটা স্বীকৃত বিষয়ের বিপরীত হওয়ায় তা বাতিল হয়ে গেল। আর যদি মধ্যকার অংশটি তার দুই পাশের দুই অংশকে পরস্পর মিলিত হতে প্রতিবন্ধক না হয়, তাহেল দুই পাশের অংশ দুটি মধ্যবর্তি অংশের মাঝে প্রবেশ করে অপর পাশের অংশের সাথে মিলিত হওয়া আবশ্যক হবে। আর এগুলো যেহেতু জওহার; এ কারণে এগুলো একটি অপরটির মাঝে এমনভাবে প্রবিষ্ট হওয়া তথা এক ইশারা সবগুলোর জন্য যথেষ্ট হওয়া যাকে تداخل جوهر বলে। আর تداخل جواهر অসম্ভব। কাজেই মধ্যবর্তী অংশটি তার দুই পাশের অংশ দুটি পরস্পর সম্মিলনে প্রতিবন্ধক হওয়াও বাতিল। যখন تالى অর্থাৎ এক অংশকে দুই অংশের মাঝে মেনে নেওয়ার উভয় পন্থাই বাতিল হয়ে গেল, তখন مقدم অর্থাৎ جزء لايتجزى তথা পরমাণুও বাতিল হয়ে গেল।

وَاَقْوٰى اَدِلَّةِ اِثْبَاتِ الْجُزْءِ اَنَّهُ لَوْ وُضِعَتْ كُرَةٌ حَقِيْقِيَّةٌ عَلٰى سَطْحٍ حَقِيْقِيٍّ لَمْ تُمَاسِّهِ اِلَّا بِجُزْءٍ غَيْرِ مُنْقَسِمٍ اِذْ لَوْ مَاسَّتْهُ بِجُزْئَيْنِ لَكَانَ فِيْهَا خَطٌّ بِالْفِعْلِ فَلَمْ تَكُنْ كُرَةً حَقِيْقَةً

সহজ তরজমা

আর جُزْء لَايَتَجَزّٰى (পরমাণু) প্রমাণের শক্তিশালী দলীল হল, যদি كُرَه حَقِيْقِى বা গোলক سَطْح حَقِيْقِى বা প্রকৃত পৃষ্ঠের উপর রেখে দেওয়া হয়, তাহলে ঐ গোলকটি ঐ পৃষ্ঠের সাথে শুধু একটি অবিভাজ্য অংশ দ্বারা মিলিত হবে। কেননা যদি দুই অংশ দ্বারা ঐ পৃষ্ঠের সাথে মিলিত হয়, তাহলে তাতে কার্যতঃ দুটি রেখা তৈরী হওয়া আবশ্যক হবে। ফলে তা আর كُرَه حَقِيْقِى (প্রকৃত গোলক) থাকবে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

পরমাণু প্রমাণের সর্বাধিক শক্তিশালী দলীল

جُزْء لَا يَتَجَزّٰى (পরমাণু) প্রমাণের ক্ষেত্রে কালাম শাস্ত্রবিদগণ অনেক দলীল পেশ করেছেন। তন্মধ্যে যে দলীলটি বেশী শক্তিশালী শারিহ রহ. প্রথমে সে দলীলটি আলোচনা করেছেন। তারপর তিনি প্রসিদ্ধ দুটি দলীল উল্লেখ করবেন। এখানে শক্তিশারী দলীলটি বুঝতে হলে কয়েকটি বিষয় মনে রাখতে হবে।

(১) كُرَه শব্দটির كَاف বর্ণে পেশ এবং رَاء বর্ণটি যবর যুক্তও তাশদীদ মুক্ত। এর جَمْع হল, كُرَات এবং كرامى অভিধানে বল বা গোলককে كُرَه বলে। আর পরিভাষায় كره বলতে এমন গোলাকার দেহকে বুঝায়, যার বেষ্টন শুধু এক পৃষ্ঠ দ্বারা হয়। যার মধ্যে কেন্দ্র বিন্দুতে যে নুকতা বা বিন্দু মেনে নেওয়া হয়, সে বিন্দু থেকে পৃষ্ঠের দিকে বেরিয়ে আসা প্রতিটি রেখা সমান হবে। চিত্র ঃ

বায়ান পৃষ্ঠা নং ১২২

প্রকৃত গোলকে কার্যতঃ কোন রেখা হয় না। কেননা পৃষ্ঠের শেষ সীমাকে রেখা বলে। আর গোলকের পৃষ্ঠের কোন শেষ নেই।

(২) প্রকৃত পৃষ্ঠ বলতে সমতল পৃষ্ঠ উদ্দেশ্য। আর তা এমন একটি পৃষ্ঠকে বলে, যার উপর অনেকগুলো সরলরেখা ধরে নেওয়া সম্ভব। অর্থাৎ এমন কতকগুলো রেখা টানা সম্ভব যার উপর বিন্দু মেনে নেওয়া হলে সমস্ত বিন্দু একই সরলরেখার উপর পতিত হবে। কোন বিন্দু অপর বিন্দু হতে উপরে-নিচে, ডানে-বামে থাকবে না। অন্যভাবে বলা যায়, সমতল পৃষ্ঠ এমন পৃষ্ঠকে বলে, যাতে সামান্য পরিমানও উঁচু-নিচু নেই।

(৩) যখন কোন জিনিসকে সমতল পৃষ্ঠে রাখা হবে তখন তার মধ্যে যত গোলকৃতি বেশী হবে, ততই তার কম অংশ পৃষ্ঠের সাথে মিলিত হবে। আর গোলাকৃতি যত কম হবে, ততই তার বেশী অংশ পৃষ্ঠের সাথে মিলিত হবে।

উক্ত ভূমিকার পর দলীলের সারমর্ম দাঁড়ায়, যদি কোন প্রকৃত গোলক যার পৃষ্ঠের কোন রেখা হয় না, কোন সমতল পৃষ্ঠের উপর রাখা হয়, তাহলে ঐ গোলকটির যে অংশটি পৃষ্ঠের সাথে মিলিত হবে, ঐ অংশটি বিভাজন যোগ্য হবে না। আর যদি বিভাজন যোগ্য হয় অর্থাৎ তার অংশ হয় তাহলে কমপক্ষে দুটি অংশ হবে। যে দুটির পারস্পরিক মিলনের ফলে কার্যতঃ রেখার সৃষ্টি হয়। অথচ গোলকে রেখার কার্যতঃ অস্তিত্ব অসম্ভ। এ কারণে গোলকের এমন অংশই পৃষ্ঠের সাথে মিলিত হবে, যা বিভাজন যোগ্য নয়। আর ঐ বিভাজনের অযোগ্য অংশকে جُزْء لَا يَتَجَزّٰى বা পরমাণু বলে।

قَوْلُهُ فَلَمْ تَكُنْ كُرَه حَقِيْقَةً ঃ অর্থাৎ যদি গোলকের দুটি অংশ পৃষ্ঠের সাথে মিলিত হয়, তাহলে ঐ দুই অংশের সমষ্টি দ্বারা যে আকৃতি সৃষ্টি হবে, তাকে রেখা বলে। এমতাবস্থায় ঐ গোলকটি গোলক থাকবে না। কেননা প্রকৃত গোলকে কার্যতঃ কোন রেখা হয় না।

وَاَشْهُرُهَا عِنْدَ الْمَشَايِخِ وَجْهَانِ اَلْاَوَّلُ اَنَّهُ لَوْ كَانَ كُلُّ عَيْنٍ مُنْقَسِمًا لَا اِلَى نِهَايَةٍ لَمْ تَكُنِ الْخَرْدَلَةُ اَصْغَرَ مِنَ الْجَبَلِ لِاَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا غَيْرُ مُتَنَاهِى الْاَجْزَاءِ وَالْعِظَمُ وَالصِّغَرُ اِنَّمَا هُوَ بِكَثْرَةِ الْاَجْزَاءِ وَقِلَّتِهَا وَذٰلِكَ اَنَّمَا يُتَصَوَّرُ فِى الْمُتَنَاهِىْ وَالثَّانِىْ اَنَّ اِجْتِمَاعَ اَجْزَاءِ الْجِسْمِ لَيْسَ لِذَاتِهِ وَاِلَّا لَمَا قَبِلَ الْاِفْتِرَاقَ فَاللّٰهُ تَعَالٰى قَادِرٌ عَلٰى اَنْ يَّخْلُقَ فِيْهِ الْاِفْتِرَاقَ اِلَى الْجُزْءِ الَّذِىْ لَايَتَجَزّٰى لِاَنَّ الْجُزْءَ الَّذِىْ تَنَازُعْنَا فِيْهِ اِنْ اَمْكَنَ اِفْتِرَاقُهُ لَزِمَتْ قُدْرَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ دَفْعًا لِلْعِجْزِ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ ثَبَتَ الْمُدَّعٰى ۔

সহজ তরজমা

পরমাণু থাকার প্রসিদ্ধ প্রমাণ

এর প্রসিদ্ধতম দলীল মাশয়িখে (আশয়িরা) এর মতে দুটি। প্রথমতঃ যদি প্রতিটি عَيْن অসীম বিভাজন গ্রহণ করে, তাহলে একটি সরিষা দানা পাহাড়ের চেয়ে ছোট হত না। কেননা এ দুটির প্রত্যেকটিই অসীম অংশ বিশিষ্ট হত। ছোট-বড় হওয়া তো অংশসমূহের কম-বেশী হওয়ার কারণে হয়ে থাকে। আর তা (কম-বেশী হওয়া) শুধু সীমিত বস্তুর ক্ষেত্রে সম্ভব। আর দ্বিতীয়তঃ جِسْم (দেহ) এর অংশসমূহের একত্রিত হওয়া তার সত্ত্বাগত চাহিদার কারণে নয়। অন্যথায় সেগুলো কখনও পৃথক হত না। তাহলে আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়ে সক্ষম যে, তিনি তাতে جُزْء لَايَتَجَزّٰى পর্যন্ত বিভাজন সৃষ্টি করে দিবেন। কেননা যে অংশ আমাদের দু পক্ষের মাঝে বিতর্কিত, যদি তার বিভাজন সম্ভব হয়, তাহলে অক্ষমতা দূরীকরণের জন্য আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতাবান হওয়া আবশ্যক হবে। আর যদি বিভাজন সম্ভব হয়, তাহলে তো আমাদের দাবী প্রমাণিত হয়ে গেল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

প্রমাণ প্রসিদ্ধ প্রমাণ

اَلْاَوَّلُ اَنَّهُ لَوْكَانَ ঃ দার্শনিকদের মতে প্রত্যেক عَيْن অসীম বন্টন গ্রহণ করে, এই মূলনীতি মুতাবিক এরূপ কোন সাধারণ বস্তু হতে পারে না, যার বিভাজন সীমাবদ্ধ হয়ে অতিরিক্ত বিভাজনের যোগ্য আর থাকবে না, যেটাকে বলা হবে جُزْء لَايَتَجَزّٰى বা পরমাণু। যেহেতু দার্শনিকদের উপরিউক্ত মূলনীতির উপর পরমাণু বাতিল করা নির্ভরশীল যে, প্রতিটি স্বাধিষ্ঠ বস্তু অসীম বিভাজনকে গ্রহণ করে, সেহেতু এ দলীলে উপরিউক্ত মূলনীতিটিকে বাতিল করে جُزْء لَايَتَجَزّٰى বা পরমাণু প্রমাণিত করা হয়েছে।

দলীলের সারাংশ হল, যদি প্রতিটি عَيْن এর অসীম বিভাজ্য হয়, তাহলে সরিষার দানা পহাড়ের চেয়ে ছোট না হওয়া আবশ্যক হয়। কেননা সরিষার দানা এবং পাহাড় উভয়টি স্বাধিষ্ঠ আর প্রতিটি عَيْن অসীম বিভাজ্য হওয়ার মূলনীতির অনুসারে এ দুটিও অসীম বিভাজ্য হবে। আর অসীম বিভাজনের ফলে উভয়টির অংশও অসীম বস্তু অপেক্ষা ছোট হবে না। কাজেই সরিষার দানার অসীম অংশগুলো পাহাড়ের অসীম অংশের চেয়ে কম হবে না এবং সরিষার দানা পাহাড় থেকে ছোট হবে না। কারণ, অংশ কম হওয়ায় একটি জিনিস অপরটি হতে ছোট হয়। উভয়টি অসীম হওয়ায় এখানে তা পাওয়া যায়নি।

মোটকথা, প্রতিটি عَيْن যদি অসীম বিভাজ্য হয়, তাহলে সরিষার দানা পাহাড় হতে ছোট না হওয়া আবশ্যক হবে। অথচ সরিষার দানা পাহাড় থেকে ছোট না হওয়া স্পষ্ট বাতিল। কাজেই প্রতিটি عَيْن অসীম বিভাজ্য হওয়া বাতিল সাব্যস্ত হল। সুতরাং বুঝা গেল, অনেক عَيْن এমন আছে যার বিভাজন সিমীত। এরপর আর বিভাজ্য হতে পারে না। যেখানে গিয়ে এই বিভাজন শেষ হয়ে যায়, তারপর আর বণ্টন হয় না, তাকে جُزْء لَا يَتَجَزّٰى বলে।

قَوْلُهُ لِاَنَّ كُلَّ وَاحِد ঃ এটা হল مُقَدَّم অর্থাৎ প্রতিটি عَيْن অসীম বিভাজন গ্রহণ করাবস্থায় تَالِى অর্থাৎ সরিষার দানা পাহাড় হতে ছোট না হওয়া আবশ্যক হওয়ার দলীল।

قَوْلُهٗ وَالْعِظَمُ وَالصِّغَرُ ঃ যার অংশ বেশী হয় সেটি বড়। আর যার অংশ অন্যটির তুলনায় কম হয় সেটি ছোট।

قَوْلُهٗ وَذَالِكَ اِنَّمَا يُتَصَوَّرُ ঃ অর্থাৎ কম-বেশী হয় সীমিত বস্তুর ক্ষেত্রে; অসীম বস্তুর ক্ষেত্রে নয়। কারণ, কম-বেশী তো তখনই প্রমাণিত হবে, যখন একটির মধ্যে এমন কোন অংশ পাওয়া যায়, যার বিপরীতে অপরটিতে কোন অংশ থাকে না। আর একটি অসীম বস্তুতে প্রতিটি অংশের বিপরীতে অপর অসীম বস্তুতে অংশ বিদ্যামন থাকে। এ কারণে অসীমের মধ্যে কম-বেশী হয় না।

দ্বিতীয় প্রসিদ্ধ প্রমাণ

قَوْلُهٗ وَالثَّانِىْ اَنَّ اِجْتِمَاعَ ঃ দলীলটি বুঝতে হলে কয়েকটি ধারা বুঝতে হবে।

১. যে জিনিস কোন বস্তুর সত্ত্বাগত চাহিদা হয়, ঐ জিনিসকে ঐ বস্তুর ذَاتِى বলা হয়। আর কোন বস্তুর সত্ত্বা বা তার জাত তা হতে দূরীভূত হয় না। যেমন, উষ্ণতা আগুনের সত্ত্বাগত চাহিদা হওয়ায় তা আগুনের সত্ত্বাগত গুণ, আগুন হতে তা দূরীভূত হওয়া সম্ভব নয়।

২. কোন জিনিসের বিভক্তি ও বন্টন তার অংশসমূহের ঐক্য শেষ হয়ে যাওয়া।

৩. আল্লাহ সকল সম্ভাব্য বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।

দলীলের সারমর্ম ঃ جِسْم এর মধ্যে অংশসমূহে বিদ্যমান সমন্বয় جِسْم এর সত্ত্বাগত চাহিদা বা সত্ত্বাগত গুণ নয়। নতুবা যদি جِسْم এর অংশসমূহের ঐক্য সত্ত্বাগত চাহিদা হয়ে তার জাতি বা মৌলিকবস্তু হত, তাহলে বিচ্ছিন্নতা গ্রহণ করত না। অতএব অংশগুলো উক্ত ঐক্য প্রথম ধারা অনুসারে দেহ থেকে পৃথক হতে পারে না এবং দেহ বিচ্ছিন্নতা ও বিভক্তি গ্রহণ করত না। কিন্তু দেহের অংশসমূহের ঐক্য দূরীভূত হয় এবং দেহ বিচ্ছিন্নতা ও বিভক্তি গ্রহণ করে। ফলে বুঝা গেল, দেহের মধ্যে অংশসমূহের ঐক্য সত্ত্বাগত চাহিদার কারণে নয় এবং جِسْم এর মৌলিক মূল বস্তুও নয়। সেহেতু তার বিচ্ছিন্নতা দ্বিতীয় ধারা অনুসারে হুবহু বিচ্ছিন্নতা এবং এটা সম্ভব। আর তৃতীয় ধারা অনুসারে আল্লাহ তা'আলা সকল সম্ভাব্য বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। কাজেই আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারেও ক্ষমতাবান যে, দেহের মধ্যে যত বিচ্ছিন্নতা এবং বিভক্তি সম্ভব, কার্যতঃ তার অস্তিত্ব প্রদান করবেন এবং ভাগ করতে করতে এমন অংশে পৌঁছে দিবেন, যার পর আর কোন ভাগ অবশিষ্ট না থাকে। ঐ অংশ যার পর আর কোন বিভক্তি হয় না, তা-ই হল جُزْءٌ لَا يَتَجَزّٰى বা পরমাণু। সুতরাং আমাদের উদ্দেশ্য প্রমাণিত হল। কেননা ঐ সর্বশেষ অংশটি যার ব্যাপারে আমাদের ও দার্শনিকদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে, যাকে আমরা جُزْءٌ لَايَتَجَزّٰى আর দার্শনিকগণ متجزى বা বিভাজনযোগ্য বলেন, যদি এর দ্বিতীয়বার বিভাজন সম্ভব হয়, তাহলে আল্লাহ তা'আলা থেকে অক্ষমতা দূরীকরণার্থে আল্লাহ তা'আলার তার উপর ক্ষমতাবান হওয়া আবশ্যক হবে। অথচ এটা স্বীকৃত বিষয়ের সম্পূর্ণ বিপরীত। কেননা আমরা ধরে নিয়ে ছিলাম, কুদরতের অধীনস্থ সকল مُمْكِنَات কে আল্লাহ তা'আলা কার্যতঃ অস্তিত্ব দান করেছেন। কোন সম্ভাব্য বস্তুর বিভাজন অবশিষ্ট নেই। তাছাড়া যদি এ অংশের আর কোন বিভাজন সম্ভব না হয়, তাহলে এটাই হল, جُزْءٌ لَا يَتَجَزّٰى বা পরমাণু এবং আমাদের দাবি প্রমাণিত হল।

قَوْلُهٗ اَنَّ اِجْتِمَاعَ اَجْزَاءِ الْجِسْمِ لِذَاتِهٖ ঃ অর্থাৎ দেহের মধ্যে অংশসমূহের ঐক্য তার সত্ত্বাগত চাহিদার কারণে নয়। এটি একটি দাবী।

قَوْلُهٗ وَاِلَّا لَمَا قَبِلَ ঃ এটা উল্লেখিত দাবীর দলীল। এটি একটি قِيَاس اِسْتِثْنَائِىْ যার মধ্যে তালী (শেষাংশ) এর প্রতিপক্ষকে ব্যতিক্রমভুক্তি করার কারণে مُقَدَّم বা প্রথমাংশের বিপক্ষ হয় ফলাফল। মূল ইবারত হবে নিম্নরূপঃ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَالِكَ بَلْ يَكُوْنُ اِجْتِمَاعُ اَجْزَاءِ الْجِسْمِ لِذَاتِهٖ (مُقَدَّم) لِمَا قَبِلَ الْاِ فْتِرَاقِ (تَالِى) لٰكِنَّهٗ (اِسْتِثْنَاء এর نَقِيْض এর تَالِى) يُقْبَلُ الْاِفْتِرَاقُ فَاِجْتِمَاعُ اَجْزَاءِ الْجِسْمِ لِذَاتِهٖ ـ

قَوْلُهٗ لِاَنَّ الْجُزْءَ الَّذِىْ تَنَازَعْنَا ঃ এটি একটি উহ্য দাবীর দলীল। মূল ইবারত হল فَثَبَتَ الْمُدَّعٰى لِاَنَّ الْجُزْءَ الَّذِىْ الخ

وَالْكُلُّ ضَعِيفٌ اَمَّا الْاَوَّلُ فَلِاَنَّهٗ اِنَّمَا يَدُلُّ عَلٰى ثُبُوتِ النُّقْطَةِ وَهُوَ لَايَسْتَلْزِمُ ثُبُوتَ الْجُزْءِ لِاَنَّ حُلُوْلَهَا فِى الْمَحَلِّ لَيْسَ الْحُلُوْلَ السَّرَيَانِىَّ حَتّٰى يَلْزَمَ مِنْ عَدَمِ اِنْقِسَامِهَا عَدَمُ اِنْقِسَامِ الْمَحَلِّ

সহজ তরজমা

উপরিউক্ত প্রমাণগুলো দুর্বল

উপরিউক্ত সবগুলো প্রমাণ দুর্বল। প্রথম দলীলটি এ কারণে দুর্বল যে, সেটি কেবল نُقْطَه (বিন্দু) এর অস্তিত্ব বুঝায়। এটি (বিন্দুর অস্তিত্ব) جُزْء لَا يَتَجَزّٰى বা পারমাণুর অস্তিত্বকে আবশ্যক করে না। কেননা বিন্দু তার স্থানে حُلُول سُرَيَانِى হিসেবে অনুপ্রবেশ করে না। যার ফলে সেটি অবিভাজ্য হওয়ায় তার مَحَل (স্থান) টির অবিভাজ্য হওয়া আবশ্যক হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

প্রথম প্রমাণের দুর্বলতার কারণ

اَمَّا الْاَوَّلُ ঃ প্রথম দলীল দুর্বল হওয়ার কারণ হল, উক্ত দলীল দ্বারা نُقْطَه (বিন্দুর) এর অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়, যা বণ্টনের অযোগ্য عَرَض কে বলে। এতে جُزْء لَا يَتَجَزّٰى এর অস্তিত্ব প্রমাণিত হবে না। যা হল বিভাজনের অযোগ্য একটি جَوْهَر। কেননা সমতল পৃষ্ঠের সাথে গোলক তার এমন অংশ দ্বারা মিলিত হয়, যা বিভাজনযোগ্য নয়। বস্তুতঃ পৃষ্ঠ عَرَض বলে তার বিভাজন অযোগ্য অংশও عَرَض হবে। আর ভাগ করা যায় না এমন عَرَض কে نُقْطَه বলে। অতএব نُقْطَه (বিন্দু) এর অস্তিত্ব প্রমাণিত হল; جُزْء لَا يَتَجَزّٰى (পরমাণু) এর অস্তিত্ব প্রমাণিত হল না।

বিন্দু প্রমাণিত হলে কি পরমাণুও প্রমাণিত হবে ?

قَوْلُهٗ وَهُوَ لَا يَسْتَلْزِمُ ঃ এটি একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্নটি হল, نُقْطَه (বিন্দু) যখন প্রমাণিত হল, তখন جُزْء لَا يَتَجَزّٰى বা পরমাণুও অবশ্যই প্রমাণিত হবে। কেননা نُقْطَه (বিন্দু) হল عَرَض আর প্রত্যেকটি عَرَض এর জন্য মৌলিক স্থানের প্রয়োজন। সুতরাং এ نُقْطَه (বিন্দু) এর জন্যও কোন مَحَل (স্থান) প্রয়োজন। আর نُقْطَه (বিন্দু) যেহেতু অবিভাজ্য, তাই তার مَحَل (স্থান) যে جَوْهَر টি তাও অবিভাজ্য হবে। আর অবিভাজ্য جَوْهَر কেও جُزْء لَا يَتَجَزّٰى বলে। সুতরাং جُزْء لَا يَتَجَزّٰى প্রমাণিত হল।

জবাব ঃ حُلُول দুই প্রকার। (১) حُلُول سُرَيَانِى তথা অনুপ্রবেশকারী জিনিসটি তার مَحَل (স্থানের) প্রতিটি অংশে এমনভাবে প্রবেশ করা, যেন অনুপ্রবেশকারী বস্তুটির অবিভাজ্য হওয়া তার (স্থান) مَحَل টি আবিভাজ্য হওয়াকে আবশ্যক করে। (২) حُلُول طَرَيَانِى তথা যার মধ্যে তদ্রূপ হয় না। আর نُقْطَه (বিন্দু) তার مَحَل (স্থান) তথা রেখার মধ্যে حُلُول سُرَيَانِى রূপে প্রবেশ করে না যে, তার অবিভাজ্য হওয়ার ফলে তার مَحَل (স্থান) ও অবিভাজ্য হওয়া আবশ্যক হবে। কেননা نُقْطَه (বিন্দু) তার مَحَل অর্থাৎ রেখার শেষ প্রান্ত হয়ে থাকে। রেখার প্রতিটি অংশ বিদ্যমান থাকে না। কাজেই نُقْطَه (বিন্দু) এর অস্তিত্ব প্রমাণিত হওয়া جُزْء لَا يَتَجَزّٰى (পরমাণু) এর অস্তিত্বকে আবশ্যক করে না।

وَاَمَّا الثَّانِىْ وَالثَّالِثُ فَلِاَنَّ الْفَلَاسِفَةَ لَايَقُوْلُوْنَ بِاَنَّ الْجِسْمَ مُتَاَلِّفٌ مِّنْ اَجْزَاءٍ بِالْفِعْلِ وَاَنَّهَا غَيْرُ مُتَنَاهِيَةٍ بَلْ يَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ قَابِلٌ لِانْقِسَامَاتٍ غَيْرِ مُتَنَاهِيَةٍ وَلَيْسَ فِيْهِ اِجْتِمَاعُ اَجْزَاءٍ اَصْلًا وَاِنَّمَا الْعِظَمُ وَالصِّغَرُ بِاِعْتِبَارِ الْمِقْدَارِ الْقَائِمِ بِهٖ لَابِاِعْتِبَارِ كَثْرَةِ الْاَجْزَاءِ وَقِلَّتِهَا وَالْاِفْتِرَاقُ مُمْكِنٌ لَا اِلٰى نِهَايَةٍ فَلَا يَسْتَلْزِمُ الْجُزْءَ وَاَمَّا اَدِلَّةُ النَّفْىِ اَيْضًا فَلَا تَخْلُوْ عَنْ ضُعْفٍ وَلِهٰذَا مَالَ الْاِمَامُ الرَّازِىْ فِىْ هٰذِهِ الْمَسْئَلَةِ اِلَى التَّوَقُّفِ فَاِنْ قِيْلَ هَلْ لِهٰذَا الْخِلَافِ ثَمَرَةٌ قُلْنَا نَعَمْ فِىْ اِثْبَاتِ الْجَوْهَرِ الْفَرْدِ نَجَاةٌ عَنْ كَثِيْرٍ مِّنْ ظُلُمَاتِ الْفَلَاسِفَةِ مِثْلِ اِثْبَاتِ الْهَيُوْلٰى وَالصُّوْرَةِ الْمُؤَدِّىْ اِلٰى قِدَمِ الْعَالَمِ وَنَفْىِ حَشْرِ الْاَجْسَادِ وَكَثِيْرٍ مِّنْ اُصُوْلِ الْهَنْدَسَةِ الْمَبْتَنٰى عَلَيْهَا دَوَامُ حَرَكَاتِ السَّمٰوٰتِ وَامْتِنَاعُ الْخَرْقِ وَالْاِلْتِيَامِ عَلَيْهَا ۔

সহজ তরজমা

দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রমাণের দুর্বলতা

আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দলীল এ কারণে দুর্বল যে, দার্শনিকগণ বলেন– جِسْم (দেহ) কার্যতঃ কতগুলি অংশ দ্বারা গঠিত হয় এবং ঐ অংশগুলি অসীম (এটা তো নিযাম মুতাযিলীর মতামত।) বরং দার্শনিকগণ বলেন, جِسْم (দেহ) অসীম বিভাজন গ্রহণ করে এবং তাতে আদৌ অংশসমূহের সমন্বয় নেই। আর ছোট-বড় হওয়া جِسْم (দেহ) এর সাথে প্রতিষ্ঠিত পরিমাণের দিক থেকে; অংশ কম-বেশী হওয়ার দিক থেকে নয়। আর جِسْم (দেহ) এর মধ্যে অসীম বিভাজন সম্ভব। কাজেই বিভাজন جُزْء لَا يَتَجَزّٰى কে আবশ্যক করবে না। বাকি রইল جُزْء لَا يَتَجَزّٰى (পরমাণু) না থাকার দলীলাদি (যা দার্শনিকগণ দিয়ে থাকেন)। সেগুলোও দুর্বলতা মুক্ত নয়। এ কারণে ইমাম রাযী রহ. আলোচ্য মাসআলায় চুপ থাকার প্রতি ধাবিত হয়েছেন। তদুপরি যদি এ প্রশ্ন করা হয়, (আকাইদ পর্বে) উক্ত বিরোধের কি উপকারীতা আছে ? তাহলে আমরা বলব, جُزْء لَايَتَجَزّٰى (পরমাণু) প্রমাণে দার্শনিকদের অনেক পথভ্রষ্টকারী (এবং শরী'আত বিরোধী) বিষয়াদি যেমন هَيُوْلٰى এবং صُوْرَت جِسْمِيَه কে প্রমাণ করা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, যা عَالَم (সৃষ্টি জগৎ) قَدِيْم (সুপ্রাচীন) হওয়া এবং দৈহিক হাশর-নশরের অস্বীকৃতির দিকে নিয়ে যায়, এরূপভাবে অনেক প্রকৌশল সংক্রান্ত মূলনীতি থেকে মুক্ত হওয়া যায়, যার উপর আসমানসমূহের ঘর্ণয়ন, চিরন্তনতা এবং তা ভাঙা-গড়ার অসম্ভাব্যতা নির্ভরশীল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

اَمَّا الثَّانِىْ وَالثَّالِثُ ঃ جُزْء لَا يَتَجَزّٰى প্রমাণের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দলীলটি বস্তুতঃ দলীলদাতার একটি অলিক ধারণার উপর নির্ভরশীল ছিল অর্থাৎ দার্শনিকদের মতে প্রতিটি عَيْن এর বিভক্তি নিম্নোক্ত অর্থে অসীম তথা তাদের মতে পরমাণু কার্যতঃ অসীম অংশসমূহ দ্বারা গঠিত। অথচ এটা দার্শনিকদের মত নয় বরং কালাম শাস্ত্রবিদদের মধ্য হতে নিযাম মুতাযিলীর মত। এ কারণে শারিহ রহ. দলীলদাতার ভুল ধারণার অবসান কল্পে দার্শনিকদের মতামত বর্ণনা করে বলেছেন, দার্শনিকগণ কার্যতঃ অনেকগুলো অংশ দেহে বিদ্যমান থাকা এবং তা অসীম হওয়ার প্রবক্তা নন বরং দার্শনিকদের মতে প্রতিটি দেহ মূলতঃ কোন সংযুক্তি বিহীন এক। আর তা অসীম বিভাজন গ্রহণের উদ্দেশ্য হল, তার বিভাজন এমন কোন সীমায় গিয়ে পৌঁছে না, যার পর আর কোন বিভাজন হতে পারে না। এ উদ্দেশ্য নয় যে, কার্যতঃ তাতে অসীম অংশ বিদ্যমান আছে, যেগুলোর দিকে এ দেহটি অসীমরূপে বিভাজ্য হয়। আর যখন দেহের মাঝে কার্যতঃ অসীম অংশ থাকার ওপর, তা দার্শনিকদের মতামত নয়, তখন দার্শনিকদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ও তৃতীয় দলীল উপস্থাপন করা শুদ্ধ হবে না।

قَوْلُهٗ اِنَّمَا الْعِظَمُ وَالصِّغَرُ ঃ দ্বিতীয় দলীলে বলা হয়েছে, একটি দেহ অপর দেহ হতে ছোট বা বড় হওয়া

দেহটির অংশ কম-বেশী হওয়ার উপর নির্ভরশীল। তার প্রতি উত্তরে বলছেন, দেহ তার ঐ পরিমাণের কারণে ছোট-বড় হয়, যা তার সাথে প্রতিষ্ঠিত। অংশ কম বেশী হওয়ায় ছোট-বড় হয় না। এর স্পষ্ট উদাহরণ হল, তুলা যখন ধূনা হয় তখন তার অংশ বেশী হওয়া ছাড়াই তা বড় হয়ে যায়। আর ধূনা তুলা চাপ দিলে অংশ না কমা সত্ত্বেও তা ছোট হয়ে যায়।

তৃতীয় প্রমাণের জবাব

قَوْلُهٗ وَالْاِفْتِرَاقُ مُمْكِنٌ ঃ এটা তৃতীয় দলীলের উত্তর। যার সারমর্ম হল, দেহের মধ্যে সম্ভাব্য সকল বণ্টনের উপর আল্লাহ তা'আলা সক্ষম হওয়া جُزْء لَايَتَجَزّٰى (পরমাণু) কে তখনই আবশ্যক করত, যখন এ বিভক্তি কোন এক সীমা পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়ে যেত এবং তারপর আর কোন বিভক্তি না হত। কিন্তু দেহের বিভক্তির কোন শেষ সীমা নেই। আল্লাহ তা'আলার শক্তি বিভক্তির যে স্তরে পৌঁছবে, তারপরও তাকে বিভাজন করা যাবে। কাজেই جُزْء لَا يَتَجَزّٰى প্রমাণিত হবে না।

পরমাণুকে যদি অস্বীকার করা হয় ?

قَوْلُهٗ نَعَمْ ঃ অর্থাৎ যদি جُزْء لَا يَتَجَزّٰى কে প্রমাণিত আছে বলে না মানা হয়, তবে جِسْم (দেহ) هَيُوْلٰى এবং صُوْرَت جِسْمِيَّه দ্বারা গঠিত হয়েছে বলে মেনে নিতে হবে। আর هَيُوْلٰى ও صُوْرَت جِسْمِيَه এর অস্তিত্ব স্বীকার করলে সৃষ্টিজগত قَدِيْم হওয়া এবং হাশরকে অস্বীকার করা আবশ্যক হবে। কারণ, যখন هَيُوْلٰى এর অস্তিত্ব স্বীকার করা হবে তখন তা قَدِيْم বলে মেনে নিতে হবে। কেননা দার্শনিকের মতে প্রত্যেক নূতন বস্তুর মূলধাতু পূর্ব হতে বিদ্যমান থাকে। এ মূলনীতি অনুসারে যদি হাইউলাও নূতন এবং নশ্বর হয়, তাহলে পূর্বে তার মূলধাতুও বিদ্যমান থাকবে। আর ঐ মূলধাতুরও কোন মূলধাতু থাকবে। এভাবে তৃতীয় মূলধাতুটিরও কোন মূলধাতু থাকবে। ফলে তাসালসুল আবশ্যক হবে। আর তাসালসুল যেহেতু অসম্ভব। তাই هَيُوْلٰى এর নতুনত্ব এবং নশ্বরতাও অসম্ভব। কাজেই هَيُوْلٰى কদীম বা সুপ্রাচীন সাব্যস্ত হল। আর هَيُوْلٰى ও صُوْرَت جِسْمِيَه পরস্পর لَازِم ও مَلْزُوْم। একটির অস্তিত্ব অপরটি ছাড়া হতে পারে না। বিধান صُوْرَة جِسْمِيَه ও সুপ্রাচীন হবে এবং هَيُوْلٰى ও صُوْرَت جِسْمِيَّه এর সমন্বয়ে গঠিত দেহও قَدِيْم হবে। আর أَجْسَام (দেহ সমূহ) أَعْرَاض (আপতন সমূহের) مَحَل (স্থান)। সুতরাং দেহসমূহ قَدِيْم হওয়ায় তার মহল তথা আপতনসমূহও قَدِيْم হবে। আর أَجْسَام ও أَعْرَاض কদীম হলে সৃষ্টিজগৎও قَدِيْم হবে। কারণ, عَالَم হল أَجْسَام ও أَعْرَاض এর সমষ্টি। আর عَالَم (সৃষ্টিজগৎ) قَدِيْم হলে حَشْر এর আক্বীদা অস্বীকৃত হয়ে যাবে। কেননা عَالَم ধ্বংস হওয়ার পরই حَشْر হবে। অথচ সৃষ্টিজগৎ قَدِيْم হওয়া ধ্বংস হওয়ার পরিপন্থী।

وَالْعَرَضُ مَالَا يَقُوْمُ بِذَاتِهٖ بَلْ بِغَيْرِهٖ بِاَنْ يَّكُوْنَ تَابِعًا لَهٗ فِى التَّحَيُّزِ اَوْ مُخْتَصًّا بِهٖ اِخْتِصَاصَ النَّاعِتِ بِالْمَنْعُوْتِ عَلٰى مَاسَبَقَ لَابِمَعْنٰى اَنَّهٗ لَايُمْكِنُ تَعَقُّلُهٗ بِدُوْنِ الْمَحَلِّ عَلٰى مَا وُهِمَ فَاِنَّ ذٰلِكَ اِنَّمَا هُوَ فِىْ بَعْضِ الْاَعْرَاضِ وَيَحْدُثُ فِى الْاَجْسَامِ وَالْجَوَاهِرِ قِيْلَ هُوَ مِنْ تَمَامِ التَّعْرِيْفِ اِحْتِرَازًا عَنْ صِفَاتِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَقِيْلَ لَابَلْ هُوَ بَيَانُ حُكْمِهٖ كَالْاَلْوَانِ وَاُصُوْلُهَا قِيْلَ السَّوَادُ وَالْبَيَاضُ وَقِيْلَ اَلْحُمْرَةُ وَالْخُضْرَةُ وَالصُّفْرَةُ اَيْضًا وَالْبَوَاقِىْ بِالتَّرْكِيْبِ وَالْاَكْوَانِ وَهِىَ الْاِجْتِمَاعُ وَالْاِفْتِرَاقُ وَالْحَرَكَةُ وَالسُّكُوْنُ وَالطُّعُوْمِ وَاَنْوَاعُهَا تِسْعَةٌ وَهِىَ الْمَرَارَةُ وَالْحَرَاقَةُ وَالْمَلُوْحَةُ وَالْعُفُوْصَةُ وَالْحُمُوْضَةُ وَالْقَبْضُ وَالْحَلَاوَةُ وَالدُّسُوْمَةُ وَالتَّفَاهَةُ ثُمَّ يَحْصُلُ بِسَبَبِ التَّرْكِيْبِ اَنْوَاعٌ لَاتُحْصٰى وَالرَّوَائِحِ وَاَنْوَاعُهَا كَثِيْرَةٌ وَلَيْسَتْ لَهَا اَسْمَاءٌ مَخْصُوْصَةٌ وَالْاَظْهَرُ اَنَّ مَا عَدَا الْاَكْوَانِ لَايَعْرِضُ اِلَّا الْاَجْسَامَ۔

সহজ তরজমা

আরয বা আপতন

আরয এমন সম্ভাব্য বস্তু, যা নিজে নিজে প্রতিষ্ঠিত নয় বরং অন্যের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ সেটি প্রতিষ্ঠিত হতে অন্যের অধীনস্থ অথবা অন্যের সাথে এমন বিশেষ সম্পর্ক রাখে, যেমন نَعْت (গুণ) এর সাথে مَنْعُوْت (গুণ বিশিষ্ট) এর সম্পর্ক থাকে। যেমন (অন্যের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অর্থ সম্পর্কে কালাম শাস্ত্রবিদ ও দার্শনিকদের মতবিরোধ) ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। (অন্যের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার) অর্থ এই নয় যে, মহল ব্যতিত তার কল্পনা করা সম্ভব নয়। যেমনটি অনেকের ধারণা। কেননা এটা তো কোন কোন عَرَض এর মধ্যে হয়ে থাকে তা (আরয) جِسْم (দেহ) جَوْهَر (পরমাণু) তে সংযুক্ত হয়। কেউ কেউ বলেছেন, এটা عَرَض এর সংজ্ঞার পরিশিষ্ট। আল্লাহ তা'আলার গুণাবলীকে বাদ দেওয়ার জন্য। আর কেউ কেউ বলেছেন– না, এটি عَرَض এর হুকুম। যেমন, রং। কেউ কেউ কাল এবং সাদাকে মূল রং সাব্যস্ত করেছেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন, লাল-সবুজ, হলুদও এর আওতাভুক্ত। আর বাকিগুলো মিশ্রণের ফলে সৃষ্টি হয়।

এবং (যেমন) اَكْوَان। আকওয়ান হল ঐক্য, বিচ্ছেদ, গতি ও স্থিতি। এবং যেমন, স্বাদ। স্বাদ নয় প্রকার– তিতা, ঝাল বা লোনা, সংকোচন, টক। জিহ্বার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অংশ সংকোচন, মিঠা, চর্বি, বিস্বাদ। আবার সংযোজন ও সংমিশ্রণের ফলে অনেক প্রকার তৈরী হয় এবং (যেমন) ঘ্রাণ। এরও অনেক অনেক প্রকার রয়েছে। তবে এগুলোর বিশেষ কোন নাম নেই। অগ্রগণ্য মত হল, اَكْوَان ব্যতিত অন্যান্য সব اَعْرَاض দেহের সাথে যুক্ত হয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

"আরয"-এর অর্থ কি ?

قَوْلُهٗ وَالْعَرَضُ ঃ عَيْن এর সংজ্ঞা ও তার বিভক্তি থেকে ফারিগ হওয়ার পর عَالَم এর দ্বিতীয় প্রকার عَرَض এর সংজ্ঞা ও তার কয়েকটি উদাহরণ পেশ করছেন। মুসান্নিফ রহ. বলেন, عَرَض এমন সম্ভাব্য বস্তুকে বলে, যা নিজে নিজে প্রতিষ্ঠিত নয় বরং অন্যের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত। চাই তার (قَائِمٌ بِالْغَيْرِ হওয়ার) অর্থ– সেটি স্থান গ্রহণে অর্থাৎ অনুভূত ইশারার বা কোন স্থান গ্রহণে অন্য কারও অধীনস্থ হয়। যেমন, কালাম শাস্ত্রবিদদের মত। অথবা قَائِمٌ بِالْغَيْرِ (অন্যের সাথে প্রতিষ্ঠিত হওয়া) এর অর্থ হোক, একটি অপর একটি বস্তুর সাথে এমন সম্পর্কযুক্ত হয় যে, একটি صِفَت ও অপরটি তার مَوْصُوْف হতে পারে। যেমনটি দার্শনিকদের মত।

قَوْلُهٗ عَلٰى مَا سَبَقَ ঃ অর্থাৎ قَائِمٌ بِالْغَيْرِ এর অর্থ নিয়ে কালাম শাস্ত্রবিদ ও দার্শনিকদের বিরোধের কথা ইতোপূর্বে মুসান্নিফ রহ. এর উক্তি فَالَا عَيَانُ مَالَهٗ قِيَامٌ بِذَاتِهٖ এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ لَا بِمَعْنَى ঃ কেউ কেউ قَائِم بِالْغَيْرِ এর অর্থ করেছেন, যার অস্তিত্ব তার مَحَل (স্থান) ব্যতিত কল্পনাই করা যায় না। শারিহ রহ. বলেন, قَائِم بِالْغَيْرِ এ অর্থটি সঠিক নয়। কেননা أَعْرَاض দুই প্রকার। (১) أَعْرَاض غَيْر نِسْبِيَّة –যেগুলোর অস্তিত্বের কল্পনা অন্যের উপর মওকূফ নয়। যেমন– كَمْ , كَيْفَ (২) أَعْرَاض نِسْبِيَّة যেগুলোর কল্পনা অন্যের উপর মউকূফ থাকে। যেমন, عَيْن - إِضَافَت - مِلْك - وَضْع - متى - فِعْل اِنْفِعَال । অতএব উল্লেখিত সংজ্ঞাটি أَعْرَاض غَيْر نِسْبِيَّة কে শামিল করে না। কাজেই সংজ্ঞাটি পূর্ণাঙ্গ নয়। তবে কালাম শাস্ত্রবিদও দার্শনিকদের প্রদত্ত প্রথোমক্ত সংজ্ঞাটি এর বিপরীত। কারণ, সেগুলো উভয় প্রকার আরযগুলোই শামিল করে।

"আরয" -এর বিধান

قَوْلُهُ : قِيْلَ ঃ কেউ বলছেন, মুসান্নিফ রহ. এর وَيَحْدُثُ فِى الْأَجْسَامِ উক্তিটি عَرْض এর সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। যাতে আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী عَرْض এর সংজ্ঞা হতে বের হয়ে যায়। অবশ্য এতে আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী عَرْض হতে এজন্য বেরিয়ে যাবে যে, আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী কদীম حَادِث নয়। কিন্তু এ উক্তিটি দুর্বল। বিশুদ্ধ কথা হল, আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী মুসান্নিফ রহ. এর উক্তি وَالْعَرْضُ مَالَايَقُوْم بِذَاتِه এর মধ্যে বর্ণিত "مَا" শব্দটির কারণে বের হয়েছে। কেননা مَا শব্দটি দ্বারা উদ্দেশ্য হল, সম্ভাব্য বস্তু। আর প্রতিটি সম্ভাব্য বস্তুই নশ্বর। অথচ আল্লাহর গুণাবলী নশ্বর নয় বরং অবিনশ্বর। এ কারণে عَرْض এর সংজ্ঞা আল্লাহ তা'আলার গুণাবলীকে অন্তর্ভুক্ত করে না। কাজেই তাকে বের করারও প্রয়োজন নেই বরং এটা তো عَرْض এর হুকুমের বিবরণ।

আরযের কয়েকটি উদাহরণ

قَوْلُهُ كَالْأَلْوَان ঃ মুসান্নিফ রহ. এখানে عَرْض এর কয়েকটি উদাহরণ পেশ করেছেন। عَرْض এর এক প্রকার হল أَلْوَان বা রং সমূহ। কেউ কেউ সাদা ও কাল রং কে মূল রং আখ্যা দিয়ে বলেছেন, বাকী রংগুলো একটিকে অপরটির সাথে মিলানোর ফলে তৈরী হয়। যেমন, সাদা একটি রং আর কাল একটি লং। সুতরাং কাল ও সাদা রং দুটিকে মিশ্রণ করলে তৃতীয় রং তৈরী হবে। অতঃপর তাতে বিশুদ্ধ সাদা রং মিশ্রণ করলে চতুর্থ রং তৈরী হবে। আর খাটি কালো রং মিশানোর ফলে পঞ্চম রং তৈরী হবে। এভাবে আরও অনেক প্রকার রং হবে। আবার কেউ কেউ তো মূল রং পাঁচটি বলেছেন। উল্লেখিত দুটি এবং লাল, সবুজ ও হলুদ।

"কাওন" -এর অর্থ ও শ্রেণীভাগ

قَوْلُهُ وَالْأَكْوَان ঃ أَكْوَان শব্দটি كَوْن এর বহুবচন। যার অর্থ হল, অস্তিত্ব। কালাম শাস্ত্রবিদদের মতে كَوْن চার প্রকার। (১) ঐক্য (২) বিচ্ছেদ (৩) গতি (৪) স্থিতি। এবার প্রত্যেকটির সংজ্ঞা শুনুন। সুতরাং যদি দুটি جَوْهَر এমনভাবে অস্তিত্ব লাভ করে যে, ঐ দুটির মাঝে তৃতীয় কোন জিনিস অনুপ্রবেশ করতে পারে না, তাকে اِجْتِمَاع (ঐক্য) বলে। দুটি جَوْهَر এর অস্তিত্ব এমনভাবে হল যে, এদুটির মাঝে তৃতীয় বস্তু প্রবেশ করতে পারে, তাকে اِفْتِرَاق বা বিচ্ছেদ বলে। কোন জিনিস দুই সময় দুটি জিনিসে বিদ্যমান হওয়াকে গতি বলে। আর দুই সময় একই জিনিসে বিদ্যমান হওয়াকে স্থিতি বলে। যেমন, কোন বস্তু কোন এক সময় যে স্থানে বিদ্যমান ছিল, অন্য সময় অন্য কোন স্থানে বিদ্যমান হওয়াকে গতি বলে। কিন্তু কোন বস্তু কোন এক সময় যে স্থানে বিদ্যমান ছিল অন্য সময়ও সেখানে বিদ্যমান থাকে, তাহলে এটা তার স্থিতি। সুতরাং গতির জন্য দুটি সময় ও দুটি স্থান প্রয়োজন, একটি সাবেক ও একটি বর্তমান। এমনিভাবে তার দুটি كَوْن বা অস্তিত্বও হয়ে থাকে। একটি সাবেক সময় ও স্থানে অস্তিত্ব। অপরটি বর্তমান সময় ও বর্তমান স্থানে অস্তিত্ব। একারণে কালাম শাস্ত্রবীদগণ حَرْكَت (গতি) এর সংজ্ঞায় বলেন, هِىَ كَوْنَانِ فِى آنَيْنِ فِى مَكَانَيْنِ তবে سُكُوْن (স্থিতি) এর মধ্যে অস্তিত্ব ও সময় দুটি হয়। স্থান হয় একটি। ফলে কালাম শাস্ত্রবিদগণ سُكُوْن (স্থিতি) এর সংজ্ঞায় বলেন, كَوْنَان فِى آنَيْنِ فِى مَكَانٍ وَاحِدٍ

মোটকথা, حَرْكَت (গতি) سُكُوْن (স্থিতি) এদুটি كَوْن (অস্তিত্ব) এর একটি প্রকার। কাজেই বস্তু দুটিই অস্তিত্ববান। আর পরস্পর বিরোধী দুটি বস্তু যখন অস্তিত্ববান হয় এবং সেগুলোর মধ্য হতে একটির কল্পনা অপরটির উপর নির্ভরশীল না থাকে, তখন সেগুলোতে থাকে تَقَابُل تَضَاد বা বিপরীত মেরুতে অবস্থান। কাজেই মুতাকাল্লিমীনদের মতে حَرْكَت ও سُكُوْن এর মাঝে تَضَاد বা বৈপরিত্য রয়েছে। আর দার্শনিকদের মতে حَرْكَت (গতি) বিদ্যমান বস্তু। কেননা حَرْكَت বা গতি কোন বস্তু ধীরে ধীরে পূর্ণতায় গিয়ে পৌছা, আর سُكُوْن (স্থিতি)

হল, গতিবান বস্তুর গতি না থাকা। একারণে দার্শনিকদের মতে حَرْكَتْ (গতি) ও سُكُوْن (স্থিতি) এর মাঝে تَقَابُل عَدَم مَكْلَه রয়েছে।

কয়েকটি স্বাদের বর্ণনা

قَوْلُهُ الْمَرَارَةُ ঃ নিমের মত তিক্ততাকে مَرَارَت বলে। মরিচের মত তেজী ভাবকে حَرْقَه বলে। জিহ্বা সংকুচিত হওয়াকে عَفُوْصَت এবং قَبْض বলে। যেমন, কাচা কলা মুখে দিলে জিহ্বার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অংশ সংকুচিত হয়। আর শুধু বাহ্যিক অংশ সংকুচিত হলে তাকে عَفُوْصَت বলে।

আরযসমূহ যুক্ত হওয়ার স্থান

قَوْلُهُ وَالْاَظْهَرُ ঃ অর্থাৎ عَرَض সমূহের মধ্য হতে اَكْوَان তথা اِجْتِمَاع , اِفْتِرَاق , حَرْكَت , سُكُوْن দেহের সাথে যুক্ত হয় এবং দেহ ব্যতিত অন্যান্য জিনিসেও যুক্ত হয়। অন্যান্য اَعْرَاض যেমন اَلْوَان (রং) طُعُوْم (স্বাদ) رَوَائِح (ঘ্রাণ) ইত্যাদি কেবল দেহেই যুক্ত হয়। শারিহ রহ. এর এ উক্তি বাহ্যতঃ "তাজরীদ ব্যাখ্যাকারের" নিম্নোক্ত উক্তির পরিপন্থী বুঝা যায় তথা অনুভূত اَعْرَاض তথা اَلْوَان (রং) طُعُوْم (স্বাদ) ইত্যাদি কেবল একটি جَوْهَر বা মূলবস্তুতে পাওয়া যেতে পারে। আর একটি মূলবস্তু جِسْم (দেহ) নয়। কিন্তু বাস্তবতা হল, উক্তি দুটি আপন স্থানে ঠিক আছে। উভয়টির মাঝে কোন বৈপরিত্য নেই। কারণ, তাজরীদ ব্যাখ্যাকারের উক্তি সম্ভাব্য বস্তু সম্পর্কে আর বক্ষমান কিতাবের শারিহের বক্তব্য হল, বাস্তব অস্তিত্ব সম্পর্কে।

وَاِذَا تَقَرَّرَ اَنَّ الْعَالَمَ اَعْيَانٌ وَاَعْرَاضٌ وَالْاَعْيَانُ اَجْسَامٌ وَجَوَاهِرُ فَنَقُوْلُ الْكُلُّ حَادِثٌ اَمَّا الْاَعْرَاضُ فَبَعْضُهَا بِالْمُشَاهَدَةِ كَالْحَرَكَةِ بَعْدَ السُّكُوْنِ وَالضَّوْءِ بَعْدَ الظُّلْمَةِ وَالسَّوَادِ بَعْدَ الْبَيَاضِ وَبَعْضُهَا بِالدَّلِيْلِ وَهُوَ طَرَيَانُ الْعَدَمِ كَمَا فِىْ اَضْدَادِ ذٰلِكَ فَاِنَّ الْقِدَمَ يُنَافِى الْعَدَمَ لِاَنَّ الْقَدِيْمَ اِنْ كَانَ وَاجِبًا لِذَاتِهِ فَظَاهِرٌ وَاِلَّا لَزِمَ اِسْتِنَادُهُ اِلَيْهِ بِطَرِيْقِ الْاِيْجَابِ اِذِ الصَّادِرُ مِنَ الشَّيْئِ بِالْقَصْدِ وَالْاِخْتِيَارِ يَكُوْنُ حَادِثًا بِالضَّرُوْرَةِ وَالْمُسْتَنَدُ اِلَى الْمُوْجِبِ الْقَدِيْمِ قَدِيْمٌ ضَرُوْرَةَ اِمْتِنَاعِ تَخَلُّفِ الْمَعْلُوْلِ عَنِ الْعِلَّةِ۔

সহজ তরজমা

বিশ্বজগতের সবই নশ্বর ঃ যখন প্রমাণিত হল যে, আলম বা সৃষ্টিজগত দুই প্রকার– اَعْرَاض ও اَعْيَان। আর اَعْيَان দুই প্রকার। جِسْم (দেহ) جَوْهَر (মূলবস্তু)। কাজেই আমরা বলব, এগুলো সবই ধ্বংসশীল। মোটকথা, কোন কোন اَعْرَاض এর নশ্বরতা প্রত্যক্ষ দর্শনের দ্বারা প্রমাণিত। যেমন– স্থিতির পর গতি, অন্ধকারের পর আলো। সাদার পর কালো। আবার কিছু কিছু عَرَض এর নশ্বরতা দলীল দ্বারা প্রমাণিত। নশ্বরতার উক্ত দলীলটি হল, অস্তিত্ব না থাকা। যেমন, উপরিউক্ত বস্তুগুলোর বিপরীত বস্তুসমূহ। কেননা قَدِيْم হওয়া অস্তিত্বহীনতার পরিপন্থী। কারণ, قَدِيْم যদি وَاجِبُ لِذَاتِه তথা স্বত্তাগতভাবে অপরিহার্য হয়, তাহলে সেটি যে অস্তিত্বহীনতার পরিপন্থী তা তো স্পষ্ট। অন্যথায় যদি مُمْكِن لِذَاتِه (সম্ভাব্য স্বত্তা) হয়, তাহলে তা وَاجِبُ لِذَاتِه এর উপর নির্ভর করা অর্থাৎ وَاجِبُ لِذَاتِه এর مَعْلُوْل হওয়া আবশ্যক হবে। কারণ, কোন বস্তু অন্য কোন বস্তু হতে আপন ইচ্ছায় প্রকাশ পেলে তা ধ্বংসশীল হয়। আর যা কোন কর্তা থেকে অনিচ্ছা কৃতভাবে প্রকাশ পায় এবং তার مَعْلُوْل হয়, তা হয় কদীম বা অবিনশ্বর। কেননা عِلَّت থেকে তার مَعْلُوْل পিছিয়ে থাকতে পারে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قوله: اِذَا تَقَرَّرَ ঃ এ পর্যন্ত আলোচনায় عَالَم তিন প্রকার সাব্যস্ত হয়েছে। (১) اَعْرَاض (২) عَيْن مُرَكَّب যেমন দেহ (৩) عَيْن غَيْر مُرَكَّب যেমন جَوَاهِر فَرْد।

قَوْلُهُ فَنَقُوْلُ اَلْكُلُّ حَادِثٌ ঃ সমস্ত عَرَض নশ্বর। এমনিভাবে সমস্ত اَعْيَان مُرَكَّبَه তথা দেহসমূহ, اَعْيَان غَيْر مُرَكَّبَه যেমন جَوَاهِر فَرْده বা মৌলিক পরমাণুসমূহও নশ্বর। এ সৃষ্টিজগতের তিন প্রকারই নশ্বর, বিধায় সৃষ্টিজগতও নশ্বর হবে। তাহলে মুসান্নিফ রহ. এর দাবী اَلْعَالَمُ بِجَمِيْعِ اَجْزَائِهِ مُحْدَثٌ কথাটি সত্য প্রমাণিত হল।

আরযের নশ্বরতার প্রমাণ

قَوْلُهُ اَمَّا الْاَعْرَاضُ ঃ সমস্ত আরযই নশ্বর। কোন কোন عَرَض এর নশ্বরতা প্রত্যক্ষ দর্শনের মাধ্যমে প্রমাণিত। যেমন, কোন বস্তু যখন স্থিতিশীল থাকে তখন গতি থেকে শূন্য থাকে। অতঃপর যখন গতীশীল হয় তখন উক্ত গতিশীলতা আরযটি অনস্তিত্ব হতে অস্তিত্ব লাভ করে। আর অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্ব লাভ করাকেই নশ্বর বলে। বুঝা গেল, গতি-স্থিতি নশ্বর। এমনিভাবে অন্ধকারের সময় আলো থাকে না। অন্ধকার দূরীভূত হলে আলো অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব লাভ করে। আর একেই নশ্বর বলে। অতএব বুঝা গেল, আলো আরযটিও নশ্বর।

وَقَوْلُهُ وَبَعْضُهَا ঃ আর কোন কোন عَرَض এর নশ্বরতা দলীল দ্বারা প্রমাণিত। সে নশ্বরতার দলীলটি হল, অনস্তিত্ব যোগ হওয়া। যেমন, উল্লেখিত আরয সমূহ যথা- গতি, আলো, কালো এগুলোর বিপরীত স্থিরতা, অন্ধকার, সাদা। এসবের নশ্বরতার দলীল হল, এগুলোর উপর অস্তিত্বহীনতা যুক্ত হয়। কেননা যখন গতির অস্তিত্ব থাকে, তখন স্থিতি অস্তিত্বহীন থাকে। তদ্রুপ আলোর অস্তিত্বের কারণে অন্ধকার অস্তিত্বহীন থাকে। আর কোন জিনিস অস্তিত্বহীন হওয়াই বস্তুটির নশ্বরতার দলীল।

অস্তিত্বহীনতা নশ্বরতা বুঝায় কেন ?

قَوْلُهُ فَاِنَّ الْقِدَمَ ঃ কোন বস্তুতে অস্তিত্বহীনতা যোগ হওয়া তার নশ্বরতার দলীল বলার কারণ হল, প্রাচীনতা ও অস্তিত্বহীনতার মাঝে বৈপরিত্য রয়েছে। যে জিনিসের প্রাচীনতা প্রমাণিত হয়, তা কখনও অস্তিত্বহীন হতে পারে না। তদ্রুপ যার সাথে অস্তিত্বহীনতা যোগ হয়, তা প্রাচীন হতে পারে না। সুতরাং নিশ্চয় তা নশ্বর হবে। এ বিষয়টি কালাম শাস্ত্রবিদ ও দার্শনিকদের ঐক্যমতে প্রমাণিত।

প্রাচীনতা ও অস্তিত্বহীনতার বৈপরিত্যের কারণ

قَوْلُهُ لِاَنَّ الْقَدِيْمَ ঃ এটা قِدَم (প্রাচীনতা) عَدَم (অস্তিত্বহীনতা) মাঝে বৈপরিত্যের দলীল। দলীলটি বুঝতে হলে কয়েকটি ভূমিকা বুঝতে হবে।

(১) وَاجِب لِذَاتِه তথা অপরিহার্য সত্তার অস্তিত্ব জরুরী ও তার অনস্তিত্ব অসম্ভব।

(২) প্রত্যেকটি সম্ভাব্য বস্তু আপন অস্তিত্ব লাভে কোন عِلَّة (কারণ) এবং فَاعِل এর উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ عِلَّة ও فَاعِل এর মুখাপেক্ষী এবং مَعْلُوْل হয়ে থাকে।

(৩) সম্ভাব্য বস্তুর জন্য কোন সম্ভাব্য বস্তুকে عِلَّة এবং فَاعِل সাব্যস্ত করা تَسَلْسُل مُحَال কে আবশ্যক করে। কেননা مُمْكِن এর عِلَّة যদি مُمْكِن হয় দ্বিতীয় ভূমিকা অনুসারে সেটিও আরেকটি عِلَّة এর মুখাপেক্ষী হবে। আর ঐ عِلَّة টিও مُمْكِن হওয়ায় অপর عِلَّة এর মুখাপেক্ষী হবে। এভাবে مُمْكِنَات (সম্ভাব্য বস্তুসমূহের) ধারাবাহিকতা অসীম হওয়া আবশ্যক হবে।

(৪) যে জিনিস কোন কারণ ও কর্তার ইচ্ছায় অস্তিত্ব লাভ করে, সেটি নশ্বর হয়। কেননা কোন কর্তার বিদ্যমান থাকা অবস্থায় فَاعِل তার অস্তিত্বের ইচ্ছা করতেই পারে না। অন্যথায় অস্তিত্ববান বস্তুকে অস্তিত্ব দান করা আবশ্যক হবে। যাকে تَحْصِيْل حَاصِل (অর্জিত জিনিস পুনঃঅর্জন করা) বলে। তাহলে অবশ্যই কোন বস্তু অস্তিত্বহীন অবস্থায় তাকে অস্তিত্ব দানের ইচ্ছা হবে। আর অস্তিত্বহীনতাই হল নশ্বরতার দলীল। সুতরাং বুঝা গেল, فَاعِل এর ইচ্ছায় যে জিনিস অস্তিত্ব লাভ করে, সেটি নশ্বর হয়।

(৫) যে বস্তু قَدِيْم فَاعِل (সুপ্রাচীন কর্তা) এবং عِلَّة (কারণ) এর مَعْلُوْل হয় অর্থাৎ قَدِيْم (সুপ্রাচীন) সত্তা দ্বারা বাধ্যতামূলক অস্তিত্ব লাভ করে, তা চিরস্থায়ী হয়। তাতে কখনও অস্তিত্বহীনতা দেখা দেয় না। অন্যথায় مَعْلُوْل তার عِلَّة হতে পিছিয়ে থাকা অর্থাৎ فَاعِل (কর্তা) ও عِلَّة (কারণ) পাওয়া যাওয়া সত্ত্বেও مَعْلُوْل না পাওয়া যাওয়া আবশ্যক হবে। আর مَعْلُوْل তার عِلَّة হতে পিছিয়ে থাকা নাজায়েয।

উক্ত মুকাদ্দামাগুলোর আলোকে ইবারতের ব্যাখ্যা সামনে রেখে قِدَم (প্রাচীনতা) عَدَم (অস্তিত্বহীনতা) এর বৈপরীত্যের দলীল প্রসঙ্গে বলা যায়, قَدِيم দু অবস্থায় থেকে খালি নয়। হয়ত তা وَاجِب لِذَاتِه (অপরিহার্য সত্ত্বা) হবে অথবা مُمْكِن لِذَاتِه বা সম্ভাব্য সত্তাগত বস্তু হবে। قَدِيم যদি وَاجِب لِذَاتِه হয় তাহলে প্রথম ভূমিকা অনুসারে তার উপর অস্তিত্বহীনতা যোগ না হওয়া সুস্পষ্ট। অন্যথায় অর্থাৎ যদি وَاجِب لِذَاتِه না হয় বরং مُمْكِن হয়, তাহলে দ্বিতীয় ভূমিকা অনুসারে উক্ত সম্ভাব্য বস্তুটি কোন কর্তা ও কারণ এর মুখাপেক্ষী হবে। যা ঐ مُمْكِن (সম্ভাব্য বস্তু) এর অস্তিত্বকে তার অনস্তিত্বের উপর প্রাধান্য দিবে। আর ঐ عِلَّة টি مُمْكِن তো হতেই পারবে না। কারণ, عِلَّة টি সম্ভাব্য বস্তু হলে তৃতীয় ভূমিকা অনুসারে تَسَلْسُل مُحَال আবশ্যক হবে। কাজেই বাধ্যতামূলক উক্ত ইল্লাতটি وَاجِب হবে। এবং ঐ مُمْكِن (সম্ভাব্য বস্তু) টি আপন অস্তিত্বে وَاجِب لِذَاتِه এর উপর বাধ্যতামূলক নির্ভর করা অর্থাৎ وَاجِب لِذَاتِه থেকে তার ইচ্ছা ও এখতিয়ার ছাড়া প্রকাশ পাওয়া আবশ্যক হবে। বাধ্যতামূলক কথাটি বলার কারণ হল, যদি وَاجِب لِذَاتِه হতে উক্ত مُمْكِن এর প্রকাশ পাওয়া বাধ্যতামূলক না হয়ে তার ইচ্ছা ও ইখতিয়ারে হয়, তাহলে বস্তুটি নশ্বর হবে। কেননা চতুর্থ ভূমিকা অনুপাতে যা কোন فَاعِل হতে তার ইচ্ছা ও ইখতিয়ারে প্রকাশ পায়, সেটি নশ্বর হয়। অথচ উক্ত مُمْكِن সম্ভাব্য বস্তুটিকে قَدِيم মেনে নিয়েছি। কাজেই ঐ مُمْكِن টি তার فَاعِل হতে বাধ্যতামূলক প্রকাশিত হবে। স্বেচ্ছায় প্রকাশিত হবে না। আর পঞ্চম মুকদ্দমা অনুসারে যে জিনিস কোন فَاعِل قَدِيم হতে বাধ্যতামূলক প্রকাশ পায়, তা قَدِيم হয়; কখনও অস্তিত্বহীন হয় না। কেননা مَعْلُول তার عِلَّة থেকে পিছিয়ে থাকা অসম্ভব। এ কারণে উক্ত مُمْكِن টি فَاعِل مُوْجِب এর مَعْلُول হওয়ায় অর্থাৎ فَاعِل থেকে বাধ্যতামূলক প্রকাশ পাওয়ায় قَدِيم হবে এবং তার عَدَم অসম্ভব হবে। মোটকথা, قَدِيم চাই তা وَاجِب لِذَاتِه হোক বা مُمْكِن হোক সর্বাবস্থায় যখন তার عَدَم অসম্ভব সাব্যস্ত হল, তখন আমাদের দাবী সুপ্রাচীনতা অস্তিত্বহীনতার পরিপন্থী প্রমাণিত হল।

قَوْلُهُ وَاِلَّا ঃ অর্থাৎ যদি কদীম وَاجِب لِذَاتِه না হয় বরং সম্ভাব্য বস্তু হয়, তখন এ সম্ভাব্য বস্তুটির وَاجِبُ لِذَاتِه এর উপর নির্ভর করা এবং তার প্রতি মুখাপেক্ষী হওয়াও তার مَعْلُول হওয়া আবশ্যক হবে।

قَوْلُهُ بِطَرِيْقِ الْاِيْجَابِ ঃ অর্থাৎ ঐ مُمْكِن বাধ্যতামূলক কোন وَاجِبُ لِذَاتِه এর مَعْلُول হবে। ঐ وَاجِب হতে তার অস্তিত্ব ইচ্ছা ও ইখতিয়ারাধীন হবে না।

قَوْلُهُ وَالْمُسْتَنَدُ اِلَى الْمُوْجِب ঃ এখানে مُوْجِب বলতে فَاعِل مُوْجِب উদ্দেশ্য। অর্থাৎ যার থেকে مَعْلُول এর অস্তিত্ব বাধ্যতামূলক হয়; ইচ্ছা ও ইখতিয়ারে নয়।

قَوْلُهُ قَدِيْم ঃ এখানে قَدِيم দ্বারা উদ্দেশ্য হল, স্থায়ী, যা কখনও অস্তিত্বহীন হয় না। শারিহ রহ. এর জন্য উচিৎ ছিল, যে জিনিস কোন قَدِيم হতে বাধ্যতামূলক প্রকাশ পায় তা কখনও অস্তিত্বহীন হয় না –এরূপ বলা।

قَوْلُهُ : اَلْمُوْجِبُ ঃ فَاعِل مُوْجِب বা عِلَّة مُوْجِبَه বলে, যার থেকে مَعْلُول তার ইচ্ছা ও ইখতিয়ার ছাড়া প্রকাশিত হয়। যেমন, আগুন হতে উষ্ণতা ও প্রজ্বলন প্রকাশ পাওয়া তার ইচ্ছা ও ইখতিয়ার ছাড়াই হয়। তাই আগুন উষ্ণতা ও জ্বালিয়ে দেওয়ার জন্য عِلَّة مُوْجِبَه ।

قَوْلُهُ: ضَرُوْرَةِ امْتِنَاع ঃ অর্থাৎ عِلَّت مُوْجِبَه হতে مَعْلُول এ অর্থে পিছিয়ে থাকে যে, عِلَّت مُوْجِبَه যেমন আগুন বিদ্যমান এবং مَعْلُول অর্থাৎ উষ্ণতা অনুপুস্থিত হওয়া নাজায়েয এবং অসম্ভব। এমনিভাবে مُمْكِن হবে তখন তার অস্তিত্বহীন তা অসম্ভব হবে।
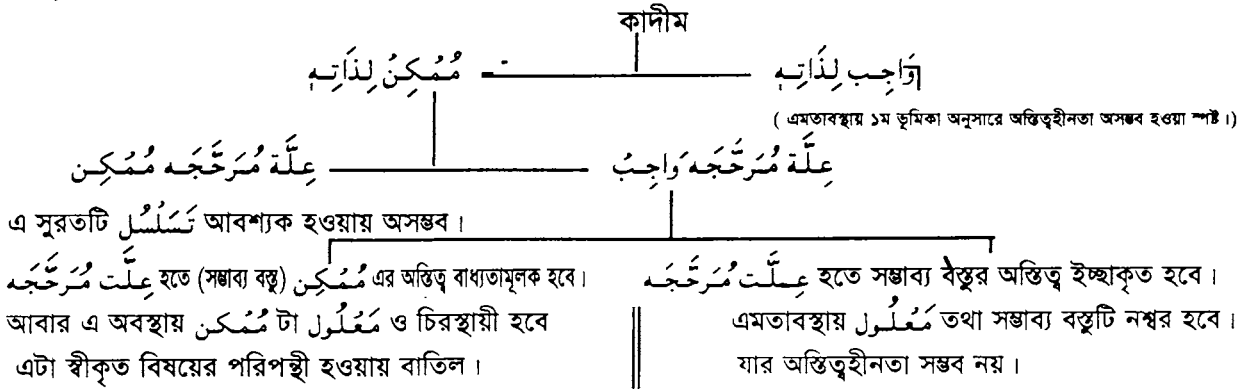
وَاَمَّا الْاَعْيَانُ فَلِاَنَّهَا لَاتَخْلُوْ عَنِ الْحَوَادِثِ وَكُلُّ مَالَا يَخْلُوْ عَنِ الْحَوَادِثِ فَهُوَ حَادِثٌ اَمَّا الْمُقَدَّمَةُ الْاُوْلٰى فَلِاَنَّهَا لَاتَخْلُوْ عَنِ الْحَرَكَةِ وَالسُّكُوْنِ وَهُمَا حَادِثَانِ اَمَّا عَدَمُ الْخُلُوِّ عَنْهُمَا فَلِاَنَّ الْجِسْمَ اَوِ الْجَوْهَرَ لَايَخْلُوْ عَنِ الْكَوْنِ فِىْ حَيِّزٍ فَاِنْ كَانَ مَسْبُوْقًا بِكَوْنٍ اٰخَرَ فِىْ ذَالِكَ الْحَيِّزِ بِعَيْنِهٖ فَهُوَ سَاكِنٌ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ مَسْبُوْقًا بِكَوْنٍ اٰخَرَ فِىْ ذَالِكَ الْحَيِّزِ بَلْ فِىْ حَيِّزٍ اٰخَرَ فَمُتَحَرِّكٌ وَهٰذَا مَعْنٰى قَوْلِهِمُ الْحَرَكَةُ كَوْنَانِ فِىْ اٰنَيْنِ فِىْ مَكَانَيْنِ وَالسُّكُوْنُ كَوْنَانِ فِىْ اٰنَيْنِ فِىْ مَكَانٍ وَاحِدٍ فَاِنْ قِيْلَ يَجُوْزُ اَنْ لَّايَكُوْنَ مَسْبُوْقًا بِكَوْنٍ اٰخَرَ اَصْلًا كَمَا فِىْ اٰنِ الْحُدُوْثِ فَلَا يَكُوْنُ مُتَحَرِّكًا كَمَا لَايَكُوْنُ سَاكِنًا قُلْنَا هٰذَا الْمَنْعُ لَايَضُرُّنَا لِمَا فِيْهِ مِنْ تَسْلِيْمِ الْمُدَّعٰى عَلٰى اَنَّ الْكَلَامَ فِى الْاَجْسَامِ الَّتِىْ تَعَدَّدَتْ فِيْهَا الْاَكْوَانُ وَتَجَدَّدَتْ عَلَيْهَا الْاَعْصَارُ وَالْاَزْمَانُ وَاَمَّا حُدُوْثُهُمَا فَلِاَنَّهُمَا مِنَ الْاَعْرَاضِ وَهِىَ غَيْرُ بَاقِيَةٍ وَلِاَنَّ مَاهِيَةَ الْحَرَكَةِ لِمَا فِيْهَا مِنْ اِنْتِقَالٍ حَالٍ اِلٰى حَالٍ تَقْتَضِى الْمَسْبُوْقِيَّةَ بِالْغَيْرِ وَالْاَزَلِيَّةُ تُنَافِيْهَا وَلِاَنَّ كُلَّ حَرَكَةٍ فَهِىَ عَلَى التَّقَضِّىْ وَعَدَمِ الْاِسْتِقْرَارِ وَكُلُّ سُكُوْنٍ فَهُوَ جَائِزُ الزَّوَالِ لِاَنَّ كُلَّ جِسْمٍ فَهُوَ قَابِلٌ لِلْحَرَكَةِ بِالضَّرُوْرَةِ وَقَدْ عَرَفْتَ اَنَّ مَايَجُوْزُ عَدَمُهٗ يَمْتَنِعُ قِدَمُهٗ وَاَمَّا الْمُقَدَّمَةُ الثَّانِيَةُ فَلِاَنَّ مَالَايَخْلُوْ عَنِ الْحَادِثِ لَوْثَبَتَ فِى الْاَزَلِ لَزِمَ ثُبُوْتُ الْحَادِثِ فِى الْاَزَلِ وَهُوَ مُحَالٌ ـ

সহজ তরজমা

স্বাধিষ্ঠ বস্তুর নশ্বরতা

মোটকথা, اَعْيَان তো একারণে (حَادِث) যে, তা حَادِث বস্তু হতে মুক্ত নয়। আর যে জিনিস حَادِث বস্তু হতে মুক্ত নয়, সেটিও حَادِث হয়। মোটকথা, প্রথম মুকাদ্দামা (অর্থাৎ اَعْيَان নশ্বর বস্তু হতে মুক্ত নয়) এজন্য যে, اَعْيَان গতি-স্থিতি হতে মুক্ত নয়। আর গতি-স্থিতি উভয়টিই নশ্বর। (বুঝা গেল, اَعْيَان নশ্বরতা থেকে মুক্ত নয়) বাকি রইল (اَعْيَان এর) حَرَكَت (গতি) سُكُوْن (স্থিতি) শূন্য না হওয়া। তা এ কারণে যে, عَيْن টা جِسْم (দেহ) হোক চাই جَوْهَر (মূলবস্তু) হোক, কোন স্থানে অধিষ্ঠিত হওয়া থেকে মুক্ত নয়। সুতরাং যদি ইতোপূর্বে হুবহু ঐ স্থানে অধিষ্ঠিত থাকে তাহলে সেটি سَاكِن (স্থিতিশীল)। আর যদি ইতোপূর্বে অন্যত্র অধিষ্ঠিত থাকে তাহলে তা مُتَحَرِّك

(গতিশীল)। কালাম শাস্ত্রবিদদের উক্তি اَلْحَرَكَةُ كَوْنَانِ فِىْ اٰنَيْنِ فِىْ مَكَانَيْنِ ـ وَالسُّكُوْنُ كَوْنَانِ فِىْ اٰنَيْنِ فِىْ مَكَانٍ وَاحِدٍ এর অর্থ এটাই।

অধিকন্তু যদি প্রশ্ন করা হয়, হতে পারে ঐ বস্তুটির ইতোপূর্বে কোন স্থানে অধিষ্ঠিত ছিল না। (হুবহু এ স্থানেও নয়। অন্যত্রও নয়) যেমন, নতুনভাবে কোন বস্তু সৃষ্টি হওয়ার সময় হয়ে থাকে। তাহলে সেটি مُتَحَرِّك বা গতিশীলও হবে না, যেভাবে সেটি سَاكِن বা স্থিরও নয়। আমরা উত্তর দেব, প্রশ্নটি আমাদের জন্য ক্ষতিকর নয়। কেননা এতে দাবী তথা حُدُوث اَعْيَان মেনে নেওয়া হয়েছে। তথাপি (আমাদের) আলোচনা ঐ সব جِسْم (দেহ) সম্পর্কে, যার মধ্যে বিভিন্ন অবস্থা সৃষ্টি হয় এবং যার উপর বহুকাল অতিবাহিত হয়েছে।

বাকী রইল حَرَكَت (গতি) ও سُكُوْن (স্থিতি) উভয়টির নশ্বরতার বিষয়টি। এ দুটির কারণ হল, এগুলো মূলতঃ اَعْرَاض এর অন্তর্ভুক্ত। আর اَعْرَاض কখনও অবশিষ্ট থাকে না। তদ্রুপ এজন্য যে, حَرَكَت তার পূর্বে অন্য কোন জিনিসের অস্তিত্ব কামনা করে। কেননা তাতে একাবস্থা হতে অন্যাবস্থায় রূপান্তর হয়। অথচ প্রাচীনত্ব তার পূর্বে কোন জিনিস থাকার পরিপন্থী। এবং একারণে যে, প্রতিটি حَرَكَت সমাপ্তি ও অস্থিরতার দ্বার প্রান্তে থাকে। প্রতিটি سُكُوْت (স্থিতি) দূরীভূত হওয়া সম্ভব। কেননা প্রতিটি দেহ নিশ্চিতভাবে حَرَكَت (গতি) এর যোগ্য। পূর্বেই জেনেছ, যে জিনিসের অস্তিত্বহীনতা সম্ভব, তা চিরন্তন হওয়া অসম্ভব। বাকি রইল দ্বিতীয় মুকাদ্দামা তথা যে জিনিস حَوَادِث হতে মুক্ত সেটি নশ্বর কেন? এর কারণ হল, যে বস্তু নশ্বর নয় সেটি যদি আদি কালে প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহলে তো নশ্বর বস্তুর আদিকালে অস্তিত্ববান ছিল বলে প্রমাণিত হওয়া আবশ্যক হয়। আর এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

স্বাধিষ্ঠ বস্তুর নশ্বরতা কয়েকটি মুকাদ্দামার উপর নির্ভরশীল

(১) اَعْيَان তথা স্বাধিষ্ট বস্তুগুলো দেহ হোক চাই جَوْهَر فَرْد বা মৌলিক পরমাণুই হোক, তা গতি ও স্থিতি মুক্ত নয়। কেননা প্রত্যেকটি عَيْن দুটি অবস্থা থেকে মুক্ত নয়। হয়ত তা প্রথমে স্বস্থানে অধিষ্ঠিত ছিল। পরবর্তীতেও সেখানে অধিষ্ঠিত থাকবে। অথবা অন্য স্থানে থাকবে। প্রথমটি অর্থাৎ পরবর্তী সময়ে পূর্বের স্থানেই অধিষ্ঠিত থাকা স্থিতি। আর দ্বিতীয়টি অর্থাৎ পরবর্তি সময়ে অন্য স্থানে অধিষ্ঠিত হওয়া গতি।

(২) গতি ও স্থিতি একাধিক কারণে নশ্বর। প্রথমতঃ উভয়টি আরয। আর আরয নশ্বর। কেননা সেগুলো অবশিষ্ট থাকে না। সৃষ্টি হয় আবার শেষ হয়ে যায়। তাছাড়া গতি আরযটি এক অবস্থা (যেমন, দ্রুতি) থেকে অন্য অবস্থায় (যেমন, মন্থর) রূপান্তর হয়ে থাকে। এ কারণে এক সময়ের গতি অন্য সময়ের গতি হতে ভিন্ন প্রকৃতি হয়। তাহলে প্রথমাবস্থার গতি পূর্ববর্তী আর দ্বিতীয়াবস্থার গতি হল পরবর্তী। আর যে জিনিস পরবর্তী অর্থাৎ যার পূর্বে কোন কিছু থাকে, তা নশ্বর হয়। কাজেই গতিও নশ্বর হবে। তাছাড়া গতি সর্বাবস্থায় দূরীভূত হওয়ার দ্বার প্রান্তে থাকে। এ কারণেও তা নশ্বর। এমনিভাবে স্থিতিও এ কারণে নশ্বর যে, তা শেষ হওয়া সম্ভব। কেননা প্রতিটি দেহের গতিশীলতা সম্ভব। আর যেহেতু গতি-স্থিতির মাঝে বৈপরিত্য রয়েছে। একটির সম্ভাবনা অপরটির অসম্ভাব্যতাকে আবশ্যক করে। ফলে এ গতির সম্ভাবনা স্থিতির অসম্ভাব্যতাকে আবশ্যক করে। একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, যার অস্তিত্বহীনতা সম্ভব, সেটি নশ্বর। তা সুপ্রাচীন চিরন্তন হওয়া অসম্ভব। কাজেই سُكُوْن বা স্থিতিও নশ্বর।

(৩) যে জিনিস নশ্বরতা হতে মুক্ত নয় অর্থাৎ তার সাথে নশ্বরতা থাকে, তাহলে সেটিও নশ্বর। কারণ, যে জিনিস নশ্বরতা মুক্ত নয়, তা যদি নশ্বর না হয় বরং সুপ্রাচীন হয়, তাহলে তার তদসংশ্লীষ্ট নশ্বর বস্তুগুলোও সুপ্রাচীন হওয়া আবশ্যক হবে। অথচ নশ্বর বস্তুসমূহের قَدِيْم (প্রাচীন) হওয়া অসম্ভব। কেননা নশ্বর বস্তু সমূহের নশ্বরতা) অস্তিত্বহীনতাকে আবশ্যক করে। আর প্রাচীনত্ব অস্তিত্বহীন তার পরিপন্থী।

এ তিনটি মুকাদ্দামার পর স্বাধিষ্ঠ বস্তুর নশ্বরতার প্রমাণ প্রসঙ্গে বলব, اَعْيَان প্রথম মুকাদ্দামা অনুসারে গতি ও স্থিতি হতে মুক্ত নয়। আর দ্বিতীয় মুকাদ্দামা অনুসারে গতি ও স্থিতি উভয়টি নশ্বর। বুঝা গেল, স্বাধিষ্ঠ বস্তু حَوَادِث হতে মুক্ত নয়। আর তৃতীয় মুকাদ্দামা অনুসারে যে حَوَادِث মুক্ত নয়, সেটি নশ্বর। কাজেই স্বাধিষ্ঠ বস্তুও নশ্বর।

قَوْلُهُ اَمَّا الْاَعْيَان ঃ এখান থেকে স্বাধিষ্ঠ বস্তুর নশ্বরতার দলীল বর্ণনা করছেন। দলীলের প্রথম মুকাদ্দামা হল,

لِاَنَّهَا لَاتَخْلُوْ عَنِ الْحَرَكَةِ আর এ মুকাদ্দামার দলীলের প্রথম মুকাদ্দামা হল لِاَنَّهَا لَا تَخْلُوْ عَنِ الْحَوَادِثِ যার দলীল শারিহ রহ. স্বীয় উক্তি لِاَنَّ الْجِسْمَ اَوِ الْجَوْهَرَ لَا يَخْلُوْ عَنِ الْكَوْنِ فِى الْحَيِّزِ দ্বারা বর্ণনা করেছেন। আর দ্বিতীয় মুকাদ্দামা হল, وَهُمَا حَادِثَانِ যার দলীল হল, اَمَّا حُدُوْثُهُمَا فَلِاَنَّهَا مِنَ الْاَعْرَاضِ الخ আর যখন এ মুকাদ্দামা দুটি অর্থাৎ اَلْاَعْيَانُ لَا يَخْلُوْ عَنِ الْحَرَكَةِ وَالسُّكُوْنِ এবং وَهُمَا حَادِثَانِ প্রমাণিত হল, তখন ফলাফল দাঁড়াল– اَلْاَعْيَانُ لَاتَخْلُوْ عَنِ الْحَوَادِثِ যা حُدُوْثُ اَعْيَانِ এর দলীলের প্রথম মুকাদ্দামা। আর দ্বিতীয় মুকাদ্দামা হল, مَالَايَخْلُوْ عَنِ الْحَوَادِثِ فَهُوَ حَادِثٌ যার দলীল হল لِاَنَّ مَالَا يَخْلُوْ عَنِ الْحَوَادِثِ لَوْ ثَبَتَ فِى الْاَزَلِ الْحَيِّزِ এবার দুই মুকাদ্দামাকে এক সাথে মিলিয়ে বলব, . اَلْاَعْيَانُ لَاتَخْلُوْ عَنِ الْحَوَادِثِ - وَمَالَايَخْلُوْ عَنِ الْحَوَادِثِ فَهُوَ حَادِثٌ ফলাফল দাঁড়াবে اَلْاَعْيَانُ حَادِثٌ

স্বাধিষ্ঠ বস্তু গতি-স্থিতি থেকে মুক্ত কেন ?

قَوْلُهُ فَلِاَنَّ الْجِسْمَ اَوِ الْجَوْهَرَ ঃ এটা عَيْن এর حَرَكَت (গতি) سُكُوْن (স্থিতি) মুক্ত না হওয়ার দলীল। আর বস্তুতঃ عَيْن দু প্রকার। (১) عَيْن مُرَكَّب অর্থাৎ جِسْم (দেহ) (২) عَيْن غَيْر مُرَكَّب অর্থাৎ جَوْهَر فَرْد (মূলবস্তু), একারণে শারিহ রহ. ঐ দুই প্রকারকে নিয়ে বলেছেন, عَيْن চাই جِسْم হোক বা جَوْهَر হোক, তা কোন না কোন স্থান দখল করে থাকবে। এখন দুটি পন্থা। যদি এক মুহূর্তে جِسْم বা جَوْهَر কোন স্থানে থাকে এবং পরবর্তী সময়ে যদি অন্যত্র থাকে, তবে তা হরকত। পক্ষান্তরে পরবর্তী সময়ে যদি ঐ স্থানেই থাকে, তাহলে এটা হল, سُكُوْن (স্থিতি)। এ দুই ছুরাত ব্যতিত তৃতীয় কোন সুরাত নেই। সুতরাং বুঝা গেল, عَيْن টা حَرَكَت ও سُكُوْن মুক্ত নয়।

উপরোল্লিখিত ব্যাখ্যা হতে বুঝা গেল, حَرَكَت এর মধ্যে দুটি অবস্থা বিদ্যমান থাকে। একটি পূর্ববর্তী অপরটি পরবর্তী। এমনিভাবে সময়ও দুটি। প্রথমটি পূর্ববর্তি ও অপরটি পরবর্তী। তদ্রূপ স্থানও দুটি। একটি পূর্ববর্তী অবস্থার ও অপরটি পরবর্তী অবস্থার স্থান। পক্ষান্তরে سُكُوْن (স্থিতি) এর মধ্যে দুটি সময় ও অবস্থা বিদ্যমান থাকে। তবে পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী উভয় অবস্থায় স্থান একটিই থাকে। কালাম শাস্ত্রবিদগণ حَرَكَت এর সংজ্ঞায় كَوْنَانِ فِى اٰنَيْنِ فِى مَكَانَيْنِ আর سُكُوْن এর সংজ্ঞায় كَوْنَانِ فِى اٰنَيْنِ فِى مَكَانٍ وَاحِدٍ বলার উদ্দেশ্য এটিই।

قَوْلُهُ وَهٰذَا مَعْنٰى قَوْلِهِمْ ঃ এ থেকে বুঝা গেল, পরবর্তী ও পূর্ববর্তী উভয়টির সমষ্টি হল حَرَكَت অথবা سُكُوْن। আর এটাই শারিহ রহ. এর নিকট অগ্রগণ্য। অপরদিকে কেউ কেউ দ্বিতীয়ও পরবর্তী অবস্থাকেই حَرَكَت ও سُكُوْت বলে সাব্যস্ত করেছেন।

সব স্বাধিষ্ঠ বস্তুই কি গতি-স্থিতি মুক্ত ?

قَوْلُهُ فَاِنْ قِيْلَ ঃ এটা শারিহ রহ. এর উক্তি فَلِاَنَّهَا لَاتَخْلُوْ عَنِ الْحَرَكَةِ وَالسُّكُوْنِ এর উপর আপত্তি। যার সারমর্ম হল, সকল عَيْن এর حَرَكَة ও سُكُوْن মুক্ত না হওয়া বিশুদ্ধ নয় বরং কিছু কিছু عَيْن এমনও রয়েছে, যেগুলো গতিশীলও নয় আবার স্থীরও নয়। যেমন সৃষ্টি হওয়ার সময় অর্থাৎ যে সময় عَيْن অস্তিত্ব লাভ করে ঐ সময়ের পূর্বে সেটি বিলুপ্ত ছিল। কোন স্থানে তার অস্তিত্ব ছিল না। এমন অবস্থাও ছিল না যে, তাকে স্থির বলা যায়। আবার এমন অবস্থায়ও নয় যে, তাকে গতিশীল বলা যায়। বুঝা গেল, عَيْن তার অস্তিত্ব লাভের সময় حَرَكَة ও سُكُوْن থেকে মুক্ত থাকে। কাজেই সকল عَيْن এর ক্ষেত্রে "তা حَرَكَة ও سُكُوْت থেকে মুক্ত নয়" একথা বলা শুদ্ধ নয়।

উপরিউক্ত প্রশ্নের জবাবঃ قَوْلُهُ قُلْنَا هٰذَا الْمَنْعُ لَايَضُرُّنَا ঃ উত্তরের সারমর্ম হল, প্রথমতঃ এ আপত্তি আমাদের উদ্দেশ্য পরিপন্থী নয়। কেননা আমাদের উদ্দেশ্য তো عَيْن এর নশ্বরতা প্রমাণিত করা। আর তোমরা যখন তোমাদের মুখেই বলে দিলে, যে সময় عَيْن অস্তিত্ব লাভ করে, সে সময় তা حَرَكَة ও سُكُوْن থেকে মুক্ত থাকে। এ উক্তি করে তোমরা নিজেরাই عَيْن এর নশ্বরতা স্বীকার করে নিলে। আমাদের দাবীও তা-ই। এখন সে স্বাধিষ্ঠ মৌলিক বস্তুগুলো حَرَكَة ও سُكُوْن মুক্ত হোক চাই না হোক, সে ব্যাপারে আমাদের কোন কথা নেই। কেননা তা আমাদের উদ্দেশ্য নয় বরং একথা তো ভূমিকাস্বরূপ ছিল। দলীলের ভূমিকাসমূহ উদ্দেশ্য হয় না। উদ্দেশ্য হয় দাবী প্রমাণ করা। তাছাড়া তোমরা তো অস্তিত্ব লাভের সময় عَيْن এর নশ্বরতার কথা স্বীকার করে নিয়েছ। এখন আমাদের কথা ঐ সব جِسْم (দেহ) সম্পর্কে, যার উপর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বিভিন্ন অবস্থা আবর্তিত হয়েছে। সেটি দু

অবস্থা শূন্য নয়। হয়ত পরবর্তী অবস্থায় ঐ স্থানে থাকাবে যেখানে পূর্বে ছিল, তাহলে এটা স্থিতি। আর যদি পরবর্তী অবস্থায় অন্য স্থানে থাকে, তাহলে এটা গতি। আর গতি-স্থিতি উভয়টি নশ্বর । বুঝা গেল, দেহসমূহ حَوَادِث মুক্ত নয়। আর যে জিনিস حَوَادِث মুক্ত নয় তা নশ্বর হয়। কাজেই যেসব দেহ বিভিন্ন অবস্থা অতিক্রম করেছে, সেগুলো নশ্বর। যেমন, তোমাদের মতে অস্তিত্ব লাভকারী দেহসমূহ নশ্বর।

وَهٰهُنَا اَبْحَاثٌ اَلْاَوَّلُ اَنَّهُ لَادَلِيْلَ عَلٰى اِنْحِصَارِ الْاَعْيَانِ فِى الْجَوَاهِرِ وَالْاَجْسَامِ وَاَنَّهُ يَمْتَنِعُ وُجُوْدُ مُمْكِنٍ يَقُوْمُ بِذَاتِهِ وَلَا يَكُوْنُ مُتَحَيِّزًا اَصْلًا كَالْعُقُوْلِ وَالنُّفُوْسِ الْمُجَرَّدَةِ الَّتِىْ يَقُوْلُ بِهَا الْفَلَاسِفَةُ وَالْجَوَابُ اَنَّ الْمُدَّعٰى حُدُوْثُ مَا ثَبَتَ مِنَ الْمُمْكِنَاتِ وَهُوَ الْاَعْيَانُ الْمُتَحَيِّزَةُ وَالْاَعْرَاضُ لِاَنَّ اَدِلَّةَ وُجُوْدِ الْمُجَرَّدَاتِ غَيْرُ تَامَّةٍ عَلٰى مَابُيِّنَ فِى الْمُطَوَّلَاتِ اَلثَّانِىْ اَنَّ مَاذُكِرَ لَايَدُلُّ عَلٰى حُدُوْثِ جَمِيْعِ الْاَعْرَاضِ اِذْ مِنْهَا مَالَا يُدْرَكُ بِالْمُشَاهَدَةِ حُدُوْثُهُ وَلَا حُدُوْثُ اَضْدَادِهِ كَالْاَعْرَاضِ الْقَائِمَةِ بِالسَّمٰوَاتِ مِنَ الْاَضْوَاءِ وَالْاَشْكَالِ وَالْاِمْتِدَادَاتِ وَالْجَوَابُ اَنَّ هٰذَا غَيْرُ مُخِلٍّ بِالْغَرَضِ لِاَنَّ حُدُوْثَ الْاَعْيَانِ يَسْتَدْعِىْ حُدُوْثَ الْاَعْرَاضِ ضَرُوْرَةً اَنَّهَا لَاتَقُوْمُ اِلَّا بِهَا ـ

সহজ তরজমা

বিশ্বজগতের নশ্বরতার দলীলের উপর কয়েকটি প্রশ্ন

আর এখানে (বিশ্বজগতের নশ্বরতার দলীলের উপর) কয়েকটি প্রশ্ন রয়েছে। **প্রথম প্রশ্ন,** عَيْن মৌলিক ও যৌগিক বস্তুতে সীমাবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে কোন দলীল নেই। এ কথারও কোন দলীল নেই যে, এমন সম্ভাব্য বস্তুর অস্তিত্ব অসম্ভব, যা নিজে নিজে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু কোন স্থানে নেই। যেমন, আকলসমূহ ও দেহাতিত আত্মাসমূহ, দার্শনিকগণ যার প্রবক্ত। এর উত্তর হল, আমাদের দাবী হচ্ছে, ঐ সকল সম্ভাব্য বস্তু حَادِث হওয়া প্রসঙ্গে, যা প্রমাণিত আছে। আর সেগুলো হল, অবস্থা বিশিষ্ট عَيْن বা اَعْيَان مُتَحَيِّزَه এবং আরযসমূহ। কেননা দেহাতিত বস্তুর অস্তিত্বে দলিলাদি পূর্ণাঙ্গ নয়। যেমন, বড় বড় কিতাবসমূহে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। **দ্বিতীয় প্রশ্ন,** উল্লেখিত দলীল সব عَرْض এর নশ্বরতা বুঝায় না। কারণ, কিছু কিছু عَرْض এমন আছে, যার নশ্বরতা বিষয়টি প্রত্যক্ষভাবে জানা নেই এবং তার বিপরীত বস্তু সমূহের নশ্বরতার বিষয়টিও জানা নেই। যেমন, ঐ সমস্ত عَرْض যা আসমানের সাথে প্রতিষ্ঠিত আছে। যেমন– আলো, আকার এবং اَبْعَاد ثَلَاثَه তথা দৈর্ঘ, প্রস্থ ও গভীরতা। এর উত্তর হল, এ প্রশ্ন আমাদের উদ্দেশ্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে না। কারণ, عَيْن এর নশ্বরতার দাবী হল, আরযসমূহ নশ্বর হওয়া। কেননা عَرْض তো عَيْن এর সাথে প্রতিষ্ঠিত থাকে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

প্রথম প্রশ্নঃ قَوْلُهُ اَلْاَوَّلُ اَنَّهُ : এ প্রশ্নটি হল, عَيْن কে جِسْم ও جَوْهَرفَرْد এ সীমাবদ্ধ করার ওপর। প্রশ্নকারী বলেন, اَعْيَان কেবল দুই প্রকার তথা جِسْم এবং جَوْهَرفَرْد-এ সীমাবদ্ধ হওয়ার কোন দলীল নেই। আবার যেসব مُمْكِنْ নিজে নিজে প্রতিষ্ঠিত ও স্থানাধিকারী নয়, সেগুলোর অস্তিত্ব অসম্ভব –এ কথারও কোন দলীল নেই। সুতরাং আমরা বলতে পারি, এমন সম্ভাব্য বস্তুও রয়েছে, যা নিজে নিজে প্রতিষ্ঠিত এ হিসাবে সেটি আইন, তবে তা স্থান দখলকারী এবং অনুভূত ইশারার উপযুক্ত নয়। এ হিসেবে সেটি দেহও নয় আবার মৌলিক পরমাণুও নয়। কেননা দেহও মৌলিক পরমাণু স্থান দখলকারী এবং অনুভূত ইশারার উপযুক্ত হয়। যেমন, عُقُوْل عَشَرَه (দশ প্রজ্ঞা) نُفُوْس (আত্মাসমূহ)। দার্শনিকগণ যার অস্তিত্ব স্বীকার করেন। যা قَائِمْ بِالذَّات হওয়ায় عَيْن তবে স্থান দখলকারী এবং অনুভূত উশারা উপযুক্ত না হওয়ায় দেহও নয় আবার মৌলিক পরমাণুও নয়। কাজেই عَيْن কে দেহ ও মৌলিক পরমাণু এর মধ্যে সীমাবদ্ধ করা বিশুদ্ধ নয়।

জবাব ঃ

قَوْلُهٗ: وَالْجَوَابُ ঃ উত্তরের সারমর্ম হল, আমাদের মূল উদ্দেশ্য তো আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব এবং তার একত্ববাদ ও গুণাবলী প্রমাণ করা। এ উদ্দেশ্য অর্জনে কেবল সেসব সম্ভাব্য বস্তুর নশ্বরতাই যথেষ্ট, যার অস্তিত্ব দলীল দ্বারা প্রমাণিত। কেননা আমাদের দাবী শুধু সে সব مُمْكِنَات এর নশ্বরতার ব্যাপারে, যার অস্তিত্ব দলীল দ্বারা প্রমাণিত, সেগুলো কেবল স্থান দখলকারী عَيْن এবং আরযসমূহ। আর স্থান দখলকারী আইনসমূহ দেহও মৌলিক পরমাণুতে সীমাবদ্ধ। বাকী রইল স্থান দখলকারী নয় এমন আইনসমূহ অর্থাৎ جَوَاهِر مُجَرَّدَه যেমন, عُقُوْل (প্রজ্ঞাসমূহ) এবং نُفُوْس (আত্মাসমূহ)। আমাদের মতে এগুলোর অস্তিত্ব প্রমাণিত নয়। কেননা এগুলোর দলীল অসম্পূর্ণ এবং ইসলামী মূলনীতি বিরোধী। এসব বিষয় বড় বড় কিতাবে পরিষ্কারভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ قَوْلُهٗ : وَالثَّانِىْ ঃ এ প্রশ্নটি আপতনসমূহের নশ্বরতার ঐ দলীলের উপর, যা শারিহ রহ. আপন উক্তি أَمَّا الْأَعْرَاضُ بَعْضُهَا بِالْمُشَاهَدَة দ্বারা বর্ণনা করেছেন। প্রশ্নের সারমর্ম হল, আপনি আপতনসমূহের নশ্বরতা প্রসঙ্গে বলেছেন, কিছু কিছু আপতনসমূহের নশ্বরতা প্রত্যক্ষ দর্শনের মাধ্যমে জানা আছে। আর কোন কোনটি নশ্বরতা দলীলের মাধ্যমে। সে দলীলটি হল, عَدَم অস্তিত্বহীনতা যুক্ত হওয়া। এ দলীলটি সব আপতনসমূহের নশ্বরতা বুঝায় না। কেননা অনেক عَرَض এমন আছে, যার নশ্বরতা প্রত্যক্ষ দর্শনের মাধ্যমে জানা যায় না। আর যখন ঐ সব عَرَض এর নশ্বরতা প্রত্যক্ষ দর্শনের মাধ্যেমে জানা গেল না, তখন সেগুলোর বিপরীত বস্তুসমূহের অস্তিত্বহীনতাও জানা যায় না যে, তার অনিস্তত্বকে অস্তিত্বের দলীল সাব্যস্ত করা যাবে। যেমন– যে সব أَعْرَاض আসমানের সাথে রয়েছে। কিন্তু সেগুলোর নশ্বরতা প্রত্যক্ষ দর্শনের মাধ্যমে জানা যায়নি এবং সেগুলোর বিপরীত বস্তুর নশ্বরতাও দলীল দ্বারা জানা নেই। কাজেই সকল أَعْرَاض এর নশ্বরতার দাবী সঠিক নয়।

উত্তর ঃ قَوْلُهٗ الْجَوَابُ ঃ এটা উপরিউক্ত প্রশ্নের উত্তর অর্থাৎ কিছু কিছু عَرَض এর নশ্বরতা প্রত্যক্ষ দর্শনে দ্বারা জানা না যাওয়ায় আমাদের উদ্দেশ্য অর্থাৎ সকল عَرَضএর নশ্বরতার কোন অসুবিধা হবে না। কেননা আসমান আইন জাতীয়। আর সকল আইনই নশ্বর। কাজেই আসমানও নশ্বর হল। আর আসমান যখন নশ্বর, আসমানের সাথে যত عَرَض আছে, সেগুলোও নশ্বর হবে। যেমন, আকার, দৈর্ঘ প্রস্থ ইত্যাদি। চাই আমরা সেগুলোর নশ্বরতা প্রত্যক্ষ করি বা না করি। কেননা আরযসমূহ قَائِمٌ بِالذَّاتِ (নিজে নিজে প্রতিষ্ঠিত) হয় না বরং সেগুলো أَعْيَان সাথে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং أَعْيَان এর সাথে মিশেই অস্তিত্ব লাভ করে। এ কারণে أَعْيَان নশ্বর হওয়ায় أَعْرَاض এর নশ্বরতা আবশ্যক করে।

وَالثَّالِثُ اَنَّ الْاَزَلَ لَيْسَ عِبَارَةً عَنْ حَالَةٍ مَّخْصُوْصَةٍ حَتّٰى يَلْزَمَ مِنْ وُجُوْدِ الْجِسْمِ فِيْهَا وُجُوْدُ الْحَوَادِثِ فِيْهَا بَلْ هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ عَدَمِ الْاَوَّلِيَّةِ اَوْ عَنْ اِسْتِمْرَارِ الْوُجُوْدِ فِىْ اَزْمِنَةٍ مُقَدَّرَةٍ غَيْرِ مُتَنَاهِيَةٍ فِىْ جَانِبِ الْمَاضِىْ وَمَعْنٰى اَزَلِيَّةِ الْحَرَكَاتِ الْحَادِثَةِ اَنَّهُ مَا مِنْ حَرَكَةٍ اِلَّا وَقَبْلَهَا حَرَكَةٌ اُخْرٰى لَا اِلٰى بِدَايَةٍ وَهٰذَا هُوَ مَذْهَبُ الْفَلَاسِفَةِ وَهُمْ يُسَلِّمُوْنَ اَنَّهُ لَاشَيْئَ مِنْ جُزْئِيَّاتِ الْحَرَكَةِ بِقَدِيْمٍ وَاِنَّمَا الْكَلَامُ فِى الْحَرَكَةِ الْمُطْلَقَةِ وَالْجَوَابُ اَنَّهُ لَاوُجُوْدَ لِلْمُطْلَقِ اِلَّا فِىْ ضِمْنِ الْجُزْئِىِّ فَلَا يُتَصَوَّرُ قِدَمُ الْمُطْلَقِ مَعَ حُدُوْثِ كُلٍّ مِّنَ الْجُزْئِيَّاتِ اَلرَّابِعُ اَنَّهُ لَوْ كَانَ كُلُّ جِسْمٍ فِىْ حَيِّزٍ لَزِمَ عَدَمُ تَنَاهِى الْاَجْسَامِ لِاَنَّ الْحَيِّزَ هُوَ السَّطْحُ الْبَاطِنُ مِنَ الْحَاوِىْ الْمُمَاسِّ لِلسَّطْحِ الظَّاهِرِ مِنَ الْمَحْوِىِّ وَالْجَوَابُ اَنَّ الْحَيِّزَ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِيْنَ هُوَ الْفَرَاغُ الْمُتَوَهَّمُ الَّذِىْ يَشْغَلُهُ الْجِسْمُ وَتَنْفُذُ فِيْهِ الْعَادَةُ ـ

সহজ তরজমা

তৃতীয় অভিযোগ হল, اَزَل বলতে বিশেষ কোন অবস্থা উদ্দেশ্য নয় যে, তার মধ্যে جِسْم (দেহ) বিদ্যমান হওয়ায় حَوَادِث তার মধ্যে বিদ্যমান হওয়া আবশ্যক হবে। বরং اَزَل বলতে উদ্দেশ্য হল, অনাদি হওয়া অথবা অতীত কালে ধরে নেওয়া অসীম কাল ধরে তার অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকা। আর حَرَكَات حَادِثَه এর অনাদি হওয়ার অর্থ হল, কোন حَرَكَة (গতি) এমন নেই যে, তার পূর্বে حَرَكَة (গতি) নেই। সীমাহীন পর্যন্ত। আর এটাই দার্শনিকদের মতামত। তারা মনে করেন, حَرَكَات جُزْئِيَّه এর মধ্য হতে কোনটিই قَدِيْم (চিরন্তন) নয়। আর (তাদের) কথা তো مُطْلَق حَرَكَة (যে কোন গতি) সম্পর্কে। উত্তর হল, جُزْئِى এর অধিন ব্যতিত مُطْلَق এর কোন অস্তিত্ব নেই। অতএব প্রতিটিই جُزْئِى নশ্বর হওয়া সত্ত্বেও مُطْلَق এর قَدِيْم হওয়ার কথা কল্পনাও করা যায় না।

চতুর্থ প্রশ্ন হল, যদি প্রতিটি দেহ কোন স্থানে অধিষ্ঠিত থাকে, তাহলে তো দেহসমূহের অসীমত্ব জরুরী হয়ে পড়বে। কারণ, حَيِّز বা স্থান হল, পরিবেষ্টনকারী দেহের সে অভ্যন্তরীণ পৃষ্ঠ, যেটি পরিবেষ্টিত দেহের বাহ্যিক পিঠের সাথে মিলিত। এর উত্তর হল, حَيِّز হচ্ছে আকাইদ শাস্ত্রবিদগণের মতে কল্পিত শূন্য স্থান, যার মধ্যে দেহটি পরিপূর্ণ থাকে। যার মধ্যে দেহের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা প্রবিষ্ঠ হয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তৃতীয় প্রশ্ন

قَوْلُهُ وَالثَّالِثُ اَنَّ الْاَزَلَ ঃ এ প্রশ্নটি হল, اَعْيَان এর নশ্বরতার প্রমাণের দ্বিতীয় মুকাদ্দামা مَالَايَخْلُوْ عَنِ لِاَنَّ مَالَا يَخْلُوْ عَنِ الْحَوَادِثِ فَهُوَ حَادِثٌ এর প্রমাণ অর্থাৎ শারেহের উক্তি لَوْثَبَتَ فِى الْاَزَلِ لَزِمَ ثُبُوْتُ الْحَادِثِ فِى الْاَزَلِ এর ওপর। প্রশ্নটি হল, যদি اَزَل বা অনাদিকাল কোন নির্দৃষ্ট অবস্থা বা সময়ের নাম হত, যেটি আসল অর্থেই ظَرْف কাল বা পাত্র হওয়ার যোগ্যতা রাখত, তখন তো اَزَل এ উপরিউক্ত অর্থে কোন দেহের অস্তিত্বের ফলে সে সব নশ্বর বস্তুর অস্তিত্ব তাতে আবশ্যক হত, যেসব নশ্বর বস্তু থেকে দেহ শূন্য হয় না। কিন্তু اَزَلِى দ্বারা কোন নির্ধারিত সময় উদ্দেশ্য নয়। যেটি ظَرْف হওয়ার যোগ্যতা রাখে। সুতরাং আপনাদের এ উক্তি যে اَعْيَان নশ্বর জিনিস থেকে শূন্য হয় না। যদি اَزَلِى বা অনাদি হয় তাহলে সেগুলোর حَادِث জিনিসগুলোও অনাদি হওয়া জরুরী হবে। যা থেকে সেগুলো শূন্য হয় না।

উত্তর ঃ আপনাদের একথা যথাযথ নয় বরং কোন বস্তুর অনাদিত্বের অর্থ হল, তার সূচনাহীনতা অথবা অতীত দিকে কল্পিত অসীমকালে কোন জিনিসের অস্তিত্ব চিরন্তন হওয়া। কোথাও অস্তিত্বহীন না হওয়া। উভয়টির সারাংশ একই বের হয়। অর্থাৎ চিরস্থায়ী হওয়া। আর চিরস্থায়িত্বের অর্থ হল, কোন বস্তুর অন্তহীনতা বা ভবিষ্যতে কল্পিত

অসীমকালে তার অস্তিত্ব স্থায়ী হওয়া। কখনও অস্তিত্বহীন না হওয়া। অর্থাৎ চিরস্থায়ীত্ব। আর أَبَدِيَّت ও أَزَلِيَّت (আদি ও অন্ত হীনতা)-এর সমষ্টি হল سَرْمَدِيَّت বা চিরন্তনতা। আল্লাহর সত্ত্বা চিরন্তন তথা অনাদি-অনন্ত। মোটকথা, যেহেতু অনাদিত্বের দ্বারা লক্ষ্য হল, তার আদিহীনতা এবং স্থায়ীত্ব এ কারণে এই অর্থে حَادِث (নশ্বর) বস্তুর অনাদিত্ব অসম্ভব নয়।

দার্শনিকদের মতে আকাশের গতি প্রাচীন কেন ?

قَوْلُهٗ وَمَعْنٰى حَرَكَات الخ ঃ এখানে একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নটি হল, আকাশের حَرَكَات جُزْئِيَّه নশ্বর। কিন্তু দার্শনিকগণ আকাশের গতিকে প্রাচীন বলেন কেন?

উত্তর ঃ দার্শনিকগণ যে বলেন, আকাশের গতি প্রাচীন –এটা সাধারণ গতি সম্পর্কে প্রযোজ্য। আকাশের حَرَكَات جُزْئِيَّه (আংশিক গতি) দার্শনিকদের মতেও প্রাচীন নয় বরং তারা এগুলোর নশ্বরতাকে স্বীকার করেন। আর এসব حَرَكَات جُزْئِيَّه কে অনাদি বলার মধ্যে তাদের উদ্দেশ্য হল, অতীতের সীমাহীন সময় পর্যন্ত যে কোন গতি থাকবে। যেহেতু এ সব حَرَكَات جُزْئِيَّه এর ক্ষেত্রে হতে প্রতিটি গতিরই অন্য আরেকটি গতি রয়েছে। আর যার পূর্বে অন্য আরেকটি জিনিস নতুন হয়ে থাকে, সেগুলো নশ্বর হয়ে থাকে। এ কারণে সমস্ত حَرَكَات جُزْئِيَّه নশ্বর হবে।

আমাদের জবাব ঃ যে কোন كُلِّى শুধুমাত্র তার আফরাদ এবং جُزْئِيَّات এর মাধ্যমে বাস্তবে বিদ্যমান হয়ে থাকে। যেমন, إِنْسَان কুল্লী হয় সমস্ত বৈশিষ্ট্য থেকে শূন্য থেকে বাস্তবে বিদ্যমান হয় না বরং زَيْد - عُمَرُ- بَكَر ইত্যাদি جُزْئِيَّات وَاَفْرَاد এর আওতায় বিদ্যমান হয়। এমনিভাবে সাধারণ গতি একটি কুল্লী, তার অস্তিত্ব حَرَكَات جُزْئِيَّه এর মাধ্যমে হবে। আর حَرَكَات جُزْئِيَّه হল, حَادِث নশ্বর। তাহলে যে حَرَكَات مُطْلَقَه এসব নশ্বর حَرَكَات جُزْئِيَّه এর আওতায় বিদ্যমান, সেগুলোও নশ্বর হবে। حَرَكَات جُزْئِيَّه নশ্বর হয়ে তার মধ্যে বিদ্যমান حَرَكَات مُطْلَقَه প্রাচীন হওয়ার কল্পনা কিভাবে করা যায়?

চতুর্থ প্রশ্ন قَوْلُهٗ وَالرَّابِعُ ঃ এ প্রশ্নটি اَعْيَان এর নশ্বরতার প্রমাণে শারেহ রহ.এর উক্তি لِاَنَّ الْجِسْمَ اَوِ الْجَوْهَرَ لَايَخْلُوْعَنِ الْحَيِّزِ এর ওপর। প্রশ্নটি হল, যদি প্রতিটি দেহরই কোন স্থানে বিদ্যমান থাকা আবশ্যক হয়, তাহলে দেহ অসীম হওয়া জরুরী হবে। কারণ, حَيِّز এর অর্থ হল, পরিবেষ্টিত দেহের বাহ্যিক পৃষ্ঠের সাথে মিলিত পরিবেষ্টনকারী দেহের অভ্যন্তরীণ পৃষ্ঠ। সুতরাং যদি প্রতিটি দেহের জন্য স্থান বা حَيِّز তথা কোন পরিবেষ্টনকারী দেহের অভ্যন্তরীণ পৃষ্ঠে থাকা জরুরী হয়, তাহলে সে পরিবেষ্টনকারী দেহও কোন স্থান অর্থাৎ পরিবেষ্টনকারী দেহের অভ্যন্তরীণ পৃষ্ঠে থাকবে। আর সে পরিবেষ্টনকারী দেহও কোন حَيِّز তথা পরিবেষ্টনকারী দেহের অভ্যন্তরীণ পৃষ্ঠে বিদ্যমান থাকবে। এমনিভাবে এ ধারাবাহিকতা অসীম পর্যন্ত চলতে থাকবে। ফলে দেহসমূহের অসীমত্ব আবশ্যক হয়ে পড়বে। অথচ এটা বাতিল। যেমন– আল্লাম মাইবুযী রহ. আব'আদে গায়রে মুতানাহিয়া (অসীম মাত্রা) বাতিল হওয়ার উপর বুরহানে সুল্লামী কায়েম করেছেন।

জবাব ঃ

اَلْجَوَابُ اَنَّ الْحَيِّزَ الخ ঃ বর্ণিত ইবারত দ্বারা এর উত্তর দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ حَيِّز এর যে অর্থ প্রশ্নকারী বর্ণনা করেছেন, সেটি দার্শনিকদের মত। মুতাকাল্লিমীনের মতে প্রতিটি দেহর حَيِّز (স্থান) হল, এমন কল্পিত শূন্যতা, যাকে দেহ পরিপূর্ণ করে ফেলে। যার মধ্যে দেহের ত্রিমাত্রা অর্থাৎ দৈর্ঘ, প্রস্থ, পুরুত্ব বা ঘনত্ব প্রবিষ্ট থাকে। যেমন– একটি দেহ দু' হাত লম্বা, এক হাত চওড়া, এক বিঘত মোটা। এ দেহটি দুই হাত দৈর্ঘ্য, এক হাত প্রস্থ, এক বিঘত পুরু শূন্যতাকে পরিপূর্ণ করে রাখবে। আর যে শূন্য স্থানটিকে দেহ পরিপূর্ণ করে রেখেছে, সেখানে দেহটি প্রবিষ্ট হয়ে আছে। সেটাই এ দেহটির হাইয়িয বা স্থান।

وَلَمَّا ثَبَتَ اَنَّ الْعَالَمَ مُحْدَثٌ وَمَعْلُوْمٌ اَنَّ الْمُحْدَثَ لَابُدَّ لَهُ مِنْ مُحْدِثٍ ضَرُوْرَةَ اِمْتِنَاعِ تَرَجُّحِ اَحَدِ طَرَفَيِ الْمُمْكِنِ مِنْ غَيْرِ مُرَجِّحٍ ثَبَتَ اَنَّ لَهُ مُحْدِثًا وَالْمُحْدِثُ لِلْعَالَمِ هُوَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَيِ الذَّاتُ الْوَاجِبُ الْوُجُوْدُ الَّذِيْ يَكُوْنُ وُجُوْدُهُ مِنْ ذَاتِهِ وَلَا يَحْتَاجُ اِلٰى شَيْءٍ اَصْلًا اِذْ لَوْكَانَ جَائِزَ الْوُجُوْدِ لَكَانَ مِنْ جُمْلَةِ الْعَالَمِ فَلَمْ يَصْلُحْ مُحْدِثًا لِلْعَالَمِ وَمَبْدَأً لَهُ مَعَ اَنَّ الْعَالَمَ اِسْمٌ لِجَمِيْعِ مَا يَصْلُحُ عَلَمًا عَلٰى وُجُوْدِ مَبْدَأٍ لَهُ -

সহজ তরজমা

বিশ্বজগতের স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ঃ বিশ্বজগত নশ্বর তথা অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্ব লাভ করেছে– একথা যখন প্রমাণিত হল; আর এটাও নিশ্চিত যে, কোন নশ্বর বস্তুর জন্য (অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্ব লাভের) অস্তিত্ব দানকারী (স্রষ্টা) আবশ্যক (যে এর অনস্তিত্বের দিক থেকে অস্তিত্বের দিকটাকে প্রাধান্য দিবে।) কারণ, সম্ভব্য বস্তুর অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব থেকে কোন একটি দিক প্রাধান্য দানকারী বস্তু ব্যতিত প্রাধান্য পাওয়া অসম্ভব। তাহলে প্রমাণিত হল যে, এ জগতেরও কোন অস্তিত্ব দানকারী আছে। আর জগতের অস্তিত্ব দানকারী হলেন একমাত্র আল্লাহ। অর্থাৎ এমন এক অপরিহার্য সত্তা, যার অস্তিত্ব নিজে নিজেই হয়েছে। তিনি আপন অস্তিত্বের জন্য কারো মুখাপেক্ষী নন। কারণ, বিশ্বস্রষ্টা যদি সম্ভাব্য সত্তা হতেন, তাহলে তিনি সৃষ্টিজগতের মধ্য হতে কোন একটি বস্তু হতেন। ফলে তিনি বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও জগতের অস্তিত্বের মূল কারণ হতে পারতেন না। এ ছাড়া عَالَم এর অর্থ সে সব জিনিস, যেগুলো নিজ মূল কারণের অস্তিত্বের নিদর্শন হয়ে থাকে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ

قَوْلُهُ وَلَمَّا ثَبَتَ الخ ঃ স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ দুটি ভূমিকার উপর নির্ভরশীল। **এক.** বিশ্বজগত নশ্বর –এটি ইতোমধ্যে বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে। ফলে শারেহ দ্বিতীয় মুকদ্দমা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সুতরাং তিনি বলেন, প্রতিটি অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্ব প্রাপ্ত বস্তুর জন্য কোন স্রষ্টা থাকা আবশ্যক। অতঃপর ضَرُوْرَةَ اِمْتِنَاعِ الخ দ্বারা দ্বিতীয় ভূমিকাটির প্রমাণ বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ নশ্বর বস্তুর অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব এর সম্ভাব্যতার কারণে সমান। সুতরাং যদি তা কোন উদ্ভাবক ও স্রষ্ট ছাড়া অনস্তিত্ব থেকে বেরিয়ে অস্তিত্বে আসে, তাহলে সম্ভাব্য বস্তুর দুইটি দিক তথা অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব থেকে একটি অপরটি হতে কোন প্রাধান্যদাতা কারণ ছাড়া প্রাধান্য পাওয়া আবশ্যক হবে। আর প্রাধান্যদাতা কারণ ছাড়া কোন একটিকে প্রাধান্য দেওয়া অসম্ভব। এতে বুঝা যায়, প্রতিটি নশ্বর বস্তুই অবশ্যই কোন স্রষ্টা এবং উদ্ভাককের মুখাপেক্ষী। যিনি তার অস্তিত্বকে অনস্তিত্ব থেকে প্রাধান্য দিয়ে অস্তিত্ববান করবেন। যেহেতু এ দুটি ভূমিকায় প্রমাণিত হল যে, বিশ্বজগত নশ্বর এবং প্রতিটি নশ্বর বস্তুর জন্য কোন স্রষ্টা থাকে, সুতরাং এর সারমর্ম দাঁড়াল– বিশ্বজগতের কোন সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন।

قَوْلُهُ وَالْمُحْدِثُ لِلْعَالَمِ هُوَ اللّٰهُ تَعَالٰى ঃ শারেহ এর উপরে বর্ণিত প্রমাণ দ্বারা বিশ্বজগতের স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে। মূল মুছান্নিফ রহ. এ উক্তির ভিত্তিতে বিশ্বস্রষ্টার অস্তিত্ব নির্দিষ্ট করে বলে দিলেন, বিশ্বজগতের স্রষ্টা হলেন আল্লাহ। অর্থাৎ এমন একটি সত্তা যার অস্তিত্ব অপরিহার্য। সত্তাগত তার সত্তা তার অস্তিত্বের কারণ। তিনি আপন অস্তিত্ব লাভের জন্য কারও মুখাপেক্ষী নন।

قَوْلُهُ الَّذِيْ يَكُوْنُ وُجُوْدُهُ مِنْ ذَاتِهِ وَلَا يَحْتَاجُ اِلٰى شَيْءٍ اَصْلًا ঃ এ ইবারতটি وَاجِبُ الْوُجُوْدِ এর ব্যাখ্যামূলক গুণ। অপরিহার্য সত্তার অর্থকে এটি স্পষ্ট করে তুলছে।

বিশ্বজগতের স্রষ্টা অপরিহার্য সত্ত্বা কেন ?

اِذْ لَوْ كَانَ جَائِزَ الْوُجُوْدِ ঃ এ উক্তিটি বিশ্বস্রষ্টার অপরিহার্য সত্তা হওয়ার প্রমাণ। অর্থাৎ যদি বিশ্বস্রষ্টা অপরিহার্য সত্তা না হন বরং সম্ভাব্য সত্ত্বা হন, তাহলে তাতে দুটি অসুবিধা অবশ্যই দেখা দিবে। প্রথমতঃ বিশ্বস্রষ্টা সম্ভাব্য বস্তু

হওয়া অবস্থায় বিশ্বজগতের অন্তর্ভূক্ত হবেন। এ অবস্থায় তিনি বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও কারণ হতে পারবেন না। অন্যথায় একটি বস্তু নিজ সত্তার স্রষ্টা ও কারণ হওয়া আবশ্যক হবে। কেননা জগতের অন্তর্ভূক্ত সেটি নিজেও। দ্বিতীয়তঃ عَالَم বলা হয় এমন বস্তুকে, যা নিজ স্রষ্টার অস্তিত্বের নিদর্শন হয়। সুতরাং বিশ্বস্রষ্টা সম্ভাব্য বস্তু হলে তা বিশ্বজগতের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর বিশ্বজগতের অস্তিত্বের কারণ নিজ স্রষ্টার অস্তিত্বের নিদর্শন হবে। যেহেতু তিনি নিজেই নিজের স্রষ্টা, এ জন্য নিজেই নিজের অস্তিত্বের নিদর্শন হওয়া আবশ্যক হবে। অথচ এটা সম্ভব নয়। এদুটি অসুবিধার কারণে বিশ্বস্রষ্টা সম্ভাব্য বস্তু হতে পারবেন না। যেহেতু সম্ভাব্য বস্তু হওয়া বাতিল। সুতরাং প্রমাণিত হল, বিশ্বস্রষ্টা অপরিহার্য সত্তা হবেন, যাকে মুসলমানগণ আল্লাহ বলে সম্বোধন করেন।

وَقَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا مَا يُقَالُ إِنَّ مَبْدَأَ الْمُمْكِنَاتِ بِأَسْرِهَا لَابُدَّ أَنْ يَكُوْنَ وَاجِبًا إِذْ لَوْ كَانَ مُمْكِنًا لَكَانَ مِنْ جُمْلَةِ الْمُمْكِنَاتِ فَلَمْ يَكُنْ مَبْدَأً لَهَا وَقَدْ يُتَوَهَّمُ أَنَّ هٰذَا دَلِيْلٌ عَلٰى وُجُوْدِ الصَّانِعِ مِنْ غَيْرِ افْتِقَارٍ إِلٰى إِبْطَالِ التَّسَلْسُلِ وَلَيْسَ كَذٰلِكَ بَلْ هُوَ إِشَارَةٌ إِلٰى أَحَدِ أَدِلَّةِ بُطْلَانِ التَّسَلْسُلِ وَهُوَ أَنَّهُ لَوْ تَرَتَّبَ سِلْسِلَةُ الْمُمْكِنَاتِ لَا إِلٰى نِهَايَةٍ لَاحْتَاجَتْ إِلٰى عِلَّةٍ وَهِيَ لَايَجُوْزُ أَنْ يَكُوْنَ نَفْسَهَا وَلَابَعْضَهَا لِاسْتِحَالَةِ كَوْنِ الشَّيْئِ عِلَّةً لِنَفْسِهِ وَلِعِلَلِهِ بَلْ خَارِجًا عَنْهَا فَيَكُوْنُ وَاجِبًا فَتَنْقَطِعُ السِّلْسِلَةُ

সহজ তরজমা

উপরিউক্ত প্রমাণের নিকটবর্তী হল, নিম্নে বর্ণিত এ প্রমাণটি –সমস্ত সম্ভাব্য বস্তুর ইল্লত বা মূল কারণ অপরিহার্য সত্তা হওয়া আবশ্যক। কারণ, সে ইল্লত যদি সম্ভাব্য বস্তু হয় তবে সে সম্ভাব্য বস্তুবসমূহেরই অন্তর্ভুক্ত একটি হবে। তবে তো তা আর সম্ভাব্য বস্তুর কারণ হতে পারবে না। কোন কোন সময় এমন ধারণা করা হয় যে, উপরে مايقال দ্বারা বর্ণিত প্রমাণটি এমন একটি প্রমাণ, যাতে تَسَلْسُل (অসীম ধারা) কে বাতিল করার কোন দরকার হয় না। পক্ষান্তরে বিষয়টি এমন নয়। বরং এখানে تَسَلْسُل বাতিল হওয়ার একটি প্রমাণের দিকে ইংগিত রয়েছে। সে প্রমাণটি হল, যদি সম্ভাব্য বস্তুসমূহের অসীম ধারা বিন্যস্ত আকারে অস্তিত্ব লাভ করে (সম্ভাব্য বস্তুর মূল কারণ সম্ভাব্য বস্তু মানলে এর অবশ্যম্ভবী পরিণতি এটাই।) তাহলে সম্ভাব্য বস্তুসমূহের এ অসীম ধারা নিশ্চয় কোন কারণের মুখাপেক্ষী হবে। আর সে কার হুবহু এ ধারাও হতে পারবে না। আবার এ অসীম ধারার কোন অংশও হতে পারবে না। কারণ, কোন বস্তুর নিজের জন্য কারণ হওয়া এবং একটি বস্তুর নিজ কারণের জন্য কারণ হওয়া অসম্ভব বরং কারণটি বহির্গত কোন জিনিস হবে। তা হবে অপরিহার্য সত্ত্বা। তবেই বন্ধ হবে এ অসীম ধারা।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

উপরিউক্ত প্রমাণের সমর্থন

قَوْلُهُ : وَقَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الخ ঃ هٰذَا এর مُشَارٌ إِلَيْهِ হল স্রষ্টার অপরিহার্য সত্তা হওয়ার সে প্রমাণ, যাকে শারেহ নিজ উক্তি جَائِزُ الْوُجُوْد দ্বারা বর্ণনা করেছেন। উদ্দেশ্য হল, এ প্রমাণ এবং উপরিউক্ত প্রমাণের সারকথা এক। শুধু শাব্দিক কিছু পার্থক্য আছে। এ প্রমাণের মূলকথা হল, সমস্ত সম্ভাব্য বস্তুর স্রষ্টা যদি সম্ভাব্য বস্তু হয়, তাহলে তাও সম্ভাব্য বস্তুর স্রষ্টা হতে পারবে না। অন্যথায় নিজের জন্য নিজে স্রষ্টা এবং কারণ হওয়া আশব্যক হবে। কেননা সমস্ত বস্তুর অন্তর্ভূক্ত সেটিও। আর একটি বস্তু নিজের সত্তার জন্য স্রষ্টা এবং কারণ হওয়া বাতিল। সুতরাং জগতের স্রষ্টা সম্ভাব্য বস্তু হওয়া কথাটি বাতিল বরং তার অপরিহার্য সত্তা হওয়া আবশ্যক।

পূর্বের দলীলগুলো অসীমধারা বাতিলের উপর নির্ভরশীল

قَوْلُهُ وَقَدْ يُتَوَهَّمُ الخ ঃ অপরিহার্য সত্ত্বা প্রমাণের যতগুলোপ্রসিদ্ধ প্রমাণাদি রয়েছে, সবগুলো تَسَلْسُل বাতিলের উপর নির্ভরশীল। যেমন, নিম্নোক্ত প্রমাণটি তথা বিশ্বজগত সম্ভাব্য বস্তু। আর কোন সম্ভাব্য বস্তুই নিজে নিজে অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না বরং তার অস্তিত্বের কোন কারণ থাকতে হবে। এবার সে কারণটির মধ্যে যৌক্তিক তিনটি সম্ভাবনা রয়েছে। **এক.** সেই ইল্লতটি অসম্ভব হবে। **দুই.** সম্ভাব্য হবে। **তিন.** অপরিহার্য হবে। প্রথমোক্ত দুটি

সম্ভাবনা বাতিল। সুতরাং তৃতীয় সম্ভাবনাই নির্ধারিত হল। প্রথম সম্ভাবনা বাতিল হওয়ার কারণ, অসম্ভব জিনিস অস্তিত্বহীন হয়ে থাকে। যা নিজেই অস্তিত্বহীন তা আবার অন্য কোন বস্তুর অস্তিত্বের কারণ কিভাবে হতে পারে? দ্বিতীয় সম্ভাবনা বাতিল হওয়ার কারণ হল, বিশ্বজগতের অস্তিত্বের কারণ যদি কোন সম্ভাব্য বস্তু হয়, তাহলে সেটিও কোন কারণের মুখাপেক্ষী হবে। আর সেই দ্বিতীয় কারণটিও কোন সম্ভাব্য বস্তু হবে। তাও তৃতীয় কোন কারণের মুখাপেক্ষী হবে। এমনিভাবে ধারাবাহিকতা অসীম পর্যন্ত পৌঁছাবে। ফলে تَسَلْسُل বা অসীম এক ধারা আবশ্যক হয়ে পড়বে। অথচ تَسَلْسُل বাতিল। সুতরাং বিশ্ব জগতের অস্তিত্বের কারণ সম্ভাব্য বস্তু হওয়াও বাতিল। যেহেতু প্রথমোক্ত দুটি সম্ভাবনা বাতিল, তাই তৃতীয় সম্ভাবনাটি নির্ধারিত হয়ে গেল অর্থাৎ বিশ্ব জগতের অস্তিত্ব দাতার অস্তিত্বের কারণ কোন অপরিহার্য সত্তা হবে।

এবার দেখুন এ প্রমাণটিতে বিশ্বজগতের অস্তিত্বের কারণ সম্ভাব্য বস্তু হওয়ার সময় تَسَلْسُل আবশ্যক হয়ে পড়ে। এ কারণটি দেখিয়ে এটাকে বাতিল করা হয়েছে। আর تَسَلْسُل বাতিল হওয়ার কথা তখনই বুঝা যাবে, যখন প্রমাণ দ্বারা তা বাতিল করা হবে। এতে বুঝা যায়, অপরিহার্য সত্তা প্রমাণের জন্য এ প্রমাণটি تَسَلْسُل বাতিল করার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু تَسَلْسُل বাতিল করা অনেক দীর্ঘ আলোচনা এবং এমন কতগুলো ভূমিকার উপর নির্ভরশীল, যেগুলো স্বয়ং প্রমাণসাপেক্ষ। এ কারণে বিষয়টিকে সংক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্য কোন কোন লেখক অপরিহার্য সত্তা প্রমাণ করার জন্য এমন প্রমাণ তুলে ধরেছেন, যার কোন অংশেই تَسَلْسُل আবশ্যক হয় না এবং সেখানে تَسَلْسُل কে বাতিল করার প্রয়োজনীতাও দেখা দেয় না।

"মাওয়াকিফ" গ্রন্থকার ও শারিহ রহ. এর মতে আলোচ্য দলীল

উপরে مَا يُقَالُ থেকে অপরিহার্য সত্তা প্রমাণ করার যে দলীল বর্ণনা করা হয়েছে, তা সম্পর্কেও مَوَاقِف গ্রন্থকার মনে করেন– এটি অপরিহার্য সত্তা প্রমাণ করার এমন দলীল, যাতে تَسَلْسُل বাতিল করার কোন প্রয়োজন দেখা দেয় না। কারণ, এ প্রমাণে তো সংক্ষিপ্ত আকারে এতটুকু বলা হয়েছে যে, সমস্ত সম্ভাব্য বস্তুর অস্তিত্বের মূল কারণ অপরিহার্য সত্তা হওয়া এ জন্য আবশ্যক যে, যদি কোন সম্ভাব্য বস্তু সমস্ত বস্তুর অস্তিত্বের কারণ হয়, তবে সেটি নিজেও সম্ভাব্য বস্তু হবে। বিধায় অন্যান্য সম্ভাব্য বস্তুর মধ্যে এটিও গণ্য হবে। এ কারণে এটি নিজের জন্যও কারণ হওয়া আবশ্যক হবে। অথচ একটি বস্তু নিজের জন্য নিজে কারণ হওয়া অবৈধ। সুতরাং কোন সম্ভাব্য বস্তুর জন্য সম্ভাব্য বস্তুর কারণ হওয়া অবৈধ। যেহেতু সম্ভাব্য বস্তুর কারণ হতে পারে না, সেহেতু প্রমাণিত হল, সমস্ত সম্ভাব্য বস্তুর অস্তিত্বের কারণ নিশ্চয় এমন কোন সত্তা, যা এসব সম্ভাব্য বস্তু থেকে বর্হিভূত হবে। আর তা-ই وَاجِبُ الْوُجُوْد বা অপরিহার্য সত্তা। সুতরাং খেয়াল করুন! এ প্রমাণে تَسَلْسُل এর নাম-গন্ধও আসেনি, যাকে বাতিল করার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। শারেহ مَوَاقِف গ্রন্থকারের এ ধারণাটিকে কাল্পনিক সাব্যস্ত করেছেন। তিনি এটাকে প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন– বরং উপরিউক্ত দলীলে تَسَلْسُل বাতিল হওয়ার একটি দলীলের দিকে ইশারা রয়েছে।

অসীম ধারা বাতিলের একটি প্রমাণ

قَوْلُهُ وَهُوَ أَنَّهُ الخ ঃ এখানে هُوَ শব্দ দ্বারা تَسَلْسُل বাতিল হওয়ার সেই প্রমাণের প্রতি ইশারা রয়েছে, যেটিকে উপরে অপরিহার্য সত্তা প্রমাণ করার জন্য مَا يُقَالُ الخ দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে। تَسَلْسُل বাতিল হওয়ার এ প্রমাণটি বর্ণনার পূর্বে দুটি বিষয় মনে রাখতে হবে। যথা,

এক. تَسَلْسُل এর অর্থ হল, সুবিন্যস্তরূপে অসীম বস্তু নিচয়ের কার্যতঃ অস্তিত্ব লাভ করা। আর বিন্যস্তরূপে বিদ্যমান হওয়ার অর্থ হল, এগুলো প্রতিটি পূর্ববর্তী বস্তু পরবর্তী বস্তুর জন্য ইল্লত বা কারণ হওয়া।

দুই. কোন সম্ভাব্য বস্তুকে সমস্ত সম্ভাব্য বস্তুর কারণ মানলে অসীম সম্ভাব্য বস্তু বিন্যস্ত আকারে কার্যতঃ অস্তিত্ব লাভ করা আবশ্যক হয়ে পড়বে। কেননা যেসম্ভাব্য বস্তু সমস্ত বস্তুর ইল্লত বা কারণ হবে, তাও কোন না কোন কারণের মুখাপেক্ষী হবে। পক্ষান্তরে সেই কারণটিও সম্ভাব্য বস্তু হবে এবং কোন কারণের মুখাপেক্ষী হবে। এমনিভাবে এ ধারাবাহিকতা অসীম পর্যন্ত পৌঁছবে। আর অসীম সম্ভাব্য বস্তু বিন্যস্ত আকারে এমনিভাবে কার্যতঃ অস্তিত্ব লাভ করা আবশ্যক হয়ে পড়বে যে, প্রত্যেকটি পূর্ববর্তী বস্তু পরবর্তী বস্তুর অস্তিত্তের কারণ হবে। আর এটাকেই বলা হয় تَسَلْسُل এটা বাতিল।

এর প্রমাণ হল, যদি অসীম সম্ভাব্য বস্তুসমূহ সুবিন্যস্ত আকারে বিদ্যমান হয়, তাহলে সে সব অসীম সম্ভাব্য বস্তুর সমষ্টির কারণ হয়ত এ সমষ্টিই হবে কিংবা সমষ্টির কোন অংশ হবে। উভয় সম্ভাবনাই বাতিল। প্রথমটি এ কারণে যে, যদি সম্ভাব্য বস্তুসমূহের সমষ্টির জন্য স্বয়ং সমষ্টিই কারণ হয়, তাহলে বস্তুর নিজের জন্যই ইল্লাত বা কারণ

হওয়া আবশ্যক হবে। আর দ্বিতীয়টি এজন্য যে, যদি অসীম সম্ভাব্য বস্তুর সমষ্টির জন্য সে সমষ্টির কোন অংশ কারণ হয় তবে যে কোন অংশই হতে পারে। যেহেতু তা নিজেও এই সমষ্টির অন্তর্ভূক্ত, বিধায় তা নিজের জন্যও কারণ হবে। অথচ একটি বস্তু নিজের জন্য কারণ হওয়া নাজায়েয। দ্বিতীয়তঃ সমষ্টির যে অংশটুকু সমস্ত সম্ভাব্য বস্তুর জন্য কারণ হবে, তা সম্ভাব্য বস্তুর সমষ্টির অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় নিজেও সম্ভাব্য। আর সম্ভাব্য বস্তুর জন্য কোন কারণ হওয়া আবশ্যক। সুতরাং এ অংশের জন্যও একটি কারণ হবে। মূলতঃ সে কারণটি সমষ্টির কোন একটি অংশই হবে। যেহেতু এ অংশটি সমষ্টির সবগুলো অংশের জন্যই কারণ, তাই এর জন্য সমষ্টির যে কোন একটিকে কারণ মানা হোক না কেন তার নিজের কারণের জন্য তার কারণ হওয়া আবশ্যক হবে। আর একটি জিনিস নিজের কারণের কারণ হওয়া বাতিল। সুতরাং এ জন্য অসীম সম্ভাব্য বস্তুসমূহের বিন্যস্ত আকারে মওজুদ হওয়া বাতিল প্রমাণিত হল। ফলে অসীম ধারা ও বাতিল হয়ে গেল। কারণ, تَسَلْسُلْ (অসীম ধারা) তো হল, সুবিন্যস্ত আকারে অসীম বস্তু নিয়ে মওজুদ হওয়ার নাম।

কোন বস্তু নিজের কারণ এবং কারণের কারণ হতে পারে না

قَوْلُهٗ لِاسْتِحَالَةِ كَوْنِ الشَّيْئِ الخ ঃ অর্থাৎ একটি বস্তুর নিজের জন্য এবং নিজের কারণের জন্য কারণ হওয়া অসম্ভব। সমষ্টিকে সম্ভাব্য বস্তুগুলোর সমষ্টির জন্য কারণ মানলে এবং সমষ্টির কোন অংশকেও কারণ মানলে প্রথমটি আবশ্যক হয়। আর দ্বিতীয়টি হয় শুধু সমষ্টির কোন অংশকে কারণ মানার সময়। যেমন, সম্ভাব্য বস্তুগুলোর সমষ্টির জন্য কারণ এ সমষ্টিরই একটি অংশ আলিফ। আর আলিফটিও সম্ভাব্য বস্তু হওয়ায় কোন কারণের মুখাপেক্ষী। এবার এর জন্য কারণ সমষ্টির একটি অংশ ب যেহেতু আলিফ সমষ্টির সবগুলো অংশের জন্যই কারণ ছিল। যেগুলোর মধ্যে ب ও একটি ছিল। সেহেতু আলিফ ب এর জন্য কারণ হল। এবার ب কে আলিফের জন্য কারণ মানতে গেলে এটি স্বীয় কারণের জন্য কারণ হয়ে দাঁড়াবে অবশ্যই।

قَوْلُهٗ بَلْ يَكُوْنُ خَرْجًا ঃ অর্থাৎ সমস্ত সম্ভাব্য বস্তুর কারণ যেহেতু এগুলোর সমষ্টি হতে পারে না এবং সমষ্টির কোন অংশও হতে পারে না, তাই সমস্ত সম্ভব্য বস্তুর কারণ সম্ভাব্য বস্তুর বাইরের কোন জিনিস হবে। আর সমস্ত সম্ভাব্য বস্তু থেকে বহির্ভুত জিনিস হল, অপরিহার্য সত্তা। যা কোন কারণের মুখাপেক্ষী নয়। সুতরাং এই ধারা প্রবাহ খতম হয়ে যাবে।

وَمِنْ مَّشْهُوْرِ الْاَدِلَّةِ بُرْهَانُ التَّطْبِيْقِ وَهُوَ اَنْ تُفْرِضَ مِنَ الْمَعْلُوْلِ الْاَخِيْرِ اِلَى غَيْرِ النِّهَايَةِ جُمْلَةً وَمِمَّا قَبْلَهٗ بِوَاحِدٍ مَّثَلًا اِلٰى غَيْرِ النِّهَايَةِ اُخْرٰى ثُمَّ تُطَبِّقُ الْجُمْلَتَيْنِ بِاَنْ نَجْعَلَ الْاَوَّلَ مِنَ الْجُمْلَةِ الْاُوْلٰى بِاِزَاءِ الْاَوَّلِ مِنَ الْجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّانِىَ بِالثَّانِىْ وَهَلُمَّ جَرًّا فَاِنْ كَانَ بِاِزَاءِ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْاُوْلٰى وَاحِدٌ مِنَ الثَّانِيَةِ كَانَ النَّاقِصُ كَالزَّائِدِ وَهُوَ مُحَالٌ وَاِنْ لَّمْ يَكُنْ فَقَدْ وُجِدَ فِى الْاُوْلٰى مَالَا يُوْجَدُ بِاِزَائِهٖ شَيْئٌ فِى الثَّانِيَةِ فَتَنْقَطِعُ الثَّانِيَةُ وَتَنَاهٰى وَيَلْزَمُ مِنْهُ تَنَاهِى الْاُوْلٰى لِاَنَّهَا لَاتَزِيْدُ عَلَى الثَّانِيَةِ اِلَّا بِقَدْرٍ مُتَنَاهٍ وَالزَّائِدُ عَلَى الْمُتَنَاهِىْ بِقَدْرٍ مُّتَنَاهٍ يَكُوْنُ مُتَنَاهِيًا بِالضَّرُوْرَةِ ـ

সহজ তরজমা

বুরহানে তাতবীকঃ (تَسَلْسُلْ বাতিল হওয়ার) বিখ্যাত প্রমাণসমূহের অন্যতম একটি হল, বুরহানে তাতবীক। এর বিবরণ হল, আমরা সর্বশেষ মালূল থেকে একটি ধারা অসীম পর্যন্ত মেনে নেব এবং এর নিকট সামনে থেকে উদাহরণ হিসেবে অসীম পর্যন্ত আরেকটি ধারা মেনে নেব। তারপর উভয় ধারাতে এভাবে সাম স্যতা বিধান করব যে, প্রথম ধারার ১ম অংশটিকে দ্বিতীয় ধারার প্রথম অংশটির বিপরীতে রেখে দেব। এমনিভাবে অসীম পর্যন্ত করতে হবে। অতঃপর যদি প্রথম ধারার প্রতিটি অংশের বিপরীতে দ্বিতীয় ধারায় কোন অংশ পাওয়া যায়, তাহলে কম-বেশী উভয়েই সমান হয়ে যাবে, এতো অসম্ভব। আর যদি প্রথম ধারার প্রতিটি অংশের বিপরীতে দ্বিতীয় ধারাতে কোন অংশ না থাকে, তাহলে এর অর্থ হবে, প্রথম ধারায় এমন একটি অংশ বিরাজমান, যার

বিপরীতে দ্বিতীয় ধারায় কোন অংশ পাওয়া গেল না। তাহলে তো দ্বিতীয় ধারা সমাপ্ত হয়ে গেল। এর অবশ্যসম্ভাবী ফল হিসেবে প্রথম ধারাটিও সীমিত হয়ে পড়বে। কারণ, প্রথম ধারাটি দ্বিতীয় ধারা অপেক্ষা শুধু সীমিত পরিমাণ বেশী। আর যে বস্তু কোন সীমিত বস্তু অপেক্ষা সীমিত পরিমাণ বেশী হয়, তা অবশ্যই সীমিত হতে বাধ্য।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তাসালাসুল বাতিলের প্রসিদ্ধ প্রমাণ

تَسَلْسُل বাতিল হওয়ার যেসব বিখ্যাত প্রমাণাদি রয়েছে। তার মধ্য হতে একটি হল, বুরহানে তাতবীক। তার পূর্বে আমাদের কয়েকটি জিনিস মনে রাখতে হবে। যেমন, تَسَلْسُل হল, অসীম বস্তুগুলোর এমন কার্যতঃ বিদ্যমান হওয়ার নাম যে, তার পূর্ববর্তী প্রত্যেকটি বস্তু তার পরবর্তী বস্তুর কারণ হবে। যেমন, কালের প্রতিটি অংশ। তার পূর্ববর্তী তার পরবর্তী অংশের জন্য عِلَّت مُعِدَّه বা প্রস্তুত কারণ অর্থাৎ এমন বস্তু যা অস্তিত্ব লাভ করার পর অস্তিত্বহীন হওয়ার সাথে সাথেই দ্বিতীয় আরেকটি বস্তুর অস্তিত্ব লাভ হয়। যেমন– ধরুন, যুহরের সময় অস্তিত্ব লাভ করে যখন শেষ হয়ে যাবে, তখনই আসরের ওয়াক্তের অস্তিত্ব লাভ করবে। এরপর আসরের ওয়াক্ত যখন খতম হয়ে যাবে, তখনই মাগরিবের ওয়াক্তের অস্তিত্ব হবে। এমনিভাবে অতীত পরশু অস্তিত্ববান হয়ে খতম হয়ে গেলে অতীত কাল এর অস্তিত্ব হবে। সেটি খতম হয়ে যাওয়ার পর আজকের দিনটি অস্তিত্ব লাভ করবে।

সুতরাং উপরিউক্ত উদাহরণগুলোতে যুহর আসরের জন্য, আসর মাগরিবের জন্য, পরশু দিনটি গতকালের জন্য, আর গতকাল আজকের জন্য عِلَّت مُعِدَّه। আজকের দিনটি গতকালের مَعْلُوْل কিন্তু যেহেতু প্রতিটি দিন অস্তিত্ব লাভ করে আবার অস্তিত্বহীন হয়ে যাওয়া, পরবর্তী দিনের অস্তিত্বের কারণ, সেহেতু আজকের দিনটি মওজুদ থাকাবস্থায় তার পরবর্তী দিনের কারণ নয়। আর যে বস্তু مَعْلُوْل হয়ে অন্য কোন বস্তুর কারণ হয় না, তাকে مَعْلُوْل اخير বলে। সুতরাং আজকের দিনটিকে বলা হবে مَعْلُوْل اخير যার জন্য গতকাল অস্তিত্ব লাভের কারণ। আর তাও مَعْلُوْل। তার কারণ হল, অতীত পরশু দিন। আর পরশু দিনটিও مَعْلُوْل তার কারণ হল, তার পূর্ববর্তী পরশু দিন। এমনিভাবে ধরে নিন।

উপরিউক্ত ভূমিকার পর বুরহানে তাতবীকের মূলকথা হল, যদি অসীম কতগুলো বস্তু নিচয়ের কার্যতঃ অস্তিত্ব সম্ভব হয়, তাহলে আমাদের পক্ষে এটা সম্ভব হবে যে, আমরা مَعْلُوْل اخير যেমন, আজকের দিন থেকে অতীতের দিকে কারণ এবং معلول এর একটি অসীম ধারা মেনে নিব এবং দ্বিতীয় একটি অসীম ধারা মেনে নিব, যার সূচনা হবে প্রথম ধারার একটি আগে থেকে অর্থাৎ গতকাল থেকে। যেমন,

প্রথম ধারা ঃ আজ, কাল, পরশু, তরশু ... অসীম
দ্বিতীয় ধারা ঃ কাল, পরশু, তরশু, নরশু ... অসীম

উপরিউক্ত উদাহরণে প্রথম ধারার সূচনা হয়েছে مَعْلُوْل اخير অর্থাৎ আজ থেকে। কারণ, অতীত কাল। তার কারণ হল, পরশু দিন। তার কারণ অতীত তরশু দিন .... অসীম। আর দ্বিতীয় ধারাতেও এমন অসীম কতগুলো বস্তু রয়েছে। কিন্তু শুরুর দিক থেকে একের পর থেকে শুরু হয়েছে। এর সূচনা হল, গতকাল থেকে। সুতরাং প্রথম ধারার মধ্যে দ্বিতীয় ধারাটি বিদ্যমান আছে। আর দ্বিতীয় ধারাটি অপেক্ষা প্রথম ধারাটিতে এক বেশী। সুতরাং প্রথম ধারাটি كُل (পূর্ণ বস্তু) হল। আর দ্বিতীয় ধারাটি হল جُزْء বা অংশ। এবার উভয় ধারাতে এমনভাবে সামঞ্জস্য বিধান করুন যে, প্রথম ধারার প্রথম অংশ অর্থাৎ আজকে দ্বিতীয় ধারার প্রথম অংশের বিপরীতে টেনে আনুন। প্রথম ধারার দ্বিতীয় অংশকে দ্বিতীয় ধারার দ্বিতীয় অংশের বিপরীতে আনুন। তদ্রুপ তৃতীয় অংশটিকে অপর তৃতীয় অংশের বিপরীতে স্থাপন করুন। এমনিভাবে সামঞ্জস্য বিধান করতে থাকুন। এবার এখানে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে। হয়ত এমনিভাবে অসীম প্রথম ধারার প্রতিটি অংশের বিপরীতে দ্বিতীয় ধারায় কোন অংশ বিদ্যমান থাকবে অথবা বিদ্যমান থাকবে না। প্রথম সম্ভাবনা বাতিল। কারণ, যদি প্রথম ধারার প্রতিটি অংশের বিপরীতে দ্বিতীয় ধারায় অংশ বিদ্যমান থাকে, তাহলে অবশ্যই كُل ও جُزْء এবং কম-বেশী সমান হয়ে পড়বে অথচ এটা স্বীকৃত বিষয়ের পরিপন্থী। কারণ, আমরা প্রথম ধারাটিকে كُل এবং এক পরিমান বেশী মেনে ছিলাম। আর দ্বিতীয় ধারাটিকে جُزْء এবং এক পরিমান কম মেনে ছিলাম। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় সম্ভাবনাটি বাতিল হওয়ার কারণ যদি প্রথম ধারার প্রতিটি অংশের বিপরীতের দ্বিতীয় ধারায় অংশ না থাকে, তাহলে এর অর্থ হল, প্রথম ধারার যেই অংশটির বিপরীতে দ্বিতীয় ধারায় অংশ নেই, সেই অংশ থেকে প্রথমেই দ্বিতীয় ধারাটি সমাপ্ত হয়ে সীমিত হয়ে

গছে। বস্তুতঃ প্রথম ধারাটি এ অংশের পরিমাণের চেয়ে অতিরিক্ত বা বেশী। আর যে বস্তু কোন সীমিত জিনিস থেকে সীমিত পরিমাণে বেশী হয়, তাও সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে। সুতরাং দ্বিতীয় ধারাটি সীমিত হওয়ার ফলে প্রথমটিও সীমিত হয়ে গেল। এটা স্বীকৃত বিষয়ের পরিপন্থী। কারণ, আমরা উভয় ধারাকেই অসীম বলে মেনে নিয়েছিলাম। যেহেতু উভয় সম্ভাবনাই বাতিল হয়ে গেল, তাই উপরিউক্ত পদ্ধতিতে উভয় ধারার অস্তিত্ব বাতিল প্রমাণিত হল। মূলতঃ উপরিউক্ত পদ্ধতিতে উভয় ধারার অস্তিত্ব সম্ভব হয়েছিল, অসীম বস্তুসমূহের বিন্যস্ত আকারে অস্তিত্ব মেনে নেওয়ার কারণে। সুতরাং অসীম বস্তুসমূহের কাযর্তঃ অস্তিত্বঃ যার নাম তাসালসুল, সেটাও বাতিল বলে চূড়ান্ত হল

وَهٰذَا التَّطْبِيْقُ اِنَّمَا يُمْكِنُ فِيْمَا دَخَلَ تَحْتَ الْوُجُوْدِ دُوْنَ مَا هُوَ وَهْمِيٌّ مَحْضٌ فَاِنَّهٗ يَنْقَطِعُ بِانْقِطَاعِ الْوَهْمِ فَلَا يَرِدُ النَّقْضُ بِمَرَاتِبِ الْعَدَدِ بِاَنْ تُطَبَّقَ جُمْلَتَانِ اِحْدٰهُمَا مِنَ الْوَاحِدِ لَا اِلٰى نِهَايَةٍ وَالثَّانِيَةُ مِنَ الْاِثْنَيْنِ لَا اِلٰى نِهَايَةٍ وَلَا بِمَعْلُوْمَاتِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَمَقْدُوْرَاتِهٖ فَاِنَّ الْاُوْلٰى اَكْثَرُ مِنَ الثَّانِيَةِ مَعَ لَاتَنَاهِيْهِمَا وَذٰلِكَ لِاَنَّ مَعْنٰى لَاتَنَاهِى الْاَعْدَادِ وَالْمَعْلُوْمَاتِ وَالْمَقْدُوْرَاتِ اِنَّهَا لَاتُنَاهِى اِلٰى حَدٍّ لَايُتَصَوَّرُ فَوْقَهٗ اُخَرُ لَابِمَعْنٰى اَنَّ مَالَانِهَايَةَ يَدْخُلُ فِى الْوُجُوْدِ فَاِنَّهٗ مُحَالٌ۔

সহজ তরজমা

আর এ তাতবীক কেবল সেসব জিনিসে সম্ভব, যেগুলো বাস্তবে অস্তিত্ব লাভ করেছে; কল্পিত বস্তুতে নয়। কারণ, এমন জিনিস কল্পনা শেষে সীমিত হয়ে যায়। সুতরাং সংখ্যার স্তর –এর মাধ্যমে বুরহানে তাতবীকের উপর এরূপে প্রশ্ন উঠানো যাবে না যে, এমন দুটি ধারায় পরস্পরে সমন্বয় আনা হবে, যাতে (সংখ্যার) একটি ধারা এক থেকে আরম্ভ হয়ে অসীম হবে। আর দ্বিতীয়টি দুই থেকে শুরু হয়ে অসীম হবে। এমনিভাবে আল্লাহর পরিজ্ঞাত ও ক্ষমতাধীন বিষয়াবলী দ্বারাও প্রশ্ন জাগে না যে, প্রথমটি দ্বিতীয়টি অপেক্ষা বেশী। অথচ পরিজ্ঞাত ও ক্ষমতাধীন সবগুলোই অসীম। (প্রশ্ন না জাগার) কারণ, সংখ্যা এবং মা'লূমাতে এলাহিয়্যাহ ও মাকদূরাতে ইলাহিয়্যাহ অসীম হওয়ার অর্থ, এগুলো এমন কোন সীমায় গিয়ে সীমিত ও নিঃশেষ হয়ে যায় না যে, তার পরে আর কল্পনা করা যায় না। এ অর্থে নয় যে, অসীম বাস্তবেই অস্তিত্ব লাভ করেছে। কারণ, তা তো অসম্ভব।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

বুরহানে তাতবীকের উপর প্রশ্ন ঃ বুরহানে তাতবীকের উপর একটি প্রশ্ন জাগে। উপরিউক্ত ইবারতে সে প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নটি হল, সংখ্যা এবং আল্লাহর পরিজ্ঞাত ও ক্ষমাতাধীন বিষয়াবলী অসীম সর্বসম্মত একটি বিষয়। কিন্তু যদি বুরহানে তাতবীককে সঠিক বলে মেনে নেওয়া হয়, তাহলে উপরিউক্ত বিষয়াবলীর মধ্যেও বুরহানে তাতবীক প্রয়োগ হতে পারে। যদি বুরহানে তাতবীক এখানে ব্যবহার করা হয়, তবে এগুলো সীমাবদ্ধ হতে বাধ্য। অথচ তা ইজমা পরিপন্থী। সংখ্যাগুলোর মধ্যে বুরহানে তাতবীক প্রয়োগের নিয়ম হল, এক থেকে সংখ্যার একটি অসীম ধারা মেনে নিন। আর দ্বিতীয় আরেকটি অসীম ধারা দুই থেকে মেনে নিন। অতঃপর উভয় ধারাতে এমনভাবে সামঞ্জস্য বিধান করুন যে, দ্বিতীয় ধারাটির প্রথম এককের বিপরীতে প্রথম ধারার প্রথম একক, দ্বিতীয় ধারার দ্বিতীয় এককের বিপরীতে প্রথম ধারার দ্বিতীয় একক এবং দ্বিতীয় ধারার তৃতীয় এককের বিপরীতে প্রথম ধারার তৃতীয় একককে স্থাপন করুন। এমনিভাবে এ কাজটি সামনের দিকে চালিয়ে যান। যেমন,

প্রথম ধারাঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ...অসীম পর্যন্ত
দ্বিতীয় ধারাঃ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ...অসীম পর্যন্ত

এখন আমাদের প্রশ্ন হল, প্রথম ধারার প্রতিটি এককের বিপরীতে দ্বিতীয় ধারার মধ্যে একক আছে কি নেই? যদি থাকে তাহলে কম অর্থাৎ দ্বিতীয় ধারা। আর বেশী অর্থাৎ প্রথম ধারা –উভয়টি সমান হওয়া আবশ্যক হয়ে পড়বে। অথচ এটি স্বীকৃত বিষয়ের পরিপন্থী। কারণ, প্রথম ধারাটিকে আমরা শুরু থেকেই এক পরিমাণ বেশী আর দ্বিতীয়টিকে এক পরিমাণ কম মেনে নিয়েছিলাম। আর যদি প্রথম ধারাটির প্রতিটি এককের বিপরীতে দ্বিতীয় ধারায়

একক না থাকে তাহলে দ্বিতীয় ধারা সীমিত হয়ে পড়বে। আর এটা সীমিত হলে প্রথম ধারাটিও বাধ্য হয়ে সীমিত হয়ে পড়বে। কারণ, সেটি দ্বিতীয় ধারা থেকে সীমিত পরিমাণে অর্থাৎ এক পরিমাণে অতিরিক্ত। আর যে বস্তু কোন সীমিত জিনিস অপেক্ষা সীমিত পরিমাণ বেশী হয় সেটিও সীমিত হয়ে থাকে। সুতরাং প্রথম ধারাটিও সীমিত হয়ে গেল। এমনিভাবে আল্লাহর পরিজ্ঞাত ও ক্ষমতধীন জিনিসগুলোতেও বুরহানে তাতবীকে চালু হবে। কারণ, আল্লাহর পরিজ্ঞাত জিনিস ক্ষমতাধীন জিনিসের তুলনায় বেশী। কারণ, আল্লাহর কুদরতের আওতায় যেসব জিনিস রয়েছে, সেগুলোর সব আল্লাহর পরিজ্ঞাতও। কিন্তু আল্লাহর যতগুলো পরিজ্ঞাত জিনিস রয়েছে, তার সবই আল্লাহর ক্ষমতাধীন নয়। যেমন, আল্লাহ নিজ সত্তা সম্পর্কে জানেন। তার সত্তা তার নিকট পরিজ্ঞাত। কিন্তু তার ক্ষমতাধীন নয়। কারণ, কুদরতের সম্পর্ক দুটি বিপরীত জিনিসের সাথে সমান হয়। অর্থাৎ কোন বস্তুর উপর ক্ষমতাবান হওয়ার অর্থ হল, সেটাকে তিনি অস্তিত্ব দানও করতে পারেন এবং অস্তিত্ব বিলীনও করতে পারেন। সুতরাং আল্লাহর সত্ত্বা সম্পর্কে ক্ষমতাবান হওয়ার অর্থ হল, নিজ সত্তাকে তিনি বিদ্যমানও রাখতে পারেন, আবার অস্তিত্বহীনও করতে পারেন। এতে আল্লাহর সত্তার অস্তিত্বহীনতার সম্ভাবনা আবশ্যক হয়ে পড়ে। অথচ আল্লাহর সত্তা অপরিহার্য। তার অস্তিত্বহীনতা অসম্ভব। এতে বুঝা যায়, আল্লাহর সত্তা তার নিকট পরিজ্ঞাত। কিন্তু ক্ষমতাধীন নয়। এমনিভাবে অসম্ভব জিনিসগুলোও আল্লাহর পরিজ্ঞাত। কিন্তু আল্লাহর ক্ষমাতাধীন নয়। সুতরাং কোন কোন জিনিস এমনও আছে, যেগুলো আল্লাহর পরিজ্ঞাত কিন্তু ক্ষমতাধীন নয়, এতে প্রমাণিত হল, আল্লাহর পরিজ্ঞাত বিষয়াবলী ক্ষমতাধীন বিষয়াবলীর চেয়ে বেশী। এবার তাতবীকের বিধানের পদ্ধতি হবে, আমরা অসীম পরিজ্ঞাত জিনিসের একটি ধারা মেনে নিব। আর দ্বিতীয় ধারা মানব অসীম ক্ষমতাধীন জিনিসের।

এরপর প্রশ্ন করব, প্রথম ধারার প্রতিটি পরিজ্ঞাত বিষয়ের বিপরীতে দ্বিতীয় ধারার কোন ক্ষমতাধীন জিনিস বিদ্যমান আছে কি-না? যদি থাকে তাহলে কম অর্থাৎ ক্ষমতাধীন জিনিস এবং বেশী অর্থাৎ পরিজ্ঞাত জিনিস সমান হওয়া জরুরী হবে। আর যদি না থাকে, তবে দ্বিতীয় ধারা অর্থাৎ ক্ষমতাধীন জিনিস সীমিত হওয়া জরুরী হবে। যেহেতু প্রথম ধারা অর্থাৎ পরিজ্ঞাত বিষয়াবলী থেকে সীমিত পরিমাণ বেশী। আর যে বস্তুটি সীমিত জিনিস থেকে সীমিত পরিমাণে বেশী হয়, তা সীমিত হয়ে থাকে। এ কারণে আল্লাহর পরিজ্ঞাত বিষয়াবলীও সীমিত হওয়া আবশ্যক হয়ে পড়বে। মোটকথা, যদি বুরহানে তাতবীককে সঠিক বলে মেনে নেওয়া হয়, তবে সংখ্যা এবং আল্লাহর পরিজ্ঞাত ও ক্ষমতাধীন বিষয়াবলীও সীমিত হওয়া জরুরী হয়ে পড়বে। অথচ এটা ইজমা বিরোধী।

শারেহ রহ. নিজ উক্তি وَالتَّطْبِيْقُ إِنَّمَا يَجْرِىْ فِيْهَا دَخَلَ تَحْتَ الْوُجُوْدِ দ্বারা উক্ত সংশয়ের অবসান করেছেন। যার মূলকথা হল, বুরহানে তাতবীক কেবল সে সব অসীম বস্তুনিচয়ের মধ্যেই প্রয়োগ হতে পারে, যেগুলে কার্যতঃ বাস্তবে বিদ্যমান। কাল্পনিক এবং ধর্তব্য বিষয়াবলীতে চালু হবে না। কারণ, কল্পনাশক্তি সীমিত হওয়ার কারণে অসীম বিষয়াবলীকে হাজির করতে পারবে না। সুতরাং যেখানে কল্পনা নিঃশেষ হয়ে যাবে, তাতবীকও সেখানে নিঃশেষ হয়ে যাবে।

মোটকথা, বুরহানে তাতবীকের ক্ষেত্রে সংখ্যার শ্রেণী এবং আল্লাহর পরিজ্ঞাত ও ক্ষমাতধীন বস্তুগুলোর দ্বারা প্রশ্ন তোলা যাবে না। কারণ, সংখ্যা এবং পরিজ্ঞাত ও আল্লাহর ক্ষমাতাধীন বিষয়াবলীর অসীম হওয়ার অর্থ এই নয় যে, সব অসীম জিনিস কার্যতঃ অস্তিত্ব লাভ করেছে বরং সেগুলো অসীম হওয়ার অর্থ কেবল সেগুলো এমন কোন প্রান্তে যেয়ে নিঃশেষ হয়ে যায় না, যার অতিরিক্ত আর কল্পনা করা যায় না। অর্থাৎ যতগুলো অংশ বাস্তবে অস্তিত্ব লাভ করবে, সেগুলো সীমাবদ্ধই হবে। এর উপর অতিরিক্ত যে সকল জিনিস হবে, সেগুলোর সম্ভাবনা অবশ্যই থাকবে।

قَوْلُهُ: فَاِنَّ مَعْلُوْمَاتِهٖ الخ ঃ এখানে পরিজ্ঞাত ও ক্ষমতাধীন জিনিসের মাধ্যমে প্রশ্ন তোলার নিয়ম বলা হয়েছে।

قَوْلُهُ: لِاَنَّ مَعْنٰى الخ ঃ এ উক্তি দ্বারা সংখ্যার স্তর এবং পরিজ্ঞাত ও ক্ষমতাধীন জিনিসের দ্বারা প্রশ্ন উত্থাপিত না হওয়ার প্রমাণ তুলে ধরা হয়েছে।

اَلْوَاحِدُ يَعْنِى اَنَّ صَانِعَ الْعَالَمِ وَاحِدٌ وَلَا يُمْكِنُ اَنْ يَّصْدُقَ مَفْهُوْمُ وَاجِبِ الْوُجُوْدِ اِلَّا عَلٰى ذَاتٍ وَاحِدَةٍ وَالْمَشْهُوْرُ فِىْ ذَالِكَ بَيْنَ الْمُتَكَلِّمِيْنَ بُرْهَانُ التَّمَانُعِ الْمُشَارُ اِلَيْهِ بِقَوْلِهٖ تَعَالٰى لَوْ كَانَ فِيْهِمَا اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا وَتَقْرِيْرُهٗ لَوْ اَمْكَنَ اِلٰهَانِ لَاَمْكَنَ بَيْنَهُمَا تَمَانُعٌ بِاَنْ يُّرِيْدَ اَحَدُهُمَا حَرَكَةَ زَيْدٍ وَالْاٰخَرُ سُكُوْنَهٗ لِاَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا فِىْ نَفْسِهٖ اَمْرٌ مُّمْكِنٌ وَكَذَا تَعَلُّقُ اِرَادَةٍ بِكُلٍّ مِنْهُمَا فِىْ نَفْسِهٖ اِذْ لَا تَضَادَّ بَيْنَ اِرَادَتَيْنِ بَلْ بَيْنَ الْمُرَادَيْنِ وَحِ اِمَّا اَنْ يَّحْصُلَ الْاَمْرَانِ فَيَجْتَمِعُ الضِّدَّانِ اَوْلَا فَيَلْزَمُ عِجْزُ اَحَدِهِمَا وَهُوَ اَمَارَةُ الْحُدُوْثِ وَالْمَكَانِ لِمَا فِيْهِ مِنْ شَائِبَةِ الْاِحْتِيَاجِ فَالتَّعَدُّدُ مُسْتَلْزِمٌ لِاِمْكَانِ التَّمَانُعِ الْمُسْتَلْزِمِ لِلْمُحَالِ فَيَكُوْنُ مُحَالًا هٰذَا تَفْصِيْلُ مَا يُقَالُ اِنَّ اَحَدَهُمَا اِنْ لَّمْ يَقْدِرْ عَلٰى مُخَالَفَةِ الْاٰخَرِ لَزِمَ عِجْزُهٗ وَاِنْ قَدَرَ لَزِمَ عِجْزُ الْاٰخَرِ

সহজ তরজমা

আল্লাহ তা'আলা এক ঃ আল্লাহ তা'আলা যিনি এক ও অদ্বিতীয়। وَاجِبُ الْوُجُوْدِ (অপরিহার্য সত্তা) –এই অর্থটি একটি সত্তা ব্যতিত অন্য কোন সত্তার বেলায় ব্যবহার হতে পারে না। আকাইদ শাস্ত্রবিদগণের মাঝে এ ব্যাপারে প্রমাণ হল, বুরহানে তামানু। যেদিকে ইশারা রয়েছে আল্লাহর বাণী لَوْ كَانَ فِيْهِمَا اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا এর মধ্যে। এর বিস্তারিত বর্ণনা, যদি দুই উপাস্য সম্ভব হয়, তাহলে তাদের মাঝে এমন বিরোধ সম্ভব হবে যে, একজন (উদাহরণতঃ) যায়েদের গতি এবং অন্যজন যায়েদের স্থিরতার ইচ্ছা পোষণ করবেন। কারণ, সত্তাগতভাবে দুটিই সম্ভব। এমনিভাবে প্রতিটি কাজের সাথে ইচ্ছার সম্পৃক্ততাও সত্তাগতভাবে সম্ভব। কারণ, উভয় ইচ্ছার মাঝে কোন বিরোধ নেই বরং বিরোধ উভয় উদ্দিষ্ট কাজের মধ্যে। আর তখন হয়ত দুটি বস্তু হাসিল হবে, তাহলে বিপরীত দুটি বিষয়ের সহাবস্থান আবশ্যক হয়ে পড়বে। অথবা দুটি বস্তু হাসিল হবে না বরং একটিই হাসিল হবে। তাহলে এক স্রষ্টার অক্ষমতা অবশ্যই প্রমাণিত হবে। আর অক্ষমতা নশ্বরতা ও সম্ভাবতার লক্ষণ। কারণ, এতে মুখাপেক্ষীতার লেশ আছে। সুতরাং একাধিক উপাস্য হওয়ার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হল, ইমকানে তামানু (বিরোধের সম্ভাবনা) যার আবশ্যকীয় ফলশ্রুতি হল, অসম্ভব। সুতরাং একাধিক উপাস্য হওয়াও অসম্ভব। এ হল বুরহানে তামানু। এটি নিম্নোক্ত আলোচনার বিস্তারিত বিবরণ অর্থাৎ উভয় ইলাহর মধ্যে একজন যদি অপরজনের বিরোধিতার সামর্থ না রাখেন, তাহলে দ্বিতীয় উপাস্য অক্ষম হতে বাধ্য।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

আল্লাহ তা'আলা একক হওয়ার অর্থ

قَوْلُهٗ اَلْوَاحِدُ ঃ ইমাম রাযী রহ. বলেছেন, আল্লাহ এক-অদ্বিতীয় হওয়ার এক অর্থ হল, তার সত্তা অনেকগুলো বস্তুর সমষ্টি দ্বারা গঠিত নয়। সে মতে وَاحِد শব্দটি بَسِيْط শব্দের সমার্থক। দ্বিতীয় অর্থ হল, বাস্তব জগতে এমন কোন বস্তু নেই, যা অপরিহার্যতা এবং সমস্ত বস্তুর অস্তিত্বের মূল কারণ ও সমস্ত সম্ভাব্য বস্তুর স্রষ্টা হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহর অংশীদার হতে পারে। মোল্লা আলী কারী রহ. মিরকাত গ্রন্থে বলেছেন, আল্লাহ এক হওয়ার অর্থ হল, তার সত্তা অবিভাজ্য, তার গুণাবলীতে বা কোন কাজকর্মে কেউ তার সমকক্ষ নেই। গোটা সৃষ্টিই তার একত্বের প্রমাণ। শায়খ আবুল হাসান আশ'আরী রহ. থেকে বর্ণিত আছে, সংখ্যার দিক দিয়ে আল্লাহ এক। তার এ উক্তিকে কেউ কেউ কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। কারণ, এর দ্বারা আল্লাহ সংখ্যাকৃত বস্তুর অন্তর্ভুক্ত হওয়া জরুরী হবে। যেহেতু প্রতিটি সংখ্যাই সীমিত আর সংখ্যা সীমিত হওয়া مَعْدُوْد এর সীমিত হওয়াকে আবশ্যক করে, এ কারণে আল্লাহকে সংখ্যার দিক দিয়ে এক বলায় তার সীমিত হওয়াকে আবশ্যক করে। কিন্তু এ প্রশ্নটি মূলতঃ নিষ্প্রাণ। কারণ, আল্লাহ অসীম না হওয়ার অর্থ এই নয় যে, আল্লাহর মধ্যে আধিক্য আছে। কারণ, এটা তো সরাসরি ও স্পষ্ট শিরক। অবশ্য এতটুকু বলা যায় যে, আল্লাহকে معدودات এর মধ্যে গণ্য করা বেয়াদবী মুক্ত নয়। এমনকি যখন

জনৈক সাহাবী হুজুর ﷺ এর সামনে আল্লাহকে দ্বিবচনের সর্বনামে ব্যক্ত করেছিলেন, হুজুর ﷺ তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। সহীহ মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ শরীফে হযরত আদী ইবনে হাতেম রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি হুজুর ﷺ এর নিকট এসে বক্তব্য রাখলেন। তাতে তিনি বললেন–

مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَقَدْ غَوٰى

তখন রাসূল ﷺ বললেন, – بِئْسَ الْخَطِيْبُ اَنْتَ قُلْ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ অর্থাৎ مَنْ يَّعْصِهِمَا এর পরিবর্তে مَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ বল।

আশ'আরী রহ. এর উক্তির মর্ম হল, আল্লাহকে যে তিনি সংখ্যার দিক দিয়ে এক বলেছেন, এর উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ جُزْئِىْ حَقِيْقِىْ وَاحِدٌ بِالْجِنْسِ - وَاحِدٌ بِالنَّوْعِ নয়। যার অধীনে অনেক আফরাদ থাকে।

قَوْلُهٗ بِمَعْنٰى اَنَّ صَانِعَ الْعَالَمِ ঃ অর্থাৎ পূর্বে মুসান্নিফ রহ. বলেছেন, اَلْمُحْدِثُ لِلْعَالَمِ هُوَ اللّٰهُ বিশ্বজগতের স্রষ্টা হলেন আল্লাহ তা'আলা। আর শারিহ রহ. আল্লাহ এর ব্যাখ্যা করেছেন, وَاجِبُ الْوُجُوْدِ সত্তা দ্বারা। সুতরাং আল্লাহ তা'আলাকে وَاحِد (এক) হওয়ার গুণে গুণান্বিত করার অর্থ وَاجِبُ الْوُجُوْدِ সত্তাকে وَاحِد (এক) হওয়ার গুণে গুণান্বিত করা হল। এ দিকে ইশারা করে শারিহ রহ. বলেছেন, فَلَايُمْكِنُ مَفْهُوْمُ ذَاتِ وَاجِبِ الْوُجُوْدِ اِلَّا عَلٰى ذَاتٍ وَاحِدَةٍ আর যেহেতু বিশ্বজগতের স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা। আল্লাহ তা'আলা হলেন وَاجِبُ الْوُجُوْدِ সত্তা। আর وَاجِبُ الْوُجُوْدِ সত্তা হল, এক। তাহলে বুঝা গেল, বিশ্বজগতের স্রষ্টা এক।

قَوْلُهٗ وَالْمَشْهُوْرُ فِىْ ذَالِكَ ঃ আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের প্রামাণ্য দলীলসমূহের কিছু তো ঐগুলো, যা বিশ্বজগতের স্রষ্টা এক হওয়ার প্রমাণ বহন করে। যেমন, বুরহানে তামানু। আর কিছু হচ্ছে, যেগুলো وَاجِبُ الْوُجُوْدِ এর এক হওয়া বুঝায়। যেমন, মুতাকাল্লিমীনদের নিম্নোক্ত দলীল তথা যদি দুটি وَاجِبُ الْوُجُوْدِ বিদ্যমান থাকে তাহলে উভয় অপরিহার্য সত্তা এ গুণে শরীক হবে। সুতরাং অন্য কোন অংশ দ্বারা একটি অপরটি হতে পৃথক ও আলাদা হত। এতে وَاجِبُ تَعَالٰى এর مَابِهِ الْاِشْتِرَاكُ ও مَابِهِ الْاِمْتِيَازُ দ্বারা مُرَكَّب (যুক্ত) হওয়া আবশ্যক হবে। কিন্তু তা অসম্ভব বিধায় وَاجِبُ الْوُجُوْدِ দুটি হওয়াও অসম্ভব। আর বুরহানে তামানু এর দিকে ইংগিত হল, আল্লাহ তা'আলার উক্তি لَوْكَانَ فِيْهِمَا اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا এর মধ্যে যে কিয়াস ইস্তিছনাঈ রয়েছে, তা দ্বারা। تَالِى এর نَقِيْض এর اِسْتِثْنَاء করার দরুন ফলাফল مُقَدَّم এর نَقِيْض হবে। সুরাতটি নিম্নরূপ ঃ

মুকাদ্দম হল لَوْكَانَ فِيْهِمَا اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ আর তালী হল لَفَسَدَتَا নকীযে তালীর ইসতেসনা হল- لكهما لَمْ تَفْسِدَا তাই নতীজা হল – فَلَمْ يَكُنْ فِيْهِمَا اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ

বুরহানে তামানুর বিশদ বিবরণ

قَوْلُهٗ تَقْرِيْرُهٗ ঃ এটা বুরহানে তামানু এর বিবরণ অর্থাৎ যদি দুজন স্রষ্টা সম্ভব হয়, তাহলে তাদের মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বীতা সম্ভব হবে। যেমন, যে সময় একজন যায়েদকে নাড়ানোর ইচ্ছা করবেন, সে সময় অপর স্রষ্টা যায়েদের স্থিরতার ইচ্ছা করা সম্ভব হবে। কেননা যায়েদ একটি দেহ। আর প্রতিটি দেহে গতি ও স্থিতি উভয়টি সম্ভব। সুতরাং যায়েদের গতি ও স্থিতির প্রতিটি তার সত্তাগত দিক থেকে অর্থাৎ বিপরীতটির প্রতি লক্ষ্য না করে সম্ভব। তাহলে যে স্রষ্ট যায়েদের গতি এর ইচ্ছা করেছেন, তিনি সম্ভাব্য বস্তুর ইচ্ছা করেছেন। আর যিনি স্থিতির ইচ্ছা করেছেন, তিনিও সম্ভাব্য বস্তুর ইচ্ছা করেছেন। এমনিভাবে প্রত্যেক স্রষ্টার ইচ্ছার সম্পর্ক গতি ও স্থিতি উভয়টির যে কোনটির সাথে হওয়া সম্ভব। অর্থাৎ প্রত্যেকেই গতি-স্থিতি এর যে কোন একটির ইচ্ছা করতে পারেন। কেননা উভয়ের ইচ্ছার মধ্যে কোন বৈপরিত্য নেই। গতির ইচ্ছা এক স্রষ্টার। আর স্থিতির ইচ্ছা অপর স্রষ্টার। বৈপরিত্য দেখা দিবে উভয়টির স্থান এক হলে অর্থাৎ গতির ইচ্ছা যে স্রষ্টা করেছেন, আবার তিনিই স্থিতির ইচ্ছা করেছেন। হ্যাঁ উভয় উদ্দেশ্য অর্থাৎ গতি ও স্থিতি এর মধ্যে বৈপরিত্য রয়েছে। মোটকথা, যায়েদের গতি এবং স্থিতি উভয়টি সম্ভব এবং উভয় স্রষ্টার ইচ্ছা করাও সম্ভব। এরই নাম পরস্পর বিরোধ এবং সংঘর্ষ।

এখন তিনটি সম্ভাবনা রয়েছে। **প্রথমতঃ** উভয় স্রষ্টার উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে অর্থাৎ যায়েদ গতিশীলও হবে আবার স্থিরও হবে। এটা দুই বিপরীত জিনিসের একত্রিত হওয়ায় অসম্ভব। **দ্বিতীয়তঃ** উভয় স্রষ্টার কারও উদ্দেশ্যই পূর্ণ

হবে না অর্থাৎ যায়েদ গতিশীল হবে না, আবার স্থিরও হবে না। এ ক্ষেত্রে বিপরীত দুটি জিনিসের কোনটি না থাকায় এটা অসম্ভব। **তৃতীয়তঃ** একজনের উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে; অপর জনের উদ্দেশ্যপূর্ণ হবে না। তাহলে যার উদ্দেশ্যপূর্ণ হল না, তিনি অক্ষম। আর অক্ষমতা নশ্বরতা এবং সম্ভাব্যতার লক্ষণ। নশ্বর ও সম্ভাব্য বস্তু কখনও বিশ্বজগতের স্রষ্টা হতে পারে না। সুতরাং স্রষ্টা একজন হল। দুইজন হওয়া বাতিল সাব্যস্ত হল।

قَوْلُهُ هٰذَا تَفْصِيْلُ ঃ অর্থাৎ বুরহানে তামানু প্রসঙ্গে আমাদের উপরিউক্ত আলোচনা ছিল, বিস্তারিত। এর সারসংক্ষেপ হল, যদি দুই খোদা হওয়া সম্ভব হয়, তাহলে তাদের মধ্য হতে একজন অপরজনের বিরোধিতায় সক্ষম হবেন অথবা হবেন না। যদি দ্বিতীয়জনের বিরোধিতায় সক্ষম না হন, তাহলে অক্ষম হবেন। আর অক্ষম কেউ খোদা হতে পারে না। আর যদি অপরজনের বিরোধিতায় সক্ষম হয় যেমন, দ্বিতীয় খোদা যে কাজ করতে চাচ্ছেন, তাকে করতে দিবে না। তাহলে দ্বিতীয়জন অক্ষম হওয়ায় তিনি খোদা হতে পারেন না। কাজেই নিঃসন্দেহে খোদা একজনই হবেন।

وَبِمَا ذَكَرْنَا يَنْدَفِعُ مَايُقَالُ اِنَّهٗ يَجُوْزُ اَنْ يَّتَّفِقَا مِنْ غَيْرِ تَمَانُعٍ اَوْ اَنْ تَكُوْنَ الْمُمَانَعَةُ وَالْمُخَالَفَةُ غَيْرَ مُمْكِنَةٍ لِاِسْتِلْزَامِهَا الْمُحَالَ اَوْ اَنْ يَّمْتَنِعَ اِجْتِمَاعُ الْاِرَادَتَيْنِ كَاِرَادَةِ الْوَاحِدِ حَرَكَةَ زَيْدٍ وَسُكُوْنَهٗ مَعًا

সহজ তরজমা

আর (বুরহানে তামানুর) উক্ত বর্ণনা দ্বারা নিম্নোক্ত আপত্তিগুলো এমনিতেই নিরসন হয়ে যায় অর্থাৎ হতে পারে উভয়ে (স্রষ্টা) তাদের মাঝে কোন বিরোধ ও সংঘর্ষ ছাড়া এক কথা বজায় রাখবেন অথবা তাদের মধ্যকার বিরোধ ও সংঘর্ষ অসম্ভব জিনিসকে আবশ্যক করায় তা অসম্ভব হবে। অথবা উভয় ইচ্ছার সমন্বয় একত্রিত হওয়া অসম্ভব হবে। যেমন, একজন স্রষ্টার পক্ষে একত্রে যায়েদের গতি-স্থিতি -এর ইচ্ছা করা (অসম্ভব)।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

কয়েকটি প্রশ্নের অবসান

قوله وبما ذكرنا ঃ বুরহানে তামানুর উপরিউক্ত বিবরণে নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলো এমনিতেই দূর হয়ে যায়। যেমন,

প্রথম প্রশ্নঃ হতে পারে উভয় স্রষ্টা প্রত্যেক কাজে ঐক্য বজায় রাখবে; বিরোধ ও সংঘর্ষে লিপ্ত হবে না। এমতাবস্থায় উভয়ের উদ্দেশ্য এক হবে। তাহলে اجتماع ضدين (দুটি পরস্পর বিরোধী সহাবস্থান) আবশ্যক হবে না। আবার ارتفاع ضدين (দুটি বিপরীত জিনিসের কোনটি না থাকা) আবশ্যক হবে না। উভয়ের মধ্যে কেউ অক্ষম হওয়াও আবশ্যক হবে না। এ প্রশ্নটি উল্লেখিত বিবরণে শারিহ রহ. এর উক্তি لامكن بينهما تمانع দ্বারা দূর হয়ে যায়। অর্থাৎ আমরা তো পরস্পর বিরোধকে সম্ভব বলেছি।

দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ একাধিক স্রষ্ট মানলে তাদের মাঝে বিরোধের সম্ভাবনা আছে। যেমন, একজন যায়েদের গতির ইচ্ছা করবেন আর দ্বিতীয়জন যায়েদের স্থিতির ইচ্ছা করবেন। আমরা এটা মনি না। কেননা এমতাবস্থায় তোমাদের উক্তি অনুসারে اجتماع ضدين বা ارتفاع ضدين বা উভয় স্রষ্টার একজন অক্ষম হওয়া আবশ্যক হয়, যা অসম্ভব। আর যে জিনিসের কারণে অসম্ভব বিষয় আবশ্যক হয়, সেটিও অসম্ভব। সুতরাং পরস্পর বিরোধ হওয়াও অসম্ভব।

এ প্রশ্নটি উল্লেখিত বর্ণনায় শারিহ রহ. এর উক্তি لان كلامنهما فى نفسه امر ممكن দ্বারা দূর হয়ে যায়। অর্থাৎ যখন যায়েদ একটি দেহ হওয়ায় গতিশীল ও স্থিতিশীল উভয়টি সম্ভব, এমনিভাবে প্রত্যেক স্রষ্টা যায়েদের গতি-স্থিতির ইচ্ছা করাও সম্ভব। তাহলে এক স্রষ্টা যায়েদের গতিশীলতার ইচ্ছা করা ও অপরজন যায়েদের স্থিরতার ইচ্ছা করাও সম্ভব। একেই বলে তামানু। অতএব তামানু সম্ভব হল।

তৃতীয় প্রশ্ন ঃ যেরূপভাবে একই ব্যক্তির পক্ষে একই সময়ে যায়দের গতিশীলতা এবং স্থিতিশীলতা উভয়টিরই ইচ্ছা করা অসম্ভব, তদ্রূপ হতে পারে বিরোধিতার উপরিউক্ত উদাহরণে উভয় ইচ্ছা অর্থাৎ গতি ও স্থিতির ইচ্ছা একত্রিত হওয়া অসম্ভব।

এ প্রশ্নটি ব্যাখ্যাতার উক্তি– إِذْ لَا تَضَادَّ بَيْنَ إِرَادَتَيْنِ দ্বারা খতম হয়ে যায়। অর্থাৎ উভয় ইচ্ছার মধ্যে কোন ধরনের বৈপরিত্য নেই, যার ফলে اِجْتِمَاعِ ضِدَّيْنِ এর কারণে এটা অসম্ভব হবে। কেননা উভয় ইচ্ছার স্থান একটি নয় বরং গতির ইচ্ছা করার স্থান হলেন একজন স্রষ্টা। আর স্থিতির ইচ্ছার স্থান হলেন দ্বিতীয় স্রষ্টা। হ্যাঁ, বৈপরিত্য রয়েছে উভয়ের উদ্দিষ্ট বিষয় অর্থাৎ গতি এবং স্থিতির মাঝে।

وَاعْلَمْ اَنَّ قَوْلَهٗ تَعَالٰى لَوْكَانَ فِيْهِمَا اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا حُجَّةٌ اِقْنَاعِيَّةٌ وَالْمُلَازَمَةُ عَادِيَّةٌ عَلٰى مَا هُوَ الْاَلْيَقُ بِالْخِطَابِيَّاتِ فَاِنَّ الْعَادَةَ جَارِيَةٌ بِوُجُوْدِ التَّمَانُعِ وَالتَّغَالُبِ عِنْدَ تَعَدُّدِ الْحَاكِمِ عَلٰى مَا اُشِيْرَ اِلَيْهِ بِقَوْلِهٖ تَعَالٰى وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ

সহজ তরজমা

জেনে রাখুন, আল্লাহ তা'আলার বাণী لَوْكَانَ فِيْهِمَا اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا হল حُجَّةٌ اِقْنَاعِيَّةٌ বা সন্তোষমূলক দলীল। আর (মুকাদ্দাম ও তালীর মাঝে) বাধ্যবাধকতা সাধারণ রীতি অনুযায়ী। যেমনটি খেতাবী (আবেদনমূলক) দলীল-প্রমাণের ক্ষেত্রে উপযোগী। কেননা একাধিক শাসক হওয়ার সময় বিরোধ এবং একজন অপরজনের উপর বিজয়ী হওয়ার চেষ্টা (পূর্ব হতে) চলে আসছে। যেমন, এ দিকে আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ এর মধ্যে ইংগিত রয়েছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

لَوْكَانَ فِيْهِمَا الخ আয়াতটি কি হুজ্জতে কত্'ঈ না ইকনাঈ ?

উপরিউক্ত ইবারত বুঝতে হলে মনে রাখতে হবে, এ আয়াতটি হল قِيَاسِ اِسْتِثْنَائِىْ। কাজেই مُقَدَّمْ বাতিল হওয়ার ফলাফল বের হয়। قِيَاس এর ধরন নিম্নরূপ ঃ

لَوْكَانَ فِيْهِمَا اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا - لٰكِنَّ التَّالِىْ بَاطِلٌ فَالْمُقَدَّمُ مِثْلُهٗ

অর্থাৎ যদি একাধিক উপাস্য হত তাহলে আসমান ও জমীন ধ্বংস হয়ে যেত। কিন্তু تَالِى ধ্বংস হওয়া প্রকাশ পায়নি বিধায় مُقَدَّمْ অর্থাৎ একাধিক খোদা হওয়াও বাতিল।

এখন জানতে হবে, উল্লেখিত আয়াতটি একাধিক উপাস্য হওয়াকে খণ্ডনের ব্যাপারে بُرْهَانِ قَطْعِىْ (অকাট্য দলীল) যা নিশ্চিত মুকাদ্দামা দ্বারা গঠিত নাকি حُجَّتِ اِقْنَاعِىْ (সন্তোষমূলক দলীল) যা প্রবল ধারণা সৃষ্টি করে এবং দলীল বুঝে না এমন লোকেরা যার উপর সন্তুষ্ট হতে পারে ? কেউ কেউ তো উল্লেখিত আয়াতকে একাধিক উপাস্য বাতিল হওয়ার ব্যাপারে بُرْهَانِ قَطْعِىْ (অকাট্য দলীল) সাব্যস্ত করেছেন। আর শারিহ রহ. একে حُجَّتِ اِقْنَاعِيَّةْ (সন্তোষমূলক দলীল) সাব্যস্ত করছেন। বস্তুতঃ এই দুটি উক্তির মাঝে কোন বৈপরিত্য নেই। কেননা আয়াতটির بُرْهَانِ قَطْعِىْ (অকাট্য দলীল) হওয়া اِشَارَةُ النَّصِّ দ্বারা প্রমাণিত। যেমন, শারিহ রহ. নিজেই বলেছেন–

وَالْمَشْهُوْرُ فِىْ ذٰلِكَ بَيْنَ الْمُتَكَلِّمِيْنَ بُرْهَانُ التَّمَانُعِ الْمُشَارُ اِلَيْهِ
بِقَوْلِهٖ لَوْكَانَ فِيْهِمَا اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا -

স্বয়ং ইবারতের দিকে তাকালেও বুঝা যায়, এটি সন্তোষমূলক দলীল। কাজেই শারিহ রহ. এর উপর আয়াতটি একাধিক উপাস্যের نَفْى এর ক্ষেত্রে بُرْهَانِ قَطْعِىْ হওয়ার অস্বীকৃতির দোষ চাপানো যায় না।

আয়াতটি হুজ্জতে ইকনাঈ কিভাবে ?

قَوْلُهٗ وَالْمُلَازَمَةُ عَادِيَةٌ ঃ এটা আয়াতটি حُجَّتِ اِقْنَاعِيَّةْ হওয়ার দলীল। সারমর্ম হল, আয়াতের মধ্যে مُقَدَّمْ অর্থাৎ একাধিক উপাস্য আর تَالِى অর্থাৎ ধ্বংস হওয়া এর মাঝে বাধ্যবাধকতা قَطْعِىْ (নিশ্চিত) নয়। যার ভিত্তিতে আয়াতটিকে একাধিক উপাস্য نَفْى করণে حُجَّتِ قَطْعِيَّةْ সাব্যস্ত করা যায় বরং বাধ্যবাধকতা সাধারণ রীতির

উপর নির্ভরশীল, যা মানুষের শাসক একাধিক হওয়ার ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। যেখানে তারা একাধিক হয়, সেখানে সাধারণতঃ পরস্পর বিরোধ ও সংঘর্ষ হয় এবং প্রত্যেকে অন্যের উপর বিজয় লাভ করার চেষ্টায় থাকার কারণে সেখানে ধ্বংস এবং বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়। কেমন যেন একাধিক শাসক আর ধ্বংস এর মাঝে বাধ্যবাধকতা সাধারণ ব্যাপার। এমনিভাবে একাধিক মাবুদ ও ধ্বংসের মাঝে বাধ্যবাধকতা হবে। তবে এ বাধ্যবধকতা সুনিশ্চিত নয়। কেননা সাধারণ রীতির বিপরীত হওয়াও সম্ভব। হতে পারে একাধিক মাবুদ হওয়ার সত্ত্বেও তারা মানুষ শাসকের রীতির বিপরীত ঐক্যমত হওয়ায় কোন ধ্বংস ও বিশৃংখলা দেখা দিবে না। সুতরাং যখন একাধিক উপাস্য ও ধ্বংসের মাঝে বাধ্যবাধকতা قَطْعِى নয় বরং রীতিগত হওয়ায় তা যন্নী, ফলে এ আয়াতটি একাধিক উপাস্যের نَفْى বা অস্বীকৃতির ক্ষেত্রে حُجَّت قَطْعِى হবে না বরং حُجَّت اِقْنَاعِيَّه হয়ে প্রবল ধারণা সৃষ্টি করবে।

قَوْلُهٗ عَلٰى مَاهُوَ اللَّائِقُ فِى الْخِطَابِيَّاتِ ঃ خِطَابِيَّات দ্বারা ঐ সব দলীল উদ্দেশ্য, যেগুলো দ্বারা প্রবল ধারণা হয় যে, শ্রোতা আমাদের দাবী মেনে নিবে। আর قِيَاس خِطَابِى ঐ قِيَاس কে বলে, যা এমন مُقَدَّمَات দ্বারা গঠিত যা বাহ্যতঃ সাধারণ মানুষের নিকট সম্মত। এ কারণে قِيَاس خِطَابِى সাধারণ মানুষের জন্য দলীলের তুলনায় বেশী উপকারী। কেননা তার মুকাদ্দমাগুলো সাধারণ মানুষের নিকট গ্রহণযোগ্য এবং পরিচিত থাকে। অধিকাংশের তিরস্কারের ভয়ে এ মুকাদ্দমাগুলো অস্বীকার করার সাহস করতে পারে না। উক্ত কিয়াসকে قِيَاس خِطَابِى বলার কারণ হল, খতীব ও বক্তাগণ তাদের আলোচনায় এ ধরনের قِيَاس দ্বারা দলীল পেশ করে থাকেন। কেননা উদ্দেশ্য হল, জনসাধারণকে আপন দাবীতে সম্মত করা। আর এ উদ্দেশ্য এমন মুকাদ্দমা দ্বারা সহজে পূর্ণ হয়। যা মানুষের মনে বদ্ধমূল হয়।

قَوْلُهٗ عَلٰى مَا اُشِيْرَ اِلَيْهِ ঃ পূরা আয়াতটি এভাবে مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ـ

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা কাউকে সন্তান সাব্যস্ত করেননি এবং তার সাথে শরীক কোন উপাস্যও নেই। তাহলে তো প্রত্যেক উপাস্য তার সৃষ্টি নিয়ে যেতেন এবং একজন অপরজনের উপর চড়াও হতেন।

وَاِلَّا فَاِنْ اُرِيْدَ الْفَسَادُ بِالْفِعْلِ اَىْ خُرُوْجُهُمَا عَنْ هٰذَا النِّظَامِ الْمُشَاهَدِ فَمُجَرَّدُ التَّعَدُّدِ لَايَسْتَلْزِمُهٗ لِجَوَازِ الْاِتِّفَاقِ عَلٰى هٰذَا النِّظَامِ وَاِنْ اُرِيْدَ اِمْكَانُ الْفَسَادِ فَلَا دَلِيْلَ عَلٰى اِنْتِفَائِهٖ بَلِ النُّصُوْصُ شَاهِدَةٌ بِطَيِّ السَّمٰوٰتِ وَرَفْعِ هٰذَا النِّظَامِ فَيَكُوْنُ مُمْكِنًا لَامَحَالَةَ

সহজ তরজমা

নতুবা যদি (ধ্বংস দ্বারা) কার্যতঃ ধ্বংস অর্থাৎ (জমীন-আসমান) উভয়টি বর্তমান শৃংখলা থেকে বেরিয়ে পড়া উদ্দেশ্য হয়, তবে এ ব্যবস্থার উপর একমত হওয়া সম্ভব হওয়ায় ইলাহ একাধিক হওয়া সেটিকে আবশ্যক করে না। আর যদি ধ্বংস হওয়া সম্ভব বলে উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তা نَفْى হওয়ার উপর কোন দলীল নেই বরং বহু نَصّ আসমানগুলোকে গুটিয়ে দেওয়া ও এ ব্যবস্থাপনা শেষ করে দেওয়ার সাক্ষ্য দেয়। সুতরাং নিঃসন্দেহে তা সম্ভব হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

উপরিউক্ত আয়াতটিকে ইকনাঈ বলে না মানলে

ইবারতের মূল বিষয় হল, আমরা যদি উপরিউক্ত আয়াতটিকে একাধিক ইলাহের অবিদ্যমানতার জন্য দলীলে ইকনাঈ এবং মুকাদ্দাম তালীর মাঝে تَلَازُم عَادِى না মানি বরং এটাকে অকাট্য প্রমাণ এবং মুকাদ্দাম ও তালীর মাঝে تَلَازُم قَطْعِى সাব্যস্ত করি, তাহলে দলীলটি পরিপূর্ণ হবে না। কারণ, একটি প্রমাণ পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য দুটি বিষয় আবশ্যক।

এক. মুকাদ্দাম অর্থাৎ একাধিক ইলাহ হওয়া এবং তালী অর্থাৎ ফাসাদ এর মাঝে নিশ্চিত বাধ্যবাধকতা থাকা।

দুই. তালী অর্থাৎ একাধিক উপাস্য বাতিল হওয়া। যাতে এটাকে ইস্তিসনা করলে মুকাদ্দাম তথা একাধিক উপাস্য হওয়া বাতিল প্রমাণিত হয়। আর এখানে এ দুটি বিষয় অনুপস্থিত। কারণ, تَالِى অর্থাৎ আল্লাহর বাণী لَفَسَدَتَا এর মাঝে ফাসাদ দ্বারা হয়ত কার্যতঃ ফাসাদ অর্থাৎ বাস্তব ফাসাদ উদ্দেশ্য হবে অথবা ফাসাদের সম্ভাবনা উদ্দেশ্য হবে। যদি বাস্তব ফাসাদ উদ্দেশ্য হয়, তাহলে দলীল পরিপূর্ণ হওয়ার প্রথম শর্ত অর্থাৎ মুকাদ্দাম ও তালীর

মাঝে নিশ্চিত বাধ্যবাধকতা পাওয়া গেল না। কেননা শুধু একাধিক উপাস্য হিসেবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে সব উপাস্যের মাঝে বিরোধ সৃষ্টি না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ফাসাদ অবধারিত হওয়াটা নিশ্চিত নয়। কারণ, সে সব একাধিক উপাস্যের মাঝে জমীন ও আসমানের বর্তমান ব্যবস্থাপনার উপর ঐকমত্য সম্ভব। আর যদি ফাসাদ দ্বারা ফাসাদের সম্ভাবনা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে মুকাদ্দম অর্থাৎ একাধিক উপাস্য এবং তালী অর্থাৎ ফাসাদরে মাঝে تَلَازُم বা আবশ্যকীয়তা স্বীকৃত। কিন্তু দীলল পরিপূর্ণ হওয়ার দ্বিতীয় শর্ত অর্থাৎ تَالِى বাতিল বলে গণ্য হওয়া সাব্যস্ত হবে না। কেননা এ মুহূর্তে আপনি বলতে পারবেন, যদি একাধিক উপাস্যত হত, তাহলে ফাসাদ সম্ভব হত। কিন্তু ফাসাদের সম্ভাবনা বাতিল। সুতরাং একাধিক উপাস্য হওয়াও বাতিল। কেননা শরী'আতের সুস্পষ্ট প্রমাণাদি আসমান এবং বিশ্বজগতের বর্তমান ব্যবস্থাপনাকে ধ্বংস করে দেওয়ার সাক্ষ্য প্রদান করছে। যেমন– ইরশাদ হচ্ছে, يَوْمَ نَطْوِى السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ এমনিভাবে ইরশাদ হচ্ছে–

إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ.. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ... وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ

এবং إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ইত্যাদি। অতএব লক্ষ্য করুন, এ সমস্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আসমানকে গুটিয়ে ফেলা এবং তা বিদীর্ণ হওয়া, তারকাগুলো খসে পড়া, সূর্য আলোহীন হয়ে যাওয়ার সংবাদ দিয়েছেন। এ সব ফাসাদ নয় তো কি? সুতরাং ফাসাদের সম্ভাবনাকে বাতিল বলে একাধিক উপাস্যের বাতিল হওয়ার ফলাফল বের করা শুদ্ধ হবে না।

قَوْلُهُ : اَىْ خُرُوْجُهَا الخ ঃ অর্থাৎ ফাসাদ দ্বারা বাস্তবে ফাসাদ সংঘটিত হওয়া এবং যমীন ও আসমানের বর্তমান ব্যবস্থাপনা ধ্বংস হওয়া উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ : فَلَا دَلِيْلَ عَلَى انْتِفَائِهِ الخ ঃ আর যেহেতু ফাসাদের সম্ভাবনা অর্থাৎ نَقِيْض تَالِى এর অবিদ্যমানতার উপর কোন দলীল নেই বরং نُصُوْص তথা আয়াত দ্বারা ফাসাদের বাস্তবায়ন সাব্যস্থ, তাই نَقِيْض مُقَدَّم বলা এবং এর মাধ্যমে لٰكِنَّهُمَا لَمْ تَفْسُدَا بِمَعْنٰى لَمْ يَكُنْ فَسَادُهُمَا إِسْتِثْنَاء করে نَقِيْض تَالِى এর فَلَمْ تَكُنْ فِيْهِمَا اٰلِهَةٌ اِلَّا اللهُ ফল বের করা শুদ্ধ নয়।

لَا يُقَالُ الْمُلَازَمَةُ قَطْعِيَّةٌ، وَالْمُرَادُ بِفَسَادِهِمَا عَدَمُ تَكَوُّنِهِمَا بِمَعْنٰى اَنَّهُ لَوْ فُرِضَ صَانِعَانِ لَامْكَنَ بَيْنَهُمَا تَمَانُعٌ فِى الْاَفْعَالِ كُلِّهَا فَلَمْ يَكُنْ اَحَدُهُمَا صَانِعًا، فَلَمْ يُوْجَدْ مَصْنُوْعٌ، لِاَنَّا نَقُوْلُ اِمْكَانُ التَّمَانُعِ لَا يَسْتَلْزِمُ اِلَّا عَدَمَ تَعَدُّدِ الصَّانِعِ، وَهُوَ لَا يَسْتَلْزِمُ اِنْتِفَاءَ الْمَصْنُوْعِ، عَلٰى اَنَّهُ يَرِدُ مَنْعُ الْمُلَازَمَةِ اِنْ اُرِيْدَ عَدَمُ التَّكَوُّنِ بِالْفِعْلِ وَمَنْعُ اِنْتِفَاءِ اللَّازِمِ اِنْ اُرِيْدَ بِالْاِمْكَانِ،

সহজ তরজমা

এ প্রশ্ন উপস্থাপন করা যাবে না যে, تَلَازُم বা বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত এবং যমীন ও আসমানের ফাসাদ দ্বারা সেগুলোর অস্তিত্ববান হওয়া উদ্দেশ্য। এ অর্থে যে, যদি দুজন সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব মেনে নেওয়া হয়, তাহলে সমস্ত কাজে তাদের মাঝে বিরোধ সম্ভব হত। এমতাবস্থায় এ দুয়ের কেউ স্রষ্টা হতে পারতেন না এবং কোন সৃষ্টির অস্তিত্ব হত না। কেননা তখন আমরা বলব, বিরোধের সম্ভবনা শুধু একাধিক উপাস্য হওয়াকে আবশ্যক করে। কোন সৃষ্টির অস্তিত্বহীনতাকে আবশ্যক করে না। এ ছাড়াও যদি কার্যতঃ অস্তিত্বহীনতা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে বাধ্যবাধকতা স্বীকৃত না হওয়ার; যদি সম্ভাব্য অস্তিত্বহীনতা উদ্দেশ্য হয়, তবে لَازِم এর অবিদ্যমানতা স্বীকৃত না হওয়ার প্রশ্ন ওঠে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

আয়াতটি কি হুজ্জতে কতঈ হতে পারে?

উপরিউক্ত এবারতে ব্যাখ্যাতা রহ. وَاِلَّا فَاِنْ اُرِيْدَ দ্বারা আলোচ্য আয়াতকে حُجَّةٌ اِقْنَاعِيَّة এবং মুকাদ্দাম ও তালীর মাঝে স্বাভাবিক تَلَازُم না মানা অবস্থায় ফাসাদকে কার্যতঃ ফাসাদ ও সম্ভাব্য ফাসাদের মাঝে সীমিত করে দিয়ে দলীলকে অসম্পূর্ণ সাব্যস্ত করেছিলেন। সেখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় لَا يُقَالُ দ্বারা ব্যাখ্যাতা রহ. সে প্রশ্ন উত্থাপন করে لِاَنَّا نَقُوْلُ বলে তার উত্তর দিয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ ফাসাদকে কার্যতঃ ফাসাদ এবং সম্ভাব্য ফাসাদের মাঝে সীমাবদ্ধ করা শুদ্ধ নয় বরং তৃতীয় আরেকটি অর্থের সম্ভাবনাও আছে। অর্থাৎ ফাসাদ মানে অস্তিত্বহীন হওয়া। আয়াতে উদ্দেশ্য হল, যদি একাধিক উপাস্য হত, তবে যমীন ও আসমানে ফাসাদ হত অর্থাৎ যেগুলোর অস্তিত্ব হত না। কিন্তু لَازِم এবং تَالِىْ অর্থাৎ যমীন ও আসমান অস্তিত্ববান না হওয়া বাতিল। কাজেই مَلْزُوْم এবং মুকাদ্দাম অর্থাৎ একাধিক উপাস্য হওয়াও বাতিল।

এমতাবস্থায় উপরিউক্ত আয়াতটি একাধিক উপাস্যের অবিদ্যমানতার উপর অকাট্য প্রমাণ বলে সাব্যস্ত হবে এবং মুকাদ্দাম (একাধিক উপাস্য) ও তালী (ফাসাদ) এর মাঝে تَلَازُم قَطْعِى বা নিশ্চিত বাধ্যবাধকতা হবে।

قَوْلُهُ بِمَعْنٰى اَنَّهُ الخ ঃ এখানে একাধিক উপাস্য এবং ফাসাদ তথা অস্তিত্বহীনতার মধ্যে বাধ্যবাধকতার আলোচনা করা হয়েছে। সারকথা হল, যদি সৃষ্টিকর্তা দুজন হতেন, তাহলে তাদের মাঝে সমস্ত বস্তুর অস্তিত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে এভাবে বিরোধ সম্ভব হত যে, তাদের মধ্য হতে কেউ কোন বস্তুর সৃষ্টি বা অস্তিত্ব প্রদানের ইচ্ছা করলে অপরজন তাকে বাঁধা দিতেন। এমতাবস্থায় উভয়ের মধ্য হতে কেউ কোন কিছুর সৃষ্টা হতেন না। আর যখন কোন সৃষ্টাই হতেন না, তখন কোন সৃষ্ট বা মাখলূকের অস্তিত্বও হত না। অতএব যেন একাধিক সৃষ্টা নিশ্চিতভাবে বিরোধের সম্ভাবনাকে আবশ্যক করে। আর বিরোধের সম্ভাবনা সৃষ্টি জগতের অনস্তিত্বকে অর্থাৎ কোন সৃষ্টি বা মাখলূকের বিদ্যমান না হওয়াকে আবশ্যক করে। সুতরাং একাধিক উপাস্য কোন সৃষ্টি জগতের অস্তিত্বহীতাকে আবশ্যক করে বলে একাধিক উপাস্য ও ফাসাদ অর্থাৎ অস্তিত্বহীনতার মাঝে নিশ্চিত বাধ্যবাধকতা সাব্যস্ত হয়ে গেল।

উপরিউক্ত প্রশ্নের উত্তর ঃ

قَوْلُهُ : لَاَنَّا نَقُوْلُ الخ ঃ এটি উপরিউক্ত প্রশ্নেরই উত্তর। সারমর্ম হল, আপনার দাবী তথা لَوْفُرِضَ مَانِعَانِ لَاَمْكَنَ بَيْنَهُمَا تَمَانُعٌ –একাধিক উপাস্য মানলে বিরোধ সম্ভব বলে ধরে নিলাম –কথাটি ঠিক আছে এবং একাধিক উপাস্য মানলে বিরোধ সম্ভব –একথাও ঠিক আছে। আর একাধিক স্রষ্টার সম্ভবনা ও বিরোধের সম্ভাবনা যা لَازِم ও تَالِىْ অসম্ভব হওয়ার দরুন শুধু নিজ মুকাদ্দাম এবং مَلْزُوْم তথা একাধিক উপাস্যের অসম্ভাতা ও অস্তিত্বহীনতাকে আবশ্যক করে; কোন সৃষ্টি বা মাখলূকের অস্তিত্বহীনতাকে আবশ্যক করে না। কেননা সৃষ্টির অস্তিত্বহীনতার জন্য বাস্তব বিরোধ আবশ্যক। একাধিক স্রষ্টার বিদ্যমান থাকাবস্থায় বিরোধের সম্ভাবনা আবশ্যক হয়; বাস্তব বিরোধ আবশ্যক হয় না। কারণ, প্রত্যেক সম্ভাব্য বস্তু বাস্তবায়িত হওয়া জরুরী নয়।

এখানে هُوَ যমীরের মারজা কি ?

قَوْلُهُ : وَهُوَ الخ ঃ এখানে هُوَ সর্বনামটির مَرْجَع সম্পর্কে একটি সম্ভাবনা হল, اِمْكَان تَمَانُع অর্থাৎ বিরোধের সম্ভাবনা সৃষ্টির অস্তিত্বহীনতাকে আবশ্যক করে না। কেননা হতে পারে বিরোধের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও বিরোধ হবে না বরং উভয় স্রষ্টা একমত হয়ে যাবেন। দ্বিতীয়তঃ عَدَم تَعَدُّدت مَانِع এমতাবস্থায় ইবারতের উদ্দেশ্য হবে, একাধিক স্রষ্টার অস্তিত্বহীনতা সৃষ্টির অবিদ্যমানতাকে আবশ্যক করে না। কেননা একজন স্রষ্টা দ্বারা সৃষ্টি অস্তিত্ব হতে পারে।

"ফাসাদ" দ্বারা যদি অস্তিত্বহীনতা উদ্দেশ্য হয়

قَوْلُهُ : عَلٰى اَنَّهُ يَرِدُ الخ ঃ এটি উপরিউক্ত প্রশ্নে ফাসাদ দ্বারা অস্তিত্বহীনতা উদ্দেশ্য নেওয়ার উপর উথাপিত প্রশ্নের আলোচনা। প্রশ্নটির সারকথা হল, আলোচ্য আয়াতটি একাধিক উপাস্যের অবিদ্যমানতার উপর অকাট্য প্রমাণ হিসেবে সাবাস্ত হবে না এবং ফাসাদ দ্বারা অস্তিত্বহীনতা উদ্দেশ্য নিলে দলীলটি পরিপূর্ণ হবে না। কেননা দলীল পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য **প্রথমতঃ** মুকাদ্দাম (একাধিক উপাস্য) এবং তালী (ফাসাদ অর্থাৎ অস্তিত্বহীনতা) -এর মাঝে বাধ্যবাধকতা অকাট্য হওয়া আবশ্যক। **দ্বিতীয়তঃ** لَازِم এবং তালী (অর্থাৎ ফাসাদ মানে অস্তিত্বহীনতা) অবিদ্যমান হওয়া। যাতে এর اِسْتِثْنَاء দ্বারা مَلْزُوْم এবং মুকাদ্দম (অর্থাৎ একাধিক উপাস্য অবিদ্যমান হওয়া) -এর ফলে বের হয়। আর এখানে দুটি শর্তই অনুপস্থিত। কারণ, যদি ফাসাদ দ্বারা কার্যতঃ অস্তিত্বহীনতা উদ্দেশ্য হয় এবং আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হয়, "যদি একাধিক উপাস্য হত, তাহলে যমীন ও আসমানে এ অর্থে ফাসাদ হত যে, সেগুলো কার্যতঃ অস্তিত্ববান হত না"। এমতাবস্থায় মুকাদ্দম এবং উপরিউক্ত অর্থে ফাসাদের মাঝে বাধ্যবাধকতা স্বীকৃত নয়। কেননা শুধুমাত্র একাধিক উপাস্য বাস্তবে বিরোধ ব্যতিত ফাসাদের উপরিউক্ত অর্থকে আবশ্যক করে না। কারণ, একাধিক উপাস্য হওয়া অবস্থায় যদিও বিরোধ সম্ভব, তথাপি বিরোধের সম্ভাবনা ঐক্যের সম্ভাবনার

বিপরীত নয়। আর যখন ঐক্য সম্ভবনার বিপরীত নয় বরং সম্ভব তখন উপরিউক্ত অর্থে ফাসাদ আবশ্যক হবে না। আর যদি ফাসাদ দ্বারা অবিদ্যমানতার সম্ভাবনা উদ্দেশ্য হয় এবং আয়াতের উদ্দেশ্য হয়, "একাধিক উপাস্য হলে যমীন ও আসমানের ফাসাদ (অস্তিত্বহীনতা) সম্ভব হত, তাহলে বাধ্যবাধকতা স্বীকৃত হবে। কিন্তু لَازِم (অর্থাৎ অস্তিত্বহীনতার সম্ভাবনা) অবিদ্যমানতা স্বীকৃত নয়। অর্থাৎ আপনি তার اِسْتِثْنَاء করে এ কথা বলবেন, وَلٰكِنَّهُمَا لَمْ تَفْسُدَ بِمَعْنٰى لَمْ يَكُنْ عَدَمَ تَكَوُّنِهِمَا। কারণ, পূর্বোক্ত বর্ণনা অনুযায়ী আয়াত দ্বারা যমীন ও আসমানের নিছক অস্তিত্বহীনতার সম্ভবানাই নয় বরং বাস্তবায়ন চূড়ান্ত। মোটকথা, ফাসাদ দ্বারা অস্তিত্বহীনতা উদ্দেশ্য নেওয়া অবস্থায় দলীল পরিপূর্ণ হবে না।

فَاِنْ قِيْلَ مُقْتَضٰى كَلِمَةِ لَوْ اِنْتِفَاءُ الثَّانِىْ فِى الْمَاضِىْ بِسَبَبِ اِنْتِفَاءِ الْاَوَّلِ فَلَا يُفِيْدُ اِلَّا الدَّلَالَةَ عَلٰى اَنَّ اِنْتِفَاءَ الْفَسَادِ فِى الزَّمَانِ الْمَاضِىْ بِسَبَبِ اِنْتِفَاءِ التَّعَدُّدِ قُلْنَا نَعَمْ هٰذَا بِحَسَبِ اَصْلِ اللُّغَةِ لٰكِنْ قَدْ يُسْتَعْمَلُ بِالْاِسْتِدْلَالِ بِاِنْتِفَاءِ الْجَزَاءِ عَلٰى اِنْتِفَاءِ الشَّرْطِ مِنْ غَيْرِ دَلَالَةٍ عَلٰى تَعْيِيْنِ زَمَانٍ كَمَا فِىْ قَوْلِنَا لَوْ كَانَ الْعَالَمُ قَدِيْمًا لَكَانَ غَيْرَ مُتَغَيِّرٍ وَالْاٰيَةُ مِنْ هٰذَا الْقَبِيْلِ وَقَدْ يَشْتَبِهُ عَلٰى بَعْضِ الْاَذْهَانِ اَحَدُ الْاِسْتِعْمَالَيْنِ بِاٰخَرَ فَيَقَعُ الْخَبْطُ

সহজ তরজমা

অতঃপর যদি প্রশ্ন করা হয়, لَوْ শব্দের চাহিদা হল, প্রথমটি অর্থাৎ শর্ত না পাওয়া যাওয়ার কারণে দ্বিতীয়টি অর্থাৎ جَزَاء-এর অনস্তিত্ব। সুতরাং لَوْ শব্দটি কেবল অতীতকালে না পাওয়া বা অস্তিত্বহীন হওয়ার কারণে ফাসাদ না হওয়া বুঝায়। প্রতিউত্তরে আমরা বলব, আভিধানিক অর্থে لَوْ শব্দের চাহিদা এটাই। কিন্তু কখনও (এ لَوْ শব্দটির) কোন কালের সম্পৃক্ততা ব্যতিত جَزَاء না পাওয়া বা তার অস্তিত্বহীনতার কারণে শর্ত না পাওয়া বা তার অস্তিত্বহীনতার উপর প্রমাণ স্বরূপও ব্যবহৃত হয়। যেমন, আমাদের উক্তি لَوْكَانَ الْعَالَمُ قَدِيْمًا لَكَانَ غَيْرَ مُتَغَيِّرٍ এর মধ্যে। আয়াতটি এরই অন্তর্ভুক্ত। কোন কোন সময় কারও কারও নিকট একটি ব্যবহার অপর ব্যবহারের সাথে জট পাকিয়ে যায়। যদ্দরুন বিষয়টি এলোমেলো হয়ে যায়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

لو শব্দের প্রয়োগ নিয়ে প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ঃ উপরিউক্ত আয়াত لَوْكَانَ فِيْهِمَا اٰلِهَةٌ এর মধ্যে হরফে শর্ত لَوْ রয়েছে। যা ব্যাকরণবিদদের বর্ণনা মতে প্রথমটি অর্থাৎ شَرْط না পাওয়া যাওয়ার কারণে অতিতকালে দ্বিতীয়টি অর্থাৎ جَزَاء না পাওয়া বুঝায়। যেমন, কোন ব্যক্তি বলল– لَوْجِئْتَنِىْ لَاَكْرَمْتُكَ "যদি আমার নিকট তুমি আসতে, তাহলে আমি তোমার সম্মান করতাম।" এ উক্তিটির স্পষ্ট অর্থ হচ্ছে, তোমার না আসার কারণে অতিতকালে আমার পক্ষ হতে তোমাকে সম্মান করা হয়নি। সে মতে لَوْكَانَ فِيْهَا اٰلِهَةٌ এর অর্থ হল, যদি একাধিক উপাস্য হত, তবে ফাসাদ হত। কিন্তু একাধিক উপাস্য ছিল না বিধায় ফাসাদ হয়নি।

অতএব আয়াতের মধ্যে لَوْ শব্দটি একাধিক উপাস্য না হওয়ার দরুন ফাসাদ না হওয়ার উপর দালালত করে। ফলে اِنْتِفَاء فَسَاد এর উপর اِنْتِفَاء تَعَدُّد اٰلِهَه দলীল হল; স্বয়ং اِنْتِفَاء اٰلِهَه এর উপর কোন প্রমাণ নেই। অথচ আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হল, اِنْتِفَاء تَعَدُّد اٰلِهَه তথা একাধিক উপাস্যের বিদ্যমান না হওয়ার পক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করা। মোটকথা, উপরিউক্ত আলোচনার দ্বারা বুঝা গেল, প্রশ্নের দুটি অংশ আছে।

এক. لَوْ শব্দটি اِنْتِفَاء اَوَّل এর কারণে اِنْتِفَاء ثَانِى অর্থাৎ প্রথমটি বিদ্যমান না হওয়ার কারণে দ্বিতীয়টি বিদ্যমান না হওয়া প্রমাণ করে। **দুই.** অতিতকালে দ্বিতীয়টির বিদ্যমান না হওয়া বুঝায়।

জবাব ঃ উত্তরের মধ্যে প্রশ্নের এ উভয় অংশের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। সারমর্ম হল, এ কথা স্বীকৃত যে لَوْ শব্দটির মূল এবং আভিধানিক সেটিই, যা আপনি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কখনও কখনও (لَوْ শব্দটি) এর বিপরীত

ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ দ্বিতীয়টির না হওয়ার কারণে প্রথমটি না হওয়া বুঝায়। অথচ প্রথমটি না হওয়া কোন কালের সাথে শর্তযুক্ত হয় না। যেমন, আমাদের উক্তি لَوْكَانَ الْعَالَمُ قَدِيْمًا لَكَانَ غَيْرَ مُتَغَيِّرٍ "যদি বিশ্বজগত প্রাচীন হত, তাহলে অপরিবর্তনশীল হত না।" এর স্পষ্ট অর্থ হল, জগত অপরিবর্তনশীল নয় বরং পরিবর্তনশীল। এতে বুঝা গেল, জগত প্রচীন নয়। এখানে লক্ষ্য করুন, দ্বিতীয় বিষয় অর্থাৎ অপরিবর্তনশীল নয় –এটাকে দলীল বানানো হয়েছে প্রথম বিষয় অর্থাৎ প্রচীন না হওয়ার ওপর।

এমনিভাবে আয়াতের মধ্যে لَوْ শব্দটি اِنْتِفَاء ثَانِى এর কারণে اِنْتِفَاء اَوَّل বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। আয়াতের অর্থ হল, যদি একাধিক উপাস্য হত তাহলে ফাসাদ হত। কিন্তু ফাসাদা হয়নি। এতে বুঝা যায়, একাধিক উপাস্য নেই। উত্তরের সারমর্ম হল, (لَوْ শব্দটির) মূল অর্থ, একটি আর ব্যবহৃত অর্থ আরেকটি। এ পার্থক্যটুকু না জানার কারণে অনেকে ধোঁকার শিকার হন।

اَلْقَدِيْمُ هٰذَا تَصْرِيْحٌ بِمَا عُلِمَ اِلْتِزَامًا اِذِ الْوَاجِبُ لَايَكُوْنُ اِلَّا قَدِيْمًا اَىْ لَا اِبْتِدَاءَ لِوُجُوْدِهٖ اِذْ لَوْكَانَ حَادِثًا مَسْبُوْقًا بِالْعَدَمِ لَكَانَ وُجُوْدُهٗ مِنْ غَيْرِهٖ ضَرُوْرَةً حَتّٰى وَقَعَ فِىْ كَلَامِ بَعْضِهِمْ اَنَّ الْوَاجِبَ وَالْقَدِيْمَ مُتَرَادِفَانِ لٰكِنَّهٗ لَيْسَ بِمُسْتَقِيْمٍ لِلْقَطْعِ بِتَغَائُرِ الْمَفْهُوْمَيْنِ وَاِنَّمَا الْكَلَامُ فِى التَّسَاوِىْ بِحَسْبِ الصِّدْقِ فَاِنَّ بَعْضَهُمْ عَلٰى اَنَّ الْقَدِيْمَ اَعَمُّ مِنَ الْوَاجِبِ لِصِدْقِهٖ عَلٰى صِفَاتِ الْوَاجِبِ بِخِلَافِ الْوَاجِبِ فَاِنَّهٗ لَايَصْدُقُ عَلَيْهَا وَلَا اِسْتِحَالَةَ فِىْ تَعَدُّدِ الصِّفَاتِ الْقَدِيْمَةِ وَاِنَّمَا الْمُسْتَحِيْلُ تَعَدُّدُ الذَّوَاتِ الْقَدِيْمَةِ .

সহজ তরজমা

(জগত স্রষ্টা) সুপ্রাচীন। ইতোপূর্বে যে বিষয়টি অবধারিতভাবে জানা গেল, এটি মূলতঃ সে বিষয়েরই স্পষ্ট বিবরণ। কেননা অপরিহার্য সত্তা সর্বদা সুপ্রাচীনই হবেন। অর্থাৎ যার অস্তিত্বের কোন সূচনা নেই। কারণ, অপরিহার্যটির সত্ত্বা যদি কোন এককালে অস্তিত্বহীন থাকেন, তাহলে অবশ্যই তাঁর অস্তিত্ব অন্যের দ্বারা অর্জিত হবে। এমনকি কোন কোন মাশায়েখের কালামে উল্লেখ আছে যে, وَاجِب (অপরিহার্য সত্তা) এবং قَدِيْم (সুপ্রাচীন) শব্দ দুটি সমার্থক। কিন্তু শব্দদ্বয়ের অর্থের মধ্যে নিশ্চিত পার্থক্য থাকার কারণে একথাটি সঠিক নয়। আর আমাদের আলোচনা হল, বাস্তবতার নিরিখে শব্দদ্বয়ের تَسَاوِىْ তথা সমার্থ প্রদানের ব্যাপারে। কেননা কারও কারও মতে অপরিহার্য সত্ত্বার সিফাতের ক্ষেত্রে قَدِيْم শব্দটি প্রযোজ্য হওয়ার কারণে শব্দটি ব্যাপক। এর বিপরীত হল, وَاجِب শব্দটি। কারণ, এটি সিফাতে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। পক্ষান্তরে صِفَات قَدِيْم বা সুপ্রাচীন গুণাবলী একাধিক হওয়া অসম্ভব নয়। অসম্ভব কেবল ذَوَات قَدِيْمَه বা সুপ্রাচীন সত্তা একাধিক হওয়া।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এটি তার সুস্পষ্ট বিবরণ

قَوْلُهٗ : هٰذَا تَصْرِيْحٌ الخ ঃ ইতোপূর্বে ব্যাখ্যতা রহ. গ্রন্থকারের উক্তি وَالْمُحْدِثُ لِلْعَالَمِ هُوَ اللّٰهُ تَعَالٰى এর মধ্যে اَللّٰهُ শব্দের ব্যাখ্যা দিয়েছেন وَاجِبُ الْوُجُوْد বা অপিরিহার্য সত্তা দ্বারা। সুতরাং وَاجِبُ الْوُجُوْد আল্লাহ শব্দের مَوْضُوْعٌ لَهٗ বা মূল অর্থ হল। আর যেহেতু وَاجِبُ الْوُجُوْد বা অপরিহার্য সত্তা বলে এমন এক সত্তাকে, যার অস্তিত্ব সত্তাগত, অন্য কারও অস্তিত্বের ফল নয় –এ হিসাবে তার জন্য আবশ্যক হল, তার অস্তিত্বের কোন সূচনা থাকবে না যে, পূর্বে সে অস্তিত্বহীন ছিল। নতুবা ইতোপূর্বে অস্তিত্বহীনতার দরুন সে নশ্বর হয়ে যাবে। আর সে মুহূর্তে তার অস্তিত্ব সত্তাগত হবে না বরং তার অস্তিত্ব হয়ে যাবে অন্যের অস্তিত্বের ফল। কিন্তু যেহেতু وَاجِبُ الْوُجُوْد এর জন্য আবশ্যক হল, তার অস্তিত্বের সূচনা না থাকা। আর যার অস্তিত্বের সূচনা থাকে না সেটি قَدِيْم বা প্রাচীন হয়। এতে বুঝা গেল, وَاجِبُ الْوُجُوْد যেটি اَللّٰهُ শব্দের অর্থ তার জন্য আবশ্যক হল قَدِيْمٌ বা সুপ্রাচীন হওয়া।

অতএব মুসান্নিফের উক্তি وَالْمُحْدِثُ لِلْعَالَمِ هُوَ اللّٰهُ تَعَالٰى এর মধ্যে اَللّٰهُ শব্দের মূল অর্থ وَاجِبُ الْوُجُوْدِ বা অপরিহার্য সত্তা বুঝানো دَلَالَتْ مُطَابِقِىْ এবং মূল অর্থের لَازِم (কদীম) বুঝানো دَلَالَتْ اِلْتِزَامِىْ। অতঃপর মুসান্নিফ রহ. যখন اَلْقَدِيْمُ কে اَللّٰهُ শব্দের সিফাত হিসেবে উল্লেখ করেছেন, এতে বুঝা গেল, যে বিষয়টি اَللّٰهُ শব্দ দ্বারা ইতোপূর্বে اِلْتِزَامِىْ তথা আবশ্যকীয়ভাবে জানা গিয়েছিল, এটি তারই সুস্পষ্ট বিবরণ।

কিভাবে আল্লাহ শব্দ থেকে সুপ্রাচীনতা বুঝা যায়

قَوْلُهُ : اِذِ الْوَاجِبُ لَايَكُوْنُ الخ ঃ এটি اَللّٰهُ শব্দ থেকে قَدِيْم বা সুপ্রাচীন অবধারিতভাবে পরিজ্ঞাত হওয়ার প্রমাণ। সারমর্ম হল, اَللّٰهُ শব্দের মূল অর্থ অর্থাৎ وَاجِبُ الْوُجُوْد এর জন্য قَدِيْم বা প্রাচীন হওয়া আবশ্যক। আর اَللّٰهُ শব্দ থেকে এর আবশ্যক হওয়ার জ্ঞান হয় অবধারিতভাবে বা ইলতিযামী ভাবে –এ হিবেবে اَللّٰهُ শব্দ দ্বারা قَدِيْم বা প্রাচীন হওয়ার ইলম اِلْتِزَامِى বা বাধ্যতামূলক।

قَوْلُهُ : اَيِ الَّا اِبْتِدَاءِ الْوُجُوْدِه الخ ঃ এটি قديم শব্দের ব্যাখ্যা। অন্য ভাষায় قَدِيْم বা প্রাচীন এমন একটি বস্তু, পূর্বে যার অস্তিত্ব ছিল না।

قَوْلُهُ : اَوْ لَوْكَانَ حَادِثًا الخ ঃ এটি اَللّٰهُ শব্দের মূল অর্থ তথা وَاجِبُ الْوُجُوْد এর জন্য قَدِيْم বা প্রাচীন لَازِم হওয়ার প্রমাণ। অর্থাৎ وَاجِبُ الْوُجُوْد যদি قَدِيْم না হয়ে حَادِث তথা কোন কালে অস্তিত্বহীন হয় অর্থাৎ তার অস্তিত্বের এমন কোন সূচনা থাকে, যার পূর্বে সে অস্তিত্বহীন ছিল, তাহলে সেটি وَاجِبُ الْوُجُوْدِ থাকবে না। কারণ, অস্তিত্বহীনের وُجُوْد বা অস্তিত্ব সত্তাগত নয় বরং অন্যের অস্তিত্বের ফল। অথচ وَاجِبُ الْوُجُوْد-এর অস্তিত্ব সত্তাগত।

নশ্বরতার প্রমাণ

قَوْلُهُ : مَسْبُوْقًا بِالْقَدِيْمِ الخ ঃ এটা حَادِث তথা নশ্বরের ব্যাখ্যা। এ ব্যাখ্যার দ্বারা এ বিষয়ে সতর্ক করা উদ্দেশ্য যে, حَادِث দ্বারা দার্শনিকদের পরিভাষা উদ্দেশ্য নয়। কারণ, তাদের নিকট حَادِث দ্বারা উদ্দেশ্য এমন বস্তু, যা স্বীয় অস্তিত্বে অন্যের মুখাপেক্ষী। যদিও সেটি কোন কালে অস্তিত্বহীন না থাকুক। যেমন, عَالَم বা জগত তাদের নিকট এ অর্থে حَادِث যে, সেটি তার অস্তিত্বে আল্লাহ তা'আলার মুখাপেক্ষী। কিন্তু পূর্বে তার অস্তিত্বহীনতা ছিল না। এ দিকে লক্ষ্য করে বিশ্বজগত তাদের নিকট قَدِيْم بِالزَّمَانِ বা কাল হিসাবে প্রাচীন।

অপরিহার্য সত্তার সুপ্রাচীনতার চূড়ান্ত প্রমাণ

قَوْلُهُ : حَتّٰى وَقَعَ فِى كَلَامِ بَعْضِهِمْ الخ ঃ এটি ব্যাখ্যতা রহ. এর উক্তি اِذِ الْوَاجِبُ يَكُوْنُ اِلَّا قَدِيْمًا এর চূড়ান্ত দলীল। অর্থাৎ واجب বা অপরিহার্য সত্তার জন্য قَدِيْم বা প্রাচীন হওয়া এত শক্তিশালী যে, কেউ কেউ এ দুটিকে এক মনে করে প্রতিশব্দ বলে ফেলেছেন। অবশ্য তাদের এ কথা সঠিক নয়। কেননা দুটি শব্দ সমার্থবোধক প্রতিশব্দ হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হল, দুটির অর্থ এক হওয়া। আর এখানে وَاجِب ও قَدِيْم দুটির অর্থ এক নয় বরং একটি অপরটি থেকে ভিন্ন। কেননা وَاجِب অর্থ হল; তার অস্তিত্ব সত্তাগত অন্যের অস্তিত্বের ফল নয়। পক্ষান্তরে قَدِيْم অর্থ হল, সেটি কোন কালে অস্তিত্বহীন নয় অর্থাৎ তার অস্তিত্বের কোন সূচনা নেই বা সেটি অনাদি।

ওয়াজিব এবং কাদীম -এর বাস্তব ব্যবহার

قَوْلُهُ وَاِنَّمَا الْكَلَامُ الخ ঃ ইতোপূর্বে দুটি শব্দের সামার্থবোধকতার উক্তি খণ্ডন করা হয়েছে। তাই এখন তিনি বলছেন, মূল আলোচনা আসলে تَسَاوِى فِى الصِّدْق সংক্রান্ত অর্থাৎ ওয়াজিব এবং কাদীম শব্দদ্বয়ের মাঝে বাস্তব প্রয়োগ হিসাবে সমতা রয়েছে কি না? দুটি জিনিসের মধ্যে সমতা থাকার অর্থ হল, এ দুটোর মধ্যে একটি যে জিনিসের উপর প্রয়োগ করা হয়, দ্বিতীয়টিও বাস্তবে তার ক্ষেত্রে প্রয়োগ হবে। যদিও উভয়টির আভিধানিক অর্থ ভিন্ন। যেমন, ইনসান এবং নাতিক -এর আভিধানিক অর্থ ভিন্ন। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দুটির প্রয়োগ একটির উপরই হয়। যে সব বস্তুর উপর ইনসান প্রয়োগ হয়, সেগুলোর ক্ষেত্রে নাতিক শব্দটিও বাস্তবে প্রয়োগ হয়।

ওয়াজিব ও কদীম শব্দের নিসবত

قَوْلُهُ فَاِنَّ بَعْضَهُمْ ذَهَبُوْا الخ ঃ এখানে শারে রহ. ওয়াজিব এবং কাদীমের মাঝে নিসবত সম্পর্কে মাশায়েখের মতবিরোধের বিবরণ দিয়েছেন। কেউ কেউ বলেছেন, بَعْضُهُمْ শব্দ দ্বারা এখানে জুমহূর উদ্দেশ্য। অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মতে উক্ত শব্দদ্বয়ের মাঝে عُمُوم خُصُوص مُطْلَق এর নিসবত। অর্থাৎ কাদীম শব্দটি আম। কারণ, এটি যেরূপ আল্লাহ সত্তার উপর প্রয়োগ হয়, তদ্রূপ সিফাতে ওয়াজিবের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ হয়। অর্থাৎ ওয়াজিব সত্ত্বা এবং গুণাবলি সবগুলোই কাদীম বা সুপ্রাচীন। কিন্তু ওয়াজিব শব্দটি এর পরিপন্থী। শুধু অপরিহার্য

সত্তার ক্ষেত্রেই এর প্রয়োগ হয়; সিফাতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয় না। কারণ, যদি স্রষ্টার সত্তার ন্যায় সিফাতের ক্ষেত্রেও ওয়াজিব প্রয়োগ হত, তাহলে একাধিক অপরিহার্য সত্তা হওয়া আবশ্যক হত। যা একত্ববাদের সম্পূর্ণ বিরোধী। কারণ, তাওহীদের অর্থ হল, অপরিহার্য সত্তা শুধু একজনই।

قَوْلُهُ: وَلَا اِسْتِحَالَةَ .... الخ ঃ এটি একটিই উহ্য প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্নটি হল, যদি ওয়াজিব শব্দটি আল্লাহর সিফাতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ ঠিক না হয়। কেননা তাতে একাধিক ওয়াজিব সত্তার অস্তিত্ব আবশ্যক হয়ে পড়ে। অথচ তা তাওহীদের পরিপন্থী। তবে তো কাদীম শব্দের প্রয়োগও সিফাতের ক্ষেত্রে না হওয়া দরকার। অন্যথায় একাধিক সুপ্রাচীন সত্তার অস্তিত্ব অবশ্যক হয়ে পড়বে। যেটি তাওহীদের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। উত্তরের সারকথা হল, অসম্ভব হল একাধিক সুপ্রাচীন সত্তার অস্তিত্ব। সিফাতকে কাদীম বা সুপ্রাচীন মানার কারণে তা আবশ্যক হয় না বরং একাধিক সিফাতে কাদীমা আবশ্যক হয়। আর এটা অসম্ভব নয়।

وَفِيْ كَلَامِ بَعْضِ الْمُتَاَخِّرِيْنَ كَالْاِمَامِ حَمِيْدِ الدِّيْنِ الضَّرِيْرِيِّ رَحِمَهُ اللّٰهُ وَمَنْ تَبِعَهُ تَصْرِيْحٌ بِاَنَّ الْوَاجِبَ الْوُجُوْدَ لِذَاتِهِ هُوَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَصِفَاتُهُ وَاسْتَدَلُّوْا عَلٰى اَنَّ كُلَّ مَاهُوَ قَدِيْمٌ فَهُوَ وَاجِبٌ لِذَاتِهِ بِاَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا لِذَاتِهِ لَكَانَ جَائِزَ الْعَدَمِ فِيْ نَفْسِهِ فَيَحْتَاجُ فِيْ وُجُوْدِهِ اِلٰى مُخَصِّصٍ فَيَكُوْنُ مُحْدَثًا اِذْلَا نَعْنِيْ بِالْمُحْدَثِ اِلَّا مَايَتَعَلَّقُ وُجُوْدُهُ بِاِيْجَادِ شَيْئٍ اٰخَرَ .

সহজ তরজমা

পরবর্তী যুগে কোন কোন আলেম যেমন ইমাম হামীদুদ্দীন যরীরী এবং তাঁর অনুসারীগণের কথায় এ বিষয়ে সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, وَاجِبُ الْوُجُوْدِ لِذَاتِهِ (সত্ত্বাগতভাবে অপরিহার্য) হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা ও তার সিফাত। আর যে বস্তু قَدِيْم হবে, সেটি ওয়াজিব হবে –এ ব্যাপারে তাঁরা প্রমাণ দিয়েছেন, যদি সেটি وَاجِب না হয়, তাহলে সেটি সত্তাগতভাবে সম্ভাব্য হবে। ফলে সেটি আপন অস্তিত্বে مُخَصِّصٌ وَمُرَجِّحٌ (প্রধান্যদাতা ও বিশিষ্টকারী) এর মুখাপেক্ষী হবে এবং নশ্বর হবে। কেননা مُحْدَثْ দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য কেবল এরূপ সত্তা, যেটির অস্তিত্ব অন্যের অস্তিত্ব দানের সাথেই সংশ্লিষ্ট। যার ফলে সে সত্তাটি অস্তিত্ব লাভ করে থাকে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

ওয়াজিব ও কাদীমের মধ্যকার নিসবত সম্পর্কে দ্বিতীয় মতঃ এ মতটি ইমাম হামীদুদ্দীন যরীরী রহ. এবং তাঁর অনুসারীদের। তাদের মতে وَاجِبُ الْوُجُوْدِ এবং কাদীমের মাঝে সম্পর্ক হল, تَسَاوِى এর। কারণ, যেরূপভাবে আল্লাহর সত্তা এবং গুণাবলী উভয়টিই কদীম বা সুপ্রাচীন, তদ্রূপ وَاجِبُ الْوُجُوْد আল্লাহর সত্তা এবং গুণাবলী উভয়টি। কারণ, বাস্তব ক্ষেত্রে দুটোই এক। অতএব এতদুভয়ের মাঝে تَسَاوِىْ এর সম্পর্ক।

যেটি কদীম সেটি ওয়াজিবও বটে

قَوْلُهُ وَاسْتَدَلُّوْا عَلٰى اَنَّ كُلَّ ঃ অনুজ আলিমদের মতে ওয়াজিব এবং কাদীমের মাঝে تَسَاوِى এর সম্পর্ক বিদ্যমান। একটি অপরটির সমস্ত শাখার উপর প্রযোজ্য হয়। অতএব প্রতিটি ওয়াজিব কাদীম হবে এবং প্রতিটি কাদীম হবে ওয়াজিব। কিন্তু প্রতিটি ওয়াজিবের কাদীম হওয়া প্রথম দল জমহূরের মতেও স্বীকৃত। কারণ, ওয়াজিব তাদের মতে কাদীম অপেক্ষা اَخَصّ। আর اَخَصّ এর প্রতিটি فَرْد এর উপর اَعَمّ প্রয়োগ হয়। তাই তাদের মতেও প্রতিটি ওয়াজিব এর জন্য কাদীম হওয়া স্বীকৃত। এ কারণে প্রতিটি ওয়াজিবের জন্য কাদীম হওয়ার প্রক্ষ প্রমাণ পেশ করেননি। কিন্তু প্রথম দলটির নিকট ওয়াজিবের তুলনায় কাদীম ব্যাপক। আর عَام এর প্রত্যেকটি فرد এর উপর খাস এর পয়োগ হয় না। এজন্য প্রতিটি কাদীমের জন্য ওয়াজিব হওয়া তাদের মতে স্বীকৃত নয়। বিধায় প্রতিটি কাদীমের জন্য ওয়াজিব হওয়া আবশ্যক এর সমর্থনে দলীল পেশ করেছেন। দলীলের সারমর্ম হল, যদি প্রতিটি কাদীম ওয়াজিব না হয়, তাহলে সম্ভব্য বস্তু হবে, যার অস্তিত্ব এবং অনস্তিত্ব উভয়ই সমান। অতএব সেটি অস্তিত্বহীনতা থেকে বেরিয়ে অস্তিত্বের দিকে আসার জন্য কোন مُخَصِّص বা বিশিষ্টকারী এবং প্রাধান্যদানকারীর মুখপেক্ষী হবে, যেটি তার অস্তিত্বকে অনস্তিত্বের উপর প্রাধান্য দিয়ে তাকে মওজুদ করবে। এমতাবস্থায় সেটি আর অবিনশ্বর থাকবে না বরং নশ্বর হয়ে যাবে। আর কাদীম জিনিসের জন্য নশ্বর হওয়া বাতিল। এ ভ্রান্ততা আবশ্যক

হয়েছে কাদীমকে সম্ভাব্য বস্তু বলে মেনে নেওয়ার কারণে। অতএব কাদীমের জন্য সম্ভাব্য বস্তু হওয়া বাতিল। সুতরাং প্রমাণিত হল, كُلُّ مَاهُوَقَدِيْمٌ فَهُوَ وَاجِبٌ অর্থাৎ প্রতিটি কাদীম ওয়াজিব।

ثُمَّ اعْتَرَضُوا بِاَنَّ الصِّفَاتِ لَوْ كَانَتْ وَاجِبَةً لِذَاتِهَا لَكَانَتْ بَاقِيَةً وَالْبَقَاءُ مَعْنًى فَيَلْزَمُ قِيَامُ الْمَعْنَى بِالْمَعْنَى فَاَجَابُوْا بِاَنَّ كُلَّ صِفَةٍ فَهِىَ بَاقِيَةٌ بِبَقَاءٍ هُوَ نَفْسُ تِلْكَ الصِّفَةِ وَهٰذَا كَلَامٌ فِىْ غَايَةِ الصُّعُوْبَةِ فَاِنَّ الْقَوْلَ بِتَعَدُّدِ الْوَاجِبِ لِذَاتِهِ مُنَافٍ لِلتَّوْحِيْدِ وَالْقَوْلُ بِاِمْكَانِ الصِّفَاتِ يُنَافِى قَوْلَهُمْ بِاَنَّ كُلَّ مُمْكِنٍ فَهُوَ حَادِثٌ

সহজ তরজমা.

সিফাতকে যারা ওয়াজিব বলেন, তাদের স্ববিরোধী প্রশ্নোত্তর

এরপর সে সব অনুজ আলিমগণ স্বয়ং নিজেদের বিরুদ্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, সিফাত যদি ওয়াজিব হয়, তবে তো অবশ্যই সেগুলো স্থায়ী হবে। আর بَقَاء বা স্থায়িত্ব হল, একটি مَعْنَى (আপাতন)। কাজেই নিশ্চিত একটি مَعْنَى অপর একটি مَعْنَى এর সাথে কায়েম হবে। এটা তো অসম্ভব। তারপর তাঁরা নিজেরাই উত্তর দিয়েছেন, আল্লাহ তা'আলার প্রতিটি সিফাত এরূপ بَقَاء (স্থায়িত্ব) এর সাথে গুণান্বিত হয়ে স্থায়ী, যে بَقَاء সে সিফাতটির عَيْن বা হুবহু বস্তু। বস্তুতঃ এ বিষয়টি অত্যন্ত জটিল। কারণ, একাধিক ওয়াজিব (অপরিহার্য সত্তা) হওয়ার উক্তিটি একত্ববাদের বিরোধী। আর সিফাত সম্ভাব্য হওয়ার উক্তিটি কালাম শাস্ত্রবিদদের মূলনীতি كُلُّ مُمْكِنٍ حَادِثٌ এর পরিপন্থী।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

প্রশ্ন ঃ সিফাতকে যারা ওয়াজিব মনে করেন, তারা নিজেরাই নিজেদের উপর একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। আবার তার উত্তরও দিয়েছেন। প্রথমে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, যে বস্তু স্বাধিষ্ঠ হবে না বরং কোন গুণবিশিষ্ট বস্তু এবং স্থানের সাথে মিলিত হয়ে অস্তিত্ব লাভ করবে, সংশ্লিষ্ট বস্তু থেকে পৃথক হয়ে তার অস্তিত্ব হবে না, মুতাকাল্লিমীন এটাকে مَعْنَى এবং দার্শনিকরা আরয বা আপাতন বলেন। আর আল্লাহ তা'আলার সিফাতগুলোও স্বীয় অস্তিত্বে তার مَوْصُوْف তথা আল্লাহর সত্তার দিকে মুখাপেক্ষী হওয়ার কারণে স্বাধিষ্ঠ নয়। এ কারণে সেগুলো مَعْنَى (আপতন) এর অন্তর্ভুক্ত। এখন মূল প্রশ্নের প্রতি লক্ষ্য করুন।

প্রশ্নটি হল, ধরুন! আমরা সিফাতগুলোকে ওয়াজিব বললাম। কেননা ওয়াজিবের অনস্তিত্ব অসম্ভব। সেটি স্থায়ী থাকা জরুরী, তাহলে সিফাত যেটি مَعْنَى এর অন্তভূর্ক্ত সেটাও স্থায়ী থাকবে। যেরূপভাবে কোন ব্যক্তির আলেম হওয়ার অর্থ, ইলম গুণটি তার সাথে প্রতিষ্ঠিত হবে, জাহেল হওয়ার অর্থ, মুর্খতার গুণটি তার সাথে প্রতিষ্ঠিত হবে অর্থাৎ কোন সত্তার উপর কোন ১টি مُشْتَق (নিস্পন্ন) শব্দের প্রয়োগ এ কথাই বুঝায় যে, সে শব্দের ক্রিয়ামূল তার সাথে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। সে মতে সিফাত যেটি مَعْنَى এর অন্তর্ভুক্ত, এর স্থায়ীত্বের অর্থ হল, بَقَاء যেটি একটি আপতন এবং সিফাত, সে গুণাবলীর সাথে প্রতিষ্ঠিত। অতএব قِيَامُ الْمَعْنَى بِالْمَعْنَى আবশ্যক হয়ে পড়বে। অথচ তা অসম্ভব, যেমন قِيَامُ الْعَرَضِ بِالْعَرَضِ অসম্ভব। অবশ্য উভয়টির অসম্ভাব্যতার কারণ একটিই। সেটি পরবর্তীতে মুছান্নিফের উক্তি لَيْسَ بِعَرَضٍ এর ব্যাখ্যায় অত্যাসন্ন।

উত্তর ঃ قَوْلُهُ فَاَجَابُوْا ...الخ ঃ জবাবটি হচ্ছে, قِيَامُ الْمَعْنَى بِالْمَعْنَى এর জন্য দুটি জিনিস আবশ্যক। **এক.** قَائِم (প্রতিষ্ঠিত)। **দুই.** مَاقَامَ بِهِ (যে বস্তুর সাথে প্রতিষ্ঠা লাভ করে সেটি)। এখানে بَقَاء صِفَات এর মধ্যে সে দুটি জিনিস নেই। কেননা, সিফাত এবং সেগুলোর بَقَاء বা স্থায়িত্ব দুটি একই বস্তু। উক্ত সিফাতগুলো থেকে অতিরিক্ত ও বহির্ভূত অন্য কোন বস্তু নয়। বস্তুতঃ আল্লাহর গুণাবলীর স্থায়ীত্ব হুবহু সিফাতই। এগুলোর একটিকে অপরটি থেকে ভিন্ন মনে করে তন্মধ্যে একটি অর্থাৎ بَقَاء কে قَائِم আর দ্বিতীয়টি অর্থাৎ সিফাতকে مَاقَامَ بِهِ সাব্যস্ত করা এবং قِيَامُ الْمَعْنَى بِالْمَعْنَى এর হুকুম লাগনো শুদ্ধ নয়। কারণ, এ দুটিতে বৈপরিত্ব আবশ্যক।

قَوْلُهُ وَهٰذَا كَلَامٌ الخ ঃ সাধারণতঃ শারেহগণ هٰذَا শব্দের مُشَارٌ اِلَيْهِ সাব্যস্ত করেছেন কালামে

মুতাআখখিরীনকে। কিন্তু পরবর্তী এবারতটির প্রতি লক্ষ্য করলে ওয়াজিব এবং কাদীমের মাঝে নিসবত সংক্রান্ত প্রাগুক্ত আলোচনাকেই مُشَارٌ اِلَيْه সাব্যস্ত করা বিশুদ্ধ মনে হয়। এতে জুমহুর এবং মুতাআখখিরীন উভয়ের মাযহাবের কথাই এসে গেছে। এখানে জটিলতার কারণ প্রসঙ্গে শারেহ রহ. নিজেই বলেছেন, মুতাআখখিরীন মাযহাবের প্রতি লক্ষ্য করলে ওয়াজিব ও কাদীম এর মাঝে تَسَاوِى এর সম্পর্ক সাব্যস্ত করে সিফাতকে ওয়াজিব বলা হয়। এমতাবস্থায় একাধিক ওয়াজিবের প্রবক্তা হতে হয়। অথচ একাধিক ওয়াজিব থাকার উক্তি করা তাওহীদের বিপরীত। আবার জুমহূরের মাযহাব মতে কাদীমকে عَام এবং ওয়াজিবকে আল্লাহর সত্তার সাথে خَاص বলে মেনে নিলে তা হবে মুতাকাল্লিমীনের উক্তি "প্রতিটি সম্ভাব্য বস্তু নশ্বর" এর পরিপন্থী। কারণ, এ উক্তি মুতাবিক সিফাতগুলো নশ্বর হবে। অথচ সেগুলো নশ্বর নয়; সুপ্রাচীন অবিনশ্বর।

فَاِنْ زَعَمُوْا اَنَّهَا قَدِيْمَةٌ بِالزَّمَانِ بِمَعْنٰى عَدَمِ الْمَسْبُوْقِيَّةِ بِالْعَدَمِ وَهٰذَا لَا يُنَافِي الْحُدُوْثَ الذَّاتِيَّ بِمَعْنَى الْاِحْتِيَاجِ اِلٰى ذَاتِ الْوَاجِبِ فَهُوَ قَوْلٌ بِمَا ذَهَبَتْ اِلَيْهِ الْفَلَاسِفَةُ مِنْ اِنْقِسَامِ كُلٍّ مِّنَ الْقِدَمِ وَالْحُدُوْثِ اِلَى الذَّاتِيِّ وَالزَّمَانِيِّ وَفِيْهِ رَفْضٌ لِكَثِيْرٍ مِّنَ الْقَوَاعِدِ وَسَيَأْتِيْ لِهٰذَا زِيَادَةُ تَحْقِيْقٍ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى.

সহজ তরজমা

অতএব এখন যদি তারা (সিফাতের সম্ভাব্যতার প্রবক্তাগণ) বলেন, সিফাত কাল হিসেবে সুপ্রাচীন অর্থাৎ এগুলো কোন সময় অস্তিত্বহীন ছিল না। আর এটা অপরিহার্য সত্ত্বার মুখাপেক্ষী হওয়ার পরিপন্থী নয় –তাহলে এটা দার্শনিকদের স্বপক্ষে উক্তি করা হবে তথা قُدُوْم وَحُدُوْث প্রতিটি ذَاتِى وَ زَمَانِى দুই ভাগে বিভক্ত। এতে বাধ্যতামূলক অনেক মৌলিক বিষয় বর্জন করতে হবে। এ প্রসঙ্গে আরও অতিরিক্ত তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ইনশাআল্লাহ অত্যাসন্ন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

দার্শনিকদের মতে সিফাত ঃ দার্শনিকগণ অবনিশ্বরতা এবং নশ্বরতাকে সত্তাগত এবং কালগত দু ভাগে বিভক্ত করে বলেছেন, قَدِيْم بِالزَّمَان হল সেটি, যার অস্তিহীনতা পূর্বে ছিল না। পক্ষান্তরে حَادِثٌ بِالزَّمَان হল, যেটি পূর্বে অস্তিত্বহীন ছিল। আর قَدِيْم بِالذَّات হল, যেটি স্বীয় অস্তিত্ব অন্যের মুখাপেক্ষী। দার্শনিকদের এ বিভাজনের ভিত্তিতে একই সময় একটি জিনিস قَدِيْم এবং حُدُوْث দুটি গুণে গুণান্বিত হতে পারে। একটি জিনিস قَدِيْمٌ بِالزَّمَان এবং حَادِثٌ بِالذَّات হতে পারে। যেমন, বিশ্বজগত সম্পর্কে তারা বলেন, এটি পূর্বে অস্তিত্বহীন ছিল না। বিধায় قَدِيْمٌ بِالزَّمَان এবং স্বীয় অস্তিত্বে আল্লাহর মুখাপেক্ষী থাকার কারণে حَادِث بِالذَّات। এরূপভাবে যারা কাদীমকে আল্লাহর সত্তার গুণাবলী উভয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োগের কারণে عَام এবং ওয়াজিবকে শুধুমাত্র আল্লাহর সত্তার ক্ষেত্রে প্রয়োগের কারণে خَاص সাব্যস্ত করেন, সিফাতকে ওয়াজিব মনে করেন না বরং সম্ভাব্য মনে করেন, তাদের মত অনুসারে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, যদি সিফাতগুলোকে مُمْكِن বলা হয়, তাহলে كُل مُمْكِن حَادِث এ মূলনীতি অনুসারে সেগুলো অবশ্যই নশ্বর হবে। অথচ সিফাতগুলো আপনাদের মতেও কাদীম। তারা এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন, সিফাতগুলো কাদীম এবং حَادِثٌ হওয়াতে কোন বৈপরিত্য নেই। কারণ, এগুলো পূর্বে অস্তিত্বহীন হওয়ার কারণে قَدِيْمٌ بِالزَّمَان আর স্বীয় অস্তিত্বে অন্যের মুখাপেক্ষী হওয়ার কারণে حَادِث بِالذَّات ।

শারেহ রহ. এ উত্তরটিকে প্রত্যাখ্যান করে বলেন, এ উত্তরটি দার্শনিকদের মাযহাবের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় ভ্রান্ত। কারণ, কাদীম এবং হাদীসকে ذَاتِى এবং زَمَانِى নামে দুই ভাগে বিভক্ত করা দার্শনিকদের মত। কালাম শাস্ত্রবিদগণ এ কথা স্বীকার করেন না। তাদের মতে কাদীম সাধারণতঃ সেটিই, পূর্বে যার অস্তিত্বহীনতা ছিল না। আর حَادِث হল, পূর্বে যেটি অস্তিত্বহীন ছিল। সুতরাং উভয়টির মাঝে বৈপরিত্য রয়েছে। এমতাবস্থায় সিফাতগুলোকে কাদীম এবং হাদীস মানার অর্থ হচ্ছে, দুটি পরস্পর বিরোধী জিনিসের একত্রিতকরণ। কিন্তু শারেহ রহ. এর পক্ষ থেকে এ উত্তরটিকে শুধু দার্শনিকদের মাযহাবের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় প্রত্যাখ্যান করা প্রশ্নসাপেক্ষ বিষয়। কারণ, প্রতিটি ব্যাপারে ন্যায় হলেও দার্শনিকদের বিরোধিতা করা আবশ্যক নয়।

সিফাতগুলোকে حَادِثٌ بِالذَّاتِ ও قَدِيْمٌ بِالزَّمَانِ বলার ফল

قَوْلُهُ وَفِيْهِ رَفْضُ الخ ঃ অর্থাৎ সিফাতগুলোকে قَدِيْمٌ بِالزَّمَانِ এবং حَادِثٌ بِالذَّاتِ বলার ফলে অনেক ইসলামী মূলনীতিকে বর্জন করতে হয়। যেমন, প্রথমতঃ আল্লাহ তা'আলা হলেন فَاعِل مُخْتَار বা স্বাধীন কর্তা। অর্থাৎ প্রতিটি কাজ তার স্বাধীন ইচ্ছানুপাতে হয়। দ্বিতীয়তঃ فَاعِل مُخْتَار বা স্বাধীন কর্তার مَعْلُوْل (কৃত) حَادِث بِالزَّمَان হয়ে থাকে। তৃতীয়তঃ اِيْجَاب তথা বাধ্যতামূলক কিছু হওয়া একটি দোষণীয় ব্যাপার। তাছাড়া সিফাতগুলোকে قَدِيْم بِالزَّمَان এবং حَادِث بِالذَّات বলার ফলে সেসব মূলনীতি বর্জন করতে হয় কেন? এর কারণ হচ্ছে, صِفَات قَدِيْمَه بِالزَّمَان দুই অবস্থা থেকে মুক্ত নয়। হয়ত সেগুলো আল্লাহ তা'আলা থেকে তার ইচ্ছা ব্যতীত হবে। এমতাবস্থায় অবশ্যই বাধ্যতামূলক আল্লাহ তা'আলা কর্তা হবেন। তবে তো প্রথম মূলনীতি ছুটে গেল, আল্লাহ তা'আলা স্বাধীনকর্তা রইলেন না। অথবা সুপ্রাচীন চিরন্তন সিফাতগুলো আল্লাহ তা'আলা থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত হবে। তখন তো দ্বিতীয় মূলনীতি ছুটে যাবে। স্বাধীন কর্তার مَعْلُوْل কৃত কাজ حَادِث بِالزَّمَان থাকবে না। আর যদি সিফাতগুলো আল্লাহ তা'আলা থেকে বাধ্যতামূলক প্রকাশ পায় এবং বিশ্বজগতে ইচ্ছাকৃতভাবে অস্তিত্ব লাভ করে। ফলে স্বাধীন কর্তার مَعْلُوْل শুধু বিশ্বজগত হওয়ার কারণে حَادِث হওয়া আবশ্যক হয়, তাহলে তৃতীয় মূলনীতিটি ছুটে যাবে। অর্থাৎ অনিচ্ছাকৃতভাবে বা বাধ্যতামূলক কর্মসম্পাদিত হওয়া একটি দোষণীয় ব্যাপার মনে করবেন না।

قَوْلُهُ وَسَيَأْتِى الخ ঃ অর্থাৎ সিফাত ওয়াজিব, যেমন মুতাআখখিরীনের মত, নাকি مُمْكِنٌ যেমন, অধিকাংশের মাযহাব –এ সম্প্রসঙ্গে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ইনশাআল্লাহ পরিবর্তীতে সিফাতের আলোচনায় وَهِىَ لَاهُوَ وَلَا غَيْرُهٗ এর ব্যাখ্যায় আসবে। যার সারকথা হল, সিফাতগুলো সত্তাগতভাবে সম্ভাব্য বস্তু। যারা এগুলোকে وَاجِبٌ لِذَاتِه বলেন, তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে সিফাত ওয়াজিব মানে আল্লাহর সত্তার জন্য সেগুলো প্রমাণিত।

اَلْحَىُّ الْقَادِرُ الْعَلِيْمُ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ الشَّائِىُ الْمُرِيْدُ لِاَنَّ بَدَاهَةَ الْعَقْلِ جَازِمَةٌ بِاَنَّ مُحْدِثَ الْعَالَمِ عَلٰى هٰذَا النَّمَطِ الْبَدِيْعِ وَالنِّظَامِ الْمُحْكَمِ مَعَ مَايَشْتَمِلُ عَلَيْهِ مِنَ الْاَفْعَالِ الْمُتْقَنَةِ وَالنُّقُوْشِ الْمُسْتَحْسَنَةِ لَايَكُوْنُ بِدُوْنِ هٰذِهِ الصِّفَاتِ عَلٰى اَنَّ اَضْدَادَهَا نَقَائِصُ يَجِبُ تَنْزِيْهُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَنْهَا وَاَيْضًا قَدْوَرَدَ الشَّرْعُ بِهَا وَبَعْضُهَا مِمَّا لَايَتَوَقَّفُ ثُبُوْتُ الشَّرْعِ عَلَيْهَا فَيَصِحُّ التَّمَسُّكُ بِالشَّرْعِ فِيْهَا كَالتَّوْحِيْدِ بِخِلَافِ وُجُوْدِ الصَّانِعِ وَكَلَامِهٖ وَنَحْوِ ذٰلِكَ مِمَّا يَتَوَقَّفُ ثُبُوْتُ الشَّرْعِ عَلَيْهِ.

সহজ তরজমা

আরও কিছু সিফাত ঃ আল্লাহ তা'আলা) চিরঞ্জীব সর্বময় ক্ষমতার উৎস, সর্বজ্ঞ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা, ইচ্ছা-এরাদার অধিকারী স্বাধীন। কেননা বিবেক এ বিষয়ে স্বতঃসিদ্ধ নিশ্চিত জ্ঞান রাখে যে, বিশ্বজগতকে ভূতপূর্ব কায়দায় সুদৃঢ় হিকমতপূর্ণ ব্যাবস্থাপনায় নিখুত শিল্প নৈপূন্য এবং মনোহরী কারুকার্য্য সহকারে যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি এ সব গুণাবলী শূন্য হতে পারেন না। তাছাড়া এ সব সিফাতের বিপরীত গুণাবলী হচ্ছে ক্রটিপূর্ণ, যেগুলো থেকে আল্লাহর সত্তা পুতঃপবিত্র। তদ্রুপ শরী'আতঃ এসব সিফাত উল্লেখ করেছে। তন্মধ্যে কিছু সিফাত এমন, যেগুলোর উপর শরী'আতের অস্তিত্ব নির্ভরশীল নয়। অতএব সেসব সিফাত সাব্যস্ত করতে শরী'আত দ্বারা প্রমাণ পেশ করা শুদ্ধ হবে। যেমন, তাওহীদ। কিন্তু স্রষ্টার অস্তিত্ব এবং কালাম প্রভৃতি সিফাত যেগুলোর উপর শরী'আতের অস্তিত্বই নির্ভরশীল, সেগুলো উপরিউক্ত সিফাতের বিপরীত।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এসব গুণে গুণান্বিত হওয়ার কারণ

قَوْلُهُ : لِاَنَّ بَدَاهَةَ الْعَقْلِ الخ ঃ শারেহ রহ. এখানে ইংগিত করেছেন, বিশ্বস্রষ্টার উপরিউক্ত সিফাতগুলোর সাথে গুণান্বিত হওয়া একটি স্বতঃসিদ্ধ বিষয়। যেকোন ন্যায়পরায়ণ লোক এ বিশ্বজগত এরূপ অভিনব পদ্ধতিতে সৃজিত

দেখে, তার গঠনে যেসব হিকমত ও রহস্যের উপর নির্ভরশীল সেগুলো প্রত্যক্ষ করে, বিশ্বজগতকে পূর্ণাঙ্গ সুন্দর-সুশৃঙ্খলরূপে অবলোকন করে সুদৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে বাধ্য হবে যে, নিশ্চয় এর স্রষ্টা সর্বদিক দিয়ে পূর্ণাঙ্গ গুণে গুণান্বিত।

দ্বিতীয় কারণ

قَوْلُهُ : عَلٰى اَنَّ اَضْدَادَهَا نَقَائِصُ ঃ এটি বিশ্বস্রষ্টার উপরিউক্ত সিফাতগুলোর সাথে গুণান্বিত হওয়ার দ্বিতীয় প্রমাণ অর্থাৎ বিশ্বস্রষ্টা যদি এসব পূর্ণাঙ্গ গুণে গুণান্বিত না হন, তাহলে এগুলোর বিপরীত দোষণীয় বিষয়াবলী যেমন– মৃত্যু, অক্ষমতা, মূর্খতা, বধিরতা এবং অন্ধত্ব ইত্যাদি দোষে দুষ্ট হবেন। আল্লাহ তা'আলাকে এসব দোষ থেকে পবিত্র মনে করা অত্যাবশ্যক।

তৃতীয় কারণ

قَوْلُهُ : وَاَيْضًا الخ ঃ এটা তৃতীয় দলীল। শরী'আত বিশ্বস্রষ্টার জন্য এসব গুণাবলীগুলো উল্লেখ করেছে। যেমন, اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ (চিরঞ্জীব, স্বাধিষ্ঠ বিশ্ববিধাতা) اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ (নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সমস্ত বিষয়ে ক্ষমতাবান), اَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ (তার জ্ঞান মুতাবিক তিনি কিতাব নাযির করেছেন) اِنَّهُ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ (নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সবদ্রষ্টা) ইত্যাদি।

উপরিউক্ত সিফাতগুলোর শরীঈ প্রমাণ

قَوْلُهُ : وَبَعْضُهَا الخ ঃ এটি একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্নটি হচ্ছে, শরী'আত এমন কতগুলো মৌলিক আইনের সমষ্টি, যা সর্বদিক দিয়ে পূর্ণাঙ্গও ত্রুটিমুক্ত। আর এমন আইন-কানুন তিনিই প্রনয়ণ করতে পারেন, যিনি পরিপূর্ণ সিফাতের অধিকারী হন। সুতরাং শরী'আতের শরী'আত হওয়ার প্রমাণ নির্ভরশীল হচ্ছে, এর প্রণেতা তথা আল্লাহ তা'আলা পরিপূর্ণ সিফাতগুলোর সাথে গুণান্বিত হওয়ার ওপর। কাজেই বিশ্বস্রষ্টার জন্য উপরিউক্ত গুণাবলী প্রমাণ করার লক্ষ্যে শরী'আত দ্বারাই প্রমাণ পেশ করা হয়, তাহলে شَكْل টি হবে নিম্নরূপঃ শরী'আতের অস্তিত্ব নির্ভরশীল আল্লাহর জন্য পূর্ণাঙ্গ সিফাত প্রমাণ করার ওপর। আর উপরিউক্ত পূর্ণাঙ্গ সিফাতগুলোর অস্তিত্ব নির্ভরশীল শরী'আতের ওপর। কাজেই ফল বের হবে "শরী'আতের অস্তিত্ব শরী'আতের উপর নির্ভরশীল।" বস্তুতঃ এটা হল, تَوَقُّفُ الشَّيْئِ عَلٰى نَفْسِهِ একে বলে দাওর বা ঘুরে ফিরে একই কথা। অথচ এ দাওর বাতিল। কাজেই বিশ্বস্রষ্টার জন্য উপরিউক্ত পূর্ণাঙ্গ সিফাতগুলোর অস্তিত্বের উপর শরী'আত দ্বারা প্রমাণ পেশ করাও বাতিল।

জবাবঃ কোন কোন সিফাত এমন যে, সেগুলোর উপর শরী'আতের অস্তিত্ব নির্ভরশীল নয়। যেমন, তাওহীদ। কারণ, কোন স্থানে যদি দু জন শাসক আইন বাস্তবায়নের জন্য অদিষ্ট হন, তাহলে প্রত্যেকের আনুগত্যই আবশ্যক হবে। এরূপ বলা যাবে না যে, এখানে ১জনের স্থলে ২জন শাসক। অতএব তাদের আইন কোন আইন নয়।

মোটকথা, এরূপ সিফাতগুলোর অস্তিত্বের উপর শরী'আত দ্বারা প্রমাণ পেশ করা বৈধ হবে। আবার কিছু কিছু সিফাত এমন যে, সেগুলোর উপর শরী'আতের অস্তিত্ব নির্ভরশীল। সেগুলোর অস্তিত্বে শরী'আত দ্বারা প্রমাণ পেশ করা বৈধ হবে না। যেমন, আল্লাহ অস্তিত্ব এবং তার কালাম। কেননা বিশ্বস্রষ্টার অস্তিত্ব এবং আদেশ-নিষেধ ইত্যাদি প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তার পক্ষ থেকে শরী'আতের কল্পনাই করা যাবে না.

لَيْسَ بِعَرَضٍ لِاَنَّهُ لَايَقُوْمُ بِذَاتِهِ بَلْ يَفْتَقِرُ اِلٰى مَحَلٍّ يُقَوِّمُهُ فَيَكُوْنُ مُمْكِنًا وَلِاَنَّهُ يَمْتَنِعُ بَقَاؤُهُ وَاِلَّا لَكَانَ الْبَقَاءُ مَعْنًى قَائِمًا بِهِ فَيَلْزَمُ قِيَامُ الْمَعْنٰى بِالْمَعْنٰى وَهُوَ مُحَالٌ لِاَنَّ قِيَامَ الْعَرَضِ بِالشَّيْئِ مَعْنَاهُ اَنَّ تَحَيُّزَهُ تَابِعٌ لِتَحَيُّزِهِ وَالْعَرَضُ لَاتَحَيُّزَ لَهُ بِذَاتِهِ حَتّٰى يَتَحَيَّزَ غَيْرُهُ بِتَبْعِيَّتِهِ.

সহজ তরজমা

আল্লাহর নেতিবাচক গুণাবলী ঃ (আল্লাহ তা'আলা) عَرَض বা আপতন নন। কেননা عَرَض স্বাধিষ্ঠ হয় না বরং এটি এরূপ স্থানের মুখাপেক্ষী, যা তাকে প্রতিষ্ঠিত করবে। ফলে তা হবে সম্ভাব্য বস্তু। তাছাড়া عَرَض এর স্থায়িত্ব অসম্ভব। অন্যথায় بَقَا এরূপ একটি مَعْنٰى বা আপতন হবে, যেটি প্রতিষ্ঠিত হবে আরযের সাথে। সুতরাং নিশ্চিত مَعْنٰى এর সাথে مَعْنٰى প্রতিষ্ঠিত হবে। অথচ তা অসম্ভব। কেননা عَرَض কোন বস্তুর সাথে প্রতিষ্ঠিত হওয়া মানে সে عَرَض টির অন্য বস্তুর স্থানাধিকারের আয়ত্বাধীন কোন স্থানের অধিকারী হওয়া। বস্তুতঃ عَرَض কখনও সত্তাগতভাবে স্থানাধিকারী হয় না। যার ফলে অন্য একটি বস্তু তার আওতাধীন বা অধীনস্থ হয়ে স্থানাধিকারী হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তিনি আরয নন ঃ মুসান্নিফ রহ. আল্লাহ তা'আলার ইতিবাচক গুণাবলী বর্ণনা শেষ করে এখন নেতিবাচক গুণাবলী বর্ণনা করছেন। কেননা উপাস্য এবং আপতনত্বের মাঝে বৈপরিত্য অতি সুস্পষ্ট। ফলে কেউই কোন আরয সম্পর্কে উপাস্য হওয়ার প্রবক্তা হয়নি। বাহ্যতঃ যদি কেউ আরযের উপাস্য হওয়ার প্রবক্তা হয়েও থাকে, তাহলে সে এর জন্য এরূপ কতগুলো গুণাবলী সাব্যস্ত করেছে, যেগুলো جَوْهَر বা মূলবস্তুর বৈশিষ্ট্য। কাজেই তাদের মতেও সেটি মূলতঃ আরয বা যৌগিক নয়।

قَوْلُهٗ : لِاَنَّهٗ لَايَقُوْمُ بِذَاتِهٖ ঃ এটি আল্লাহ তা'আলার আরয না হওয়ার প্রমাণ। কেননা আরয স্বাধিষ্ট হয় না বরং আপন অস্তিত্বে কোন স্থানের মুখাপেক্ষী হয়। আর মুখাপেক্ষীতা সম্ভাব্য বস্তুর গুণ। সুতরাং বিশ্বস্রষ্টাকে আরয মানা হলে অবশ্যই তাকে সম্ভাব্য বস্তু হতে হবে। অথচ বিশ্বস্রষ্টার সম্ভাব্য বস্তু হওয়া বাতিল। কাজেই বিশ্বস্রষ্টার আরয হওয়ার ধারণাও বাতিল।

قَوْلُهٗ : يَمْتَنِعُ بَقَاؤُهٗ. ঃ এ ইবারতটি আল্লাহ তা'আলার আরয না হওয়ার দ্বিতীয় দলীলের কুবরা; সুগরা এখানে উল্লেখ নাই। আর এই দলীলটির হদ্দে আওসাতের সুগরা এবং কুবরা উভয়টিতে مَحْمُوْل হওয়ায় কিয়াসের شَكْل ثَانِيْ । পুরো দলীলটি নিম্নরূপঃ বিশ্বস্রষ্টা অপরিহার্য হওয়ার কারণে স্থায়ী। কিন্তু আরয স্থায়ী নয়। সুতরাং বিশ্বস্রষ্টা আরয নন। অবশ্য প্রশ্ন থাকে– আরযের স্থায়িত্ব অসম্ভব কেন? এর কারণ হচ্ছে, প্রথমতঃ আরয মানেই এরূপ বস্তু যার স্থায়িত্ব নেই। যেমন, বলা হয়– عَرَضَ لِفُلَانٍ اَمْرٌ যখন একটি জিনিস কোন একটি বস্তুর সাথে যুক্ত হয় এবং সেটা স্থায়ী হয় না। তদ্রূপ বলা হয়, এ অবস্থাটি আসলী নয় আরযী অর্থাৎ এগুলো স্থায়ী নয় অস্থায়ী। দ্বিতীয়তঃ وَاِلَّا لَكَانَ الْبَقَاءُ الخ অর্থাৎ যদি আরযের স্থায়িত্ব অসম্ভব না হয় বরং একে স্থায়ী বলা হয়, তাহলে যেহেতু বাকী শব্দটি মুশতাক (নিষ্পন্ন)। আবার মুশতাক (নিষ্পন্ন) শব্দ প্রয়োগ করতে হলে ক্রিয়ামূল তার সাথে প্রতিষ্ঠিত হতে হয়। সেহেতু বাকী থাকার অর্থ হবে, بَقَاء যেটি অন্যের সাথে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দরুণ একটি مَعْنٰى, সেটি উক্ত আরযের সাথে প্রতিষ্ঠিত। অপরদিকে আরযটি যেহেতু একটি مَعْنٰى বিধায় قِيَامُ الْمَعْنٰى بِالْمَعْنٰى আবশ্যক হয়ে পড়বে। অথচঃ قِيَامُ الْمَعْنٰى بِالْمَعْنٰى অসম্ভব। যেভাবে قِيَامُ الْعَرَضِ بِالْعَرَضِ অসম্ভব। এটি অধিকাংশ মুতাকাল্লিমীনের অভিমত।

قَوْلُهٗ لِاَنَّ قِيَامَ الْعَرَضِ بِالشَّيْءِ ঃ এখানে قِيَامُ الْعَرَضِ بِالْعَرَضِ অসম্ভব হওয়ার দলীল পেশ করা হয়েছে। অর্থাৎ একটি আরয তার স্থানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অর্থ হচ্ছে, এ আরযটি স্থান গ্রহণে অর্থাৎ যে স্থানের মধ্যে সেটি রয়েছে, সে স্থানে বিদ্যমান হওয়ার ব্যাপারে কিংবা ইন্দ্রিয়নুভূত ইংগিতযোগ্য হওয়ার ক্ষেত্রে আরযটি সেই স্থানের অধীন। অথচ সেই স্থানটিও একটি আরয। কাজেই স্থান গ্রহণে সেটিও অন্য একটি বস্তুর অধীন হল। পক্ষান্তরে যে বস্তুটি নিজেই স্থান গ্রহণে অপর একটি বস্তুর অধীনস্থ হয়, তার অধীনস্থ হয়ে অন্য আরেকটি বস্তু প্রতিষ্ঠিত হবে, সেটি যেন সত্তাগতভাবে স্থান গ্রহণকারী হয়; অন্য কারও অধীনস্থ না হয়। আর সত্তাগতভাবে স্থান গ্রহণকারী হয়, جَوْهَر বা মূলবস্তু। সুতরাং আরয جَوْهَر এর সাথে প্রতিষ্ঠিত হবে, আরযের সাথে প্রতিষ্ঠিত হবে না।

وَهٰذَا مَبْنِيٌّ عَلٰى اَنَّ بَقَاءَ الشَّيْئِ مَعْنًى زَائِدٌ عَلٰى وُجُوْدِهٖ وَاَنَّ الْقِيَامَ مَعْنَاهُ اَلتَّبْعِيَّةُ فِى التَّحَيُّزِ وَالْحَقُّ اَنَّ الْبَقَاءَ اِسْتِمْرَارُ الْوُجُوْدِ وَعَدَمُ زَوَالِهٖ وَحَقِيْقَتُهُ الْوُجُوْدُ مِنْ حَيْثُ النِّسْبَةِ اِلَى الزَّمَانِ الثَّانِىْ وَمَعْنٰى قَوْلِنَا وُجِدَ لَوْ يَبْقَ اَنَّهٗ حَدَثَ فَلَمْ يَسْتَمِرَّ وُجُوْدُهٗ وَلَمْ يَكُنْ ثَابِتًا فِى الزَّمَانِ الثَّانِىْ وَاَنَّ الْقِيَامَ هُوَ الْاِخْتِصَاصُ النَّاعِتُ كَمَا فِىْ اَوْصَافِ الْبَارِىْ تَعَالٰى فَاِنَّهَا قَائِمَةٌ بِذَاتِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَلَا تَتَحَيَّزُ بِطَرِيْقِ التَّبْعِيَّةِ لِتَنَزُّهِهٖ تَعَالٰى عَنِ التَّحَيُّزِ وَاَنَّ اِنْتِفَاءَ الْاَجْسَامِ فِىْ كُلِّ اٰنٍ وَمُشَاهَدَةَ بَقَائِهَا بِتَجَدُّدِ الْاَمْثَالِ لَيْسَ بِاَبْعَدَ مِنْ ذٰلِكَ فِى الْاَعْرَاضِ .

সহজ তরজমা

আরযের স্থায়িত্ব অসম্ভাব্যতার দলীল ঃ আর এ দলীলটি এ বিষয়ের উপর নির্ভরশীল যে, একটি বস্তুর بَقَاء বা স্থায়ীত্ব মূল বস্তুটির অস্তিত্ব অপেক্ষা অতিরিক্ত জিনিস; অনুরূপভাবে قِيَام এর অর্থ হচ্ছে, স্থান গ্রহণের ক্ষেত্রে অন্য বস্তুর অধীনস্থ হওয়া। অথচ বিশুদ্ধ কথা হল, بَقَاء দ্বারা কোন বস্তুর অস্তিত্ব বিলীন না হয়ে স্থায়ী থাকা ও আবহামান কাল অক্ষুণ্ন থাকা উদ্দেশ্য। এর বাস্তবতা হচ্ছে, পরবর্তীকালের দিকে লক্ষ্য করে কোন কিছুর অস্তিত্ব। আর وُجِدَ فَلَمْ يَبْقَ আমাদের উক্তির অর্থ হচ্ছে, একটি বস্তু حَادِث হয়েছে তথা অস্তিত্ব হীনতার পর অস্তিত্ব লাভ করেছে। কিন্তু সেটি বহাল থাকেনি এবং পরবর্তীকালে স্থায়ী হয়নি। আরেকটি বাস্তব সত্য হচ্ছে, اِخْتِصَاص نَاعِت কিয়ামের অপর নাম। যেমন, আল্লাহ তা'আলার সত্তায় সিফত কায়েম। অন্য কোন কিছুর অধীনস্থ হয়ে স্থানাবিধকারী নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা স্থানাধিকার থেকে পবিত্র। আরেকটি বাস্তব সত্য হচ্ছে, প্রতিটি মুহূর্তে দেহসমূহের অবিদ্যমানতা এবং রূপ নবায়নের কারণে এগুলোর স্থায়িত্ব প্রত্যেক্ষ করা, প্রতিটি মুহূর্তে আপতনসমূহের অবিদ্যমানতা এবং রূপ নবায়নের দরুন প্রত্যক্ষ করা অপেক্ষা অধিক অযৌক্তিক নয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ وَهٰذَا مَبْنِيٌّ الخ ঃ هٰذَا দ্বারা আরযের স্থায়িত্ব অসম্ভব হওয়ার উপরিউক্ত দলীলের দিকে ইংগিত করা হয়েছে। আরযের স্থায়িত্ব অসম্ভাব্যতা প্রসঙ্গে **প্রথমতঃ** বলা হয়েছিল, যদি আরয স্থায়ী হয়, তাহলে بَقَاء আরযটির সেই আরযের সাথে কায়েম হওয়া আবশ্যক হবে। মূলতঃ একটি আরয অপর আরযের সাথে কায়েম হওয়া অসম্ভব। **দ্বিতীয়তঃ** বলা হয়েছিল, قِيَامُ عَرْض এর অর্থ হচ্ছে, স্থান গ্রহণে অন্যের অধীনস্থ হওয়া। আরযের স্থায়িত্বের অবস্থায় بَقَاء আরযের সাথে কায়েম থাকা নির্ভরশীল হল, قَائِمْ অর্থাৎ بَقَاء স্বীয় مَاقَامَ بِهٖ অর্থাৎ আরয থেকে অতিরিক্ত এবং অর্থ থেকে বহির্ভূত অন্য কোন জিনিস। কেননা قَائِمْ এবং مَاقَامَ بِهٖ উভয়টি ভিন্নতর এবং স্বতন্ত্র হতে হয়। অনুরূপভাবে قِيَامُ الْعَرْضِ بِالْعَرْضِ এর অসম্ভবতাও قِيَام عَرْض এর অর্থ স্থান গ্রহণে অধীনস্থ হওয়ার উপর নির্ভরশীল। অথচ এ দুটির কোনটিই স্বীকৃত নয়। বরং বাস্তবতা হল, একটি জিনিসের بَقَاء মানে সে বস্তুর হুবহু অস্তিত্ব। যে মুহূর্তে একটি বস্তু অনিস্তত্ব থেকে অস্তিত্ব লাভ করে, সে মুহূর্তের দিকে লক্ষ্য করে এটির জন্মকে আস্তিত্ব বলা হয়। আর অতীত মুহূর্তের দিকে লক্ষ্য করে সেটি স্থায়ীভাবে থাকলে সেই অস্তিত্বেটিকেই بَقَاء বলা হয়। যেমন, কোন বস্তুকে অস্তিত্বের সময় وُجِد শব্দ দ্বারা আর পরবর্তীতে তার অস্তিত্বের স্থায়িত্বকে বোঝায় بقى শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়। সে মতে আরযের بَقَاء মানে হুবহু তার অস্তিত্ব। بَقَاء عَرْض এবং আরয স্বতন্ত্র কোন বস্তু নয়। ফলে بَقَاء কে قائم এবং عَرْض কে مَاقَامَ بِهٖ সাব্যস্ত করে قِيَامُ الْعَرْضِ بِالْعَرْضِ এর হুকুম লাগানো ঠিক নয়। কারণ, قَائِم এবং مَاقَامَ بِهٖ দুটি স্বতন্ত্র বস্তু; এক নয়।

بَقَاء কে হুবহু অস্তিত্ব সাব্যস্থ করা হলে

قوله : وَمَعْنٰى قَوْلِنَا وُجِدَ الخ ঃ এটি একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্নটি হচ্ছে, وُجِدَ فَلَمْ يَبْقَ বাক্যটি সর্বসম্মতিক্রমে বিশুদ্ধ। কিন্তু بقاء কে হুবহু অস্তিত্ব সাব্যস্ত করা হলে "হা-না" একত্র হওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে। এতো সুস্পষ্ট বৈপরিত্য। যেমন, আপনার উক্তি وُجِدَ فَلَمْ يُوْجَدْ বিপরীতধর্মী দুটি বিষয়ের সহাবস্থান। ব্যাখ্যাতা এ প্রশ্নের উত্তরে

বলেন, وُجِدَ فَلَمْ يَبْقَ এর অর্থ হল, حَدَثَ فَلَمْ يَسْتَمِرَّ وُجُوْدُهٗ অর্থাৎ একটি জিনিসের অস্তিত্ব হয়েছে, কিন্তু পরবর্তীকালে তা স্থায়ী হয়নি। সুতরাং অস্তিত্ব সাব্যস্ত করার সম্পর্কে হল, পূর্বকালের সাথে, আর অস্তিত্বহীনতার সম্পর্ক হল, পরবর্তীকালের সাথে। কাজেই اِثْبَات এবং نَفِى এর কাল স্বতন্ত্র। বিধায় কোন বৈপরিত্য নেই। কেননা বৈপরিত্যের জন্য উভয়টির কাল এক হওয়া শর্ত।

কিয়ামের প্রথম অর্থটি প্রত্যাখ্যাত

قَوْلُهٗ : وَاَنَّ الْقِيَامَ هُوَ الْاِخْتِصَاصُ الخ এ বাক্যটির আত্ফ হয়েছে اِنَّ الْبَقَاءَ اِسْتِمْرَارُ الْوُجُوْدِ এর ওপর। প্রথমে বলা হয়েছিল, قِيَامُ الْعَرَضِ بِالْعَرَضِ অসম্ভব হওয়া নির্ভরশীল হল, قِيَام এর অর্থ স্থান গ্রহণে অন্যের অধীনস্থ হওয়ার ওপর। শাহের রহ. সে কথা অস্বীকার করে বলেছিলেন, কিয়ামের অর্থ স্থান গ্রহণে অন্যের অধীনস্থ হওয়া নয়। অন্যথায় আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী তার সত্তার সাথে কায়েম হওয়ার অর্থ দাঁড়াবে, সিফাতগুলো নিজ স্থান গ্রহণে আল্লাহ তা'আলার সত্তার অধীনস্থ। অথচ তা নাজায়েয। কেননা আল্লাহ তা'আলার সত্তা এবং তার গুণাবলী আদৌ স্থান গ্রহণকারী নয়। না প্রত্যক্ষভাবে, না পরোক্ষভাবে। বাস্তবতা হল, কিয়ামের অর্থ, اِخْتِصَاص نَاعِت অর্থাৎ একটি বস্তু অপর একটি বস্তুর সাথে এমন বিশেষ সম্পর্কযুক্ত হওয়া, যার কারণে একটি সিফাত অপরটি মওসূফ হতে পারে। যেমন, بَيَاض বা শুভ্রতা এ অর্থে দেহের সাথে প্রতিষ্ঠিত যে, দেহের সাথে এর এরূপ একটি বিশেষ সম্পর্ক আছে, যার কারণে بَيَاض সিফাত এবং جِسْم মওসূফ হতে পারে এবং جِسْم اَبْيَض বলা যায়। কিন্তু قِيَام এ অর্থটি তার প্রথম অর্থ অপেক্ষা ব্যাপক। কারণ, এ অর্থটি 'আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী তার সত্তার সাথে কায়েম হওয়ার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কেননা আল্লাহর সিফাত যেমন, حَيَات، عِلْم، سَمْع، بَصَر ইত্যাদির এমন বিশেষ সম্পর্ক আল্লাহর সাথে রয়েছে, যার ফলে এ সিফাতগুলোকে نَعْت এবং আল্লাহ তা'আলাকে مَنْعُوْت বা مَوْصُوْف বলা যায়। যেমন, اللهُ الْحَيُّ اللهُ الْعَلِيْمُ ـ اَللهُ السَّمِيْعُ ইত্যাদি। উল্লেখ্য যে, قِيَامُ الْعَرَضِ بِالْعَرَضِ অসম্ভব হওয়ার ব্যাপারে প্রমাণ উপস্থাপন কারীগণ মুতালাক কিয়ামের অর্থ تَبْعِيَت فِى التَّحَيُّز বলেননি বরং قِيَامُ عَرَضٍ بِالشَّيْئِ এর অর্থ, পেশ করেছিলেন। অথচ আল্লাহর গুণাবলী আরযের অন্তর্ভূক্ত নয়। কাজেই আল্লাহর গুণাবলী নিয়ে প্রশ্ন করা ঠিক হবে না। যার ফলে এ অর্থটি আল্লাহ তা'আলার সিফাত তার সত্তার সাথে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রজোয্য নয়।

বাকায়ে আরযের অসম্ভাব্যতা প্রত্যাখ্যান

قَوْلُهٗ وَاَنَّ اِنْتِفَاءَ الْاَجْسَامِ الخ এটিও اِنَّ الْبَقَاءَ اِسْتِمْرَارُ الْوُجُوْدِ এর উপর عَطْف হয়েছে। আসল ইবারত وَالْحَقُّ اَنَّ اِنْتِفَاءُ الْاَجْسَامِ الخ। শারহে রহ. بَقَاءُ عَرَضٍ অসম্ভব হওয়ার দলীলের দুটি মুকাদ্দামাকে প্রত্যাখ্যান করার পর এখন মূল দাবী অর্থাৎ بَقَاء عَرَض এর অসম্ভাব্যতাকেই প্রত্যাখ্যান করছেন। সারকথা, আশ'আরীদের মতে দেহ প্রতিটি মুহূর্তে ধ্বংস হতে থাকে এবং তার স্থানে তার অনুরূপ বস্তু মওজুদ হতে থাকে। এভাবে এর স্থায়িত্ব প্রত্যক্ষ হতে থাকে। সুতরাং দেহগুলোর প্রতিটি মুহূর্তে ধ্বংস হওয়া এবং সেগুলোর স্থানে সেই মুহূর্তেই সেগুলোর অনুরূপ জিনিস মওজুদ হওয়ার কারণে সেগুলোর স্থায়িত্ব প্রত্যক্ষ হতে থাকা, আরযগুলোর এরূপভাবে প্রতিটি মুহূর্তে ধ্বংস হওয়া এবং তার অনুরূপ নবয়ন হওয়ার কারণে সেগুলো স্থায়িত্ব প্রত্যক্ষ হতে থাকা অধিক অযৌক্তিক নয় বরং যৌক্তিকভাবে উভয়টি সমান। কাজেই দেহসমূহের স্থায়িত্বহীনতা সম্ভম হওয়া সত্ত্বেও আশআরীগণ সেগুলোর بقاء কে আবশ্যক সাব্যস্ত করেছেন। ফলে আরযেরও স্থায়িত্বহীনতা সম্ভব হওয়া সত্ত্বেও সেগুলোর بقاء আবশ্যক হবে। بقاء জরুরী হওয়ার ব্যাপারে উভয়ের মাঝে কোন বিরোধ নেই। অবশ্য কোন কোন সমালোচক বলতে পারেন, দেহ এবং আরযসমূহের অস্থায়িত্বে পার্থক্য করা ঠিক নয়। কারণ, দেহসমূহের অস্থায়িত্ব অযৌক্তিক বরং অসম্ভব। কেননা দেহগুলোকে স্থায়ী না মানা হলে প্রতিদান, দণ্ড ইত্যাদি বাতিল হয়ে যাবে। কেননা যুক্তি মতে শাস্তি সেই দেহেরই হওয়া উচিৎ, যার থেকে অপরাধমূলক কাজ প্রমাণিত হয়েছে। এটা তখনই সম্ভব, যখন শাস্তির সময় হুবহু সে দেহটি যার থেকে অপরাধ সংঘঠিত হয়েছিল, সেটি বহাল থাকবে। নতুবা অপরাধ করবে একজন আর শাস্তি ভোগ করবে আরেকজন –বিষয়টি এমনই হবে। কিন্তু আরযের ব্যাপারটি এর বিপরীত। তার অস্তিত্বহীনতা অযৌক্তিক নয়।

قَوْلُهُ مِنْ ذَالِكَ فِى الْأَعْرَاضِ أَىْ مِنَ الْاِنْتِفَاءِ وَمُشَاهَدَةِ بَقَائِهَا بِتَجَدُّدِ الْأَمْثَالِ نَعَمْ تَمَسُّكُهُمْ فِىْ قِيَامِ الْعَرْضِ بِالْعَرْضِ بِسُرْعَةِ الْحَرَكَةِ وَبُطُوْئِهَا لَيْسَ بِتَامٍّ اِذْ لَيْسَ هٰهُنَا شَئٌ هُوَ حَرَكَةٌ وَاٰخَرُ هُوَ سُرْعَةٌ اَوْ بُطُوْءٌ بَلْ هٰهُنَا حَرَكَةٌ مَخْصُوْصَةٌ تُسَمّٰى بِالنِّسْبَةِ اِلٰى بَعْضِ الْحَرَكَاتِ سَرِيْعَةٌ وَبِالنِّسْبَةِ اِلَى الْبَعْضِ بَطِيْئَةٌ وَبِهٰذَا تَبَيَّنَ اَنْ لَيْسَتِ السُّرْعَةُ وَالْبُطُوْءُ نَوْعَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ مِنَ الْحَرَكَةِ اِذِ الْاَنْوَاعُ الْحَقِيْقَةُ لَاتَخْتَلِفُ بِالْاِضَافَاتِ.

সহজ তরজমা

قِيَامُ عَرَضٍ بِالْعَرَضِ সম্পর্কে গতির দ্রুততা ও ধীরতা দ্বারা দার্শনিকদের প্রমাণ পেশ করাও শুদ্ধ নয়। কেননা এখানে একটি বস্তুর গতি আরেকটি বস্তুর ধীরতা বা দ্রুততা এমন নয় বরং এখানে একটি বিশেষ ধরনের গতি রয়েছে, যেটাকে কোন কোন গতি অপেক্ষা দ্রুত এবং অন্য কোন গতি অপেক্ষায় ধীর বলা হয়। এতে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, سُرْعَتْ وَبُطُو (ধীরতা ও দ্রুততা) গতির স্বতন্ত্র দুটি প্রকার নয়। কারণ, প্রকৃত প্রকারসমূহে আপেক্ষিক বিভিন্নতা ও পার্থক্য হয় না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

কিয়ামুল আরয বিল-আরয জায়েয হওয়ার প্রমাণটি দুর্বল

قِيَامُ الْعَرَضِ بِالْعَرَضِ এর অসম্ভাব্যতা প্রসঙ্গে মুতাকাল্লিমীনের দলীল প্রত্যাখ্যান করে এখানে শারেহ রহ. قِيَامُ الْعَرَضِ بِالْعَرَضِ এর বৈধতার পক্ষে দার্শনিকদের একটি দলীলকে দুর্বর সাব্যস্ত করেছেন। দার্শনিকরা قِيَامُ الْعَرَضِ بِالْعَرَضِ এর বৈধতার উপর প্রমাণস্বরূপ বলেন, হরকত একটি আরয (আপতন)। এটি দেহের সাথে প্রতিষ্ঠিত। سُرْعَتْ (দ্রুততা) এবং بُطُو (ধীরতা) উভয়টি আরয। এগুলো হরকতের সাথে প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং قِيَامُ عَرَضٍ بِالْعَرَضِ প্রমাণিত হয়ে গেল।

শারেহ রহ. বলেন, তাদের এ প্রমাণ অসম্পূর্ণ। কেননা قِيَامُ عَرَضٍ بِالْعَرَضِ দুটি আরযের অস্তিত্ব চায়, যাতে একটি قَائِم অপরটি مَاقَامَ بِهٖ হতে পারে। আর এখানে দুটি বস্তু নেই যে, ১টির নাম হরকত যেটি مَاقَامَ بِهٖ আর অপরটির سُرْعَتْ কিংবা بُطُو যেটি হবে قَائِم এবং একটি বিশিষ্ট হরকত যেটি অন্য হরকতের তুলনায় سَرِيْع বা দ্রুত আর অপর একটি হরকতের বিপরীতে বলা হয় بطى বা ধীর। যেমন, তিন ব্যক্তি একটি সুনির্দিষ্ট স্থানে একত্রে দৌড়াতে আরম্ভ করল। একই সময় তিনজন দৌড় শেষ করল। এখন তাদের প্রত্যেকের দৌড়ানোর পরিধি দেখে বুঝা গেল, একজন একশ গজ পরিমান, একজন দেড়শ গজ পরিমান এবং অপরজন ২শ গজ পরিমান দৌড়ে এসেছে। অতএব যে গতিতে দেড়শ গজ পথ অতিক্রমের গতিটিকে একশ গজ পথ অতিক্রমের গতির তুলনায় দ্রুত বলা যাবে। আবার সেই গতির তুলনায় ধীর বলা যাবে, যার মধ্যেমে দুইশ গজ পথ অতিক্রান্ত হল। এতে বুঝা যায়, একটি গতির দ্রুততা বা ধীরতা হওয়া একটি অপেক্ষিক বিষয়। যেহেতু سُرعت এবং بطو অপেক্ষিত বিষয়, সেহেতু সে সব লোকের এ উক্তির ভ্রান্ততা প্রমাণিত হল, যারা বলে– سُرعت ও بطو সাধারণ গতির দুটি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। কারণ, প্রকৃত প্রকারগুলোর মধ্যে বৈচিত্র এবং বিভিন্নতা আপেক্ষিক হয় না বরং সত্ত্বাগত হয়। প্রতিটি প্রকারের স্বতন্ত্র জাতিসত্ত্বা থাকে। যেমন, اِنْسَان এবং فَرَس হাইওয়ানের দুটি স্বতন্ত্র প্রকৃত প্রকার। কারণ, ইনসান এর জাতি হল حَيْوَان এবং نَاطِق আর فَرَس এর জাতি হল حَيْوَان এবং صَاهِل ।

وَلَاجِسْمٍ لِاَنَّهٗ مُتَرَكِّبٌ وَمُتَحَيِّزٌ وَذٰلِكَ اَمَارَةُ الْحُدُوْثِ وَلَا جَوْهَرٍ اَمَّا عِنْدَنَا فَلِاَنَّهٗ اِسْمٌ لِلْجُزْءِ الَّذِىْ لَايَتَجَزّٰى وَهُوَ مُتَحَيِّزٌ وَجُزْءٌ مِّنَ الْجِسْمِ وَاللّٰهُ تَعَالٰى مُتَعَالٍ عَنْ ذٰلِكَ وَاَمَّا عِنْدَ الْفَلَاسِفَةِ فَلِاَنَّهُمْ وَاِنْ جَعَلُوْهُ اِسْمًا لِلْمَوْجُوْدِ لَا فِىْ مَوْضُوْعٍ مُجَرَّدًا كَانَ اَوْ

مُتَحَيِّزًا لَكِنَّهُمْ جَعَلُوهُ مِنْ اَقْسَامِ الْمُمْكِنِ وَاَرَادُوْا بِهِ الْمَاهِيَةَ الْمُمْكِنَةَ الَّتِى اِذَا وُجِدَتْ كَانَتْ لَافِى مَوْضُوْعٍ وَاَمَّا اِذَا اُرِيْدَ بِهَا الْقَائِمُ بِذَاتِهِ وَالْمَوْجُوْدُ لَا فِى مَوْضُوْعٍ فَاِنَّمَا يَمْتَنِعُ اِطْلَاقُهَا عَلَى الصَّانِعِ بِذَاتِهِ وَالْمَوْجُوْدُ لَا فِى مَوْضُوْعٍ فَاِنَّمَا يَمْتَنِعُ اِطْلَاقُهَا عَلَى الصَّانِعِ مِنْ جِهَةِ عَدَمِ وُرُوْدِ الشَّرْعِ بِذٰلِكَ مَعَ تَبَادُرِ الْفَهْمِ اِلَى الْمُرَكَّبِ وَالْمُتَحَيِّزِ وَذَهَبَ الْمُجَسِّمَةُ وَالنَّصَارٰى اِلَى اِطْلَاقِ الْجِسْمِ وَالْجَوْهَرِ عَلَيْهِ بِالْمَعْنَى الَّذِىْ يَجِبُ تَنْزِيْهُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَنْهُ

সহজ তরজমা

(আল্লাহ) দেহ বিশিষ্ট নন। কারণ, দেহ যোগিক ও স্থান দখলকারী বস্তু। এটা নশ্বরতার লক্ষণ। (তিনি) জওহার বা পরমাণুও নন। কারণ, আমাদের মতে এটি হল, اَلْجُزْءُ الَّذِى لَايَتَجَزّٰى অর্থাৎ অবিভাজ্য পরমাণু এবং দেহের অংশ। বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলা এ থেকে পুতঃপবিত্র। আর দার্শনিকদের মতে এর কারণ হল, তারা জওহার এরূপ একটি বস্তুর নাম রেখেছেন বটে, যেটি কোন স্থানের অধীনস্থ নয়, দেহহীন হোক চাই স্থান দখলকারী হোক। কিন্তু তারা এটাকে مُمْكِن এর একটি প্রকার সনাক্ত করেছেন। এর দ্বারা এমন একটি مَاهِيَت مُمْكِنَه (সম্ভাব্য মূল পদার্থ) উদ্দেশ্য নিয়েছেন, যখনই সেটি অস্তিত্ব লাভ করবে, কোন স্থান বা মহলের অধীনস্থ হবে না। মোটকথা, যখন جِسْم এবং جَوْهَر দ্বারা স্বাধিষ্ঠ এবং স্থানের অমুখাপেক্ষী অস্তিত্ববান বস্তু উদ্দেশ্য হবে, তখন বিশ্বস্রষ্টার ক্ষেত্রে উক্ত শব্দদ্বয়ের প্রয়োগ নাজায়েয হবে। কারণ, শরী'আত এ দুটি শব্দের উল্লেখ করেনি। তাছাড়া এ দুটো শব্দ দ্বারা মন দ্রুত এ দিকে ধাবিত হয় যে, স্রষ্টা যৌগিক ও স্থান দখলকারী একটি বস্তু। অনুরূপভাবে فِرْقَه مُجَسِّمَه ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে جِسْم وَجَوْهَر শব্দদ্বয়কে এরূপ অর্থে প্রয়োগ করে, যা থেকে আল্লাহ তা'আলার পুতঃপবিত্র হওয়া অনিবার্য।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

বিশ্বস্রষ্টা দেহ বিশিষ্ট নন কেন ?

قَوْلُهُ وَلَاجِسْمَ الخ ঃ বিশ্বস্রষ্টা দেহবিশিষ্ট নন। কারণ, প্রতিটি দেহ মুরাক্কাব (যৌগিক) হয়ে থাকে اَجْزَاء عَقْلِيَّه এবং ذِهْنِيَّه অর্থাৎ جِنْس ও فَصْل দ্বারা এবং اَجْزَاء وُجُوْدِيَّه অর্থাৎ هَيُوْلٰى ও صُوْرَة جِسْمِيَّه দ্বারা। যেমন, মাশ্‌শাইয়্যাহ দার্শনিকদের মতাদর্শ অথবা اَجْزَاى لَايَتَجَزّٰى দ্বারা। যেমনটি মুতাকাল্লিমীনের অভিমত। তদ্রূপভাবে اَجْزَاء مِقْدَارِيَّه দ্বারা গঠিত। আর প্রতিটি মুরাক্কাব তার গঠনে অংশগুলোর দিকে মুখাপেক্ষী। এভাবে প্রতিটি দেহ স্থান দখলকারী হয়। আর প্রতিটি স্থান দখলকারী জিনিস স্থানের মুখাপেক্ষী হয়। বস্তুতঃ মুখাপেক্ষীতা নশ্বরতার আলামত। অথচ বিশ্বস্রষ্টা নশ্বর হতে পারে না বরং কাদীম ও সুপ্রাচীন। দ্বিতীয়তঃ এ প্রসঙ্গে আরেকটি প্রমাণ হল, আল্লাহ তা'আলা দেহ বিশিষ্ট হলে তিনি হয়ত দেহের সকল গুণাবলীর সাথে গুণান্বিত হবেন। এমতবস্থায় দুই বিপরীত বস্তু ও গতি-স্থিতি একত্রিত হওয়া আবশ্যক হবে। অথবা দেহসমূহের কোনও গুণের সাথেই গুণান্বিত হবেন না। এমতাবস্থায় এমন গুণাবলীর ও অনস্তিত্ব আবশ্যক হয়ে পড়বে, যেগুলা দেহের জন্য আবশ্যকীয়। যেমন, ত্রিমাতা বিশিষ্ট হওয়া ইত্যাদি। তাছাড়া হরকত-সুকূন তথা গতি-স্থিতি কোন ১টির সাথেও গুণান্বিত না হওয়া আবশ্যক। আর এটি হল, اِرْتِفَاع ضِدَّيْن (বিপরতী ধর্মী দুটি বস্তু এক সাথে উঠে যাওয়া) কিংবা দেহের কোন কোন গুণের সাথে গুণান্বিত হবেন, কিছুর সাথে গুণান্বিত হবেন না। আর যদি গুণান্বিত হওয়ার পেছনে কোন কারণ থাকে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই প্রাধান্যতা কারণের দিকে মুখাপেক্ষী হবেন। যদি প্রাধান্যদাতা কোন কারণ না থাকলে তো تَرْجِيْع بِلَامُرَجِّع আবশ্যক হয়ে পড়ল।

اِجْتِمَاع ضِدَّيْن ، اِرْتِفَاع ضِدَّيْن ، اِنْتِفَاءُ تَرْجِيْع بِلَامُرَجِّع، اِحْتِيَاجُ الْوَاجِب، لَوَازِم جِسْمِيَّت সবই বাতিল। কাজেই ওয়াজিব তা'আলার জন্য দেহবিশিষ্ট হওয়াও বাতিল।

আরেকটি প্রমাণ হল, আল্লাহ তা'আলা দেহবিশিষ্ট হলে নিশ্চয়ই তিনি সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বেন। কারণ, মাত্রা অসীম হওয়া বাতিল। এমতাবস্থায় তিনি কোন রূপে রূপায়িত হবেন। কারণ, شَكْل এমন একটি রূপের নাম, যেটি এক বা একাধিক প্রান্ত কর্তৃক দেহকে পরিবেষ্টন করার কারণে অর্জিত হয়। ফলে সুনিশ্চিতরূপে তার পরিবেষ্টিত

হওয়া আবশ্যক হবে। যাকে বলা হবে شكل। তখন হয়ত তার মধ্যে সমস্ত রূপই পাওয়া যাবে অথবা কোন কোন রূপ। সমস্ত রূপে রূপায়িত হওয়াতো اجتماع اضداد (দুটি বিপরীত বিষয়ের সহবাস্থান) কে আবশ্যক করবে, যা অসম্ভব। আবার কোন কোন রূপে রূপায়িত হওয়া কোন প্রাধান্যদাতা কারণে হলে তার দিকে মুখাপেক্ষীতা আবশ্যক হয়। আর অকারণে হলে ترجيح بلا مرجح আবশ্যক হয়ে পড়বে।

বিশ্বস্রষ্টা পরমাণু নন কেন ?

قوله ولا جوهر الخ ঃ ওয়াজিব তা'আলা جوهر বা পরমাণু নন –এ প্রসঙ্গে আশ'আরী এবং দার্শনিক সকলে একমত। অবশ্য প্রত্যেকের প্রমাণ ভিন্ন ভিন্ন। আমাদের প্রমাণ হল, جوهر جزء لايتجزى বা পরমাণুর নাম। আর جزء لايتجزى স্থানাধিকারী এবং দেহের অংশ। আল্লাহ তা'আলা স্থানাধিকারী হওয়া এবং কেন বস্তুর অংশ হওয়া থেকে পুতঃপবিত্র। পক্ষান্তরে দার্শনিকদের মতে جوهر অবশ্যই এরূপ একটি বিদ্যমান বস্তুর নাম, যেটি স্বীয় অস্তিত্বে কোন স্থানের মুখাপেক্ষী নয়। সেটি দেহাতীত জিনিস হোক। যেমন, আল্লাহ তা'আলা আকল, আত্মা ইত্যাদি অথবা স্থানাধিকারীই হোক যেমন, দেহ هيولى ও صورة جسمية ইত্যাদি। সেক্ষেত্রে তাদের মতে ওয়াজিব তা'আলার উপর جوهر শব্দটির ব্যবহার সিদ্ধ হওয়া উচিত বটে। তদুপরি তারা এটাকে জায়েয মনে করেন না। কারণ, তাদের মতে جوهر হল ممكن বা সম্ভাব্য বস্তুর একটি প্রকার। বিধায় তারা বলেন, মনে উদিত বিষয়গুলো দুই প্রকার। ওয়াজিব (অপরিহার্য সত্তা) এবং মুমকিন (সম্ভাব্য সত্তা)। এরপর মুমকিন দুই প্রকার। جوهر এবং عرض। তারা جوهر এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, এটি এরূপ একটি সম্ভাব্য বস্তু, যেটি নিজ অস্তিত্ব লাভের সময় কোন স্থানে হয়ে বিদ্যমান হবে না। মোটকথা, جوهر তাদের মতে সাম্ভব্য বস্তু আর সম্ভাব্যতা অপরিহার্যতার পরিপন্থী। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা جوهر হতে পারেন না।

قوله اما اذا اريد بهما الخ ঃ بهما জমীর দ্বারা جسم এবং جوهر উদ্দেশ্য। এটি ১টি উহ্য প্রশ্নের জবাব। প্রশ্ন হল, যদি বলেন– جسم এর অর্থ, স্বাধিষ্ঠ। আর جوهر এর অর্থ, এরূপ বিদ্যমান বস্তু, যার অস্তিত্ব কোন স্থানের অধীনস্থ নয়, তাহলে আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে جسم এর جوهر শব্দের ব্যবহার নাজায়েয কেন?

এর উত্তর হল ওয়াজিব আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে جسم এবং جوهر উপরিউক্ত অর্থে ব্যবহার করা কোন ক্ষতিকর নয় বটে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ সব শব্দের ব্যবহার আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে কয়েকটি কারণে নাজায়েয।

এক. শরী'আত অর্থাৎ কুরআন-হাদীস ওয়াজিব আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে এসব শব্দ ব্যবহার করেনি। আর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে সেসব নামই প্রয়োগ করা যাবে, যেগুলো কুরআন-হাদীসে রয়েছে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها –আল্লাহ অনেক গুণবাচক নাম রয়েছে, সে সব নামে তাকে ডাক।

দুই. جسم এবং جوهر শব্দ বললে বিবেক ধাবিত হয় আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে নাজায়েয বিষয়ের দিকে। যেমন, جسم শব্দটি থেকে مركب আর جوهر শব্দটি থেকে স্থানাধিকারী হওয়ার দিকে মন ধাবিত হয়। কেননা এগুলো প্রসিদ্ধ অর্থ। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে এ দুটি শব্দ ব্যবহার করা হলে শ্রোতার মন আল্লাহ তা'আলা মুরাক্কাব (সংযুক্ত) এবং متحيز (স্থানাধিকারী) হওয়ার দিকে চলে যাবে। অথচ তা নাজায়েয।

তিন. ফিরকায়ে মুজাসসিমা ওয়াজিব আল্লাহ তা'আলার জন্য সাধারণ দেহের মত দেহ থাকার দাবীদার, যার জন্য মুরাক্কাব এবং স্থান দখলকারী হওয়া আবশ্যক। অনুরূপভাবে খ্রিস্টানরা ওয়াজিব তা'আলাকে তিন অংশ তথা পিতা, পুত্র এবং পবিত্রাত্মার সমন্বয়ে গঠিত জাওহার সাব্যস্থ করে। সুতরাং আমরা অবশ্য ওয়াজিব তা'আলাকে এ অর্থে جسم এবং جوهر বলি না, যে অর্থে مجسمة এবং খ্রিস্টানরা বলে থাকে। আমরা বরং جسم এবং جوهر উপরিউক্ত অর্থেই বলব, যেগুলোতে অর্থগত দিক দিয়ে কোন সমস্যা নেই। তদুপরি جسم শব্দ ব্যবহারে ফিরকায়ে মুজাসসিমার সাথে এবং جوهر শব্দ ব্যবহারে খ্রিস্টানদের সাথে অবশ্যই সামঞ্জস্য সৃষ্টি হবে। আর এ কাজ من تشبه بقوم فهو منهم মূলনীতির আলোকে শরী'আত মতে নিষিদ্ধ। কাজেই আল্লাহ তা'আলাকে جسم অথবা جوهر বলা নাজায়েয।

قَوْلُهُ ذَهَابُ الْمُجَسِّمَةِ ঃ এটিও আতফ হয়েছে عَدَمُ وُرُوْدِ الشَّرْعِ এর ওপর। কোন কোন সংস্করণে এখানে ذَهَبَ শব্দ আছে।

قَوْلُهُ بِالْمَعْنَى الَّذِىْ الخ ঃ جسم এর অর্থ সমূহের মধ্যে مُرَكَّب এবং مُتَحَيِّز হওয়া থেকে আল্লাহ তা'আল পুতঃপবিত্র। আর جَوْهَر এর অর্থসমূহের মধ্যে তিন অংশ সংযুক্ত বা মুরাক্কাব হওয়া থেকে আল্লাহ তা'আলা পুতঃপবিত্র।

فَإِنْ قِيْلَ فَكَيْفَ يَصِحُّ اِطْلَاقُ الْمَوْجُوْدِ وَالْوَاجِبِ وَالْقَدِيْمِ وَنَحْوِ ذٰلِكَ مِمَّا لَمْ يَرِدْ بِهِ الشَّرْعُ قُلْنَا بِالْاِجْمَاعِ وَهُوَ مِنْ اَدِلَّةِ الشَّرْعِ وَقَدْ يُقَالُ اِنَّ اللّٰهَ وَالْوَاجِبَ وَالْقَدِيْمَ اَلْفَاظٌ مُتَرَادِفَةٌ وَالْمَوْجُوْدُ لَازِمٌ لِلْوَاجِبِ وَاِذَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِاِطْلَاقِ اِسْمٍ بِلُغَةٍ فَهُوَ اِذْنٌ بِاِطْلَاقِ مَا يُرَادِفُهُ مِنْ تِلْكَ اللُّغَةِ اَوْ مِنْ لُغَةٍ اُخْرٰى وَمَا يُلَازِمُ مَعْنَاهَا وَفِيْهِ نَظَرٌ.

সহজ তরজমা

এখন যদি প্রশ্ন করা হয়, তাহলে কিভাবে مَوْجُوْد ، وَاجِب ، قَدِيم শব্দগুলো আল্লাহর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা জায়েয হয়, শরী'আত তো এসব শব্দও (আল্লাহর জন্য) উল্লেখ্য করেনি? আমরা প্রতি উত্তরে বলব, ইজমা -এর কারণে (এটা বৈধ)। কেননা ইজমাও একটি শরঈ প্রমাণ। আবার কখনও এরূপ উত্তর প্রদান করা হয়ে থাকে যে, ، قَدِيم وَاجِب ، اَللّٰه সবই সমার্থক শব্দ। আর مَوْجُوْد وَاجِب এর জন্য আবশ্যক। শরী'আত যখন কোন ভাষার একটি শব্দ প্রয়োগ করে, তখন এ শব্দটির সমার্থক শব্দ, চাই এ ভাষায় হোক কিংবা অন্য ভাষায় ব্যবহার করা কিংবা সে অর্থের জন্য আবশ্যক অর্থপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করা জায়েয বলে অনুমোদিত হয়। অবশ্য এ জবাবটি প্রশ্নসাপেক্ষ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

আল্লাহর জন্য ওয়াজিব, কাদীম, মওজূদ শব্দ ব্যবহার

শারেহ রহ. এখানে আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে جِسْم স্বাধিষ্ট অর্থে এবং جَوْهَر স্থান ব্যতিত বিদ্যমান অর্থে ব্যবহার করা নাজায়েয হওয়ার প্রথম দলীলের উপর একটি প্রশ্নোত্তর উল্লেখ করেছেন। প্রশ্ন হচ্ছে, যদি جسم এবং جوهر এর ব্যবহার উপরিউক্ত অর্থে শুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও শুধু এ কারণে নাজায়েয হয় যে, শরী'আত এ নামগুলো আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেনি, তাহলে ওয়াজিব এবং কাদীম ও মওজূদ শব্দ আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা বৈধ হয় কিভাবে? অথচ শরী'আতে আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে এসব নামেরও ব্যবহার নেই?

শারেহ রহ. এ প্রশ্নের জবাবে বলেন, এসব নামের ব্যবহার ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। আর ইজমাও শরী'আতের একটি দলীল– একথা শরী'আতের দলীল দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

শায়খ আবু মানসুর মাতরীদী রহ. এ আয়াতে দ্বারা ইজামা শরঈ প্রমাণ হওয়ার পক্ষে দলীল পেশ করেছেন। কেননা আল্লাহ এ উম্মতকে ন্যায়পরায়ণতার গুণে গুণান্বিত করেছেন। আর এ ন্যায়পরায়ণতার উপরই সাক্ষ্য এবং সাক্ষ্য গ্রহণ করা নির্ভর করে। যখন এ উম্মত কোন একটি বিষয়ের উপর ঐক্যমত হবে এবং সে বিষয়ে সাক্ষ্য দিবে, তখন তা গ্রহণ করা আবশ্যক। হাদীস শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, لَاتَجْتَمِعُ اُمَّتِىْ عَلَى الضَّلَالَةِ। আমার উম্মত ভ্রান্তির উপর একমত হবে না।

আরেকটি উত্তর

قَوْلُهُ : وَقَدْ يُقَالُ الخ ঃ কেউ কেউ উপরিউক্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন একটি ভূমিকার পর একটি মূলনীতির মাধ্যমে। ভূমিকাটি হল, আল্লাহ ওয়াজিব-কাদীম শব্দগুলো সমার্থক। মওজূদ শব্দটি ওয়াজিবের অর্থের জন্য আবশ্যক। এরপর মূলনীতি বর্ণনা করেছেন, শরী'আত যখন কোন ভাষার কোন শব্দ আল্লাহর ক্ষেত্রে ব্যবহার করে, তখন সে ভাষার বা অন্য কোন ভাষার সে সব শব্দেরও অনুমতি পাওয়া যায়, যেগুলো এর সমার্থক কিংবা

সেগুলোর অর্থের জন্য আবশ্যক। সুতরাং যেহেতু শরী'আত আরবী ভাষায় আল্লাহ শব্দ স্রষ্টার ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছে, সেহেতু এ শব্দটির সমার্থক শব্দ ওয়াজিব ও কাদীম এবং অন্য ভাষার সমার্থক শব্দ যেমন ফারসী খোদা শব্দ ব্যবহারের অনুমতিও হয়ে গেছে। আর ওয়াজিব শব্দ ব্যবহারের অনুমতি যখন পাওয়া গেল, তখন তার لَازِم مَعْنَى অর্থাৎ মওজুদ শব্দ ব্যবহারেরও অনুমতি হয়ে গেছে।

দ্বিতীয় জবাবটি দুর্বল

قَوْلُهُ فِيْهِ نَظَرٌ ঃ দ্বিতীয় উত্তরটি দুর্বলাকারে قَدْ يُقَالُ যোগে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, এতে তিনটি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

এক. আল্লাহ, ওয়াজিব, কাদীম সমার্থক শব্দ।

দুই. শরী'আত কতৃক আল্লাহর ক্ষেত্রে কোন শব্দ ব্যবহার তার সমার্থক শব্দ ব্যবহারের অনুমতি দেয়।

তিন. শরী'আত আল্লাহ ক্ষেত্রে কোন শব্দ ব্যবহার করলে তার আবশ্যকীয় অর্থবোধক শব্দের ব্যবহারেরও অনুমোদন পাওয়া যায়। শারেহ এর নিকট তিনটি বিষয়ই প্রশ্নসাপেক্ষ।

এক. কারণ تَرَادُفْ এর অর্থ হল, সমার্থবোধক হওয়া। অথচ উপরিউক্ত তিনটি শব্দের অর্থ এক নয়। আল্লাহ শব্দ جُزْئِىْ حَقِيْقِىْ এটি একটি নাম। আভিধানিক অর্থ উপাস্য বা এমন সত্তা, যার সম্পর্কে বিবেক কিংকর্তব্য বিমূঢ় ইত্যাদি। বায়যাবী শরীফে এ প্রসঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা রয়েছে। ওয়াজিব মানে অপরিহার্য। আর কাদীম শব্দের অর্থ, যার অস্তিত্বের সূচনা নেই– অনাদি। মোটকথা, উপরিউক্ত শব্দগুলোর অর্থই যখন ভিন্ন ভিন্ন, তখন শব্দগুলো সমার্থক বলা ঠিক নয়।

দুই. এমনিভাবে দ্বিতীয় বিষয়টিও প্রশ্নসাপেক্ষ। কারণ, শরী'আত যখন কোন একটি শব্দ আল্লাহর ক্ষেত্রে ব্যবহার করে, তখন তার সমার্থক শব্দের ব্যবহারের অনুমতি থাকে– একথাও স্বীকৃত নয়। কারণ, যেখানে শরী'আত আল্লাহর ক্ষেত্রে কোন শব্দ ব্যবহার করল। অথচ তার সমার্থবোধক আরেকটি শব্দের মধ্যে কোন ত্রুটি পাওয়া গেল, তাহলে তা আল্লাহর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা আদৌ বৈধ নয়। যেমন, শরী'আত আল্লাহর ক্ষেত্রে আলিম শব্দ ব্যবহার করেছে। (عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ) কিন্তু এর সমার্থক শব্দ আকিল (عَاقِل) শব্দ ব্যবহারে অনুমতি নেই। কেননা আকল শব্দটি কয়েদ এর অর্থ থেকে উদ্ভূত। এটি একটি দোষণীয় বিষয়। আর আকিল শব্দের ক্রিয়ামূল হল, আকল।

তিন. এমনিভাবে তৃতীয় বিষয়টিও প্রশ্ন সাপেক্ষে। কেননা আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে শরী'আত খালিক শব্দ ব্যবহার করেছে। সুতরাং خَالِقُ كُلِّ شَيْئٍ তথা সব কিছুর স্রষ্টা হওয়ার দ্বারা বাধ্যতামূলকভাবে বুঝা যায়, তিনি خَالِقُ الْخَنَازِيْرِ। কিন্তু এ শব্দটি আল্লাহর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা জায়েয নয়।

আল্লাহর নাম কি তাওফীকী ?

এখানে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ যে, আল্লাহর নাম تَوْفِيْقِىْ হওয়ার বিষয়টি বিতর্কিত। কোন কোন মুহাক্কিকের মতে বিভিন্ন ভাষায় আল্লাহর জন্য প্রণীত নামসমূহ যেমন ফার্সিতে খোদা, তুর্কিতে تَنْكِرِىْ শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন বিতর্ক নেই। বরং বিতর্ক হল, সেসব নাম ব্যবহারের ক্ষেত্রে যেগুলো সিফাত এবং ক্রিয়া থেকে উদ্ভূত। যেমন, কুরআনে এসেছে سَيَجْزِى اللّٰهُ الشَّاكِرِيْنَ। এখানে جُزِى ক্রিয়াটি আল্লাহর দিকে সম্বোধিত হয়েছে। তাহলে جُزِى শব্দ থেকে নির্গত ইসমে ফায়েল جَازِى আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে ব্যবহার করাও কি বৈধ হবে?

এতে মতপার্থক্য রয়েছে। মুতাযিলা এবং কাররামিয়াদের মতে প্রতিটি এমন অর্থবোধক শব্দ আল্লাহর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা জায়েয, যেগুলোর সাথে তার গুণান্বিত হওয়া বিবেকগ্রাহ্য। শরী'আত যদিও শব্দটি ব্যবহার না করে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, শরী'আতে আল্লাহর যেসব নাম প্রমাণিত, সে সব নামের সমার্থক শব্দ ব্যবহার করা বৈধ। শুধুমাত্র সেসব শব্দ ব্যতিক্রমভুক্ত যেগুলো কাফিরদের ভাষায় নির্ধারিত। কাযী আবু বকর বলেছেন, যেসব শব্দ এমন গুণ বুঝায় যেগুলো আল্লাহর জন্য প্রমাণিত এবং কোন দোষত্রুটির অর্থের কল্পনাও তার মাঝে উদয় হয় না, সেগুলো ব্যবহার করা জায়েয। কারও কারও মতে ত্রুটির কল্পনা সৃষ্টি করে, এমন না হওয়ার সাথে সাথে শব্দগুলো মাহাত্ম এবং বড়ত্বের অর্থবোধক হওয়ারও শর্ত আছে। ইমাম গাযযালী রহ. বলেছেন, যে শব্দ কোন গুণ বুঝায় সেগুলো ব্যবহার করা জায়েয। কিন্তু যে সব শব্দ সত্তা বুঝায়, সেগুলো ব্যবহার করা জায়েয নয়। শায়খ আবুল হাসান আশআরী শরী'আতের পক্ষ থেকে অনুমোদনকে আবশ্যক সাব্যস্ত করেছেন। শরহে মাওয়াকিফ গ্রন্থে একেই পছন্দনীয় মত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যেন শায়খ আশ'আরী রহ. এর মতে এটা তাওফীকী। কিন্তু কোন

কোন আলেম আল্লাহর নামসমূহ তাওফীকী হওয়ার বিষয়টিকে প্রশ্নসাপেক্ষ অভিহিত করেছেন। কেননা আল্লাহর নাম সিফাত, তুর্কী, ফার্সী, হিন্দি ইত্যাদি বিভিন্ন ভাষায় রয়েছে। সেসব নামের মধ্য হতে কোন কোনটি কুরআন-হাদীসে নেই। এতদসত্ত্বেও সেসব নাম আল্লাহর ক্ষেত্রে ব্যবহার করার ব্যাপারে মুসলমানদের ঐক্যমত রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا –এ আয়াতে কারীমা দ্বারা আল্লাহর নাম তাওকীফী হওয়ার ক্ষেত্রে প্রমাণ দেওয়া শুদ্ধ নয়। কারণ, এ আয়াতে নামসমূহে حُسْنٰى গুণের সাথে গুণান্বিত করা হয়েছে। আর নামের মধ্যে সৌন্দর্য সৃষ্টি হবে প্রশংসা এবং মাহাত্ম্য সূচক গুণাবলী বুঝানোর কারণেই। সুতরাং যেসব নাম প্রশংসা এবং মাহাত্মের গুণ বুঝায়, সেগুলো اَلْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى এর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর ক্ষেত্রে এগুলোর ব্যবহারও বৈধ হবে।

وَلَا مُصَوَّرٍ اَىْ ذِىْ صُوْرَةٍ وَشَكْلٍ مِثْلِ صُوْرَةِ اِنْسَانٍ اَوْ فَرَسٍ لِاَنَّ تِلْكَ مِنْ خَوَاصِّ الْاَجْسَامِ تَحْصُلُ لَهَا بِوَاسِطَةِ الْكَمِّيَّاتِ وَالْكَيْفِيَّاتِ وَاِحَاطَةِ الْحُدُوْدِ وَالنِّهَايَاتِ وَلَا مَحْدُوْدٍ اَىْ ذِىْ حَدٍّ وَنِهَايَةٍ وَلَا مَعْدُوْدٍ اَىْ ذِىْ عَدَدٍ وَكَثْرَةٍ يَعْنِىْ مَحَلًّا لِلْكَمِّيَّاتِ وَالْمُتَّصِلَةِ كَالْمَقَادِيْرِ وَلَا الْمُنْفَصِلَةِ كَالْاَعْدَادِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلَا مُتَبَعِّضٍ وَلَامُتَجَزٍّ اَىْ ذِىْ اَبْعَاضٍ وَاَجْزَاءٍ وَلَا مُتَرَكِّبٍ مِنْهَا لِمَا فِىْ كُلِّ ذٰلِكَ مِنَ الْاِحْتِيَاجِ الْمُنَافِىْ لِلْوُجُوْبِ فَمَا لَهٗ اَجْزَاءٌ يُسَمّٰى بِاعْتِبَارِ تَاَلُّفِهٖ مِنْهَا مُتَرَكِّبًا وَبِاعْتِبَارِ اِنْحِلَالِهٖ اِلَيْهَا مُتَبَعِّضًا وَمُتَجَزِّيًا وَلَا مُتَنَاهٍ لِاَنَّ ذٰلِكَ مِنْ صِفَاتِ الْمَقَادِيْرِ وَالْاَعْدَادِ

সহজ তরজমা

তিনি কোন আকার-আকৃতি বিশিষ্ট নন। যেমন আকৃতি হয়ে থাকে মানুষ-অশ্ব ইত্যাদির। কেননা আকার-আকৃতি হল, দেহ বা কায়ার বৈশিষ্ট্য, যা সাধারণতঃ মাত্রা, ধরন ও সীমা-পরিসীমার পরিবেষ্টনের ফলে হয়ে থাকে। আল্লাহর মধ্যে সংখ্যা ও আধিক্য নেই। অর্থাৎ স্রষ্টা كَمِّيَّتْ مُتَّصِلَه ও كَمِّيَّتْ مُنْفَصِلَه যেমন, পরিমাণ ও সংখ্যার স্থান নন। এ তো সুস্পষ্ট বিষয়। তিনি সংখ্যা বিশিষ্টও নন, বিভিন্ন অংশ দ্বারাও গঠিত নন। কারণ, এসবে পরমুখাপেক্ষিতা বিদ্যমান, যা অপরিহার্যতার পরিপন্থী। অতঃপর যে বস্তুর অংশ রয়েছে, সে অংশগুলোর দ্বারা গঠিত ও সংযুক্ত হিসেবে সেটাকে مُتَرَكِّبْ বলা হয়। আবার বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হওয়া হিসেবে বলা হয় مُتَبَعِّضْ مُتَجَزِّىْ এবং তিনি সীমাবদ্ধও নন। কেননা এটা পরিমাণ ও সংখ্যার বৈশিষ্ট্য।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

আল্লাহ পাকের কোন আকার-আকৃতি নেই

قَوْلُهٗ : تَحْصُلُ لَهَا الخ ঃ شَكْل এরূপ একটি অবস্থার নাম, যা এক বা একাধিক সীমার কোন মাত্রা তথা দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, পুরুত্ব বা ঘনত্ব পরিপূর্ণরূপে পরিবেষ্টন করার ফলে অর্জিত হয়। যেমন, শুধু একটি সীমা দ্বারা যদি পরিপূর্ণরূপে পরিবেষ্টিত হয়, তাহলে সেটাকে বলবেন شَكْل مُدَوَّر বা গোল চক্র। আর যদি তিনটি সীমা দ্বারা পরিপূর্ণরূপে পরিবেষ্টিত হয়, তাহলে সে আকৃতিকে বলা হয় شَكْل مُثَلَّث বা ত্রিকোণ বিশিষ্ট, ত্রিভূজ। এবার লক্ষ্য করুন! شَكْل এর সংজ্ঞায় আলোচিত আকৃতি ও هَيْئَت হল, একটি كَيْفِيَّت বা ধরন। আর কথিত মাত্রাটি كَمِّيَّات এর অন্তর্ভুক্ত। এরূপভাবে اِحَاطَه حُدُوْد বা সীমা কর্তৃত পরিবেষ্টন এর কথা আলোচিত হয়েছে। আর كَمِّيَّات ও كَيْفِيَّات এর সাথে গুণান্বিত হওয়া দেহসমূহের বৈশিষ্ট্য। দেহসমূহের জন্য আকার-আকৃতি হবে। شَكْل ও صُوْرَة হবে। অথচ আল্লাহ তা'আলা কোন দেহ নেই। বিধায় তার কোন রূপ-আকৃতিও নেই।

قَوْلُهٗ : بِوَاسِطَةِ الْكَمِّيَّاتِ الخ ঃ যেমন, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, ঘনত্ব। **قَوْلُهٗ اَلْكَيْفِيَّاتِ** ঃ যেমন, রং, সরল হওয়া বাঁকা হওয়া।

كَمْ দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

قَوْلُهُ : يَعْنِي لَيْسَ مَحَلًّا الخ ঃ এখানে বিশদভাবে বলতে হয় যে, كَمْ দ্বারা এরূপ একটি যোগিক বস্তু উদ্দেশ্য যা প্রত্যক্ষভাবে বিভাজ্য। এটি দুই প্রকার। **এক.** كَمْ مُتَّصِل যদ্দারা এরূপ একটি যৌগিক বস্তু উদ্দেশ্য। সেটিকে যখনই ভাগ করা হবে তখন তার দুটি অংশের জন্য কোন হদ্দে মুশতারাক বা যৌথ প্রান্ত হবে। যাকে উভয় অংশে প্রত্যেকটিরই সীমা মনে করা যায়। যেমন, এক বিঘৎ দীর্ঘ একটি রেখার অর্ধাংশে একটি বিন্দু মেনে নিলে এই রেখাটির অর্ধেক অর্ধবিঘতের দুইটি অংশের দিকে ভাগ হয়ে যাবে। এ বিন্দুটি উভয় অংশের জন্য حَدّ مُشْتَرِك বা যৌথ প্রান্ত। কারণ, যদি সে বিন্দুটি রেখার এক অংশের শেষ প্রান্ত হয়, তাহলে দ্বিতীয় অংশের শুরু প্রান্তও। এরপর এ كَمْ مُتَّصِل যদি غَيْرُ قَارِّ الذَّاتِ তথা এর অংশগুলো এক সাথে অবিদ্যমান হয়, তাহলে সেটিকে বলা হয় কাল। কেননা এর অংশগুলো এক সাথে অস্তিত্ব লাভ করে না বরং একটির পর একটি অস্তিত্ব লাভ করে। আর যদি হয় قار الذات অর্থাৎ তার অংশগুলো এক সাথে মওজুদ হয়, তাহলে সেটাকে مِقْدَار বা পরিমাণ বলবে। এটি আবার তিন প্রকার। প্রথমতঃ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, ঘনত্ব তিন দিক দিয়েই বিভাজ্য হলে তাকে বলবে جِسْم تَعْلِيمِي (দেহ) বলে। শুধু দুই দিক তথা দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে বিভাজ্য হলে তাকে বলবে سَطْح বা পৃষ্ঠ। আর মাত্র একদিক দিয়ে তথা কেবল দৈর্ঘে বিভাজ্য হলে, তাকে বলা হবে خَط বা রেখা। উপরিউক্ত বিবরণ থেকে বুঝা গেল, কায়া রেখা এবং পৃষ্ঠ সবগুলোই كَمْ مُتَّصِل এর প্রকার। এতে রেখা বা خَط হল سَطْح এর শেষ প্রান্ত। আর سَطْح জিসম এর শেষ প্রান্ত। মুছান্নিফ রহ. لَامَحْدُوْد শব্দ এনে ইংগিত করেছেন, আল্লাহ তা'আলা كَمِّيَّات مُتَّصِلَه এর স্থান নন।

দুই. كَمْ مُنْفَصِل। এর দ্বারা উদ্দেশ্য এরূপ একটি আরয, সেটাকে যখন ভাগ করা হবে, তখন তার উভয় অংশের জন্য حَدّ مُشْتَرِك হবে না। আর كَمْ مُنْفَصِل হল সংখ্যা। যেমন, দশ সংখ্যাকে আমরা এরূপ ভাগ করলাম যে, এ দিকে ছয় অপর দিকে চার। তাহলে চার এবং দুয়ের মাঝখানে কোন সংখ্যা حَدّمُشْتَرِك বা যৌথ নেই। যেটি উভয় দিকে ধর্তব্য। অন্যথায় দুটি দিকে এ সংখ্যাটি ধর্তব্য হলে চার আর চার থাকবে না বরং পাঁচ হয়ে যাবে। তদ্রূপ ছয় আর ছয় থাকবে না বরং সাত হয়ে যাবে। মোটকথা, সংখ্যা যখন كَمْ مُنْفَصِل হয় তখন মুছান্নিফ রহ. وَلَامَعْدُوْد বলে ইংগিত করেছেন, আল্লাহ তা'আলা كَمِّيَّات مُنْفَصِلَه এর স্থানও নন।

قَوْلُهُ: لِمَا فِي ذٰلِكَ ঃ এখানে ذٰلِكَ শব্দ দ্বারা تَبَعُّض- تَجَزِّيْ এবং تَرَكُّب এর প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ فَمَا لَهُ أَجْزَاء ঃ শারেহ রহ. تَبَعُّض এবং تَرَكُّب এর মাঝে আপেক্ষিক পার্থক্য বর্ণনা করছেন। মোটকথা, যে জিনিসের জন্য শাখা বা অংশ আছে, সেগুলোর মধ্যে দুটি দিক রয়েছে। **এক.** সে সব অংশ দ্বারা এগুলো গঠিত এবং সেই অংশগুলোর সমষ্টি, এ হিসেবে সেটাকে مُتَرَكِّب বলা হয়। **দুই.** যদি সেটিকে বিভক্ত করা হয়, তাহলেও এসব অংশ বের হবে। এ হিসেবে একে مُتَبَعِّض এবং مُتَجَزِّي বলে।

وَلَايُوْصَفُ بِالْمَاهِيَةِ اَيْ اَلْمُجَانَسَةِ لِلْاَشْيَاءِ لِاَنَّ مَعْنٰى قَوْلِنَا مَاهُوَ مِنْ اَيِّ جِنْسٍ هُوَ وَالْمُجَانَسَةُ تُوْجِبُ التَّمَائُزَ عَنِ الْمُتَجَانِسَاتِ بِفُصُوْلٍ مُقَوِّمَةٍ فَيَلْزَمُ التَّرْكِيْبُ وَلَا بِالْكَيْفِيَّةِ مِنَ اللَّوْنِ وَالطُّعْمِ وَالرَّائِحَةِ وَالْحَرَارَةِ وَالْبُرُوْدَةِ وَالرُّطُوْبَةِ وَالْيُبُوْسَةِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ مِمَّا هُوَ مِنْ صِفَاتِ الْاَجْسَامِ وَتَوَابِعِ الْمِزَاجِ وَالتَّرْكِيْبِ .

সহজ তরজমা

তিনি مَاهِيَت তথা বিভিন্ন দ্রব্যের সমাজাতীয়তা গুণে গুণান্বিত নন। কেননা আমাদের উক্তি مَاهُوَ এর অর্থ হল, এটা কোন জাতীয়? সমাজাতীয়তা অংশীদার বস্তু সমূহের হতে فُصُوْل ذَاتِيَه দ্বারা পার্থক্য করাকে আবশ্যক করে। অতএব সংযুক্তি আবশ্যক হয়ে দাঁড়াবে। এবং সৃষ্টিকর্তা ধরন যেমন রং, স্বাদ, গন্ধ, উষ্ণতা, শৈত্ব, আদ্রতা, শষ্কতা ইত্যাদি ধরনের গুণে গুণান্বিত নন, যেগুলো দেহের সিফাত, সংমিশ্রণ ও সংযুক্তির অধীনস্থ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : اَي الْمُجَانَسَةُ ঃ শারেহ রহ. مَاهِيَت শব্দের অর্থ করেছেন مُجَانَسَت তথা সমজাতীয় হওয়া। স্বপক্ষে দলীল স্বরূপ বলেছেন, مَاهِيَت শব্দটি مَاهُوَ থেকে গৃহীত। আর مَاهُوَ দ্বারা কোন বস্তুর জাত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। কিন্তু

আল্লাহ তা'আলা সমজাতীয়তা থেকে পবিত্র কেন? এর কারণ হল, যদি আল্লাহ তা'আলা সমজাতীয় হন অর্থাৎ তার কোন জিন্‌স থাকে, যার মধ্যে বিভিন্ন হাকীকতের অনেকগুলো বস্তু অংশীদার। তাহলে সেই সমাজাতীয় জিনিসগুলো থেকে তাকে পৃথক করার জন্য এরূপ কোন فَصْل এর প্রয়োজন হবে, যা এটাকে প্রতিষ্ঠিত করবে। এখানে চয়িত مُقَوِّم শব্দটি قَوَام থেকে উদ্ভুত। যার অর্থ, জাত বা সত্তার অন্তর্ভুক্ত বস্তু। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই جِنْس এবং فَصْل দ্বারা মুরাক্কাব (গঠিত) হবেন। আর মুরাক্কাব হওয়া মানে মুখাপেক্ষীতা, যা সম্ভাব্য বস্তুর বৈশিষ্ট্য। অথচ সম্ভাব্যতা অপরিহার্যতার পরিপন্থী।

জ্ঞাতব্য, শারেহ রহ. "শরহে মাকাসিদে" লিখেছেন, এ বর্ণনাটি আদৌ শুদ্ধ নয় যে, ইমাম আবু হানীফা রহ. বলতেন "আল্লাহ তা'আলার এরূপ مَاهِيَت রয়েছে, যা শুধু তিনিই জানেন। কারণ, এ বর্নগুণটি ইমাম সাহেব রহ. এর কিতাবে নেই; তার এমন কোন শিষ্যও তাঁর থেকে বর্ণনা করে নি, যারা তাঁর মাযহাব সম্পর্কে উত্তমরূপে ওয়াকিফহাল ছিলেন। তদুপরি মেনে নিলাম এ বর্ণনাটি বিশুদ্ধ, তথাপি مَاهِيَت দ্বারা নাম উদ্দেশ্য হবে। কারণ, مَا শব্দটি কোন বস্তুর নাম জিজ্ঞেস করার জন্যও ব্যবহৃত হয়। যেমন, শায়খ আবু মানসুব মাতুরীদি রহ. বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তি আমাদের কাজ থেকে আল্লাহর সম্পর্কে প্রশ্ন করে, مَاهُوَ দ্বারা তাহলে আমরা প্রশ্ন করব, مَاهُوَ দ্বারা তোমার কি উদ্দেশ্য? যদি مَاهُوَ দ্বারা مَااِسْمُهٗ উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এর জবাব হবে– আল্লাহ রহমান, রাহীম। আর যদি مَا দ্বারা সিফাত উদ্দেশ্য হয়, তাহলে জবাব হবে, তিনি سَمِع - بَصِير সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। আর যদি مَا فِعْلُهٗ হয়, তাহলে জবাব হবে, মাখলুকাত সৃষ্টি করা এবং প্রতিটি বস্তুকে যথাস্থানে রাখা। আর مَا দ্বারা مَاهِيَت উদ্দেশ্য হলে জবাব হবে, তিনি সাদৃশ এবং جِنْس থেকে পবিত্র।

শায়খ রহ. এর এ বিস্তারিত উক্তির প্রথম অংশ দ্বারা বুঝা যায়, শব্দটি কোন বস্তুর নাম জিজ্ঞেস করার জন্য ব্যবহার হয়। শেষাংশে এসে আরও জানা গেল, مَا শব্দটি কোন বস্তুর জিন্‌স সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য আসে। مَا هِيَت শব্দের অর্থ হচ্ছে مُجَانَسَت তথা সমজাতীয়তা।

قَوْلُهٗ : وَلَابِالْكَيْفِيَّةِ ঃ ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলার جِسْم নন। ফলে সমস্ত কাইফিয়াত বা ধরনও আল্লাহ তা'আলা থেকে অস্বীকৃত হয়েছে। চাই সেগুলোর অনুভব পঞ্চইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে হোক, যেমন– ঘ্রাণ, স্বাদ, উষ্ণতা, শৈত্ব অথবা সেগুলো অনুভব হোক আভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয় দ্বারা। যেমন– আনন্দ, বেদনা ইত্যাদি।

قَوْلُهٗ : مِنْ تَوَابِعِ الْمِزَاجِ الخ ঃ কতগুলো বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য এবং ক্রিয়ার অধিকারী বস্তুর পারস্পারিক সংযুক্তি ও সংমিশ্রণের ফলে সৃষ্ট একটি মধ্যম ধরনের অবস্থাকে বলে مِزَاج। এখানে مِزَاج শব্দটি بَاب مُفَاعَلَه এর ক্রিয়ার মূল مُمَازَجَة এর অর্থে চয়িত হয়েছে। যার অমিশ্রণ, পরস্পর মিলিত হওয়া, কারণ, فِعَال শব্দ مُفَاعَلَه এর মূলধাতু। মোটকথা, কাইফিয়ত হল, পারস্পরিক সংমিশ্রণ ও সংযুক্তির ফল। আল্লাহ তা'আলা এরূপ সংমিশ্রণ ও সংযুক্তি থেকে পবিত্র।

وَلَا يَتَمَكَّنُ فِىْ مَكَانٍ لِاَنَّ التَّمَكُّنَ عِبَارَةٌ عَنْ نُفُوْذِ بُعْدٍ فِىْ آخَرَ مُتَوَهَّمٍ اَوْ مُتَحَقِّقٍ يُسَمُّوْنَهُ الْمَكَانَ، وَالْبُعْدُ عِبَارَةٌ عَنْ اِمْتِدَادٍ قَائِمٍ بِالْجِسْمِ اَوْ بِنَفْسِهٖ عِنْدَ الْقَائِلِيْنَ بِوُجُوْدِ الْخَلَاءِ . وَاللّٰهُ تَعَالٰى مُنَزَّهٌ عَنِ الْاِمْتِدَادِ وَالْمِقْدَارِ لِاسْتِلْزَامِهِ التَّجَزِّىْ. فَاِنْ قِيْلَ الْجَوْهَرُ الْفَرْدُ مُتَحَيِّزٌ وَلَا بُعْدَ وَاِلَّا لَكَانَ مُتَجَزِّيًا . قُلْنَا اَلْمُتَمَكِّنُ اَخَصُّ مِنَ الْمُتَحَيِّزِ لِاَنَّ الْحَيِّزَ هُوَالْفَرَاغُ الْمُتَوَهَّمُ الَّذِىْ يَشْغُلُهٗ شَيْئٌ مُمْتَدٌّ اَوْ غَيْرُ مُمْتَدٍّ فَمَا ذُكِرَ دَلِيْلٌ عَلٰى عَدَمِ التَّمَكُّنِ فِى الْمَكَانِ وَاَمَّا الدَّلِيْلُ عَلٰى عَدَمِ التَّحَيُّزِ فَهُوَ اَنَّهٗ لَوْ تَحَيَّزَ فَاِمَّا فِى الْاَزَلِ فَيَلْزَمُ قِدَمُ الْحَيِّزِ اَوْلَا فَيَكُوْنُ مَحَلًّا لِلْحَوَادِثِ وَاَيْضًا اِمَّا اَنْ يُسَاوِىَ الْحَيِّزَ اَوْ يَنْقُصَ عَنْهُ فَيَكُوْنُ مُتَنَاهِيًا اَوْ يَزِيْدَ عَلَيْهِ فَيَكُوْنُ مُتَجَزِّيًا .

সহজ তরজমা

সৃষ্টিকর্তা কোন স্থানে অধিষ্ঠিত নন। কারণ, تَمَكُّن এর অর্থ, কোন একটি মাত্রার অন্য একটি কল্পিত অথবা বিদ্যমান মাত্রায়– যাকে স্থান বলে, তাতে দাখিল হওয়া, بُعْد দ্বারা উদ্দেশ্য (সে ত্রিমাত্রা তথা দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, গভীরতা) যে মাত্রা শরীরের সাথে প্রতিষ্ঠিত অথবা স্বাধিষ্ঠ হয় শূন্যতার প্রবক্তাদের মতে। আর আল্লাহ তা'আলা মাত্রা ও পরিমাণ থেকে পবিত্র। কেননা তা বিভক্তি-বিভাজনকে আবশ্যক করে। সুতরাং যদি বলা হয়, لَايَتَجَزّٰى তথা পরমাণু مُتَحَيِّز তথা স্থান গ্রহণকারী। কারণ حَيِّز এরূপ একটি কল্পিত শূন্য স্থান, যার মধ্যে কোন বস্তু দাখিল হয়, চাই সে বস্তুটি মাত্রাবিশিষ্ট হোক বা না হোক। সুতরাং উল্লেখিত প্রমাণটি সৃষ্টিকর্তার কোন স্থানে অধিষ্ঠিত না হওয়ার দলীল। বাকী রইল مُتَحَيِّز না হওয়ার দলীল। সেটি হচ্ছে, যদি সৃষ্টিকর্তা কোন স্থানে مُتَحَيِّز তথা স্থানাধিকারী হন, তাহলে হয়ত অনাদিকালেই হবেন। এমতাবস্থায় সুনিশ্চিতরূপে حَيِّز বা স্থানটির অনাদি হবে। অথবা অনদিকালে স্থান গ্রহণকারী হবেন না। তবে তো তিনি অবিনশ্বর বস্তু সমূহের স্থান হয়ে যাবেন। তাছাড়া তিনি সে স্থানটির সমান হবেন অথবা তা থেকে ছোট হবেন। এমতাবস্থায় তিনি সীমাদ্ধ হয়ে পড়বেন। কিংবা স্থান থেকে বড় হবেন, তবে তো তিনি বিভক্ত হয়ে পড়বেন ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ وَلَا يَتَمَكَّن الخ ঃ تَمَكُّن শব্দের আভিধানিক অর্থ, كَوْن فِى الْمَكَانِ তথা কোন স্থানে বিদ্যমান হওয়া। কাজেই يَتَمَكَّن শব্দের পর فِى مَكَانٍ বলার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু কদাচিৎ শব্দটি কুদরত বা ক্ষমতার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। বিধায় فِىْ مَكَانٍ শব্দটি বাড়িয়ে গ্রন্থকার বুঝালেন, এখানে দ্বিতীয় অর্থ উদ্দেশ্য নয়। তাছাড়া কোন বস্তুর কোন স্থানে বিদ্যমান হওয়ার অর্থ হচ্ছে, সে বস্তুটি তার অস্তিত্বে উক্ত স্থানের মুখাপেক্ষী।

আল্লাহ তা'আলাকি কোন স্থানে সমাসীন

قَوْلُهٗ لِاَنَّ التَّمَكُّن الخ ঃ মুতাকাল্লিমীন এবং শূন্যের প্রবক্তা ইশারাকিয়্যাদের নিকট মাত্রা দুই প্রকার। একটি দেহের সাথে প্রতিষ্ঠিত। অপরটি দেহাতীত এবং স্বাধিষ্ঠ। অর্থাৎ কোন দেহ যদি সে স্থানটিকে পরিপূর্ণ করে না রাখে এবং তার মধ্যে প্রবিষ্ঠ না হয়, তাহলে সেটি হবে শুধুমাত্র শূন্য। মুতাকাল্লিমীন এবং ইশরাকিয়্যারা শূন্যস্থান খ্যাত এ দ্বিতীয় মাত্রাটিকে مَكَان বা স্থান বলেন। পার্থক্য কেবল এতটুকু যে, মুতাকাল্লিমীন এ মাত্রাকে দেহাহীত এবং কাল্পনিক সাব্যস্ত করেন। আর ইশরাকিয়্যা এটাকে বিদ্যমান সাব্যস্ত করেন। যেন দেহ তার মাত্রা পরিমাণ যে শূন্যস্থান পরিপূর্ণ করে রাখে, সেই শূন্যস্থানটুকুই অর্থাৎ দেহাতীত স্বাধিষ্ঠ মাত্রার মধ্যে দেহের মাত্রা প্রবিষ্ঠ হওয়ার নাম তামাক্কুন। সে মতে মুতামাক্কিন হবে সেই বস্তু, যেটির মাত্রা এবং পরিমাণ রয়েছে। আর মাত্রা এবং পরিমাণ বিভক্তি ও বিভাজনকে আবশ্যক করে। ফলে আল্লাহ তা'আলা এ মাত্রা থেকে পবিত্র। বিধায় তিনি এ তামাক্কুন (স্থান গ্রহণ) থেকেও পবিত্র।

قَوْلُهٗ عَنْ نُفُوْذِ بُعْدٍ ঃ এখানে দেহের সাথে প্রতিষ্ঠিত মাত্রা উদ্দেশ্য। **قَوْلُهٗ فِىْ بُعْدٍ اٰخَرَ ঃ** এখানে দেহাতীত বস্তু, যেটি مَكَان বা স্থান সে মাত্রা উদ্দেশ্য। **قَوْلُهٗ مُتَوَهَّم ঃ** এটি মুতাকাল্লিমীনের অভিমত। **قَوْلُهٗ اَوْمُتَحَقِّق ঃ** এটি ইশরাকিয়্যার মত। **قَوْلُهٗ اِمْتِدَاد قَائِم بِالْجِسْم ঃ** এখানে দেহের মাত্রা উদ্দেশ্য। **قَوْلُهٗ اَوْبِنَفْسِهٖ ঃ** এখানে মাকান ব্যতি দেহাতীত মাত্রা উদ্দেশ্য।

মাত্রা বিহীন পরমাণু কি মুতাহাইয়্যিয হয় ?

قَوْلُهٗ فَاِنْ قِيْلَ الخ ঃ এখানে تَمَكُّن এর উপরিউক্ত সংজ্ঞার উপর একটি প্রশ্নোত্তর বর্ণনা করা হয়েছে। বস্তুতঃ حَيِّز এবং مَكَان এর মাঝে পার্থক্য ছাড়াই উভয়টিকে এক মনে করার দরুন এ প্রশ্নের সৃষ্টি হয়। আর উত্তরের উৎস হল, উভয়টির মাঝে পার্থক্য করা। প্রশ্নটি হল, تَمَكُّن এর উপরিউক্ত অর্থ মতে مَكَان এবং حَيِّز এরূপ বস্তুর জন্যই হবে, যার মধ্যে মাত্রা এবং পরিমাণ রয়েছে। অথচ جَوْهَرفَرْد তথা جُزْء لَايَتَجَزّٰى (পরমাণু) مُتَحَيِّز বা স্থান গ্রহণকারী। তদুপরি তাতে কোন প্রকার মাত্রা এবং পরিমাণ নেই। অন্যথায় সেটি جُزْء لَايَتَجَزّٰى হত না বরং বিভক্ত হত।

জবাবের সারকথা হল, حَيِّز এবং مَكَان দুটি এক বিষয় নয় বরং মাকান اَخَصّ। কেননা مَكَان এরূপ বস্তুর জন্যই হয়, যার মধ্যে মাত্রা ও পরিমাণ আছে। কিন্তু حَيِّز এর বিপরীত। এটি এরূপ বস্তুর জন্যও হয়, যেটির মাত্রা

এবং পরিমাণ আছে। যেমন, দেহ। আবার যেটির মাত্রা এবং পরিমাণ নেই সেটির জন্যও হয়। যেমন, جَوْهَرفَرْد। সুতরাং جَوْهَر فَرْد مُتَحَيِّز মুতামাক্কিন নয়।

قَوْلُهٗ فَمَا ذُكِرَ الخ ঃ শারেহ যখন مَكَان এবং حَيِّز এর মাঝে পার্থক্য স্পষ্ট করে দিলেন এবং বুঝা গেল, আল্লাহ তা'আলার জন্য মাকান-স্থান নেই, কিন্তু এতে তার জন্য حَيِّز নেই বলে বুঝা যায়নি। সুতরাং مُتَحَيِّز হওয়ার বিষয়টিও তার থেকে প্রত্যাখ্যান করা আবশ্যক হয়ে গেল। গ্রন্থকার আল্লাহ থেকে تَحَيُّز বাদ দেওয়ার লক্ষ্যে দুটি দলীল উল্লেখ করেছেন।

(১) প্রথমতঃ আল্লাহ তা'আলা যদি مُتَحَيِّز হন অর্থাৎ কোন স্থানে সমাসীন হন, তাহলে সেখানে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে। **(ক)** অনাদি কাল থেকেই তিনি সেখানে সমাসীন হবেন। আর এটা তখনই হবে যখন حَيِّز বা স্থানটি হবে অনাদি। এমতাবস্থায় حَيِّز অনাদি এবং সুপ্রাচীন হওয়া আবশ্যক হবে। অথচ এটা বাতিল। কেননা حَيِّز বিশ্বজগতের অন্তর্ভূক্ত হওয়ার দরুণ নশ্বর।

খ. অনাদিকালের পর مُتَحَيِّز হবেন। অর্থাৎ অনাদি কালে حَيِّز ছিলেন না, পরবর্তীতে আস্তিত্ববান হয়েছেন। অথচ অস্তিত্বহীনতার পর অস্তিত্ব লাভকারী বস্তু নশ্বর। কাজেই আল্লাহ তা'আলা নশ্বর বস্তুর স্থান হওয়া আবশ্যক হবে। অথচ এটাও বাতিল। সুতরাং مُتَحَيِّز হওয়ার দুটি পদ্ধতিই যখন বাতিল হয়ে গেল, তখন তার مُتَحَيِّز হওয়াও বাতিল।

(২) দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ তা'আলার জন্য সাব্যস্থকৃত حَيِّز স্থানটি আল্লাহর সমান হবে অথবা কম হবে অথবা বেশী। প্রথম এবং দ্বিতীয় পদ্ধতিটি বাতিল। কেননা স্থান হল সীমিত। আর যে জিনিস সীমিত জিনিসের সমান অথবা তার চেয়ে ছোট হবে, সেটিও সীমাবদ্ধ হবে। অথচ আল্লাহ তা'আলার জন্য সীমিত হওয়া বাতিল। তৃতীয় পদ্ধতিটিও বাতিল। কেননা এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার জন্য বিভাজন আবশ্যক হবে। আল্লাহ তা'আলার একাংশ হবে স্থানের ভিতর; অপর অংশ হবে স্থান থেকে বাড়তি এবং স্থান বহির্ভূত। সুতরাং উপরিউক্ত তিনটি পন্থাই যখন বাতিল সাব্যস্ত হল, তখন আল্লাহ তা'আলার مُتَحَيِّز হওয়াও বাতিল প্রমাণিত হল।

وَاِذَا لَمْ يَكُنْ فِىْ مَكَانٍ لَمْ يَكُنْ فِىْ جِهَةٍ لَا عُلْوٍ وَلَا سِفْلٍ وَلَا غَيْرِهِمَا لِاَنَّهَا اِمَّا حُدُوْدٌ وَاَطْرَافٌ لِلْاَمْكِنَةِ اَوْ نَفْسُ الْاَمْكِنَةِ بِاعْتِبَارِ عُرُوْضِ الْاِضَافَةِ اِلٰى شَيْءٍ وَلَا يَجْرِىْ عَلَيْهِ زَمَانٌ لِاَنَّ الزَّمَانَ عِنْدَنَا عِبَارَةٌ عَنْ مُتَجَدِّدٍ يُقَدَّرُ بِهٖ مُتَجَدِّدٌ اٰخَرُ وَعِنْدَ الْفَلَاسِفَةِ عَنْ مِقْدَارِ الْحَرَكَةِ وَاللّٰهُ تَعَالٰى مُنَزَّهٌ عَنْ ذٰلِكَ وَاعْلَمْ اَنَّ مَاذَكَرَهٗ مِنَ التَّنْزِيْهَاتِ بَعْضُهٗ يُغْنِىْ عَنِ الْبَعْضِ اِلَّا اَنَّهٗ حَاوَلَ التَّفْصِيْلَ وَالتَّوْضِيْحَ قَضَاءً لِحَقِّ الْوَاجِبِ فِىْ بَابِ التَّنْزِيْهِ وَرَدًّا عَلَى الْمُشَبِّهَةِ وَالْمُجَسِّمَةِ وَسَائِرِ فِرَقِ الضَّلَالِ وَالطُّغْيَانِ بِاَبْلَغِ وَجْهٍ وَاَوْكَدِهٖ فَلَمْ يُبَالِ بِتَكْرِيْرِ الْاَلْفَاظِ الْمُتَرَادِفَةِ وَالتَّصْرِيْحِ بِمَا عُلِمَ بِطَرِيْقِ الْاِلْتِزَامِ.

সহজ তরজমা

এবং তিনি যখন কোন স্থানে সমাসীন নন তখন তিনি কোন দিকেও থাকবেন না, না উপরে না নিচে বা অন্য কোথাও। কারণ, দিক হয়ত কোন স্থানের সীমা অথবা প্রান্ত অথবা হুবহু স্থান অন্য কোন বস্তুর দিকে অপেক্ষাকৃত। বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলার উপর কাল অতিক্রম করে না। কেননা আমাদের মতে কাল বলে এরূপ একটি নতুন জিনিস উদ্দেশ্য, যার দ্বারা দ্বিতীয় আরেকটি নতুন জিনিস অনুমান করা যায়। আর দার্শনিকদের মতে কাল হচ্ছে, গতির পরিমাণ। আর আল্লাহ তা'আলা এ থেকে পবিত্র। মনে রাখতে হবে, মুছান্নিফ আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতার ব্যাপারে যা কিছু উল্লেখ করেছেন, সেগুলোর কোন কোনটি অপরটির আলোচনাকে অপ্রয়োজনীয় সাব্যস্ত করে। তদুপরি তিনি পবিত্রতা অধ্যায়ে ওয়াজিব আল্লাহ তা'আলার হক আদায় করতে গিয়ে বিস্তারিত বিবরণ এবং ফিরকায়ে মুশাব্বিহা, মুজাসসিমা এবং সমস্ত বিভ্রান্ত, অবাধ্য ফিরকাগুলোর পরিপূর্ণরূপে মজবুত পদ্ধতিতে খণ্ডন করার ইচ্ছা করেছেন। ফলে মুতারদিফ তথা সমার্থক শব্দের পুনরাবৃত্তি এবং সেসব বিষয় স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করতে দ্বিধাবোধ করেননি, যেগুলো বাধ্যতামূলক জানা গেছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ وَاِذَا لَمْ يَكُنْ الخ ঃ শারেহ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার কোন দিকে নেই– কথাটি তিনি এরূপভাবে উল্লেখ করেছেন, যাতে মুছান্নিফের পক্ষ থেকে এ বিষয়েও অপারগতা প্রকাশ পেশ করা হয় যে, তিনি আল্লাহ তা'আলার জন্য স্থানের কথা প্রত্যাখ্যান করেছেন বটে। কিন্তু দিক না থাকার কথা উল্লেখ করেননি। কেননা দিক হয়ত স্বয়ং স্থানের নাম অথবা স্থানের কোন عَوَارِض বা যৌগিক বিষয়ের নাম। আর আল্লাহ তা'আলা স্থান থেকে পবিত্র। বিধায় তিনি স্থানের যে কোন যৌগিক বস্তু থেকেও পবিত্র হবেন।

اَوْ نَفْس الْاَمْكِنَه ঃ যেমন ঘরের ছাদ তার উপর রাখা বস্তুর স্থান এবং এটিই আবার উপর দিকও।

আল্লাহ তা'আলা কাল থেকেও পবিত্র

قَوْلُهُ وَلَا يَجْرِىْ الخ ঃ আল্লাহ তা'আলা যেভাবে স্থান থেকে পবিত্র, তদ্রূপ কাল থেকেও পবিত্র। কেননা আহলে হকের মতে কাল দ্বারা এরূপ বস্তু উদ্দেশ্য যেগুলো মান্বয়ে নতুন বিষয় হয়। যার মাধ্যমে অন্য আরেকটি নতুন বিষয় অনুমান করা যায়। যেমন, ঘণ্টা দ্বারা দিন, দিন দ্বারা মাস, মাস দ্বারা বৎসর আর বৎসর দ্বারা গোটা জীবনের অনুমান করা যায়। বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলা নতুনত্ব থেকে পবিত্র। দার্শনিকদের মতেও আল্লাহ তা'আলা কাল থেকে পবিত্র। কেননা তাদের মতে কাল হচ্ছে গতির পরিমাণ। অথচ আল্লাহ তা'আলা পরিমাণ থেকে পবিত্র। উল্লেখ্য যে, تَجَدُّد শব্দের অর্থ, নতুনত্ব, ক্রমান্বয়ে একটির পর একটি নতুনভাবে তৈরী হওয়া।

قَوْلُهُ مِقْدَارُ الْحَرَكَةِ الخ ঃ لَامَحْدُوْد وَلَا مَعْدُوْد এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে كَمْ مُتَّصِل এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও তার প্রকারসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে مِقْدَار বা পরিমাণকে কালের পরিপন্থী। এখানে مِقْدَار বা পরিমাণ সে অর্থে নয় বরং এখানে আভিধানিক অর্থ উদ্দেশ্য। আর এর দ্বারা كَمْ مُتَّصِل উদ্দেশ্য। দার্শনিকদের মতে কাল এরূপ একটি যৌগিক বিষয়, যেটি প্রত্যক্ষভাবে কম-বেশীতে বিভক্ত হয়। যেমন, অর্ধ দিবস পূর্ণ দিবস অপেক্ষা কম। আর যে আরযটি প্রত্যক্ষভাবে বিভাজ্য, সেটি হল كَمْ । তাছাড়া বিভক্ত হওয়ার সুরতে এর দুটি অংশের জন্য একটি যৌথ অংশ থাকবে। অতএব সেটি كَمْ مُتَّصِل এবং مِقْدَار বা পরিমাণ। এখন হয়ত সে আকৃতির কোন পরিমাণ থাকবে, যেটি قَار الذَّات বা সুস্থির হবে। অর্থাৎ তার অংশগুলো একত্রিত হতে পারবে। এটা বাতিল। কারণ, কাল غَيْر الذَّات অর্থাৎ অস্থিতিশীল। অথবা এরূপ আকাবের জন্য পরিমাণ হবে, যেটি غَيْر قَارُّ الذَّاتِ। আর غَيْر قَارِّ الذَّاتِ অবস্থাকে বলে গতি। কাজেই বুঝা গেল, কাল গতির পরিমাণ। বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলা كَمِّيَّات এবং مِقْدَارِيَّات থেকে পবিত্র। বিধায় তিনি কাল থেকেও পবিত্র।

قَوْلُهُ اِعْلَمْ اَنَّ مَاذَكَرَهُ الخ ঃ মুছান্নিফ রহ. কর্তৃক لَيْسَ بِعَرَضٍ থেকে নিয়ে وَلَايَجْرِى عَلَيْهِ زَمَان পর্যন্ত যে আলোচনা স্থান পেয়েছে, তাতে কোন কোন বিষয়ের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। কোন কোন বস্তু একটির আওতায় অবধারিত অস্বীকৃত হয়েছে, সেটি না থাকার কথা আবার স্পষ্ট ভাষায়ও উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, جَوْهَر এর অস্বীকৃতি جِسْم এর অস্বীকৃতিকে আবশ্যক করে। কারণ, জওহার جِسْم এর অংশ। আর جُزْء এর নফী হলে كُل এরও نَفِى হয়ে যায়। কাজেই যখন صُوْرَه তথা আকার-আকৃতি নেই। বুঝা গেল, لَامُصَوَّر দ্বারা তৎসঙ্গে مَحْدُوْد، مَعْدُوْد، مُتَنَاهِ এরও نَفِى হয়ে গেছে। কারণ, আকার-আকৃতির জন্য পরিমাণ থাকা আবশ্যক। অথচ আল্লাহ পরিমাণ থেকে পবিত্র। তদ্রূপ সীমিত হওয়া, সংখ্যাকৃত হওয়া, সীমাবদ্ধ হওয়াও পরিমাণের বৈশিষ্ট্য। অতএব এগুলো থেকেও আল্লাহ তা'আলা পবিত্র হবেন। অনুরূপভাবে تَبَعُّض - تَجَزِّى এর মধ্যে থেকে একটির দ্বারা অপরটির অবিদ্যমানতা নিশ্চিত। কিন্তু মুছান্নিফ রহ. পরোক্ষভাবে অবধারিতরূপে বুঝানো যথেষ্ট মনে করেননি বরং প্রত্যেকটির অবিদ্যমানতা স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন দুটি কারণে। **এক.** পবিত্রতার ক্ষেত্রে ওয়াজিব আল্লাহ তা'আলার হক আদায় করতে। **দুই.** বাতিল ফিরকাগুলোকে পরিপূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যানের উদ্দেশ্য।

ثُمَّ إِنَّ مَبْنَى التَّنْزِيهِ عَمَّا ذُكِرَتْ عَلَى أَنَّهَا تُنَافِي وُجُوبَ الْوُجُودِ لِمَا فِيهَا مِنْ شَائِبَةِ الْحُدُوثِ وَالْإِمْكَانِ عَلَى مَا أَشَرْنَا إِلَيْهِ لَا عَلَى مَاذَهَبَتْ إِلَيْهِ الْمَشَائِخُ مِنْ أَنَّ مَعْنَى الْعَرَضِ بِحَسَبِ اللُّغَةِ مَا يَمْتَنِعُ بَقَاؤُهُ وَمَعْنَى الْجَوْهَرِ مَايَتَرَكَّبُ عَنْهُ غَيْرُهُ وَمَعْنَى الْجِسْمِ مَايَتَرَكَّبُ هُوَ عَنْ غَيْرِهِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِمْ هٰذَا أَجْسَمُ مِنْ ذٰلِكَ وَأَنَّ الْوَاجِبَ لَوْ تَرَكَّبَ فَأَجْزَاؤُهُ إِمَّا أَنْ تَتَّصِفَ بِصِفَاتِ الْكَمَالِ فَيَلْزَمُ تَعَدُّدُ الْوَاجِبِ أَوْلَا فَيَلْزَمُ النَّقْصُ وَالْحُدُوثُ أَيْضًا إِمَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى جَمِيعِ الصُّوَرِ وَالْأَشْكَالِ وَالْمَقَادِيرِ وَالْكَيْفِيَّاتِ فَيَلْزَمُ إِجْتِمَاعُ الْأَضْدَادِ أَوْ عَلَى بَعْضِهَا وَهِيَ مُسْتَوِيَةُ الْأَقْدَامِ فِي إِفَادَةِ الْمَدْحِ وَالنَّقْصِ وَفِي عَدَمِ دَلَالَةِ الْمُحْدَثَاتِ عَلَيْهِ فَيَفْتَقِرُ إِلَى مُخَصِّصٍ وَيَدْخُلُ تَحْتَ قُدْرَةِ الْغَيْرِ فَيَكُونُ حَادِثًا بِخِلَافِ مِثْلِ الْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ فَإِنَّهَا صِفَاتُ كَمَالٍ تَدُلُّ الْمُحْدَثَاتُ عَلَى ثُبُوتِهَا وَأَضْدَادُهَا صِفَاتُ نُقْصَانٍ لَادَلَالَةَ لَهَا عَلَى ثُبُوتِهَا لِأَنَّهَا تَمَسُّكَاتٌ ضَعِيفَةٌ تُوهِنُ عَقَائِدَ الطَّالِبِينَ وَتُوسِعُ مَجَالَ الطَّاعِنِينَ زَعْمًا مِنْهُمْ أَنَّ تِلْكَ الْمَطَالِبَ الْعَالِيَةَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى أَمْثَالِ هٰذِهِ الشُّبْهَةِ الْوَاهِيَةِ.

সহজ তরজমা

এরপর আল্লাহ পাকের উপরিউক্ত বিষয়াবলী থেকে পবিত্র হওয়ার বিষয়টি নির্ভর করে এ কথার উপর যে, এসব বিষয় তার সত্তাগত অপরিহার্যতার সম্পূর্ণ বিপরীত। কেননা এ সব জিনিসে নতুনত্ব-নশ্বরতা এবং সম্ভাব্যতার আভাস রয়েছে। যেমন, আমরা সে সবের দিকে ইংগিত করে এসেছি; সেসব দলীল প্রমাণাদি নির্ভর নয়, যেসব মাশায়েখে কিরাম অবলম্বন করেছেন অর্থাৎ আরয মানে এমন বস্তু যার স্থায়িত্ব অসম্ভব আর جَوْهَر মানে এমন বস্তু, যদ্বারা অন্য কোন বস্তু গঠিত হয়। বস্তুতঃ جِسْم এর অর্থ, এরূপ বস্তু যা অন্য বস্তু দ্বারা গঠিত হয়। কেননা প্রবাদ আছে, هٰذَا أَجْسَمُ مِنْ ذٰلِكَ তথা এটা অমুক বস্তু অপেক্ষা স্থূল। অধিকন্তু যদি আল্লাহ তা'আলা কোন জিনিস দ্বারা গঠিত হন, তবে তার অংশগুলো হয়ত পরিপূর্ণতার গুণে গুণান্বিত হবে। এমতাবস্থায় অপরিহার্য সত্তা একাধিক হওয়া আবশ্যক হয়ে পড়বে। অথবা পরিপূর্ণতার গুণে গুণান্বিত হবেন না। এমতাবস্থায় ত্রুটি এবং নশ্বরতা আবশ্যক হয়ে পড়বে। তদ্রূপ সৃষ্টিকর্তা হয়ত সমস্ত রূপ, মাত্রা এবং ধরনের গুণে গুণান্বিত হবেন। তখন পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন জিনিসের সহাবস্থান আবশ্যক হয়ে পড়বে। অথবা কোন কোনটির সাথে গুণান্বিত হবেন। অথচ মর্যাদাগত দিক থেকে প্রশংসা-ত্রুটি বুঝানোর ক্ষেত্রে এবং নশ্বর বিষয়াবলী সে সবের প্রমাণ না দেওয়ার ক্ষেত্রে সবগুলো সমান। ফলে আল্লাহ তা'আলা কোন مُخَصِّص (বিশিষ্টকারী) এর মুখাপেক্ষী হবেন এবং অন্যের ক্ষমতার আওতায় প্রবিষ্ট হবেন। এর বিপরীত জ্ঞান ও ক্ষমতার মত গুণাবলী। কেননা এসব হচ্ছে, পরিপূর্ণ গুণ। নশ্বর বস্তুগুলো সেসব প্রমাণিত হওয়ার দলীল আর এগুলোর বিপরীত সিফাতগুলো ত্রুটিযুক্ত। নশ্বর বিষায়াবলী সেগুলোর অস্তিত্ব প্রমাণ করে না। কারণ, এসব হচ্ছে দুর্বল দলীল-প্রমাণ যেগুলো ছাত্রদের ধর্মবিশ্বাসকে দুর্বল করে দেয়, সমালোচকদের ময়দান প্রশস্ত করে দেয়। কেননা তারা বলবে, এ ধরনের উঁচু পর্যায়ের বিষয়াবলী এমন দুর্বল প্রমাণাদির উপর নির্ভরশীল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এসব থেকে আল্লাহ পাকের পবিত্রতার কারণ কি ?

শারেহ রহ. এর আলোচনার সারকথা হল, ইতোপূর্বে যেসব জিনিস থেকে আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা ঘোষণা করা হয়েছে, যেমন- আপতন হওয়া, দেহ হওয়া, পরমাণু হওয়া ইত্যাদি -এগুলো থেকে পবিত্রতার উৎসমূল হচ্ছে,

এসব জিনিসে সম্ভাব্যতার আভাস আছে। বিধায় এসব আল্লাহ তা'আলার অপরিহার্যতা বিরোধী। এক্ষেত্রে মাশায়েখে কিরামের চয়িত দলীল-প্রমাণের উপর বিষয়টি নির্ভরশীল নয়। কারণ, তাদের দলীল-প্রমাণাগুলো দুর্বল। ফলে এ সব বিষয়ে ছাত্রদের মনে দুর্বলতা প্রবেশ করবে। এমনকি মানুষের আকীদা দুর্বল করার কারণ হবে। তাছাড়া এ সুযোগে বিরোধীপক্ষ বলতে পারবে, ইসলামী আকীদাগুলো দুর্বল দলীল-প্রমাণের উপর নির্ভরশীল।

মাশাইখে কিরামের প্রদত্ত দলীল

قَوْلُهُ وَاَنَّ الْوَاجِبَ الخ ঃ এখানে মাশায়েখে কিরামের পক্ষ থেকে প্রদত্ত আল্লাহ তা'আলার মুরাক্কাব বা সংযুক্ত না হওয়ার দলীল বর্ণনা করা হয়েছে। সারকথা হল, যদি তিনি বিভিন্ন অংশ দ্বারা মুরাক্কাব হন, তাহলে সে অংশগুলো দু' অবস্থা থেকে মুক্ত হবে না। ১. হয়ত সেগুলো পূর্ণাঙ্গ সিফাতের সাথে বিশেষিত হবে। অথচ সবচেয়ে বড় সিফাত হল, অপরিহার্যতা। সুতরাং সে অংশগুলো অপরিহার্যতার গুণে গুণান্বিত হবে। এমতাবস্থায় একাধিক ওয়াজিব অপরিহার্য সত্তা মানা আবশ্যক হবে। কিন্তু তা তাওহীদ বিরোধী হওয়ার কারণে বাতিল। ২. অথবা সে অংশগুলো সমস্ত পরিপূর্ণতার গুণে গুণান্বিত হবে না। চাই কোন পরিপূর্ণতার গুণের সাথেই গুণান্বিত না হোক। মোটকথা, পরিপূর্ণ অথবা কোন কোন পরিপূর্ণ গুণ ছুটে যাওয়ার কারণে অবশ্যই ত্রুটি দেখা দিবে। আর ত্রুটি নশ্বরতাকে আবশ্যক করবে। কেননা আংশিক ত্রুটি সমষ্টির (আল্লাহ তা'আলার) ত্রুটিকে আবশ্যক করে। অথচ অসম্ভব ও ত্রুটিপূর্ণ বস্তু অপরিহার্য হতে পারে না। ফলে বাধ্য হয়ে সেটি নশ্বর হবে। অথচ আল্লাহ তা'আলা আদৌ নশ্বর নন।

قَوْلُهُ وَاَيْضًا اِمَّا اَنْ يَّكُوْنَ عَلٰى جَمِيْعِ الصُّوَرِ الخ ঃ এটি আল্লাহ তা'আলার জন্য রূপ, আকৃতি, পরিমাণ ও ধরন না হওয়ার প্রমাণ। কেননা আল্লাহ তা'আলা যদি এসব বস্তুর সাথে গুণান্বিত হন, তাহলে দুই অবস্থা থেকে মুক্ত হবে না। হয়ত সমস্ত রূপ, আকার, পরিমাণ এবং ধরনের গুণ তার মধ্যে থাকবে অথবা সমস্ত বিপরীত বস্তুর সমন্বয় বা সেগুলোর কোন কোনটি থাকবে। প্রথম অবস্থায় পরস্পর সাংঘর্ষিক বিষয়ের সহাবস্থান আবশ্যক হবে। কারণ, সমস্ত আকার-আকৃতির সাথে গুণান্বিত হওয়ার অর্থ দাঁড়ায়, উদাহরণঃ আল্লাহ তা'আলা সুন্দর আকৃতির; আবার কদাকারও। অনুরূপভাবে সমস্ত ধরনের গুণে গুণান্বিত হওয়ার অর্থ যেমন তিনি সাদা-কালো। যাকে বলে اِجْتِمَاعِ ضِدَّيْن বা দুটি দ্বৈত জিনিসের সমন্বয়। আর দ্বিতীয় অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার মুখাপেক্ষিতা এবং অন্যের ক্ষমতার আয়ত্বে প্রবিষ্ট হওয়া আবশ্যক হবে। কেননা সমস্ত রূপ, আকার, পরিমাণ, ধরন ইত্যাদি বিদ্যমান থাকা অবস্থায় প্রশংসনীয় হওয়ার ব্যাপারে এবং এগুলো না হওয়ার সুরতে দোষণীয় বা ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার ব্যাপারে তিনি সমান। তাছাড়া এ ব্যাপারেও সবগুলো সমান যে, সম্ভাব্য বস্তুগুলো এসব গুণের সাথে আল্লাহ তা'আলার গুণান্বিত হওয়ার কথা বুঝায় না। সুতরাং যদি আল্লাহ তা'আলা এগুলোর মধ্য থেকে কোন কোনটির সাথে গুণান্বিত হন, তাহলে কোন প্রাধান্য দানকারীর মুখাপেক্ষী হবেন। আর এ মুখাপেক্ষীতা এবং কারও কুদরত বা ক্ষমতাধীন হওয়া বাতিল। আল্লাহ তা'আলার মধ্যে এসব হতে পারে না।

একটি প্রশ্নের জবাব

قَوْلُهُ بِخِلَافِ مِثْلِ الْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ ঃ এটি একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্ন হল, কোন কোন আকার-আকৃতি এবং ধরনের সাথে আল্লাহ তা'আলা গুণান্বিত হওয়া সম্পর্কে আপনারা বলেছেন, এগুলো যদি আল্লাহ তা'আলার মধ্যে কোন প্রাধান্য দানকারী কারণ ছাড়া পাওয়া যায়, তাহলে تَرْجِيْحُ بِلَا مُرَجِّحٍ বা অকারণে প্রাধান্য দান করতে হয়। আর প্রাধান্য দানকারী কোন জিনিসের কারণে হলে, সেদিকে আল্লাহ তা'আলার মুখাপেক্ষিতা আবশ্যক হবে। সুতরাং জটিলতা তো এ সিফাতগুলোকে প্রমাণিত করার ক্ষেত্রেও দেখা দিবে। কেননা আপনারা তো আল্লাহ তা'আলাকে কোন কোন গুণে গুণান্বিত করেছেন অর্থাৎ জ্ঞান, জীবন, ক্ষমতা, শ্রবণ ও দর্শন ইত্যাদি। এগুলোর বিপরীত মৃত্যু, অক্ষমতা, মূর্খতা ইত্যাদির গুণে গুণান্বিত করেননি। সুতরাং এখানেও যদি বলা হয়, এরূপ কোন কোন গুণের সাথে গুণান্বিত হওয়া যদি কোন প্রাধান্য দানকারী কারণ ছাড়াই হয়, তাহলে تَرْجِيْح بِلَا مُرَجِّح তথা অকারণে প্রাধান্যদান হবে। অন্যথায় প্রাধান্য দানকারীর দিকে মুখাপেক্ষীতা আবশ্যক হবে।

উত্তরের সারকথা হল, সব সিফাতই একরকম নয় বরং আমরা যেসব সিফাত আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করি, যেমন– ইলম-কুদরাত ইত্যাদি এগুলো হল, পরিপূর্ণতার গুণ, সাম্ভব্য বস্তুগুলো বিদ্যমানতা বুঝায়। কেননা গোটা বিশ্বজগত অভিনব পদ্ধতিতে সৃজিত হওয়া আল্লাহ তা'আলার এসব গুণাবলীর সাথে গুণান্বিত হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ। আর এর বিপরীত যেসব গুণাবলী রয়েছে, যেমন– মৃত্যু, অক্ষমতা, মুর্খতা ইত্যাদি এগুলো হল ত্রুটি। সাম্ভাব্য বস্তুগুলো এসবের বিদ্যমানতা বুঝায় না বরং এগুলোর অবিদ্যমানতাই বুঝায়।

وَاحْتَجَّ الْمُخَالِفُ بِالنُّصُوصِ الظَّاهِرَةِ فِى الْجِهَةِ وَالْجِسْمِيَّةِ وَالصُّوْرَةِ وَالْجَوَارِحِ وَبِاَنَّ كُلَّ مَوْجُوْدَيْنِ فُرِضَا لَابُدَّ اَنْ يَكُوْنَ اَحَدُهُمَا مُتَّصِلًا بِالْاٰخَرِ مُمَاسًّالَهُ اَوْ مُنْفَصِلًا عَنْهُ مُبَائِنًا فِى الْجِهَةِ وَاللّٰهُ تَعَالٰى لَيْسَ حَالًّا وَلَا مَحَلًّا لِلْعَالَمِ فَيَكُوْنُ مُبَائِنًا لِلْعَالَمِ فِىْ جِهَةٍ فَيَتَحَيَّزُ فَيَكُوْنُ جِسْمًا اَوْجُزْءَ جِسْمٍ مُصَوَّرًا مُتَنَاهِيًا وَالْجَوَابُ اَنَّ ذٰلِكَ وَهْمٌ مَحْضٌ وَحُكْمٌ عَلٰى غَيْرِ الْمَحْسُوْسِ بِاَحْكَامِ الْمَحْسُوْسِ وَالْاَدِلَّةُ الْقَطْعِيَّةُ قَائِمَةٌ عَلَى التَّنْزِيْهَاتِ فَيَجِبُ اَنْ يُفَوَّضَ عِلْمُ النُّصُوْصِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى عَلٰى مَا هُوَ دَأْبُ السَّلَفِ اِيْثَارًا لِلطَّرِيْقِ الْاَسْلَمِ اَوْيُأَوَّلَ بِتَاوِيْلَاتٍ صَحِيْحَةٍ عَلٰى مَااخْتَارَهُ الْمُتَأَخِّرُوْنَ دَفْعًا لِمَطَاعِنِ الْجَاهِلِيْنَ وَجَذْبًا لِضَبْعِ الْقَاصِرِيْنَ سُلُوْكًا لِلسَّبِيْلِ الْاَحْكَمِ .

সহজ তরজমা

বিরোধীপক্ষ (প্রথমতঃ) সে সব نَصّ দ্বারা দলীল দিয়েছে, যেগুলো দিক, দেহ, আকার এবং অঙ্গ-প্রতঙ্গ সম্পর্কে সুস্পষ্ট। আবার (দ্বিতীয়তঃ) এ দলীলও দিয়েছে যে, যদি দুটি বিদ্যমান বস্তু মেনে নেওয়া হয়, তাহলে অবশ্যই সে দুটি বস্তু হয়ত একটি অপরটির সাথে মিলিত হবে স্পর্শ করবে অথবা অপরটি থেকে পৃথক থাকবে, তার বিপরীত দিকে থাকবে এবং আল্লাহ তা'আলা বিশ্বজগতের স্থানও নন, না তার মধ্যে প্রবিষ্ট। সুতরাং তিনি বিশ্বজগতের বিপরীত দিকে থাকবেন এবং স্থানাধিকারী হবেন। কাজেই তিনি হয় দেহ হবেন; না হয় দেহের কোন একটি অংশ হবেন। এর জবাব হল, এসব নিছক এটি কল্পনা এবং অনুভূত বিষয়ের হুকুম লাগানো অনানুভূত বিষয়ের ওপর। আল্লাহ তা'আলা উপরিউক্ত বিষয়গুলো থেকে পবিত্র হওয়ার পক্ষে অকাট্য প্রমাণাদি রয়েছে। কাজেই نصوص এর জ্ঞান আল্লাহর নিকট সোপর্দ করতে হবে, যেমনটি সাল্‌ফে সালেহীনের পদ্ধতি, নিরাপদ পন্থায় প্রাধান্য দেওয়ার লক্ষ্যে অথবা মুজবুত পথে চলার জন্য সে সব نَصّ বা প্রমাণাদির যথার্থ কোন ব্যাখ্যা দিতে হবে। যেমন পরবর্তী উলামায়ে কিরামের গৃহীত প্রশ্নাবলী নিরসন এবং দুর্বল মুসলমানদের সহযোগিতার উদ্দেশ্যে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

আল্লাহর জন্য দেহ-দিক প্রমাণিত কিনা ?

যারা আল্লাহকে দেহ-দিক ইত্যাদি থেকে পবিত্র নয় বলে, তারা আল্লাহর জন্য এসব সাব্যস্ত করতে যুক্তি ও নকলী দলীল দ্বারা প্রমাণ পেশ করে।

(১) যৌক্তিক দলীলঃ কোন দুটি মওজুদ বস্তু আপনি মেনে নিন। তা দুই অবস্থা থেকে মুক্ত নয়। হয়ত দুটি বস্তু এক সাথে মিলিত হবে, চাই এই স্পর্শ এ অর্থে হোক যে, উভয়টি এক প্রান্তে যেমনঃ রেখা, পৃষ্ঠ ও অন্যান্য প্রান্তের সাথে মিলিত অথবা এভাবে যে, একটি অপরটির বিপরীত দিকে থাকবে। যেমন, একটি যদি দক্ষিণ দিকে থাকে অপরটি থাকবে উত্তর দিকে। এরূপভাবে আমরা যখন দুটি বিদ্যমান জিনিস মেনে নিব। যেমন, একটি বিদ্যমান জিনিস হল, বিশ্বজগত; অপরটি আল্লাহ তা'আলা। এ দুটির মধ্যেও উপরিউক্ত দুই সাম্ভাবনা থাকবে। প্রথম সম্ভাবনা বাতিল। কারণ, আল্লাহ তা'আলা বিশ্বজগতের মধ্যে প্রবিষ্ট নন এবং বিশ্বজগতের মহল বা স্থানও নন যে বিশ্বজগত তার মধ্যে প্রবিষ্ট হবে। কেননা প্রবিষ্ট হওয়ার জন্য প্রয়োজন প্রবেশকারী এবং যার মধ্যে প্রবিষ্ট হবে। এতদুভয়ের একটি অপরটির প্রতি মুখাপেক্ষী হয়। আল্লাহ তা'আলা মুখাপেক্ষিতা থেকে পবিত্র। কাজেই দ্বিতীয় সুরতটি চূড়ান্ত হয়ে গেল অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বিশ্বজগত থেকে প্রথম এবং বিপরীত দিকে আছেন। পক্ষান্তরে যে বস্তু কোন দিকে থাকে সেটি স্থানাধিকারী। তা হয়ত কোন দেহ; না হয় দেহের অংশ অর্থাৎ পরমাণু। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা হয়ত দেহ হবেন না হয় পরমাণু হবেন।

(২) নকলী দলীলঃ কুরআন-হাদীসে উল্লেখিত যেসব শব্দ বাহ্যতঃ আল্লাহ তা'আলার জন্য দিক এবং দেহ ইত্যাদি বুঝায়। যেমন কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে– **এক.** اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى **দুই.** وَجَاءَ رَبُّكَ **তিন.** وَيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ **চার.** يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ **পাঁচ.** اَلسَّمٰوٰتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِيْنِهٖ

অনুরূপভাবে হাদীস শরীফে এসেছে–

এক. إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَنْزِلُ إِلٰى سَمَاءِ الدُّنْيَا　　দুই. إِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ آدَمَ عَلٰى صُوْرَتِهٖ

তিন. إِنَّ الْجَبَّارَ يَضَعُ قَدَمَهٗ فِى النَّارِ　　চার. إِنَّهٗ يَضْحَكُ إِلٰى أَوْلِيَائِهٖ حَتّٰى تَبْدُوَ نَوَاجِذُهٗ

যৌক্তিক দলীলের জবাবঃ

قَوْلُهٗ اَلْجَوَابُ الخঃ ইতোপূর্বে অনুভূত জগতের দুটি মওজুদ বিষয়ের উপর মিলিত হওয়া কিংবা বিচ্ছিন্ন হওয়ার হুকুম লাগানো হয়েছিল। অথচ আল্লাহ তা'আলা অনুভূত বা ইন্দ্রিয়লব্ধ কোন সত্তা নন। কাজেই আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে উক্ত হুকুম লাগানো বৈধ নয়। এটি হল, قِيَاسُ الْغَائِبِ عَلَى الشَّاهِدِ তথা উপস্থিত বস্তুর উপর অনুপস্থিত বস্তুকে অনুমান করা। এটি নিছক কল্পনা শক্তির কারসাজি। তাছাড়া উপরিউক্ত জিনিসগুলো থেকে যৌক্তিক প্রমাণাদি রয়েছে। কিন্তু বিবেক বিরুদ্ধ কাল্পনিক সিদ্ধান্ত বাতিল।

আল্লাহ তা'আলার দেহ-দিক ইত্যাদি থেকে পবিত্রতার ব্যাপারে যৌক্তিক প্রমাণাদি রয়েছে বলে একটি মূলনীতি আছে। যদি কোন শরঈ দলীলের বাহ্যিক শব্দাবলী দ্বারা এরূপ কোন জিনিস বুঝায়, যেগুলো যুক্তির পরিপন্থী তাহলে সেখানে শরঈ দলীলের বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য হয় না। এজন্য আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সর্বসম্মত মতে যেসব শরঈ দলীলের বাহ্যিক শব্দাবলী আল্লাহ তা'আলার জন্য দেহ-দিক ইত্যাদি বুঝায়, সেগুলোকে এবং যেগুলোকে نُصُوص مُتَشَابِهَات (দ্ব্যর্থতাবোধক বা অস্পষ্ট প্রমাণাদি) বলা হয়, সেগুলোর বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নয় বরং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত এখানে এসে দুটি মত পোষণ করে। একটি মুতাকাল্লিমীনের মত; অপরটি মুতাআখখিরীনের। মতবিরোধের কারণ হল, مُتَشَابِهَات সংক্রান্ত কুরআন শরীফের আয়াতে কিরাআতের পার্থক্য অর্থাৎ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيْلَهٗ إِلَّا اللّٰهُ وَالرَّاسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ আয়াতে এক কিরাত মতে ইল্লাল্লাহ এর উপর ওয়াক্‌ফ হয়ে والرسخون থেকে দ্বিতীয় বাক্য আরম্ভ। এ পক্ষে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. এর কিরাআত সহায়ক। এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ হবে, مُتَشَابِهَات এর সদার্থ এবং সেগুলোর উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'আলাই জানেন। বান্দা এ সব সম্পর্কে জ্ঞান রাখে না। এ কারণে মুতাকাল্লিমীন এ কিরাআতটিকেই বুনিয়াদ সাব্যস্ত করে مُتَشَابِهَات সংক্রান্ত জ্ঞান আল্লাহর কাছে সোপর্দ করেছেন। যেখানেই কোন مُتَشَابِهَات আয়াত এসেছে, যেগুলো দ্বারা আল্লাহ তা'আলার জন্য দিক অথবা দেহ ইত্যাদি বুঝা গেছে, সেখানে তারা বলেছেন, اَللّٰهُ أَعْلَمُ بِمُرَادِهٖ بِذٰلِكَ এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা সম্যক অবগত।

তারা আরও বলেন, আল্লাহ তা'আলার জন্য হাত, পা, আঙ্গুল প্রভৃতি, যেগুলো শরঈ দলীলের মাধ্যমে সাব্যস্থ করা হয়েছে, এগুলো সব আল্লাহর সিফাত। এগুলোর হাকীকত সম্পর্কে আমরা ওয়াকিফহাল নই।

দ্বিতীয় কিরাআতে ইল্লাল্লাহ এর উপর ওয়াকফ নয়। اَلرَّاسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ আল্লাহ শব্দের উপর عَطْف হবে। আয়াতের অর্থ হবে, مُتَشَابِهَات এর সদার্থের জ্ঞান আল্লাহ এবং প্রাজ্ঞ উলামায়ে কিরামের রয়েছে। যখন মুতাআখখিরীনের যুগে বাতিল মতবাদগুলো ছড়িয়ে পড়ে এবং ফিরকায়ে মুশাব্বিহা, মুজাসসিমা مُتَشَابِهَات এর বাহ্যিক শব্দবলীর আশ্রয় নিয়ে দুর্বল মুসলমান এবং স্বল্প জ্ঞানী লোকদেরকে বিভ্রান্ত করতে থাকে, তখন তারা দ্বীনের হেফাযত এবং মুসলমানদেরকে গোমরাহী থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় কিরাআত মুতাবিক اَلرَّاسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ শব্দটিকে আল্লাহ শব্দের উপর عَطْف মেনে প্রাজ্ঞ উলামায়ে কিরামের জন্য مُتَشَابِهَات এর তাবীল বা সদার্থ করার জ্ঞান জায়েয ও সম্ভব বলে সাব্যস্ত করেছেন এবং مُتَشَابِهَات এর সঙ্গত সদার্থ বর্ণনা করেছেন। এগুলো তাফসীর ও হাদীসের কিতাবাদিতে উল্লেখ আছে। উলামায়ে আহলে সুন্নাতের দুটি মত বর্তমানে আমাদের সামনে রয়েছে। বিধায় আমাদের জন্য তন্মধ্যে যে কোন একটি পন্থা অবলম্বন করা জায়েয।

وَلَا يُشْبِهُهُ شَيْئٌ اَىْ لَايُمَاثِلُهُ اِمَّا اِذَا اُرِيْدَ بِالْمُمَاثَلَةِ الْاِتِّحَادُ فِى الْحَقِيْقَةِ فَظَاهِرٌ وَاَمَّا اِذَا اُرِيْدَ بِهَا كَوْنُ الشَّيْئَيْنِ بِحَيْثُ يَسُدُّ اَحَدُهُمَا مَسَدَّ الْاٰخَرِ اَىْ يَصْلُحُ كُلٌّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا لِمَا يَصْلُحُ لَهُ الْاٰخَرُ فَلِاَنَّ شَيْئًا مِّنَ الْمَوْجُوْدَاتِ لَايَسُدُّهُ تَعَالٰى فِىْ شَيْئٍ مِّنَ الْاَوْصَافِ فَاِنَّ اَوْصَافَهُ مِنَ الْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ اَجَلُّ وَاَعْلٰى مِمَّا فِى الْمَخْلُوْقَاتِ بِحَيْثُ لَامُنَاسَبَةَ بَيْنَهُمَا

সহজ তরজমা

এবং কোন বস্তু আল্লাহ তা'আলার সাথে সামঞ্জস্যশীল নয় অর্থাৎ আল্লাহর অনুরূপ নয়। মোটকথা, যখন مُمَاثَلَتْ বা সাদৃশ্যতা দ্বারা দুটি জিনিসের حَقِيْقَتْ তথা মূলবস্তু এক হওয়া উদ্দেশ্য হবে, তখন তো বিয়টি স্পষ্ট। আর যখন এ দ্বারা উদ্দেশ্য হবে দুটি জিনিস এরূপ হওয়া যে, প্রতিটি বস্তু অপরটির স্থলভিষিক্ত হতে পারে। অর্থাৎ উভয়টির প্রত্যেকটি এরূপ যোগ্যতা রাখবে অন্যটি যে যোগ্যতা রাখে, তখন এর (সাদৃশ্যতার) কারণ হবে বিদ্যমান বস্তুর মধ্যে এমন কোন জিনিস নেই, যা আল্লাহ তা'আলার কোন একটি গুণে স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। কেননা আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী যেমন জ্ঞান-ক্ষমতা ইত্যাদি, মাখলূকের গুণাবলী অপেক্ষা এমন সুমহান ও উঁচু পর্যায়ের যে, উভয়ের মাঝে কোন সামঞ্জস্য নেই।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শারেহ রহ. এর মতে মুশাবাহাতের অর্থ

قَوْلُهُ لَايُمَاثِلُهُ الخ: শারেহ রহ. মুশাবাহাতের অর্থ করেছেন مُمَاثَلَتْ। কেননা মুশাবাহাতের প্রসিদ্ধ অর্থ, ধরনের দিক থেকে এক হওয়া। অর্থাৎ দুটি বস্তু একই ধরনে অংশীদার হওয়া। যেমন, আগুন এবং সূর্য আলোতে আবার দুটি কাপড় শুভ্রতায় একই রকম এবং সামঞ্জস্যশীল। আর পূর্বেই বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলার কোন কাইফিয়্যাত বা ধরণ নেই। সুতরাং যদি এখানে মুশাবাহাতের অর্থ ধরনের দিক দিয়ে এক হওয়া উদ্দেশ্য হয়, তাহলে পুনরাবৃত্তি হবে। বিধায় এখানে মুশাবাহাত শব্দটির অর্থ مُمَاثَلَتْ বলেছেন। কোন বস্তু আল্লাহ তা'আলার অনুরূপ নেই। কারণ, مُمَاثَلَتْ এর দুটি অর্থ। **এক.** نَوْع হিসেবে দুটি জিনিস এক হওয়া। অর্থাৎ দুটি বস্তুর সমস্ত জাতিগত দিক দিয়ে অংশীদার হওয়া। যেমন, যায়েদ এবং আমর জাতিগত দিক তথা حَيْوَان এবং نَاطِق হিসাবে এক। এতদ্রূপভাবে অন্যান্য জাতিগত দিক দিয়েও একই রকম। এ হিসেবে কোন বস্তু আল্লাহ তা'আলার অনুরূপ না হওয়া সুস্পষ্ট। কেননা কোন বস্তু এ অর্থে আল্লাহ তা'আলার অনুরূপ হতে পারে না যে, তার সাথে সমস্ত জাতিগত দিক দিয়ে অংশীদার হবে। অথচ আল্লাহ তা'আলার জাতিগত জিনিসের মধ্যে সত্তাগত অপরিহার্যতাও রয়েছে। সুতরাং কোন একটি বস্তু وَاجِبُ الْوُجُوْدِ হওয়ার ক্ষেত্রে অংশীদার হওয়ার অর্থ, বহু ওয়াজিব আবশ্যক হওয়া। অথচ তা তাওহীদের পরিপন্থী। বিধায় এটা বাতিল। আর مُمَاثَلَتْ এর দ্বিতীয় অর্থ হল, দুটি জিনিস এরূপ হওয়া যে, একটি অপরটির স্থলাভিষিক্ত হতে পারে এবং প্রত্যেকটি এরূপ কাজের যোগ্যতা রাখবে, যে যোগ্যতা অপরটির মধ্যে রয়েছে। এ হিসেবেও কোন বস্তু আল্লাহ তা'আলার অনুরূপ হতে পারে না। কেননা কোন বস্তুই আল্লাহ তা'আলার কোন সিফাতে তার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না বরং আল্লাহ তা'আলার সিফাতগুলো মাখলূকের সিফাত অপেক্ষা অনেক উর্ধ্বে। উভয় গুণাবলীর মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নেই।

قَالَ فِى الْبِدَايَةِ اِنَّ الْعِلْمَ مِنَّا مَوْجُوْدٌ وَعَرْضٌ وَعِلْمٌ مُحْدَثٌ وَجَائِزُ الْوُجُوْدِ وَيَتَجَدَّدُ فِى كُلِّ زَمَانٍ فَلَوْ اَثْبَتْنَا الْعِلْمَ صِفَةً لِلّٰهِ تَعَالٰى لَكَانَ مَوْجُوْدًا وَصِفَةً قَدِيْمَةً وَوَاجِبَ الْوُجُوْدِ دَائِمًا مِّنَ الْاَزَلِ اِلَى الْاَبَدِ فَلَا يُمَاثِلُ عِلْمَ الْخَلْقِ بِوَجْهٍ مِّنَ الْوُجُوْهِ هٰذَا كَلَامُهُ فَقَدْ صَرَّحَ بِاَنَّ الْمُمَاثَلَةَ عِنْدَنَا اِنَّمَا يَثْبُتُ بِالْاِشْتِرَاكِ فِى جَمِيْعِ الْاَوْصَافِ حَتّٰى لَوِاخْتَلَفَا فِى وَصْفٍ وَاحِدٍ اِنْتَفَتِ الْمُمَاثَلَةُ وَقَالَ الشَّيْخُ اَبُو الْمُعِيْنِ فِى التَّبْصِرَةِ اِنَّا نَجِدُ اَهْلَ اللُّغَةِ لَا يَمْتَنِعُوْنَ مِنَ الْقَوْلِ بِاَنَّ زَيْدًا مِثْلٌ لِعَمْرٍو فِى الْفِقْهِ اِذَا كَانَ يُسَاوِيْهِ فِيْهِ وَيَسُدُّ مَسَدَّهُ فِى ذٰلِكَ الْبَابِ وَاِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا مُخَالَفَةٌ بِوُجُوْهٍ كَثِيْرَةٍ وَمَا يَقُوْلُهُ الْاَشْعَرِيُّ مِنْ اَنَّهُ لَا مُمَاثَلَةَ اِلَّا بِالْمُسَاوَاةِ مِنْ جَمِيْعِ الْوُجُوْهِ فَاسِدٌ لِاَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اَلْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَاَرَادَ الْاِسْتِوَاءَ فِى الْكَيْلِ لَا غَيْرَ وَاِنْ تَفَاوَتَ الْوَزْنُ وَعَدَدُ الْحَبَّاتِ وَالصَّلَابَةِ وَالرَّخَاوَةِ وَالظَّاهِرُ اَنَّهُ لَا مُخَالَفَةَ لِاَنَّ مُرَادَ الْاَشْعَرِيِّ الْمُسَاوَاةُ مِنْ جَمِيْعِ الْوُجُوْهِ فِيْمَا بِهِ الْمُمَاثَلَةُ كَالْكَيْلِ مَثَلًا وَعَلٰى هٰذَا يَنْبَغِى اَنْ يُحْمَلَ كَلَامُ صَاحِبِ الْبِدَايَةِ اَيْضًا وَاِلَّا فَاشْتِرَاكُ الشَّيْئَيْنِ فِى جَمِيْعِ الْاَوْصَافِ وَمُسَاوَاتُهُمَا مِنْ جَمِيْعِ الْوُجُوْهِ يَرْفَعُ التَّعَدُّدَ فَكَيْفَ يَتَصَوَّرُ التَّمَاثُلُ .

সহজ তরজমা

মুমাছালাত প্রসঙ্গে "বিদায়া" ও "তাবসিরা" গ্রন্থকারের ভাষ্য

বিদায়া গ্রন্থে তিনি বলেছেন, আমাদের জ্ঞান বিদ্যমান, যৌগিক এবং নশ্বর সম্ভাব্য সর্বকালে নতুন এবং পরিবর্তনশীল। এরপর যখন আমরা আল্লাহ তা'আলার গুণ মেনে নেব, তখন সেটি হবে মওজুদ, চিরন্তন অপরিহার্য, অনাদি, অনন্ত, চিরস্থায়ী। অতএব সে জ্ঞান মাখলূকের জ্ঞানের সাথে কোন গুণেই সামঞ্জস্য রাখে না। এ ছিল বিদায়া রচয়িতার উক্তি। তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন, مُمَاثَلَت বা সামঞ্জস্যশীলতার জন্য আমাদের মতে সমস্ত গুণাবলীতে অংশীদারিত্ব প্রমাণিত হয়। এমনকি যদি একটি গুণেও অপরটির সাথে বৈপরিত্য বা তফাৎ থাকে তাহলে সামঞ্জস্য থাকবে না। এদিকে শাইখ আবুল মুঈন "তাবসিরা" গ্রন্থে বলেছেন, আমরা দেখেছি–অভিধানবিদগণ নির্দ্বিধায় বলেন, "যায়েদ আইন শাস্ত্রে আমরের অনুরূপ" যখন এরা দুজন ফিকহের দিক দিয়ে সমান হয়। একজন অপরজনের স্থলাভিষিক্ত হয়। যদিও উভয়ের মাঝে অনেক গুণাবলীতেই ব্যবধান থাক না কেন। আর আশ'আরী রহ. যে বলেছেন, সমস্ত গুণাবলীতে সমতা ব্যতীত মুমাছালাত বা সামঞ্জস্য হতে পারে না –এ উক্তিটি ভুল। কেননা নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা গম গমের বিনিময়ে বিক্রয় কর, যখন একটি অপরটির অনুরূপ হবে। এখানে শুধু মাপের দিক দিয়ে সমতা উদ্দেশ্য। যদিও ওজন এবং শস্যদানার সংখ্যা, শক্ত ও নরমে ব্যবধান হোক না কেন। উল্লেখ্য যে, উপরিউক্ত দুটি উক্তির মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই। কেননা আশ'আরীর উদ্দেশ্য সে জিনিসের পরিপূর্ণরূপে সমতা, যাতে সমাঞ্জস্য উদ্দেশ্য। উদাহরস্বরূপ উপরিউক্ত উদাহরণে মাপে। এ অর্থেই "বিদায়া" গ্রন্থকারের উক্তিটিও প্রয়োগ করা উচিৎ। অন্যথায় দুটি বস্তু সমস্ত গুণাবলীতে অংশীদার হলে এবং উভয়ের মধ্যে পরিপূর্ণরূপে সমতা থাকলে একাধিক্যকেই দূর করে দিবে। এরপর تَمَاثُل বা সাম স্যতার কল্পনাই কিভাবে করা যাবে?

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ قَالَ فِى الْبِدَايَه الخ ঃ ইতোপূর্বে শারেহ রহ. فَاِنَّ اَوْصَافَهُ مِنَ الْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ ......الخ এ উক্তিটির মাধ্যমে বিদায়া রচয়িতা ইমাম নুরুদ্দীন আহমদ ইবনে মাহমুদ বুখারীর উক্তি পেশ করছেন। এটি তাঁর কিতাব

বিদায়াতুল কালামে উল্লেখ আছে। বিদায়া রচয়িতা মাখলূকের ইলম এবং আল্লাহ তা'আলার ইলমের মধ্যে তুলনা করতে গিয়ে লিখেছেন – মাখলুকের ইলম নতুন-নশ্বর। অর্থাৎ প্রতিটি মুহূর্তে নতুনরূপে তৈরী হয়। এর পরিপন্থী আল্লাহর ইলম। কাজেই মাখলূকের ইলম যে কোন গুণে আল্লাহর ইলমের অনুরূপ হতে পারে না।

قَوْلُهُ فَقَدْ صَرَّحَ الخ ঃ এখানে যদি فِعْل مَاضِى مَعْرُوْف হয়, তাহলে তো এর ফায়েল হবে বিদায়া মুছান্নিফ। তখন শারেহ রহ. এর উদ্দেশ্য হবে, বিদায়া কিতাবে উল্লেখিত উক্তি– فَلَا يُمَاثِلُ عِلْمَ الْخَلْقِ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوْهِ অর্থাৎ মাখলুকের ইলম কোন গুণে আল্লাহর ইলমের অনুরূপ হবে না। এতে বুঝা যায়, কোন কোন গুণে অংশীদারিত্ব থাকলে مُمَاثَلَت বা সামঞ্জস্যতা সাব্যস্ত হয়। কিন্তু অন্যত্র বিদায় মুছান্নিফ স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন, যে দুটি বস্তুর মধ্যে مُمَاثَلَت বা সাদৃশ্যতা সমস্ত গুণাবলী অংশীদারিত্ব ও সমতা ব্যতীত হতে পারে না। সুতরাং বিদায়া মুছান্নিফের দুটি উক্তির মধ্যে সুস্পষ্ট বৈপরিত্য রয়েছে। আর এ শব্দটি مَاضِى مَجْهُوْل এর সীগাহ হলে এর অর্থ হবে, অন্য কোন কোন উলামায়ে কিরামের পক্ষ থেকে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে, مُمَاثَلَت সমস্ত গুণাবলীতে সমতা এবং অংশীদারিত্ব ব্যতীত ব্যস্তবায়িত হবে না এমতাবস্থায় বৈপরিত্য হবে বিদায়ার উক্তি এবং অন্যান্য উলামায়ে কিরামে সুস্পষ্ট বক্তব্যের মাঝে।

قَالَ الشَّيْخُ اَبُوْ الْمُعِيْنِ الخ ঃ শাইখ আবুল মুঈন রহ. স্বরচিত "তাবাসিরা" গ্রন্থে অভিধানিক প্রমাণ সাপেক্ষে লিখেছেন, কোন ব্যক্তি যদি অন্য কোন ব্যক্তির সাথে হাজারো বিষয়ে বৈপরিত্য রাখা সত্ত্বেও কোন একটি গুণে অংশীদারিত্ব ও সমতা রাখেন, তাহলে অভিধানবিদগণ এ দুজনের মাঝে সে গুণটিতে مُمَاثَلَت বা সাদৃশ্যতার হুকুম লাগান। যেমন, যায়েদ এবং আমরের মাঝে রং, রূপ, আকার-আকৃতি দেহ-সৌষ্ঠব আখলাক-চরিত্র ইত্যাদি গুণাবলীতে পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু ইলমে ফিকহে উভয়েই শরীক। একজন অপরজনের সমকক্ষ। সুতরাং অভিধানবিদগণ এ দুজনের মাঝে সাদৃশ্যতা আছে বলে স্বীকৃতি দেন এবং زَيْدٌ مِثْلُ عَمْرٍو فِى الْفِقْهِ বলেন। এতে বুঝা যায়, مُمَاثَلَت বাস্তবে প্রতিফলিত হওয়ার জন্য কোন কোন গুণে সমকক্ষতাই যথেষ্ট।

শাইখ আবুল মুঈন স্বরচিত "তাবসিরা" গ্রন্থে সামনে গিয়ে আরও বলেছেন, শাইখ আবুল হাসান আশ'আরী রহ. এর নিম্নোক্ত উক্তিটি ভুল অর্থাৎ দুটি বস্তুর মাঝে সাদৃশ্যতা বা مُمَاثَلَت সমস্ত গুণাবলীতে সমকক্ষতা ব্যতীত বাস্তবায়িত হয় না। কারণ, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছে, اَلْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ

এতে রাসূলে আকরাম ﷺ مُمَاثَلَت দ্বারা শুধু মাপে দুটি জিনিস সমান হওয়া উদ্দেশ্য নিয়েছেন, যদিও ওজন, শস্যদানার সংখ্যা এবং শক্ত ও নরমের ক্ষেত্রে একটি অপরটি থেকে পৃথক হোক না কেন। এতে বুঝা যায়, مُمَاثَلَت এর জন্য কোন কোন গুণে সমকক্ষ হওয়াই যথেষ্ট।

قَوْلُهُ وَالظَّاهِرُ ঃ শারেহ রহ. এর উদ্দেশ্য হল, দুটি পরস্পর বিরোধী উক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা। যার সারকথা হল, مُمَاثَلَت বাস্তবায়িত হওয়ার জন্য শুধু কোন কোন গুণে অংশীদরিত্বই যথেষ্ট। যেমন, আবুল মুঈন রহ. বলেছেন। তার এ বক্তব্য শাইখ আবুল হাসান আশ'আরী রহ. এর উক্তি لَامُمَاثَلَةَ اِلَّا بِالْمُسَاوَاةِ مِنْ جَمِيْعِ এর পরিপন্থী নয়। কারণ, শাইখ আশ'আরী উপরিউক্ত উক্তির অর্থ এই নয় যে, সমস্ত গুণাবলীতে সমকক্ষতা দ্বারাই مُمَاثَلَت সাব্যস্ত হবে। যেমনটি মনে করেছেন শাইখ আবুল মুঈন। সে মতে তিনি আশ'আরীর উপরিউক্ত উক্তিকে ভ্রান্ত সাব্যস্ত করেছেন। কেননা এ অর্থ তখনই হত যখন শাইখ আশআরী فِى جَمِيْعِ الْوُجُوْهِ শব্দ ব্যবহার করতেন। কিন্তু তিনি مِنْ جَمِيْعِ الْوُجُوْهِ শব্দ এনেছেন। সুতরাং তার উক্তির অর্থ দাঁড়াবে, সাদৃশ্যতা বা مُمَاثَلَت কেবলমাত্র পূর্ণাঙ্গরূপে সাম্যের দ্বারাই হবে। অর্থাৎ এখানে উদ্দিষ্ট বিষয়ে পরিপূর্ণরূপে সমতা উদ্দেশ্য। যেমন, اَلْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ হাদীসটিতে লেনদেনকৃত গমের মাঝে মাপের দিক দিয়ে সাদৃশ্যতা উদ্দেশ্য। অতএব মাপের দিকে দিয়ে পূর্ণাঙ্গরূপে সমান হলেই مُمَاثَلَت হবে। অন্যথায় مُمَاثَلَت এর জন্য সমস্ত গুণাবলীতে অংশীদারিত্ব ও সমতা সুস্পষ্ট বাতিল। কেননা مُمَاثَلَت হল, দুটি বস্তুর মাঝে অংশীদারিত্ব ও সমতার নাম। সে মতে এটি দুটি ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর আবেদন রাখে। অতএব যদি সমস্ত গুণাবলীতে সমান হয়, তাহলে এখানে আর দুটি বস্তু থাকবে না বরং বড়জোর একই বস্তুর দুটি নাম হবে। যখন দুটি জিনিসই থাকবে না, তখন আবার مُمَاثَلَت বা সাদৃশ্যতা সাব্যস্ত হবে কিভাবে?

এতে বুঝা যায়, مُمَاثَلَت এর জন্য কোন কোন গুণাবলীতে অংশীদারীত্ব এবং সমতাই যথেষ্ট। মোটকথা, مُمَاثَلَت সাব্যস্ত হওয়ার জন্য একটি দল কোন কোন গুণে সমতাকে আবশ্যক সাব্যস্ত করেছে আর অপর দল সমস্ত গুণাবলীতে সমতাকে আবশ্যক মনে করেছে। বাস্তবতা হল, যে গুণটিতে مُمَاثَلَت বা সাদৃশ্যতা উদ্দেশ্য, সে

গুণে পরিপূর্ণরূপে সমতা আসতে হবে। উভয় দলের বক্তব্যের দ্বারা যদি এটাই উদ্দেশ্য হয়, তাহলে আর বিরোধ থাকে না।

قَوْلُهٗ قَالَ الشَّيْخُ اَبُوالْمُعِيْنِ الخ : শাইখ আবুল মুঈন রহ. তার বক্তব্য স্বরচিত "তাবসিরা" গ্রন্থে সেসব লোকের বিরুদ্ধে প্রশ্নরূপে উল্লেখ করেছেন, যারা مُمَاثَلَتْ এর জন্য সমস্ত গুণাবলীতে সমতাকে আবশ্যক সাব্যস্ত করেছেন।

وَلَايَخْرُجُ عَنْ عِلْمِهٖ وَقُدْرَتِهٖ شَيْئٌ لِاَنَّ الْجَهْلَ بِالْبَعْضِ وَالْعِجْزَ عَنِ الْبَعْضِ نَقْصٌ وَافْتِقَارٌ اِلٰى مُخَصِّصٍ مَعَ اَنَّ النُّصُوصَ الْقَطْعِيَّةَ نَاطِقَةٌ بِعُمُومِ الْعِلْمِ وَشُمُوْلِ الْقُدْرَةِ فَهُوَ بِكُلِّ شَيْئٍ عَلِيْمٌ وَعَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ لَا كَمَا يَزْعُمُ الْفَلَاسِفَةُ مِنْ اَنَّهٗ لَايَعْلَمُ الْجُزْئِيَّاتِ وَلَا يَقْدِرُ عَلٰى اَكْثَرَمِنْ وَاحِدٍ وَالدَّهْرِيَّةُ اَنَّهٗ لَايَعْلَمُ ذَاتَهٗ وَالنَّظَّامُ اَنَّهٗ لَايَقْدِرُعَلٰى خَلْقِ الْجَهْلِ وَالْقُبْحِ وَالْبَلْخِيُّ اَنَّهٗ لَايَقْدِرُعَلٰى مِثْلِ مَقْدُوْرِ الْعَبْدِ وَعَامَّةُ الْمُعْتَزِلَةِ اَنَّهٗ لَايَقْدِرُ عَلٰى نَفْسِ مَقْدُوْرِ الْعَبْدِ

সহজ তরজমা

কোন কিছু আল্লাহর জ্ঞান ও ক্ষমতার বাইরে নেই। কেননা কোন জিনিস সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং কোন জিনিস সম্পর্কে অক্ষমতা একটি ত্রুটি এবং مخصص (বিশিষ্টকারী) এর দিকে মুখাপেক্ষীতার কারণ। তাছাড়া অকাট্য শরঈ প্রমাণাদি আল্লাহ জ্ঞান ও কুদরতের ব্যাপকতা ঘোষণা করছে। কাজেই তিনি প্রতিটি বস্তু সম্পর্কে সম্যক অবগত। সমস্ত কিছুর উপর তার ক্ষমতা রয়েছে। এরূপ নয় যেমনটি দার্শনিকগণ বলেন অর্থাৎ তিনি جزئيات তথা শাখাগত বিষয়গুলো জানেন না। একের অধিক বস্তুর উপরও তিনি ক্ষমতাবান নন। তিনি এরূপও নন, যেমনটি দাহরিয়ারা বলে অর্থাৎ তিনি স্বীয় সত্তা সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন না। এমনও নয় যেমন নিযাম বলেন– তিনি মূর্খতা এবং মন্দ জিনিস সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেন না। এরূপও নয় যেরূপ বলখী বলেছেন অর্থাৎ তিনি বান্দার কুদরতের আওতাধীন জিনিসের সাদৃশ তৈরী করার ক্ষমতা রাখেন না। এরূপও নয়, যেরূপ অধিকাংশ মুতাযিলীরা বলে, তিনি হুবহু এরূপ বস্তু তেরী করার ক্ষমতা রাখেন না, যা বান্দার ক্ষমতাধীন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

কোন কিছু আল্লাহর জ্ঞান ও কুদরতের বাইরে নেই কেন?

قَوْلُهٗ لِاَنَّ الْجَهْلَ بِالْبَعْضِ : গ্রন্থকারের উক্তি لَايَخْرُجُ عَنْ عِلْمِهٖ وَقُدْرَتِهٖ شَيْئٌ বাক্যে شَيْئٌ শব্দটি نَكِرَه এর পরে এসেছে। এটা ব্যাপকতা বুঝায়। কাজেই বাক্যটির অর্থ হবে, لَاشَيْئَ بِخَارِجٍ عَنْ عِلْمِهٖ وَقُدْرَتِهٖ। এর مُوْجِبَه جُزْئِيَّةٌ بَعْضُ الْاَشْيَاءِ خَارِجٌ عَنْ عِلْمِهٖ وَقُدْرَتِهٖ হল نَقِيْض ।

এটি সত্য নয়। কেননা কোন কোন জিনিস সম্পর্কে আল্লাহর ইলম না থাকা, সেগুলো সম্পর্কে আল্লাহর অজ্ঞতাকে আবশ্যক করবে। তদ্রূপ কোন কোন জিনিস আল্লাহর কুদরতের বাইরে থাকা, তার অক্ষমতাকে আবশ্যক করবে। এ দুটোই ত্রুটি। আল্লাহ তা'আলা সমস্ত ত্রুটি থেকে মুক্ত। তাছাড়া সমস্ত জিনিসের সাথে আল্লাহ তা'আলার সম্পর্ক সমান। অথচ কোন কোন জিনিস সম্পর্কে জ্ঞান ও ক্ষমতা রাখা, আর কোন কোন জিনিস সম্পর্কে জ্ঞান এবং ক্ষমতা না রাখা প্রাধান্য দান কারীর মুখাপেক্ষী। ফলে অপরের দিকে আল্লাহ তা'আলার মুখাপেক্ষীতা আবশ্যক হবে। অথচ তা অপরিহার্য সত্তার পরিপন্থী। তদ্রূপ مُوْجِبَه جُزْئِيَّه بَعْضُ اَشْيَاءِ خَارِجٌ عَنْ عِلْمِهٖ وَقُدْرَتِهٖ সত্য নয়। আর এ মূলনীতি সঠিক যে, যখন একটি জিনিস সত্য হবে না, তখন তার نَقِيْض বাস্তবায়িত হবে। কাজেই مُوْجِبَه جُزْئِيَّه لَايَخْرُجُ عَنْ عِلْمِهٖ وَقُدْرَتِهٖ شَيْئٌ নকীযটি সত্য হবে। যেটি সালেবায়ে কুল্লিয়াহ।

এক্ষেত্রে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি

قَوْلُهٗ لَا كَمَا يَزْعُمُ الْفَلَاسِفَةُ الخ : আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান এবং কুদরত থেকে কোন জিনিস বাইরে নেই –এ কথাটুকু ব্যাখ্যাতা পেছনে সল্‌বে কুল্লী রূপে পেশ করে এসেছেন। এবার সে উক্তিগুলোকেও বাতিল করে দিচ্ছেন, যেগুলো এ سَلْبُ كُلِّى এর পরিপন্থী। কারণ, سَلْبُ كُلِّى দ্বারা প্রামাণিত হল, هُوَكُلِّ شَيْئٍ عَلِيْمٌ وَهُوَ

عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ। আর এ সব উক্তি কোন কোন জিনিস আল্লাহর ইলম থেকে খারিজ হওয়া কোন কোন বস্তু আল্লাহর কুদরত বহির্ভূত হওয়াকে আবশ্যক করে। সর্বপ্রথম দার্শনিকগণ এ উক্তি অমান্য করেছেন। তারা বলেছেন, جُزْئِيَّات সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান নেই। তাদের দলীল হচ্ছে, جُزْئِيَّات এর মধ্যে পার্থক্য ও পরিবর্তন হয়। অতএব যদি جُزْئِيَّات বা খুঁটি-নাটি বিষয়ের সাথে আল্লাহর ইলমের সম্পর্ক হয়, তাহলে আল্লাহ জ্ঞানের মধ্যেও পরিবর্তন হবে। যেমন, যায়েদ যখন ঘরে উপস্থিত তখন আল্লাহ তা'আলা জানেন, যায়েদ ঘরে আছে। অতঃপর যায়েদ যখন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, তখনও যদি আল্লাহ তা'আলার ইলম থাকে, যায়েদ ঘরে আছে– তাহলে সেটা জ্ঞান হবে না বরং তা হবে جَهْل বা অজ্ঞতা । কারণ, বাস্তবে যায়েদ ঘরে নেই। যদি এখন যায়েদের ঘরের বাইরে যাওয়ার জ্ঞান থাকে, তাহলে আল্লাহর ইলমে পরিবর্তন হবে। অথচ আল্লাহ তা'আলা যেমন তার সত্তার পরিবর্তন থেকে পবিত্র, তদ্রুপ তার গুণাবলীর পরিবর্তন থেকে পবিত্র। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা كُلِّيَّات বা মৌলিক বিষয়াবলী সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন। আর সেগুলোতে পরিবর্তন হয় না।

এ প্রমাণের জবাব হল, যায়েদ যখন ঘরে ছিল তখন এ সম্পর্কেই আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান ছিল। যখন ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে, তখন আল্লাহর ইলমের সম্পর্কে হয়ে গেছে তার ঘর থেকে বের হওয়ার সাথে। অতএব পরিবর্তন এসেছে সম্পর্কের মধ্যে। আর সম্পর্কের পরিবর্তন সত্তা এবং সিফাত কোনটার মধ্যেই পরিবর্তন আবশ্যক করে না। যেমন, যদি কোন সড়কের পার্শ্বে কোন একটি আয়না লাগিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে তার সামনে দিয়ে যখন কোন মানুষ অতিক্রম করবে, তখন আয়নার সম্পর্ক হবে মানুষের রূপের সাথে। আয়নার মধ্যে মানুষের রূপ প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠবে। আবার যখন কোন গাধা সামনে দিয়ে অতিক্রম করবে, তখন আয়নার সম্পর্ক হবে গাধার আকৃতি এবং তাতে গাধার একটি রূপ প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠবে। এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, আয়নার সম্পর্কের মধ্যে পরিবর্তন হয়েছে। এতে আয়নার সত্তা এবং তার গুণ যেমন পরিষ্কার-পরিছন্নতা কোনটাতেই কোন প্রকার পরিবর্তন আসেনি।

দার্শনিকগণ আরও বলেন, আল্লাহ তা'আলা একাধিক বস্তুর উপর ক্ষমতা রাখেন না। কারণ, আল্লাহ তা'আলা সবদিক দিয়েই একও অদ্বিতীয়। একটি জিনিস থেকে একটি বস্তুই প্রকাশ পেতে পারে। অতএব তার থেকে দেহ প্রকাশ পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ, দেহ বিভিন্ন অংশ দ্বারা গঠিত। অতএব তার থেকে শুধুমাত্র একটি দেহাতীত جوهر প্রকাশ পেয়েছে, যার নাম আকল। এরপর সেই আকল থেকে ক্রমশঃ নিয়মতান্ত্রিকিভাবে অন্যান্য দেহসমূহ এবং আকলগুলো প্রকাশ পেয়েছে।

তাদের এ প্রমাণের জবাব হল, আমরা তাদের কথিত অর্থের ওয়াহ্দাত বিশ্বাস করি না যদ্দরুন তারা সিফাতের অস্তিত্বকেও এ একত্ববাদের পরিপন্থী মনে করে সিফাতগুলোকে অস্বীকার করে বসে। বরং আমরা বলি, আল্লাহ তা'আলার অনেকগুলো সিফাত আছে। যেগুলো তার সত্তার একত্বের পরিপন্থী নয়। তাছাড়া প্রচুর সিফাত থাকার কারণে আল্লাহ তা'আলা থেকে প্রচুর জিনিস প্রকাশ পাওয়া সম্ভব।

নিযামের মতামত

قَوْلُهٗ وَلَا كَمَا يَزْعَمُ النَّظَّمُ ঃ নিযামের প্রকৃত নাম ইব্রাহীম ইবনে সাইয়্যার মুতাযিলী। তার উক্তি মতে আল্লাহ তা'আলা মুর্খতা এবং নিকৃষ্ট বস্তু সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেন না। কারণ, নিকৃষ্ট বস্তুকে তিনি হয়ত নিকৃষ্ট জেনেই সৃষ্টি করবেন। এটা তো খারাপ কথা নতুবা তিনি সেটাকে নিকৃষ্ট না জেনে করবেন। তাতো মুর্খতা। আল্লাহ তা'আলা এতদুভয় থেকে পবিত্র।

এর জবাব হল, আল্লাহ তা'আলা থেকে যে কোন বস্তু প্রকাশ পাওয়া খারাপ নয়। দ্বিতীয়তঃ কোন মন্দ জিনিস উপার্জন করা মন্দ; মন্দ জিনিস সৃষ্টি করা মন্দ নয়। তাছাড়া উপরিউক্ত দলীল দ্বারাই বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা মন্দ জিনিসের স্রষ্টা নন। অথচ দাবী ছিল, আল্লাহ তা'আলা মন্দ জিনিস সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেন না। কিন্তু কোন কাজ না করা তার উপর ক্ষমতা না থাকা বুঝায় না। সুতরাং তার দাবী এবং দলীলের মধ্যে আদৌ সামঞ্জস্য নেই।

বলখীর মতামত

قَوْلُهٗ وَلَا كَمَا يَزْعَمُ الْبَلْخِيُّ الخ ঃ বলখীর উপনাম আবুল কাসেম। তিনি কা'বী নামে প্রসিদ্ধ। তার উক্তি মতে বান্দা যে জিনিসের উপর ক্ষমতা রাখে, আল্লাহ তা'আলার তদনরূপ জিনিসের উপর ক্ষমতা রাখেন না। অন্যথায় বান্দা আল্লাহর অনুরূপ হয়ে যাওয়া আবশ্যক হবে। এর জবাব হল, আল্লাহর কুদরত বা ক্ষমতা অনাদি সুপ্রাচীন চিরন্তন। পক্ষান্তরে বান্দার কুদরত ও ক্ষমতা সম্ভাব্য ও নশ্বর। অতএব উভয়টিতে কোনই মিল নেই।

মু'তাযিলার মত

قَوْلُهُ وَلَا كَمَا زَعَمَ الْمُعْتَزِلَةُ ঃ আবু আলী জুব্বাঈ প্রমুখের উক্তিমতে বান্দা যে জিনিসের ক্ষমতা রাখে, আল্লাহ তা'আলা হুবহু সেই বস্তুর ক্ষমতা রাখেন না। অন্যথায় একটি ক্ষমতাধীন বস্তু আল্লাহ এবং বান্দার কুদরতের আওতাভুক্ত হওয়া আবশ্যক হবে। এর জবাব হল, এতেও কোন সমস্যা নেই। উভয় কুদরতের দিক স্বতন্ত্র। বান্দার কুদরত উপার্জন হিসেবে; আল্লাহর কুদরত সৃষ্টি হিসেবে অর্থাৎ বান্দা উপার্জনে ক্ষমতাবান আর আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির উপর ক্ষমতাবান।

وَلَهُ صِفَاتٌ لِمَا ثَبَتَ مِنْ اَنَّهُ تَعَالٰى عَالِمٌ قَادِرٌ حَيٌّ اِلٰى غَيْرِ ذٰلِكَ وَمَعْلُوْمٌ اَنَّ كُلًّا مِنْ ذٰلِكَ يَدُلُّ عَلٰى مَعْنًى زَائِدٍ عَلٰى مَفْهُوْمِ الْوَاجِبِ وَلَيْسَ الْكُلُّ اَلْفَاظًا مُتَرَادِفَةً وَاَنَّ صِدْقَ الْمُشْتَقِّ عَلَى الشَّيْئِ يَقْتَضِى ثُبُوْتَ مَاْخَذِ الْاِشْتِقَاقِ لَهُ فَتَثْبُتُ لَهُ صِفَةُ الْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ وَالْحَيٰوةِ وَغَيْرُ ذٰلِكَ لَاكَمَا يَزْعُمُ الْمُعْتَزِلَةُ اَنَّهُ عَالِمٌ لَا عِلْمَ لَهُ وَقَادِرٌ لَاقُدْرَةَ لَهُ اِلٰى غَيْرِ ذٰلِكَ فَاِنَّهُ مُحَالٌ ظَاهِرٌ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِنَا اَسْوَدُ لَاسَوَادَ لَهُ وَقَدْ نَطَقَتِ النُّصُوْصُ بِثُبُوْتِ عِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ وَغَيْرِهِمَا وَدَلَّ صُدُوْرُ الْاَفْعَالِ الْمُتْقَنَةِ عَلٰى وُجُوْدِ عِلْمِهِ لَاعَلٰى مُجَرَّدِ تَسْمِيَتِهِ عَالِمًا وَقَادِرًا

সহজ তরজমা

আল্লাহর কিছু (বিশেষ) গুণাবলী রয়েছে। কারণ, এ বিষয়টি প্রমাণিত যে, আল্লাহ তা'আলা প্রজ্ঞাময়, ক্ষমতাবান, চিরঞ্জীব ইত্যাদি। একথাও সর্বজনবিদিত যে, এ শব্দগুলোর মধ্য হতে প্রত্যেকটি ওয়াজিব তথা অপরিহার্য সত্তার অর্থ থেকে অতিরিক্ত গুণাবলী বুঝায়। এগুলো সব সমার্থক শব্দ নয়। আরও জানা আছে যে, اِسْم مُشْتَق কোন কিছুর উপর প্রয়োগ হতে হলে তার জন্য ক্রিয়ামূল সাব্যস্ত হতে হয়। অতএব আল্লাহ তা'আলার জন্য জ্ঞান, জীবন, ক্ষমতা ইত্যাদি গুণাবলী রয়েছে। এরূপ নয় যেরূপ মুতাযিলারা বলে, তিনি জ্ঞানী তবে তার জ্ঞান সিফাত নেই এবং ক্ষমাতবান কিন্তু তার ক্ষমতা নেই ইত্যাদি। কারণ, এটা তো সুস্পষ্ট অসম্ভব ব্যাপার। এ তো আমাদের সে উক্তিটির মত যে, অমুক বস্তুটি কালো; কিন্তু তার মধ্যে কালো রং নেই এবং نُصُوص বা শরঈ প্রমাণাদি ও আল্লাহর ইলম ও কুদরত ইত্যাদি সিফাত সাব্যস্ত করার প্রমাণ; মজবুত ক্রিয়াকর্ম তার পক্ষ থেকে হওয়াও আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান থাকার প্রমাণ পেশ করে। শুধু জ্ঞানবান ও ক্ষমতাবান নাম হওয়ার উপর নয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

আল্লাহর বিভিন্ন সিফাত

قَوْلُهُ وَلَهُ صِفَاتٌ ঃ এখানে لَهُ জার-মাজরূর মিলে খবরে মুকাদ্দাম। আর সিফাত শব্দটি তার মুবতাদায়ে মুয়াখখার। খবরকে আগে আনার ফলে এখানে لَهُ সীমাবদ্ধতা বুঝাচ্ছে। এবারতের মর্ম হবে, আল্লাহর কিছু সুনির্দিষ্ট বিশেষ গুণাবলী রয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সাথে সিফাতের মধ্যে মাখলূক শুধু নামেই অংশীদার। যেমন, জ্ঞান সিফাতটি সৃষ্টির মধ্যেও পাওয়া যায় বটে। কিন্তু তা আল্লাহর ইলমের মত নয়। কারণ, মাখলূকের ইলম নশ্বর-নতুন আর আল্লাহর জ্ঞান চিরন্তন।

সিফাত থাকার প্রমাণ

قَوْلُهُ لِمَا ثَبَتَ مِنْ اَنَّهُ الخ ঃ এটি আল্লাহ পাকের সিফাত থাকার প্রথম দলীল। সারকথা হল, যুক্তি এবং শরী'আত উভয়ের আলোকে প্রমাণিত যে, আল্লাহ তা'আলা প্রজ্ঞাময়, ক্ষমতাবান, চিরঞ্জীব ইত্যাদি। প্রচলন এবং অভিধান উভয়ের আলোকে জানা যায় যে, এসব নাম তথা عَالِم، قَادِر ইত্যাদি মুশ্‌তাক; ওয়াজিব এবং এর সমার্থক নয় বরং উপরিউক্ত اَسْمَاء مُشْتَقَّه এর মধ্য থেকে প্রত্যেকটির অর্থ আলাদা আলাদা। সে অর্থগুলো ওয়াজিবের অর্থ থেকে অতিরিক্ত। عِلْم، قُدْرَت، حَيَاة ইত্যাদি এগুলো আল্লাহ তা'আলার সিফাত।

قَوْلُهٗ وَاَنَّ صِدْقَ الْمُشْتَقِّ الخ ঃ এ শব্দটি اِنَّ كُلًّا مِنْ ذَالِكَ এর উপর عَطْف হয়েছে অর্থাৎ এটা সর্বজন বিদিত যে, কোন বস্তুর উপর مشتق এর প্রয়োগ তার মধ্যে مَاخَذِ اِشْتِقَاق তথা ক্রিয়ামূল প্রমাণিত হওয়ার দাবী রাখে। যেমন, কারও উপর ضَارِب শব্দ প্রয়োগ হলে তার জন্য ضرب বা মারা সাব্যস্ত হওয়ার তাগাদা রাখবে। সুতরাং যখন যুক্তি এবং শরী'আত উভয়ের আলোকে আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে حَيٌّ ، قَادِر ، عَالِم ইত্যাদি اَسْمَاء مُشْتَقَّه প্রয়োগ হয়, এর চাহিদা হল এ সব مُشْتَقَّات এর مَاخَذ اِشْتِقَاق তথা ক্রিয়ামূল حَيَات قُدْرَت ইত্যাদি আল্লাহ জন্য প্রমাণিত হওয়া। অতএব এগুলো আল্লাহ তা'আলার সিফাত। এরূপ নয় যে, اِسْم مُشْتَق তো আল্লাহর জন্য প্রমাণিত। কিন্তু ক্রিয়ামূল তার মধ্যে বিদ্যমান নেই। তিনি ক্ষমাতাবান তবে তার মধ্যে কুদরত নেই। কারণ, এটা তো সুস্পষ্ট অসম্ভব ব্যাপার। অনুরূপভাবে কেউ যদি বলে, অমুক বস্তুটি কালো। কিন্তু তার মধ্যে কালো রং নেই অথবা অমুক বস্তুটি শ্বেত-শুভ্র কিন্তু তার মধ্যে শুভ্রতার নাম-নিশানাও নেই। এরূপ কথা বলা যেমন ভুল, তেমনি عِلْم، قَادِر ইত্যাদি ব্যতীত আল্লাহ তা'আলাকে عَالِم، قَادِر ইত্যাদি বলাও ভুল। অন্যথায় আল্লাহ তা'আলা তো শুধু নামেই প্রজ্ঞাময় ও ক্ষমতাবান হবেন। অথচ কুরআন-হাদীসের দলীল-প্রমাণাদি, এরূপভাবে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মজবুত এবং বিস্ময়কর সৃজনের অস্তিত্ব আল্লাহ তা'আলার জন্য ক্ষমতা, জীবন ইত্যাদি সিফাত বিদ্যমান আছে বলে প্রমাণ করে। শুধু এতটুকুই বুঝায় না যে, আল্লাহ তা'আলা নামেই কেবল সর্বজ্ঞ, সর্বময় ক্ষমতাবান।

فَتَثْبُتُ لَهٗ الخ ঃ এখানে উপরিউক্ত দুটি দলীলের ফল বের করার জন্য শাখা বের করা হয়েছে অর্থাৎ উভয় দলীলের আলোকে আল্লাহ তা'আলার জন্য عِلْم، قُدْرَت، حَيَاة ইত্যাদি প্রমাণিত হয়।

قَوْلُهٗ وَقَدْ نَطَقَتِ النُّصُوْصُ الخ ঃ এখানে মুতাযিলাদের মত খণ্ডন করা হয়েছে। অর্থাৎ কুরআন-হাদীসের দলীল প্রমানাদি এবং আল্লাহ তা'আলার ক্রিয়াকর্মও তার প্রজ্ঞাময় এবং সর্বময় ক্ষমতার মালিক হওয়া বুঝায়। ইলমবিহীন আলীম এবং কুদরতবিহীন কাদীর নামের অস্তিত্ব বুঝায় না।

وَلَيْسَ النِّزَاعُ فِى الْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ الَّتِىْ هِىَ مِنْ جُمْلَةِ الْكَيْفِيَّاتِ وَالْمَلَكَاتِ لِمَا صَرَّحَ بِهٖ مَشَائِخُنَا مِنْ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى حَىٌّ وَلَهٗ حَيٰوةٌ اَزَلِيَّةٌ لَيْسَتْ بِعَرَضٍ وَلَا مُسْتَحِيْلِ الْبَقَاءِ وَاللّٰهُ تَعَالٰى عَالِمٌ وَلَهٗ عِلْمٌ اَزَلِىٌّ شَامِلٌ لَيْسَ بِعَرَضٍ وَلَا مُسْتَحِيْلِ الْبَقَاءِ وَلَا ضَرُوْرِىٌّ وَلَا مُكْتَسِبٌ وَكَذَا فِىْ سَائِرِ الصِّفَاتِ بَلِ النِّزَاعُ فِىْ اَنَّهٗ كَمَا اَنَّ لِلْعَالِمِ مِنَّا عِلْمًا هُوَ عَرَضٌ قَائِمٌ بِهٖ زَائِدٌ عَلَيْهِ حَادِثٌ فَهَلْ لِصَانِعِ الْعَالَمِ عِلْمٌ هُوَ صِفَةٌ اَزَلِيَّةٌ قَائِمَةٌ بِهٖ زَائِدَةٌ عَلَيْهِ وَكَذَا جَمِيْعُ الصِّفَاتِ فَاَنْكَرَتْهُ الْفَلَاسِفَةُ وَالْمُعْتَزِلَةُ وَزَعَمُوْا اَنَّ صِفَاتِهٖ عَيْنُ ذَاتِهٖ بِمَعْنٰى اَنَّ ذَاتَهٗ يُسَمّٰى بِاعْتِبَارِ التَّعَلُّقِ بِالْمَعْلُوْمَاتِ عَالِمًا وَالْمَقْدُوْرَاتِ قَادِرًا اِلٰى غَيْرِ ذٰلِكَ فَلَا يَلْزَمُ تَكَثُّرٌ فِى الذَّاتِ وَلَا تَعَدُّدٌ فِى الْقُدَمَاءِ وَالْوَاجِبَاتِ وَالْجَوَابُ مَا سَبَقَ مِنْ اَنَّ الْمُسْتَحِيْلَ تَعَدُّدُ الذَّوَاتِ الْقَدِيْمَةِ وَهُوَ غَيْرُ لَازِمٍ وَيَلْزَمُكُمْ كَوْنُ الْعِلْمِ مَثَلًا قُدْرَةً وَحَيٰوةً وَعَالِمًا وَحَيًّا وَقَادِرًا وَصَانِعًا لِلْعَالَمِ وَمَعْبُوْدًا لِلْخَلْقِ وَكَوْنُ الْوَاجِبِ غَيْرَ قَائِمٍ بِذَاتِهٖ اِلٰى غَيْرِ ذٰلِكَ مِنَ الْمَحَالَاتِ.

সহজ তরজমা

এবং বিতর্ক সেই ইলম ও কুদরত নিয়ে নয়, যেটি ধরন এবং যোগ্যতার অন্তর্ভুক্ত। কেননা আমাদের মাশাইখে কিরাম স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা চিরঞ্জীব। তার এরূপ জীবন রয়েছে, যেটি চিরন্তন, যৌগিক নয়, সেটির স্থায়িত্বও অসম্ভব নয়। আল্লাহ তা'আলা প্রজ্ঞাময়, তার এরূপ জ্ঞান রয়েছে, যেটি অনাদি ব্যাপক; যৌগিক নয় এবং এর স্থায়িত্ব অসম্ভব নয়। সেটি ضرورى স্বতঃলব্ধও নয় আবার কাসবী বা অর্জিতও নয়। তদ্রূপভাবে অন্য সিফাত সম্পর্কেও; বরং বিতর্কিত বিষয় হল, যেমনিভাবে আমাদের মধ্য থেকে কোন জ্ঞানী ব্যক্তির এরূপ জ্ঞান

রয়েছে, যেটি যৌগিক এবং তার সাথে প্রতিষ্ঠিত, তার সত্তা থেকে অতিরিক্ত নতুন বিষয়, তদ্রুপ সমস্ত গুণাবলীর অবস্থা। দার্শনিকগণ এবং ফিরকায়ে মুতাযিলা এটা অস্বীকার করে। তারা বলে, আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী সরাসরি আল্লাহর সত্তাই। অর্থাৎ আল্লাহর সত্তাকে পরিজ্ঞাত বিষয়াবলীর সাথে সম্পর্ক হিসেবে আলীম বা প্রজ্ঞাময়, কুদরতের আওতাধীন বিষয়াবলীর সাথে সম্পর্ক হিসেবে ক্ষমতাবান বলা হয়। অনুরূপ এতদ্ব্যতীত অন্যান্য সিফাতী নামগুলো। সুতরাং আল্লাহর সত্তার মধ্যে আধিক্য এবং একাধিক চিরন্তন বস্তু ও একাধিক অপরিহার্য সত্তা হওয়া আবশ্যক হবে না। এর জবাব তাই, যা উপরে দেওয়া হয়েছে। অসম্ভব হল, অনেকগুলো চিরন্তন সত্তা হওয়া। এখানে তা আবশ্যক নয়। কিন্তু তোমাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই ইলম, কুদরত ও হায়াত হওয়ার এবং জ্ঞানী, ক্ষমতাবান, বিশ্বস্রষ্টা, সৃষ্টির উপাস্য হওয়ার প্রশ্ন ওঠে। এমনিভাবে ওয়াজিব আল্লাহ তা'আলার স্বাধিষ্ঠ না হওয়া ও অন্যান্য অসম্ভব বিষয়াবলী আবশ্যক হওয়ার প্রশ্ন উঠবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

কিছু লোকের বিভ্রান্তি ঃ কেউ কেউ বিভ্রান্তি বশতঃ বলেছেন, আমাদের এবং মুতাযিলাদের মধ্যে মূল বিতর্কিত বিষয় হল, সেই ইলম ও কুদরত যেটি কাইফিয়ত (ধরন) এর অন্তর্ভূক্ত অর্থাৎ আমরা তো আল্লাহ তা'আলার জন্য সেগুলো প্রমাণ করি আর মুতাযিলারা সেসব অস্বীকার করে।

শারেহ রহ. এ মত খণ্ডন করে বলেন, যে ইলম ও কুদরত কাইফিয়ত (ধরন), আদৌ সেটি বিতর্কিত বিষয় নয় বরং আমাদের মাশাইখে কিরাম আল্লাহ তা'আলার জন্য ইলমও কুদরত –এর চিরন্তনতা ও অনাদিত্বের কথা স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করেছেন। আর কাইফিত আরযের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে নশ্বর। অতএব যেই জ্ঞান ও ক্ষমতা কাইফিয়তের অন্তর্ভূক্ত আল্লাহ তা'আলা সেগুলো থেকে পবিত্র। এ ব্যাপারে আমাদের এবং মুতাযিলাদের ঐকমত্য রয়েছে। এ প্রসঙ্গে আমাদের এবং তাদের মধ্যে কেন বির্তক নেই। বিতর্ক হল, শুধু এ নিয়ে যে, আমরা যেমন কোন ব্যক্তির আলিম হওয়ার অর্থ বুঝি, তার জন্য ইলম নামক একটি সিফাত আছে, যেটি তার সত্তা থেকে অতিরিক্ত আরয ও নশ্বর, তদ্রূপভাবে আল্লাহ তা'আলারও আলিম হওয়ারও কি এ অর্থ যে, আল্লাহ তা'আলার জন্য ইলম নামক একটি প্রকৃত গুণ আছে, যেটি তার সত্তা থেকে অতিরিক্ত, তার সত্তার সাথে কায়েম এবং সুপ্রাচীন চিরন্তন?

দার্শনিকগণ এটা অস্বীকার করেন। তারা বলেন, সিফাতগুলো হুবহু ওয়াজিবের সত্তা অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার আলিম, কাদির (ইত্যাদি) হওয়ার অর্থ এই নয় যে, ইলম-কুদরত নামে কোন প্রকৃত গুণ আল্লাহ তা'আলার জন্য প্রমাণিত, যেটি তার সত্তা থেকে অতিরিক্ত বরং আল্লাহ তা'আলার জন্য আলিম-কাদির ইত্যাদি হওয়া একটি আপেক্ষিক বিষয়। আল্লাহ তা'আলার সাথে পরিজ্ঞাত জিনিসগুলোর সাথে সম্পর্ক আছে হিসেবে তিনি আলিম; ক্ষমাতাধীন জিনিসের সাথে সম্পর্ক আছে হিসেবে তিনি ক্ষমতবান। এরূপভাবে শ্রুতজিনিসগুলোর সাথে সম্পর্ক থাকা হিসেবে তিনি سَمِيْع বা সর্বশ্রোতা, পরিদৃষ্ট জিনিসগুলোর সাথে সম্পর্ক থাকা হিসেবে তিনি সর্বদ্রষ্টা।

মোটকথা, আল্লাহ তা'আলা সর্বদিক দিয়েই এক অদ্বিতীয়। কিন্তু তার একাধিক সিফাত রয়েছে এবং তার সম্পর্ক রয়েছে প্রচুর জিনিসের সাথে। আর সম্পর্ক আল্লাহ তা'আলার সত্তা থেকে বহির্ভূত একটি বিষয়। বিধায় সেগুলোর আধিক্যের কারণে আল্লাহর সত্তার মধ্যে আধিক্য ও একাধিক সুপ্রচীন বস্তু হওয়া এবং একাধিক অপরিহার্য সত্তা হওয়া আবশ্যক হবে না। যেমনটি মনে করেন আল্লাহ তা'আলার জন্য সিফাতে কাদীমা (সুপ্রাচীন গুণাবলী) এর প্রবক্তাগণ।

একটি আপত্তি ও তার জবাব

قَوْلُهٗ وَلَاتَعَدُّدٌ ঃ এখানে মুতাযিলাদের পক্ষ হতে আশ'আরীদের প্রতি একটি অভিযোগের দিকে ইংগিত করা হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সত্তা হতে অতিরিক্ত صِفَات قَدِيْمَة এর উক্তিটি অনেক قَدِيْم মেনে নেওয়া এবং قَدِيْم ও وَاجِب এর সমার্থক হওয়ার ভিত্তিতে একাধিক وَاجِب মেনে নেওয়াকে আবশ্যক করে। শারিহ রহ. উক্ত অভিযোগের ঐ জবাবই দিয়েছেন, যা اَلْقَدِيْم এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ একাধিক সত্ত্বা قَدِيْم হওয়া অসম্ভব। এখানে তা আবশ্যক হয় না। বরং একাধিক সিফাতে কদীমা আবশ্যক হয়, যা অসম্ভব নয়।

যদি সিফাতে বারীকে যাতে বারী বলা হয় ?

قَوْلُهٗ وَيَلْزَمُكُمْ ঃ এখানে আশ'আরীদের পক্ষ থেকে মুতাযিলা এবং দার্শনিকদের বিরুদ্ধে বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলার সিফাতগুলো হুবহু তার সত্তা সাব্যস্ত করার কারণে অনেক অসম্ভব বিষয় আবশ্যক হয়ে পড়বে। কারণ,

দুটি জিনিস হুবহু এক হওয়ার সম্পর্ক হল, উভয়ের সাথে। অতএব যদি আল্লাহর সিফাতগুলো হুবহু তার সত্তা হয়, তাহলে আল্লাহ তা'আলার সত্ত্বাও হুবহু তার সিফাত হবে। এমতাবস্থায় উদাহরণতঃ বলা যাবে– ইলম হল, আল্লাহ তা'আলার হুবহু সত্ত্বা এবং আল্লাহ তা'আলার হুবহু সত্ত্বা হল কুদরত। অতএব জ্ঞান সরাসরি ক্ষমতা। এরূপভাবে ইলম হল, হুবহু আল্লাহ তা'আলার সত্ত্বা এবং আল্লাহ তা'আলার সত্ত্বাই হুবহু জীবন। অতএব এলমটাই হল হুবহু জীবন। অদ্রুপ ইলম হুবহু আল্লাহ তা'আলার সত্ত্বা। আর আল্লাহ তা'আলার সত্ত্বা হল আলিম। অতএব ইলমটাই আলিম হল। অনুরূপভাবে ইলম হল, হুবহু আল্লাহ তা'আলার সত্ত্বা। আর আল্লাহর সত্ত্বা হল কাদির। অতএব ইলমটি কাদিরও হল। আবার ইলম হল, হুবহু আল্লাহ তা'আলার জাত বা সত্ত্বা। আর আল্লাহর সত্ত্বা হল, সৃষ্টিজীবের মাবূদ বা উপাস্য। অতএব ইলমটাই হল সমস্ত মাখলূকাতের উপাস্য।

অনুরূপভাবে দ্বিতীয়পক্ষ থেকে একাত্মতার প্রতি লক্ষ্য করে বলা যাবে যে, ওয়াজিব তা'আলা হল হুবহু ইলম। আর ইলম হল غَيْرُ قَائِمٍ بِالذَّاتِ বা অস্বাধিষ্ঠ। অতএব ওয়াজিব তা'আলা غَيْرُ قَائِمٍ بِالذَّاتِ। মোটকথা, সিফাতগুলোকে আল্লাহ তা'আলার হুবহু সত্তা মেনে নিলে ইলমটিই কুদরত হওয়া, হায়াত হওয়া, আলিম হওয়া, কাদির হওয়া, সৃষ্টিজীবের উপাস্য হওয়া ইত্যাদি আবশ্যক হয়ে পড়বে। আর ওয়াজিব তা'আলা غَيْرُ قَائِمٍ بِالذَّاتِ (স্বাধিষ্ঠ নয়) হওয়া অসম্ভব বিষয়কে আবশ্যক করে তুলবে। অতএব সিফাতগুলো হুবহু আল্লাহ তা'আলার সত্ত্বা হওয়া অসম্ভব।

أَزَلِيَّةٌ لَا كَمَا يَزْعُمُ الْكَرَّامِيَّةُ مِنْ أَنَّ لَهُ صِفَاتٍ لٰكِنَّهَا حَادِثَةٌ لِاسْتِحَالَةِ قِيَامِ الْحَوَادِثِ بِذَاتِهِ قَائِمَةٌ بِذَاتِهِ ضَرُوْرَةَ أَنَّهُ لَا مَعْنٰى لِصِفَةِ الشَّيْئِ إِلَّا مَا يَقُوْمُ بِهِ لَا كَمَا يَزْعُمُ الْمُعْتَزِلَةُ مِنْ أَنَّهُ مُتَكَلِّمٌ بِكَلَامٍ هُوَ قَائِمٌ بِغَيْرِهِ لٰكِنَّ مُرَادَهُمْ نَفْيُ كَوْنِ الْكَلَامِ صِفَةً لَهُ لَا إِثْبَاتَ كَوْنِهِ صِفَةً لَهُ غَيْرَ قَائِمٍ بِذَاتِهِ.

সহজ তরজমা

আল্লাহর সে সব গুণাবলী অনাদী। কার্‌রামিয়্যাদের ধারণা মাফিক নয়, যেমন তারা বলে, আল্লাহর অনেক গুণাবলী রয়েছে, তবে সেগুলো নশ্বর। কারণ, আল্লাহ সত্তার সাথে নশ্বর জিনিস প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না এবং সে সকল গুণ আল্লাহর সত্তার সাথে প্রতিষ্ঠিত। কারণ, এটা সুস্পষ্ট যে, কোন বস্তুর কোন গুণের অর্থ এছাড়া অন্য কিছুই নয় যে, তা সেই সত্তার সাথে প্রতিষ্ঠিত। এমন নয় যেমনটা মুতাযিলারা বলে অর্থাৎ আল্লাহ এমন কালামের মাধ্যমে মুতাকাল্লিম, যা তার সত্তা ছাড়া অন্যের সাথে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তাদের মূল উদ্দেশ্য হল, আল্লাহর كلام গুণকে অস্বীকার করা। আল্লাহ তা'আলার এরূপ বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করা নয়, যা আল্লাহর সত্তার সাথে অবিদ্যমান।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

কার্‌রামিয়া কারা ?

قَوْلُهُ لَا كَمَا يَزْعُمُ الْكَرَّامِيَّةُ : كَرَّامِيَه শব্দটি كَاف –এ যবর এবং رَا তে তাশদীদ অথবা কাফে যের এবং রাতে যবর দুভাবেই পড়া যায়। সুলতান মাহমূদ সুবুকতগীর যুগে এ দলটি আত্মপ্রকাশ ঘটে। এরা আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে কাররামের উত্তরসূরী।

কার্‌রানিয়্যাদের মত প্রত্যাখ্যান

ব্যাখ্যাতা এখানে আল্লাহ পাকের গুণাবলীকে অনাদি বলে কাররামিয়্যাদের মতকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এরা صِفَات আল্লাহর জন্য বিদ্যমান আছে বলে স্বীকার করে বটে। তবে সেগুলোকে নশ্বর সাব্যস্ত করে। কেননা তাদের মতে নশ্বর বস্তু আল্লাহ সাথে বিদ্যমান হওয়া দোষণীয় নয়। তাদের দলীল হল, শ্রবণযোগ্য বিষয় ব্যতিত سَمْع (শ্রবণ) এর বাস্তব অস্তিত্ব, দর্শনযোগ্য জিনিস ব্যতিত بَصَر (দর্শন) এর বাস্তব অস্তিত্ব এবং শ্রোতা ব্যতিত কথার বাস্তব অস্তিত্ব হতে পারে না। আর শ্রুত, দৃষ্ট ও শ্রোতা প্রত্যেকটিই নশ্বর। সুতরাং নশ্বরের সাথে সম্পৃক্ত গুণাবলীও নশ্বর। এছাড়া গুণাবলীর মধ্যে পরিবর্তন আসে। যেমন, যায়েদের জন্মের পূর্বে যায়েদ জন্মগ্রহণ করবে এর সাথে

আল্লাহর عِلْم গুণটি সম্পৃক্ত ছিল। কিন্তু যায়েদ যখন জন্ম নিল, তখন আল্লাহ عِلْم গুণটির সম্পর্ক যায়েদের জন্মগ্রহণ করেছে এর সাথে হয়ে গেছে। এতে বুঝা গেল, আল্লাহর عِلْم গুণে পরিবর্তন হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সকল পরিবর্তনশীল বস্তুই নশ্বর। সুতরাং আল্লার عِلْم গুণটিও নশ্বর।

দলীল দুটি উত্তর হল, গুণাবলীর সম্পর্ক নশ্বর। এমনিভাবে দ্বিতীয় প্রমাণের জন্য যে উপমা দেওয়া হয়েছে, তা দ্বারা عِلْم এর সম্পর্কে পরিবর্তন অবশ্যই হয়েছে। কেননা প্রথমে عِلْم এর সম্পর্ক এক জিনিসের সাথে ছিল; পরবর্তিতে সে সম্পর্ক অন্য আরেকটি জিনিসের সাথে হয়েছে। কাজেই সম্পর্কের মধ্যে ভিন্নতা ও পরিবর্তন এসেছে। অথচ كُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ এই মূলনীতি অনুসারে تَعَلُّقَات এর অধীনেই সেগুলো নতুনভাবে অস্তিত্ব লাভ করেছে। আর সম্পর্কের নশ্বরতা সংশ্লিষ্ট সিফাতের নশ্বরতাকে অত্যাবশ্যক করে না।

ব্যাখ্যাতার দাবীর প্রমাণ

قَوْلُهُ : لِاسْتِحَالَةِ قِيَامِ الْحَوَادِثِ الخ ঃ এখানে শারেহ রহ. এর উক্তি لَاكَمَا يَزْعُمُ الْكَرَّامِيَةُ এর প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ গুণাবলী যেহেতু আল্লাহ সত্তার সাথে প্রতিষ্ঠিত। আর নশ্বর বিষয়বলীর সম্পর্ক আল্লাহর সাথে হওয়া সম্ভব নয়। এ কারণে আল্লাহর গুণাবলী নশ্বর হতে পারে না। আল্লাহর সাথে নশ্বর বস্তু প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং আল্লাহর গুণাবলী নশ্বর নয় বরং তাও অনাদিই হবে।

উল্লেখ্য যে, গুণাবলী চার প্রকার। (ক) محضه حقيقيه যেমন জীবন। (খ) حَقِيْقِيَّه ذَاتُ الْإِضَافَه যেমন– জ্ঞান, কুদরত/ক্ষমতা, ইচ্ছা, শ্রবণ, দর্শন ও কথন। আর মাতুবিদিয়্যাহ মতানুসারে تَكْوِيْن বা সৃজন। (গ) إضَافِيَه مَحْضَه যেমন, কোন কিছুর আগে বা পরে হওয়া বা সাথে হওয়া ইত্যাদি। (ঘ) صِفَات سَلْبِيَه বা নেতিবাচক গুণ। যেমন– দেহ, পরমাণু ইত্যাদি না হওয়া। এ চার প্রকারের মধ্যে প্রথম ও চতুর্থ প্রকারে কোন ধরনের পরিবর্তন এবং নতুনত্ব নেই। দ্বিতীয় প্রকার গুণাবলী সত্তাগতভাবে কোন প্রকার পরিবর্তনযোগ্য নয়। অবশ্য এগুলোর সম্পর্কের মাঝে পরিবর্তন এবং নতুনত্ব আসে। কেননা এগুলো আপেক্ষিক বিষয়। আসল অর্থে সেগুলো আল্লাহর সত্তার সাথে প্রতিষ্ঠিত হয় না।

সিফাতে বারীর পক্ষে আভিধানিক ও উরফী দলীল

قَوْلُهُ : قَوْلُهُ ضَرُوْرَةَ أَنَّهُ لَا مَعْنٰى لِصِفَاتِ الشَّيْئِ ঃ ব্যাখ্যাতা আল্লাহর সিফাতগুলো তার সত্তার সাথে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার উপর ওরফ ও অভিধান দ্বারা দলীল দিয়েছেন। ওরফ ও অভিধানে কোন বস্তুর সিফাত ও গুণ সেই বস্তুকে বলে, যা তার সাথে প্রতিষ্ঠিত। যেমন– শুভ্রতা কাপড়রে একটি গুণ। এটি তখনই সাব্যস্ত হবে, যখন এটি কাপড়ের সাথে প্রতিষ্ঠিত হবে। সুতরাং জ্ঞান, জীবন, ক্ষমতা ইত্যাদি আল্লাহর গুণ হওয়ার অর্থ হল, এগুলো আল্লাহর সত্তার সাথে প্রতিষ্ঠিত।

মু'তাযিলার উদ্দেশ্য সিফাতে কালামুল্লাহকে অস্বীকার করা

قَوْلُهُ قَائِمَةٌ بِذَاتِهِ لَا كَمَا يَزْعُمُ الْمُعْتَزِلَةُ ঃ মুতাযিলারা দাবী করে– আল্লাহ তা'আলা কথা বলেন। তবে তার কথা বলার অর্থ এই নয় যে, কালাম নামক কোন প্রকৃত গুণ তার সাথে প্রতিষ্ঠিত বরং তিনি এমন কালাম দ্বারা কথা বলেন, যেটি তার সত্তা ব্যতিত অন্য কিছুর সাথে প্রতিষ্ঠিত। যেমন– লাওহে মাহফুয, জিবরাঈল বা নবী করীম ﷺ। মুতাযিলাদের এ কথায় বাহ্যতঃ মনে হয়, তারা কালামকে আল্লাহর গুণ তো মানে বটে; কিন্তু সেটাকে আল্লাহর সাথে প্রতিষ্ঠিত বলে মানে না বরং অন্যের সাথে প্রতিষ্ঠিত বলে বিশ্বাস করে।

ব্যাখ্যাতা স্বীয় বক্তব্য لٰكِنَّ مُرَادَهُمْ দ্বারা এ উক্তিটি খণ্ডন করে বলেছেন, মুতাযিলাদের উদ্দেশ্য কালামকে এমন গুণ প্রমাণ করা নয় বরং তাদের লক্ষ্য "কালাম আল্লাহর গুণ" বিষয়টিকে অস্বীকার করা। কারণ, তাদের বক্তব্য إِنَّ اللّٰهَ مُتَكَلِّمٌ بِكَلَامٍ هُوَ قَائِمٌ بِغَيْرِهِ এর অর্থ, আল্লাহ এ অর্থে কথক নয় যে, কালাম তার প্রকৃত গুণ বরং তার কথক হওয়ার অর্থ হল, তিনি কালামকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর মাঝে সৃষ্টি করেন। যেমন, লাওহে মাহফুয, জিবরাঈলের সত্তা, রাসূল ﷺ এর সত্তা। আর কালাম ঐ অন্য জিনিসের সাথে প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং আল্লাহর মুতাকাল্লিম হওয়ার অর্থ যেন هُوَمُوْجِدٌ لِلْكَلَامِ বা তিনি কালামের স্রষ্টা। যেমন, اَسْوَدُ শব্দটি ব্যবহার ক্রিয়ামূল তথা কালো রং এ রঙ্গিন কাপড়ের ক্ষেত্রে। সেই পেইন্টারের ক্ষেত্রে নয়, যে কাপড়ের মধ্যে এ কালো রং করে দেয়।

وَلَمَّا تَمَسَّكَتِ الْمُعْتَزِلَةُ بِاَنَّ فِى اِثْبَاتِ الصِّفَاتِ اِبْطَالُ التَّوْحِيْدِ لِمَا اَنَّهَا مَوْجُوْدَةٌ قَدِيْمَةٌ مُتَغَايِرَةٌ لِذَاتِ اللّٰهِ فَيَلْزَمُ قِدَمُ غَيْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَتَعَدُّدُ الْقُدَمَاءِ بَلْ تَعَدُّدُ الْوَاجِبِ لِذَاتِهِ عَلٰى مَاوَقَعَتِ الْاِشَارَةُ اِلَيْهِ فِى كَلَامِ الْمُتَقَدِّمِيْنَ وَالتَّصْرِيْحُ بِهِ فِىْ كَلَامِ الْمُتَأَخِّرِيْنَ مِنْ اَنَّ وَاجِبَ الْوُجُوْدِ بِالذَّاتِ هُوَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَصِفَاتُهُ وَقَدْ كُفِّرَتِ النَّصَارٰى بِاِثْبَاتِ ثَلٰثَةٍ مِّنَ الْقُدَمَاءِ فَمَابَالُ الثَّمَانِيَةِ اَوْ اَكْثَرَ اَشَارَ اِلَى الْجَوَابِ بِقَوْلِهِ وَهِىَ لَا هُوَ وَلَا غَيْرُهُ يَعْنِىْ اَنَّ صِفَاتِ اللّٰهِ تَعَالٰى لَيْسَتْ عَيْنَ الذَّاتِ وَلَا غَيْرَ الذَّاتِ فَلَا يَلْزَمُ قِدَمُ الْغَيْرِ وَلَا تَكَثُّرُ الْقُدَمَاءِ وَالنَّصَارٰى وَاِنْ لَّمْ يُصَرِّحُوْا بِالْقُدَمَاءِ الْمُتَغَايِرَةِ لٰكِنْ لَزِمَهُمْ ذٰلِكَ لِاَنَّهُمْ اَثْبَتُوا الْاَقَانِيْمَ الثَّلٰثَةَ الَّتِىْ هِىَ الْوُجُوْدُ وَالْعِلْمُ وَالْحَيٰوةُ وَسَمَّوْهَا الْاَبَ وَالْاِبْنَ وَرُوْحَ الْقُدُسِ وَزَعَمُوْا اَنَّ اُقْنُوْمَ الْعِلْمِ قَدِ انْتَقَلَ اِلٰى بَدَنِ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَجَوَّزُ الْاِنْفِكَاكَ وَالْاِنْتِقَالَ فَكَانَتْ ذَوَاتٍ مُتَغَايِرَةً

সহজ তরজমা

মুতাযিলারা যখন আল্লাহর গুণাবলী অস্বীকার করতে দলীল স্বরূপ বলল, গুণাবলী প্রমাণ করলে আল্লাহর একাত্মবাদকে বাতিল করতে হয়। কারণ, গুণাবলী এমন বিদ্যমান বিষয় হবে, যেগুলো চিরন্তন এবং আল্লাহর সত্তা ব্যতিত অন্য কিছু। সুতরাং গাইরুল্লাহর চিরন্তনতা আবশ্যক হবে; সাথে সাথে বাধ্যতামূলক অনেক চিরন্তন বস্তু বরং একাধিক অনিবার্য সত্তার অস্তিত্ব আবশ্যক হয়ে পড়বে। যেমনটি ইংগিত রয়েছে মুতাকাদ্দিমীনের বক্তব্যে। আর মুতাআখখিরীনদের বক্তব্যে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে- وَاجِبُ الْوُجُوْدِ بِالذَّاتِ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ অপরিহার্য সত্তা আল্লাহ এবং তার গুণাবলী। আর খ্রিস্টানরা শুধু তিনটি চিরন্তন বস্তু প্রমাণ করেছে। ফলে কাফির সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং আট অথবা ততোধিক চিরন্তন বস্তু সাব্যস্ত করলে তার অবস্থা কি হবে? লেখক এ প্রশ্নের প্রতি وَهِىَ لَا هُوَ وَلَا غَيْرُهُ দ্বারা ইশারা করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহর গুণাবলী হুবহু তার সত্তাও নয়; তা ভিন্ন অন্য কিছু নয়। সুতরাং গাইরুল্লাহর চিরন্তনতা বা একাধিক চিরন্তন বস্তুর অস্তিত্ব আবশ্যক হবে না। অবশ্য খ্রিস্টানরা স্বতন্ত্র অনেকগুলো চিরন্তন বস্তু স্পষ্ট ভাষায় প্রমাণ করেনি বটে; তাদের কথায় তা সাব্যস্ত হয়। কারণ, তারা তিনটি اقانيم বা মূলবস্তু সাব্যস্ত করেছে। যথা- উজূদ, ইলম ও হায়াত। আর এ তিনটির নাম রেখেছে তারা পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মা। বলেছে, اُقْنُوْم عِلْم হযরত ঈসা (আ.) এর দেহের দিকে স্থানান্তরিত হয়েছে। সুতরাং তারা একটি অপরটি থেকে পৃথক বা স্থানান্তরিত হওয়া বৈধ বলে প্রমাণ করেছে। অতএব এগুলো সব স্বতন্ত্র, ভিন্ন ভিন্ন সত্তা।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

মু'তাযিলীরা সিফাতে বারীকে অস্বীকার করে

সকল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ঐক্যমতে আল্লাহর এমন কিছু গুণাবলী রয়েছে, যেগুলো ওয়াজিবুল উজূদ এর অর্থ থেকে অতিরিক্ত। কিন্তু আল্লাহর হুবহু সত্তাও নয়। পক্ষান্তরে মুতাযিলীরা এসব গুণাবলীকে অস্বীকার করে বলেছে, এগুলো ওয়াজিব আল্লাহর হুবহু সত্তা। আর সিফাতগুলো হুবহু ওয়াজিব হওয়ার অর্থ হল, যেসব ক্রিয়াকর্মের উদ্দেশ্যে আল্লাহর জন্য সিফাতগুলো প্রমাণ করা হয়, সেগুলোর জন্য আল্লাহ সত্তাই যথেষ্ট। তার সত্তা থেকে অতিরিক্ত কোন জিনিস তার জন্য প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই; প্রমাণিতও নয়।

মু'তাযিলাদের প্রমাণ

সিফাতগুলোকে অস্বীকার করার ব্যাপারে মুতাযিলারা দলীলস্বরূপ বলে, যদি আল্লাহ জন্য এমন কতগুলো সিফাত থাকে, যেগুলো হুবহু আল্লাহর সত্তা নয় বরং তার সত্তা থেকে অতিরিক্ত। সেগুলো হয়ত আল্লাহর সত্তা ভিন্ন অন্য কিছু হবে। তাহলে তো সেগুলো حَادِث হতে পারবে না। অন্যথায় এগুলো مَوْصُوْف অর্থাৎ ওয়াজিব আল্লাহ তা'আলার নশ্বরতা জরুরী হবে। সেগুলো কাদীম হওয়া বাধ্যতামূলক। অতএব গাইরুল্লাহ অবশ্যই কাদীম হবে।

তাছাড়া এমন গুণ তো অনেক। ফলে একাধিক চিরন্তন বস্তু হওয়া আবশ্যক হবে। অধিকন্তু ইতোপূর্বে মুসান্নিফ রহ. এর উক্তি "আল-কাদীম" এর ব্যাখ্যায় মুতাকাদ্দিমীনের বক্তব্যে ইংগিত ও মুতাআখেরীনের সুস্পষ্ট বিবরণে বলা হয়েছে, কাদীম এবং ওয়াজিব উভয়টি সমার্থক। সুতরাং একের অধিক ওয়াজিব সত্ত্বা হওয়া জরুরী হয়ে পড়বে। আর গাইরুল্লাহর কাদীম হওয়া, একাধিক কাদীম ও ওয়াজিব হওয়া সবই তাওহীদের পরিপন্থী।

এরপর যারা গুণাবলী এর প্রবক্তা তাদের মধ্য থেকে কেউ সাঁতটি, কেউ আটটি আবার কেউ এর চেয়েও বেশী মানেন। খ্রিস্টানরা শুধু তিনটি কাদীম তথা পিতা, পুত্রও পবিত্রাত্মার প্রবাক্তা হওয়ায় কাফির সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং যারা সাত, আট বা ততোধিক কাদীম মানেন, তাদের কুফুরির অবস্থা কী হবে?

জবাব ঃ মুসান্নিফ রহ. মুতাযিলাদের এ প্রমাণের উত্তরের দিকে وَهِيَ لَاهُوَ وَلَاغَيْرُهُ দ্বারা ইশারা করেছেন। উক্ত ইংগিতবহ স্থানে তিনি গুণাবলীকে আল্লাহর সত্তা ছাড়া অন্য কিছুও নয়, সে কথাও বলেছেন। কেননা যখন সিফাতগুলো আল্লাহর সত্তা ছাড়া অন্য কিছু নয়, তখন সেগুলো কাদীম হওয়া দ্বারা গাইরুল্লাহ কাদীম হওয়া এবং বিভিন্ন বস্তসমূহের আধিক্যের মাঝে বৈপরিত্য তথা একটি অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন এবং স্থানান্তরিত হওয়া সম্ভাবনার উপর মওকুফ। যেহেতু আল্লাহর সিফাতগুলোর পরস্পর ভিন্নতা এ অর্থে নয় যে, সেগুলো একটি অপরটি থেকে বিচ্ছন্ন হতে পারে। সেহেতু একাধিক হওয়া অবাস্তব। কাজেই এগুলো কাদীম হওয়ার দ্বারা একাধিক কাদীম আবশ্যক হবে না।

মোটকথা, অনেকগুলো প্রাচীন বস্তু হওয়া ব্যাপকভাবে অসম্ভব নয় বরং পরস্পর বিরোধী অনেকগুলো কাদীম হওয়া অসম্ভব। আর আমরা যে صِفَات কে কাদীম বলে বিশ্বাস করি, সেগুলো পরস্পর একটি অপরটি থেকে ভিন্ন কোন জিনিস নয়। আর ওয়াজিব সত্তা থেকে আলাদাও নয়।

قَوْلُهُ : اِشَارًا لِى الْجَوَابِ الخ ঃ শারিহ রহ. এর উক্তি দ্বারা পরক্ষোভাবে মুতাযিলাদের প্রমাণের উত্তর হয়ে যায় ব্যাখ্যাকার اشار শব্দ এনে একথাই বুঝাতে চেয়েছেন। এখানে উত্তর দেওয়া লেখকের উদ্দেশ্য নয় বরং অপরিহার্য সত্তার মুকাবিলায় সিফাতগুলোর হুকুম বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। নতুবা তিনি শুধু غَيْرِيَت বা ভিন্নতা প্রত্যাখ্যান করাই যথেষ্ট মনে করতেন এবং তা করেই ক্ষান্ত হতেন। কারণ, عَيْنِيَّت প্রত্যখ্যান এঁর সাথে উত্তরের কোন সম্পর্কে নেই। অবশ্য যদি সিফাতগুলোর প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারে মুতাযিলাদের প্রমাণের বিবরণে বলা হয়, যদি আল্লাহর জন্য সিফাত মেনে নেই, তাহলে সেগুলো দুই অবস্থা থেকে মুক্ত হবে না। হয়ত হুবহু আল্লাহর সত্তা হবে। এহেন অবস্থায় সম্ভব অসম্ভব বিষয়াবলী আবশ্যক হবে। যেগুলো আবশ্যক হওয়ার কথা ইতোপূর্বে আপনারা আমাদের উপর চাপিয়েছেন অর্থাৎ ইলম, কুদরত, হায়াত হওয়া, আলিম হওয়া, সৃষ্টির উপাস্য হওয়া ইত্যাদি। নতুবা সে সিফাতগুলো আল্লাহর সত্তা ভিন্ন অন্য কিছু হবে। এমতাবস্থায় এসব সিফাতে কাদীম হওয়ার ফলে গাইরুল্লাহর কাদীম হওয়া এবং একের অধিক কাদীম হওয়া বা সুপ্রাচীনতা আবশ্যক হবে। এভাবে মুতাযিলাদের প্রমাণের বিবরণ দিলে عَيْنِيَّت এবং غَيْرِيَت উভয়টির প্রত্যাখানের সাথে উত্তরের সম্পর্ক হবে। অর্থাৎ সিফাতে ওয়াজিব হুবহু ওয়াজিব তা'আলার সত্তা নয়, যার ফলে অসম্ভব বিষয়াবলী আবশ্যক হবে। আর ওয়াজিব সত্তা ভিন্ন কোন কিছুও নয়। যার ফলে গাইরুল্লাহর প্রাচীন হওয়া অথবা অনেকগুলো সপ্রাচীনতা আবশ্যক হয়।

قَوْلُهُ : فَلَا يَلْزَمُ الْغَيْر الخ ঃ غَيْرِيَت এর অস্বীকৃতির উপর প্রাসঙ্গিক আলোচনা।

বিনাশর্তে একাধিক কাদীম মানা যায় কি ?

قَوْلُهُ: وَالنَّصَارى وَاِنْ لَمْ يُصَرِّح الخ এখানে একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। প্রশ্ন হল, এ খ্রিস্টান যারা তিনটি সুপ্রাচীন সত্তায় বিশ্বাসী, তারা এগুলোকে পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন মনে করে না। তদুপরি তাদেরকে কাফির সাব্যস্থ করা হয়েছে। এতে বুঝা যায়, শর্তহীনভাবে একাধিক কাদীম হওয়া তাওহীদ বিরোধী। চাই সেগুলো পরস্পর একটি অপরটির ভিন্ন কিছু হোক বা না হোক। সুতরাং আপনাদের এ উক্তি, শর্তহীন একাধিক কাদীম হওয়া অসম্ভব নয় বরং পরস্পর একটি অপরটি থেকে ভিন্ন অনেকগুলো কাদীম হওয়াই অসম্ভব –এটা ঠিক নয়।

উপরিউক্ত পশ্নের উত্তর হল, খ্রিস্টানরা যে তিনটি কাদীম সত্ত্বায় বিশ্বাসী, সেগুলোর মাঝে ভিন্নতা সম্পর্কে যদিও তারা সুস্পষ্ট কিছু বলেনি। কিন্তু তারা এমন উক্তি করেছে, যেগুলোর অবশ্যম্ভবী ফল হল, তারা পরস্পর একটি অপরটি থেকে ভিন্ন তিন সুপ্রাচীন সত্তায় বিশ্বাসী। আর সে উক্তিটি হল, তারা তিনটি উকনূম বা বিভূতি সাব্যস্ত করেছে। যথা– وُجُود যাকে তারা পিতা, عِلْم যাকে পুত্র এবং حَيَاة যাকে পবিত্রাত্মা বলে আখ্যায়িত করে। তারা আরও বলে, উকনূমে ইলম (জ্ঞান নামক বিভূতি) আল্লাহর সত্তা থেকে হযরত ঈসা আ. এর দেহের দিকে

স্থানান্তরিত হয়ে গেছে। এভাবে তারা এগুলোকে পরস্পর একটি অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া বৈধ প্রমাণ করেছে। আর এ বিচ্ছিন্নতা যাকে বলে গায়রিয়াত বা তাগায়ুর, সেটা হয় ভিন্ন সত্তার মধ্যে। সুতরাং এ তিনটি বিভূতি পরস্পর ভিন্ন কতগুলো সত্তা হল।

জবাব ঃ উত্তরের সারকথা হল, একাধিক্য তখনই সাব্যস্ত হবে, যখন বিচ্ছিন্নতা ও স্থানান্তর অর্থে গায়রিয়াত সম্ভব হয়। সুতরাং খ্রিস্টানদের উপর একাধিক কাদীম মানার অভিযোগ উঠবে। কেননা তারা যে তিনটি সুপ্রাচীন সত্তায় বিশ্বাসী, সেগুলো পরস্পর একটি অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া ও স্থানান্তরিত হওয়াকে তারা বৈধ সাব্যস্ত করে। কিন্তু আশ'আরীগণ সিফাতগুলোকে ওয়াজিব তা'আলার হুবহু সত্তা, কিংবা একটি সিফাতকে অপর সিফাত থেকে ভিন্ন মনে করেন না অর্থাৎ সিফাতগুলোকে ওয়াজিব তা'আলার সত্তা থেকে এবং একটি সিফাত অন্য সিফাত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া ও স্থানান্তরিত হওয়া বৈধ মনে করেন না। সুতরাং সিফাতগুলোকে কাদীম মনে করার কারণে তাদের বিরুদ্ধে একাধিক কাদীম হওয়ার উক্তি করার অভিযোগ উত্থাপিত হবে না।

وَلِقَائِلٍ اَنْ يَمْنَعَ تَوَقُّفَ التَّعَدُّدِ وَالتَّكَثُّرِ عَلَى التَّغَائُرِ بِمَعْنٰى جَوَازِ الْاِنْفِكَاكِ لِلْقَطْعِ بِاَنَّ مَرَاتِبَ الْاَعْدَادِ مِنَ الْوَاحِدِ وَالْاِثْنَيْنِ وَالثَّلٰثَةِ اِلٰى غَيْرِ ذٰلِكَ مُتَعَدِّدَةٌ مُتَكَثِّرَةٌ مَعَ اَنَّ الْبَعْضَ جُزْءٌ مِنَ الْبَعْضِ وَالْجُزْءُ لَايُغَائِرُ الْكُلَّ وَاَيْضًا لَايُتَصَوَّرُ النِّزَاعُ مِنْ اَهْلِ السُّنَّةِ فِىْ كَثْرَةِ الصِّفَاتِ وَتَعَدُّدِهَا مُتَغَائِرَةً كَانَتْ اَوْ غَيْرَ مُتَغَائِرَةٍ فَالْاَوْلٰى اَنْ يُّقَالَ الْمُسْتَحِيْلُ تَعَدُّدُ ذَوَاتٍ قَدِيْمَةٍ لَا ذَاتٌ وَصِفَاتٌ وَاَنْ لَايُجْتَرَءَ عَلَى الْقَوْلِ بِكَوْنِ الصِّفَاتِ وَاجِبَةَ الْوُجُوْدِ لِذَاتِهَا بَلْ يُقَالُ هِىَ وَاجِبَةٌ لَا لِغَيْرِهَا بَلْ لِمَا لَيْسَ عَيْنَهَا وَلَا غَيْرَهَا اَعْنِىْ ذَاتَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَتَقَدَّسَ وَيَكُوْنُ هٰذَا مُرَادَ مَنْ قَالَ وَاجِبُ الْوُجُوْدِ لِذَاتِهٖ هُوَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَتَقَدَّسَ وَيَكُوْنُ هٰذَا مُرَادُ مَنْ قَالَ وَاجِبُ الْوُجُوْدِ لِذَاتِهٖ هُوَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَصِفَاتُهٗ يَعْنِىْ اَنَّهَا وَاجِبَةٌ لِذَاتِ الْوَاجِبِ تَعَالٰى وَتَقَدَّسَ وَاَمَّا فِىْ نَفْسِهَا فَهِىَ مُمْكِنَةٌ وَلَا اِسْتِحَالَةَ فِىْ قِدَمِ الْمُمْكِنِ اِذَا كَانَ قَائِمًا بِذَاتِ الْقَدِيْمِ وَاجِبًا بِهٖ غَيْرَ مُنْفَصِلٍ عَنْهُ فَلَيْسَ كُلُّ قَدِيْمٍ اِلٰهًا حَتّٰى يَلْزَمَ مِنْ وُجُوْدِ الْقُدَمَاۤءِ وُجُوْدُ الْاٰلِهَةِ لٰكِنْ يَنْبَغِىْ اَنْ يُّقَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَدِيْمٌ بِذَاتِهٖ مَوْصُوْفٌ بِصِفَاتِهٖ وَلَا يُطْلَقُ الْقَوْلُ بِالْقُدَمَاءِ لِئَلَّا يَذْهَبَ الْوَهْمُ اِلٰى اَنَّ كُلًّا مِنْهَا قَائِمٌ بِذَاتِهٖ مَوْصُوْفٌ بِصِفَاتِ الْاُلُوْهِيَّةِ

সহজ তরজমা

কোন প্রশ্নকারীর জন্য তিনি একাধিক ভিন্নতার অর্থ اِمْكَانِ اِنْفِكَاك এর উপর মওকুফ হওয়ার বিষয়টিকে অস্বীকার করার অবকাশ আছে। কারণ, একথা সুনিশ্চিত যে, সংখ্যার স্তরগুলো যেমন এক, দুই, তিন ইত্যাদি একাধিক এবং প্রচুর। তদুপরি এগুলোর মধ্য হতে একটি অপরটির অংশ। আর অংশ পূর্ণ বস্তু থেকে আলাদা কোন জিনিস হয় না। এ ছাড়া আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পক্ষ থেকে সিফাত একাধিক –এ বিতর্কের কল্পনা করা যায় না। সে সিফাতগুলো স্বতন্ত্র হোক চাই না হোক। সুতরাং বলা উচিৎ, অসম্ভব একাধিক চিরন্তন সত্তা হওয়া, সত্তা ও সিফাত সহকারে নয়। এমনিভাবে গুণাবলীকে পত্যক্ষভাবে অপরিহার্য সত্তা বলার ধৃষ্ঠতা না দেখানো। বরং বলা হবে, গুণাবলী ওয়াজিব তথা বিদ্যমান। কিন্তু তা অপরের জন্য নয় বরং এমন সত্তার জন্য, যা হুবহু সে গুণও নয়। আবার তা থেকে আলাদাও নয়। অর্থাৎ আল্লাহর জন্য। যারা বলেছেন, সরাসরি অপরিহার্য সত্তা আল্লাহ এবং তাঁর গুণাবলী, তাদের লক্ষ্যও হয়ত এটাই অর্থাৎ গুণগুলো ওয়াজিব তথা বিদ্যমান এবং এগুলো আল্লাহর সত্তা। মোটকথা, এ গুণগুলো সত্তাগতভাবে তো সম্ভব। আর সম্ভাব্য বস্তুর চিরন্তনতা অসম্ভব নয়। যখন সেটি চিরন্তন সত্তার সাথে প্রতিষ্ঠিত হয়। তার কারণে আবশ্যক হয়, তার থেকে আলাদা না হয়। সুতরাং প্রতিটি কাদীম বস্তু

উপাস্য নয় যে, অনেকগুলো কাদীম বস্তুর অস্তিত্বের কারণে একাধিক উপাস্যের অস্তিত্ব জরুরী হয়ে পড়বে। তবে সত্ত্বাগতভাবে কাদীম নিজ গুণাবলীর সাথে গুণান্বিত, অনেকগুলো কাদীম বস্তু আছে– এ উক্তি না করা উচিৎ। যাতে এমন কল্পনা করা নশত না যায় যে, এ গুণগুলো প্রতিটি স্বাধিষ্ঠ উপাস্যের গুণাবলীর সাথে গুণান্বিত।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ وَلِقَائِلٍ اَنْ يَّمْنَعَ ঃ গুণগুলোকে অস্বীকার করার ক্ষেত্রে মুতাযিলাদের প্রমাণে লেখকের উক্তি وَلَا غَيْرُهٗ কে ব্যবহার করেছেন। সেটি تَعَدُّد এবং تَكَثُّر এর تَغَايُر তথা আলাদা হওয়ার আশঙ্কার উপর নির্ভশীল ছিল অর্থাৎ আল্লাহ কাদীম গুণ আল্লাহর হুবহু সত্তা এমনিভাবে একে অপরের থেকে ভিন্ন নয়। যদ্দরুন সেগুলো একটি অপরটি থেকে আলাদা হওয়া সম্ভব হয়। সুতরাং একের অধিক কাদীম প্রমাণিত হবে না। আর গুণাবলী কাদীম হওয়ার কারণে একের অধিক কাদীম জরুরী হবে না। এখানে ব্যাখ্যাকার বলেছেন, বিরোধীপক্ষের জন্য تَعَدُّد এবং تَكَثُّر কে تَغَايُر মানা বিচ্ছিন্নতা সম্ভব হওয়ার উপর নির্ভরশীল। কারণ, সংখ্যার শ্রেণীগুলোতে একটি অপরটির অংশ। মূলতঃ এ আর كُل এর মাঝে ভিন্নতা নেই। যেমন আট এবং দশ। এখানে প্রথমটি দ্বিতীয়টির অংশ এবং দ্বিতীয়টি প্রথমটির كُل কিন্তু এ দুটির মাঝে تَغَايُر তথা বিচ্ছিন্নতার সম্ভাবনা নেই। কারণ, দশের অংশ আট নিজ كُل অর্থাৎ দশ থেকে আলাদা হতে পারে না। নতুবা দশ আর দশ থাকবে না বরং দুই বাকী থাকবে। তদুপরি এ আট এবং দশ উভয়টি مُتَعَدِّد। এতে বুঝা যায়, تَعَدُّد এবং تَكَثُّر তাগায়ুর বা বিচ্ছিন্নতার সম্ভাবনার উপর স্থগিত নয়।

এক কি সংখ্যা নয় ?

قَوْلُهٗ: مِنَ الْوَاحِدِ এখানে مِنْ টি بَيَانِيَه অর্থাৎ যারা সংখ্যাকে كَم مُنْفَصِل প্রমাণিত করেন, তারা এককে কোন সংখ্যা মনে করেন না। কেননা كَم এমন একটি আরয বা যৌক্তিক বস্তু, যেটি প্রত্যক্ষভাবে বিভাজ্য অর্থাৎ যার অনেকগুলো অংশ হয়। কিন্তু এক বসীত। এর কোন অংশ নেই। যে দিকে বিভাজ্য হতে পারে। সুতরাং এটি عَدَد বা সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত হবে না। কিন্তু যারা সংখ্যার সংজ্ঞায় বলেন, সংখ্যা হল, যা গণনা করা যায়– তাদের মতে একও সংখ্যা। ব্যাখ্যাকারের বক্তব্য এ মতের উপর নির্ভরশীল।

قَوْلُهٗ : وَاَيْضًا لَايُتَصَوَّر ঃ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের কেউ কেউ প্রকৃত صِفَات এর সংখ্যা সাত মনে করেন। قُدْرَت - حَيَات - عِلْم - كَلَام - بَصَر - سَمْع اِرَادَه، আর কেউ تَكْوِين কেও প্রকৃত গুণের মধ্যে গণ্য করেন। তাদের মতে মোট গুণ আটটি। আবার কেউ এর চেয়েও বেশী মানেন। এতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, একাধিক গুণ হওয়ার ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মধ্যে কোন মতানৈক্য নেই। এগুলোকে পরস্পর একটিকে অপরটি থেকে ভিন্ন কিছু মনে করা হোক চাই না হোক। সুতরাং এসব গুণকে কাদীম মানলে একাধিক কাদীম মানা আবশ্যক হয়।

সমস্যা উত্তরণের উত্তম পদ্ধতি

قَوْلُهٗ: فَالْاَوْلٰى اَنْ يُّقَالَ ঃ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে সিফাত একের অধিক হওয়ার ব্যাপারে কোন মতবিরোধ নেই। বিধায় মুতাযিলাদের দলীলের সেই উত্তর দেওয়া সমীচীন নয়, যেটি সিফাতের একাধিক্যের অস্বীকৃতির উপর নির্ভরশীল বরং কাদীম গুণের আধিক্য স্বীকার করে নেওয়া হবে এবং বলা হবে– গুণগুলো কাদীম মানার দ্বারা একটি সত্তাসহ অনেকগুলো গুণ আবশ্যক হয়। এটা অসম্ভব নয় বরং অসম্ভব হল, অনেকগুলো কাদীম সত্তার অস্তিত্ব। এ অভিযোগ আমাদের উপর উত্থাপিত হয় না। কেননা আমরা গুণগুলোকে মুতাযিলাদের মত হুবহু সত্তা বলি না। যার ফলে অনেকগুলো কাদীম সত্তা হওয়া জরুরী হয়। শারেহ রহ. লেখকের উক্তি وَهِيَ لَاهُوَ দ্বারা عَيْنِيَّت কে অস্বীকার করে এ উত্তরের দিকে ইশারা করেছেন।

قَوْلُهٗ : وَاَنْ لَّايُجْتَرَأَ الخ ঃ বাক্যটি اَن শব্দের উপর আতফ হয়েছে। মুতাযিলারা তাদের দলীলে বলেছিল, গুণগুলো কাদীম মানলে একাধিক কাদীম মানা জরুরী হয়। আর কাদীম এবং ওয়াজিব সমার্থক। এ উক্তির আলোকেএ গুণগুলো وَاجِبٌ لِذَاتِهٖ বা সত্ত্বাগতভাবে অপরিহার্য ও হবে। সুতরাং একের অধিক وَاجِبٌ لِذَاتِهٖ ও জরুরী হবে। অথচ এটি তাওহীদ বিরোধী। কেউ কেউ মুতাযিলাদের প্রমাণের উত্তর গুণগুলোকে وَاجِبٌ لِذَاتِهٖ প্রমাণিত করে দিয়েছেন, ওয়াজিব গুণের আধিক্য অসম্ভব নয় বরং একের অধিক ওয়াজিব সত্তার অস্তিত্ব অসম্ভব।

ব্যাখ্যাকার বলেন, তাওহীদের প্রমাণাদি সত্তা ও গুণগুলোর মাঝে ব্যবধ্যান করা ব্যতিত নিঃশর্ত জরুরী সত্তার একত্বের দলীল পেশ করছে। এ কারণে গুণকে وَاجِبُ الْوُجُوْدِ لِذَاتِهِ বলার ধৃষ্ঠতা প্রদর্শন করা উচিত নয় বরং বলা উচিত, গুণগুলো وَاجِب তথা বিদ্যমান। এগুলো হুবহু সে সত্তার জন্য, যেটি হুবহু গুণও নয়; আবার গুণ ছাড়া অন্য কিছুও নয়। অর্থাৎ আল্লাহর সত্তার জন্য। যারা গুণগুলোকে وَاجِبٌ لِذَاتِهِ বলেছেন, তাদের মনবাসনাও এটাই অর্থাৎ وَاجِب প্রমাণ অর্থে ব্যবহৃত। বাকী থাকে لِذَاتِهِ এর অর্থ لِذَاتِ اللّٰهِ تَعَالٰى গুণগুলো আসলে কি? এর সমাধান হল, সেগুলো আসলে সম্ভাব্য বস্তু। তদুপরি কাদীম। কেননা সেগুলো আল্লাহর কাদীম সত্তার সাথে প্রতিষ্ঠিত। যখন সম্ভাব্য কোন জিনিস কাদীম কোন জিনিসের সাথে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সেটিও কাদীম হওয়া অসম্ভব নয়। সে মতে প্রসিদ্ধ মূলনীতি كُلُّ مُمْكِنٍ حَادِثٌ এর মধ্যে مُمْكِن দ্বারা এমন সম্ভাব্য বস্তু উদ্দেশ্য, যেটি কাদীম সত্তার সাথে প্রতিষ্ঠিত নয়।

قَوْلُهُ فَلَيْسَ كُلُّ قَدِيْمٍ اِلٰهًا ঃ এটি ব্যাখ্যাকারকের উক্তি وَلَااِسْتِحَالَةَ فِىْ قِدَمِ الْمُمْكِنِ এর শাখা অর্থাৎ যখন গুণ কাদীম হওয়া সত্ত্বেও সম্ভাব্য, তখন প্রতিটি কাদীম বস্তু উপাস্য নয় যে, একের অধিক কাদীম গুণের অস্তিত্ব দ্বারা একাধিক উপাস্যের অস্তিত্ব জরুরী হবে। কারণ উপাস্যের জন্য অপরিহার্য সত্তা হওয়া জরুরী।

قَوْلُهُ : لٰكِنْ يَنْبَغِىْ الخ ঃ অর্থাৎ সতর্কতা হিসেবে বলা উচিৎ, আল্লাহ নিজ গুণাবলী সহকারে কাদীম। এমন বলা যাবে না যে, তার গুণাবলী কাদীম। যাতে সাধারণ মানুষ, যারা প্রতিটি কাদিম জিনিসকে উপাস্য মনে করে, তাদের অন্তরে এ ধারণা না জন্মে যে, সেসব গুণাবলীর মধ্য হতে প্রতিটি নিজে নিজে প্রতিষ্ঠিত এবং উপাস্যের গুণে গুণান্বিত।

وَلِصُعُوْبَةِ هٰذَا الْمَقَامِ ذَهَبَتِ الْمُعْتَزِلَةُ وَالْفَلَاسِفَةُ اِلٰى نَفْىِ الصِّفَاتِ وَالْكَرَّامِيَّةُ اِلٰى نَفْىِ قِدَمِهَا وَالْاَشَاعِرَةُ اِلٰى نَفْىِ غَيْرِيَّتِهَا وَعَيْنِيَّتِهَا

সহজ তরজমা

এ বিষয়টি কঠিন হওয়ার কারণে মুতাযিলা এবং দার্শনিকগণ গুণগুলো অস্বীকারের করার পক্ষ নিয়েছে। কাররামিয়া অস্বীকার করেছে সিফাতের সুপ্রাচীনতা। আর আশ'আরীগণ বলেছেন, আল্লাহর গুণগুলো আল্লাহর সত্তা ছাড়া অন্য কিছু নয় এবং হুবহু সত্তাও নয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

বিষয়টির কাঠিন্যর ফল

ব্যাখ্যাকারের উদ্দেশ্য হল, আল্লাহর জন্য পূর্বোল্লেখিত গুণগুলোর অস্তিত্ব যদিও যুক্তিযুক্ত ও শরঈ দলীলনিভর, তদুপরি এর উপর নানা দিক থেকে প্রশ্নাবলী উত্থাপিত হয়। ফলে প্রত্যেক দল নিজ নিজ জ্ঞান ও যুক্তির আলোকে সকল প্রশ্ন নিরসনের চেষ্টা করেছেন। আসলে মানুষের মন-মানসিকতা বিচিত্র ধরনের। ফলে গুণ সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের মাযহাব তৈরী হয়েছে। সুতরাং মুতাযিলারা যখন লক্ষ্য করল, গুণের অস্তিত্ব যদি মেনে নেই এবং একে حَادِث মানলে আল্লাহর সত্তার সাথে حَادِث বস্তু প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবার কাদীম মানলে একের অধিক কাদীম হওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে। অথচ দুটিই অসম্ভব। বিধায় তারা গুণ আছে বলেই স্বীকার করে না। কাররামিয়া সিফাতগুলোকে কাদীম বলে। কিন্তু একের অধিক কাদীম মানার অভিযোগ থেকে বাঁচার জন্য সে সব সিফাতকে কাদীম বলে না। তারা বলছে, সিফাতগুলো حَادِث তবে আল্লাহর সত্তার সাথে حَادِث বস্তু প্রতিষ্ঠিত হওয়া বৈধ। আশ'আরীরা চিন্তা করল গুণগুলোকে حَادِث মানলে আল্লাহ حَادِث বস্তুর স্থান হয়ে পড়েন। এ কারণে গুণগুলোক তারা কাদীম মেনেছে। অবশেষে যখন তাদের বিরুদ্ধে একাধিক কাদীম এবং গায়রুল্লাহ কাদীম হওয়ার অভিযোগ আসল, তখন তারা বলল– এ গুণগুলো হুবহু ওয়াজিবের সত্তাও নয় আবার ভিন্ন কিছু ও নয়।

فَاِنْ قِيْلَ هٰذَا فِى الظَّاهِرِ رَفْعٌ لِلنَّقِيْضَيْنِ وَفِى الْحَقِيْقَةِ جَمْعٌ بَيْنَهُمَا لِاَنَّ الْمَفْهُوْمَ مِنَ الشَّيْئِ اِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ الْمَفْهُوْمُ مِنَ الْاٰخَرِ فَهُوَ غَيْرُهٗ وَاِلَّا فَعَيْنُهٗ وَلَايُتَصَوَّرُ بَيْنَهُمَا وَاسِطَةٌ قُلْنَا قَدْ فَسَّرُوْا الْغَيْرِيَّةَ بِكَوْنِ الْمَوْجُوْدَيْنِ بِحَيْثُ يُقَدَّرُ وَيُتَصَوَّرُ وُجُوْدُ اَحَدِهِمَا مَعَ عَدَمِ الْاٰخَرِ اَىْ يُمْكِنُ الْاِنْفِكَاكُ بَيْنَهُمَا وَالْعَيْنِيَّةُ بِاتِّحَادِ الْمَفْهُوْمِ بِلَا تَفَاوُتٍ اَصْلًا فَلَا يَكُوْنَانِ نَقِيْضَيْنِ بَلْ يُتَصَوَّرُ بَيْنَهُمَا وَاسِطَةٌ بِاَنْ يَكُوْنَ الشَّيْئُ بِحَيْثُ لَايَكُوْنُ مَفْهُوْمُهٗ مَفْهُوْمَ الْاٰخَرِ وَلَايُوْجَدُ بِدُوْنِهٖ كَالْجُزْءِ مَعَ الْكُلِّ وَالصِّفَةِ مَعَ الذَّاتِ وَبَعْضِ الصِّفَاتِ مَعَ الْبَعْضِ فَاِنَّ ذَاتَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَصِفَاتِهٖ اَزَلِيَّةٌ وَالْعَدَمُ عَلَى الْاَزَلِىِّ مُحَالٌ وَالْوَاحِدُ مِنَ الْعَشَرَةِ يَسْتَحِيْلُ بَقَاؤُهٗ بِدُوْنِهَا وَبَقَاؤُهَا بِدُوْنِهٖ اِذْهُوَ مِنْهَا فَعَدَمُهَا عَدَمُهَا وَ وُجُوْدُهَا وُجُوْدُهَا بِخِلَافِ الصِّفَاتِ الْمُحْدَثَةِ فَاِنَّ قِيَامَ الذَّاتِ بِدُوْنِ تِلْكَ الصِّفَةِ الْمُعَيَّنَةِ مُتَصَوَّرٌ فَتَكُوْنُ غَيْرَ الذَّاتِ كَذَا ذَكَرَهُ الْمَشَائِخُ .

সহজ তরজমা

যদি প্রশ্ন করা হয়, এতো সুস্পষ্ট اِرْتِفَاعُ نَقِيْضَيْنِ তথা দুটি পরস্পর বিরোধী বস্তু এক সাথে উঠে যাওয়া। আর অস্পষ্টতঃ اِجْتِمَاعُ نَقِيْضَيْنِ তথা দুটি পরস্পর বিরোধী বস্তুর সমন্বয়। কেননা একটি বস্তুর অর্থ যদি হুবহু দ্বিতীয়টির অর্থ না হয়, তাহলে এটি অপরটি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হবে। নতুবা এটি হুবহু একই বস্তু হবে। এ দুটির মধ্যে তৃতীয় আরেকটির বস্তুর কথা কল্পনা করা যাবে না। এর উত্তরে আমরা বলব, আমাদের মাশাইখে কিরাম غَيْر ভিন্ন হওয়ার বিশদ আলোচনা করেছেন অর্থাৎ দুটি বিদ্যমান বস্তু এমন হওয়া, যার ফলে প্রতিটির কল্পনা অপরটি ছাড়াও করা যায়। অর্থাৎ একটি অন্যটি থেকে আলাদা হওয়া সম্ভব। আর عَيْن বা এক হওয়ার অর্থ হল, দুটি জিনিসের অর্থ কোন ধরনের পার্থক্য ছাড়া এক হওয়া। সুতরাং এ দুটি জিনিস পরস্পর বিরোধী হবে না বরং এ দুটির মধ্যে তৃতীয় আরেকটি বিষয় কল্পনা করা যাবে। যেমন, একটি বস্তু এমন হল যে, এর অর্থ হুবহু দ্বিতীয়টির অর্থ নয় এবং দ্বিতীয়টি ব্যতিত এর অস্তিত্বও হয় না। যেমন, অংশ পূর্ণ বস্তুর সাথে, সিফাত সত্তার সাথে এবং একটি গুণ অন্য আরেকটির গুণের সাথে। কেননা আল্লাহর সত্তা এবং তার গুণাবলী অনাদী/কাদীম। প্রকৃতপক্ষে কাদীম বস্তুর অস্তিত্বহীনতা অসম্ভব। এবং দশের এক দশ ছাড়া অবশিষ্ট হওয়া অসম্ভব। এমনি ভাবে দশ এক ছাড়া অবশিষ্ট থাকা অসম্ভব। কেননা এ এক তো দশেরই অংশ। সুতরাং দশ অস্তিত্বহীন হওয়া মানেই এক অস্তিত্বহীন হয়ে যাওয়া। আবার দশের অস্তিত্ব পাওয়া মানে একের অস্তিত্ববান হওয়া। নশ্বর গুণাবলী এর বিপরীত। কারণ, সত্তার অস্তিত্বের কল্পনা সে সব নির্দিষ্ট গুণাবলী ব্যতিত সম্ভব। সুতরাং সেটি সত্তা থেকে আলাদা। মাশাইখগণ এমনই বলেছেন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

কয়েকটি প্রশ্নের অবসান

قَوْلُهٗ فَاِنْ قِيْلَ هٰذَا الخ ঃ এখানে লিখকের উক্তি وَهُوَ لَا هُوَ وَلَا غَيْرُهٗ এর উপর একটি প্রশ্ন বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নটি বস্তুতঃ غَيْرِيَّت ও عَيْنِيَّت এর মাঝে বৈপরিত্য এবং উভয়ের মধ্যে তৃতীয় আরেকটি বস্তু ওয়াসিতাহ বা মাধ্যম না থাকার উপর নির্ভরশীল। সারকথা হল, غَيْرِيَّت ও عَيْنِيَّت একটি অপরটির বিপরীত। কেননা দুটি বস্তুর অর্থ এক হওয়া عَيْنِيَّت এবং এক না হওয়া غَيْرِيَّت এ দুটির মাঝে কোন মাধ্যম নেই। সুতরাং عَيْنِيَّت এবং غَيْرِيَّت দুটি দ্বৈত বিষয়। কিন্তু দুটি নকীযের মধ্য হতে একটির অনস্তিত্ব অপরটির অনস্তিত্বকে

আবশ্যক করে। ফলে লেখক যখন বললেন– গুণ হুবহু সত্তা নয়, তখন বুঝা গেল, গুণ সত্তা ছাড়া অন্য কিছু। এরপর যখন غَيْرُ ذَات বলেছেন, তখন বুঝা যায়, সেটি আইন। ফলে عَيْنِيَّت এবং غَيْرِيَّت উভয়টি প্রমাণিত হল। আর এরই নাম اِجْتِمَاعِ نَقِيْضَيْن তথা দুটি পরস্পর বিরোধী বস্তুর সহাবস্থান।

قُلْنَا : قَدْ فَسَّرُوْا الْغَيْرِيَّة ঃ এখানে উপরিউক্ত প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে। জবাবটি غَيْرِيَّت এবং عَيْنِيَّت এর মাঝে বৈপরিত্যের উপর নির্ভরশীল। সারকথা হল, عَيْنِيَّت এবং غَيْرِيَّت একটি অপরটির نَقِيْض নয়। সুতরাং উভয়টির অনস্তিত্ব اِنْتِفَاءُ نَقِيْضَيْن নয় এবং প্রতিটির অনস্তিত্ব অপরটির অনস্তিত্বকে জরুরী করবে না। যার ফলে اِجْتِمَاعُ نَقِيْضَيْن আবশ্যক হয়।

কেননা দুটি বিপরীত জিনিসে মধ্যে তৃতীয় আরেকটি জিনিস থাকে না। অথচ غَيْرِيَّت এবং عَيْنِيَّت এর মধ্যে তৃতীয় আরেকটি জিনিস রয়েছে। আশ'আরী মাশাইখে কিরাম عَيْنِيَّت এর অর্থ করেছে, যা প্রশ্নকারী বর্ণনা করলেন অর্থাৎ দুটি বস্তুর অর্থ এক হওয়া। কিন্তু তাতে غَيْرِيَّت এর আরেকটি অর্থ ও বর্ণনা করেছেন অর্থাৎ, একটি বস্তুর অস্তিত্ব দ্বিতীয়টির অস্তিত্বহীনতা সহকারে কল্পনা করা সম্ভব হওয়া অর্থাৎ একটি অপরটি থেকে পৃথক হওয়া, বিচ্ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা। غَيْرِيَّت এর এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী عَيْنِيَّت এবং غَيْرِيَّت পরস্পর نَقِيْض নয় বরং উভয়টির মাঝখানে তৃতীয় আরেকটি মাধ্যম হতে পারে। যেমন, দুটি বস্তু এমন হবে যে, এগুলোর অর্থ এক নয় এবং একটি অপরটি ছাড়া অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না। সুতরাং দুটির অর্থ এক না হওয়ার কারণে এ দুটির মাঝে عَيْنِيَّت হল না। আবার একটি অপরটি থেকে বিচ্ছিন্নও হতে পারে না বলে غَيْرِيَّت ও হল না। যেমন, আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী। উভয়ের অর্থ এক না হওয়ার কারণে তাতে عَيْنِيَّت নেই। আবার উভয়টি অনাদি, অনস্তিত্ব অসম্ভব। ফলে একটি অপরটি থেকে আলাদা হওয়া অসম্ভব বলে غَيْرِيَّت নেই। কাজেই গুণ হুবহু সত্তা নয় আবার তা থেকে পৃথকও নয়। আর আল্লাহর গুণগুলোর মধ্য হতে একটির সাথে অন্যটির সম্পর্ক এমনই। দুটির অর্থ এক না হওয়ার কারণে এবং অনাদি হওয়ার ফলে একটি অপরটি থেকে পৃথক হতে পারে না। সুতরাং কোন গুণ অন্য কোন গুণের عَيْن বা غَيْر কোনটি নয়।

جُزْء এবং كُل এর ব্যাপারটিও তদ্রূপ; উভয়ের অর্থ এক নয়। ফলে তাতে عَيْنِيَّت নেই। একটি অপরটি ছাড়া অস্তিত্ব লাভ অর্জন করতে পারে না বলে غَيْر ও নয়। দুটোর অর্থ এক না হওয়া তো স্পষ্ট। কারণ, جُزْء এর অর্থ হল, যার দ্বারা কোন জিনিস গঠিত হয়। আবার একটি অন্যটি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া অসম্ভব। যেমন দশের এক এবং দশ। এক হল جُزْء আর দশ হল, তার كُل। দশের এক দশের অংশ। এ একের অস্তিত্ব দশ ছাড়া সম্ভব নয়। কেননা যদি দশ না থাকে বরং উদাহরণ স্বরূপ তিন কমে যায় তাহলে সাত থাকবে। এমতাবস্থায় যদিও তাতে এক রয়েছে কিন্তু এ এক তো দশের অংশ এক নয় বরং এটি সাতের এক অংশ। এমনিভাবে দশ যেটি كُل, তার অস্তিত্বও দশের এক ছাড়া হতে পারে না। কারণ, এক দশ থেকে পৃথক হতে পারে না। তাহলে নয় হয়ে যাবে। এমনিভাবে প্রতিটি جُزْء এবং كُل এর অবস্থা অর্থাৎ একটি অপরটি থেকে পৃথক হওয়া অসম্ভব। ফলে সেগুলোর সাথে غَيْرِيَّت নেই। যেমনিভাবে উভয়ের অর্থ এক না হওয়ার কারণে عَيْنِيَّت নেই।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ الصِّفَاتِ الْمُحْدَثَة ঃ উপরে যে সত্তা এবং তার গুণের মাঝে غَيْرِيَّت তথা বিচ্ছিন্নতা সম্ভব হওয়ার কথা অস্বীকার করা হয়েছিল, সেই সত্তা দ্বারা অপরিহার্য সত্তা আর সিফত দ্বারা ওয়াজিব এর সিফাত উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু এর পরিপন্থী হল, আমাদের সত্তা ও গুণ। কেননা যেহেতু এগুলো حَادِث এগুলোর উপর অস্তিত্বহীনতা যোগ হতে পারে। যেমন আজকে আমরা সুস্থ, কালকে এগুণটি থাকবে না, সেটা আগামীকাল আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া সম্ভব। তখন আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ব। তদুপরি আমাদের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকবে। আর যেহেতু নশ্বর গুণ বিশিষ্ট সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে, সেহেতু حَادِث গুণ তার মওসূফের غَيْر হবে।

قَوْلُهُ : فَاِنَّ قِيَامَ الذَّاتِ....الخ ঃ مُعَيَّنَه বা নির্ধারিত শর্ত আরোপ করার কারণ হল, নিঃশর্ত গুণ ব্যতীত সত্তার অস্তিত্ব অসম্ভব। কেননা মতলাক গুণের একটি فَرد বা শাখা অস্তিত্ব। সুতরাং সাধারণ গুণ ব্যতিত সত্তা বিদ্যমান থাকার অর্থ হল, অস্তিত্ব ব্যতীত বিদ্যমান হওয়া। অথচ এটা সুস্পষ্ট বাতিল।

وَفِيهِ نَظَرٌ لِاَنَّهُمْ اِنْ اَرَادُوْا بِهِ صِحَّةَ الْاِنْفِكَاكِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ اِنْتَقَضَ الْعَالَمُ مَعَ الصَّانِعِ وَالْعَرَضُ مَعَ الْمَحَلِّ اِذْلَا يُتَصَوَّرُ وُجُوْدُ الْعَالَمِ مَعَ عَدَمِ الصَّانِعِ لِاسْتِحَالَةِ عَدَمِهِ وَلَا وُجُوْدُ الْعَرَضِ كَالسَّوَادِ مَثَلًا بِدُوْنِ الْمَحَلِّ وَهُوَ ظَاهِرٌ مَعَ الْقَطْعِ بِالْمُغَايَرَةِ اِتِّفَاقًا وَاِنْ اِكْتَفَوْا بِجَانِبٍ وَاحِدٍ لَزِمَتِ الْمُغَايَرَةُ بَيْنَ الْجُزْءِ وَالْكُلِّ وَكَذَا بَيْنَ الذَّاتِ وَالصِّفَةِ لِلْقَطْعِ بِجَوَازِ وُجُوْدِ الْجُزْءِ بِدُوْنِ الْكُلِّ وَالذَّاتِ بِدُوْنِ الصِّفَةِ وَمَا ذُكِرَ مِنْ اِسْتِحَالَةِ بَقَاءِ الْوَاحِدِ بِدُوْنِ الْعَشَرَةِ ظَاهِرُ الْفَسَادِ

সহজ তরজমা

এতে আপত্তি আছে। কেননা তারা যদি غَيْرِيَّتْ এর সংজ্ঞায় "বিচ্ছেদের সম্ভাবনা প্রমাণিত করে উভয় পক্ষ থেকে বিচ্ছিন্নতা সম্ভব" বলে উদ্দেশ্য করে থাকেন, তাহলে এ সংজ্ঞাটি বিশ্বজগৎ ও বিশ্বস্রষ্টার কারণে এবং عَرَض ও محل দ্বারা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়বে। সুতরাং সৃষ্টিকর্তা নেই –এ কল্পনা করে বিশ্বজগতের অস্তিত্ব ধারণা করা অসম্ভব। কারণ, সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বহীনতা সম্ভব নয়। এমনিভাবে عَرَض যেমন কালো রংয়ের অস্তিত্ব তার মহল ব্যতীত কল্পনা করা যায় না। আর এ বিষয়টি স্পষ্ট। অথচ সর্বসম্মতভাবে উভয়ের মাঝে বিচ্ছিন্নতা নিশ্চিত। আর যদি এক পক্ষ থেকে বিচ্ছেদ যথেষ্ট মনে করেন, তবে তো অংশ এবং পূর্ণবস্তু, সত্তা এবং গুণ এর মাঝেও বিচ্ছিন্নতা জরুরী হয়ে পড়বে। কেননা পূর্ণবস্তু ব্যতীত অংশ, সত্তা ব্যতিত গুণের অস্তিত্বের সম্ভবনা নিশ্চিত এবং দশ ব্যতীত এক অবশিষ্ট থাকা অসম্ভব। এসব কথা যে একটি ভ্রান্ত উক্তি তাও সুস্পষ্ট।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

প্রশ্নের মূলকথা হল, غَيْرِيَّتْ এর ব্যাখ্যায় বিচ্ছেদের সম্ভাবনা দ্বারা যদি মাশায়েখগণ উভয় পক্ষ থেকে বিচ্ছেদের সম্ভাবনা বুঝিয়ে থাকেন অর্থাৎ উভয়টির মধ্য হতে প্রতিটির অস্তিত্ব অন্যটির অবিদ্যমানতাসহ কল্পিত হবে। তাহলে সংজ্ঞাটি ব্যাপক থাকে না। কেননা বিশ্বজগত এবং স্রষ্টার মাঝে, তদ্রূপ আপতন এবং স্থানের মাঝে غَيْرِيَّتْ (ভিন্নতা) এর সম্পর্ক কিন্তু এখানে غَيْرِيَّتْ উভয় পক্ষ থেকে বিচ্ছিন্নতার অর্থে প্রযোজ্য নয়। কেননা বিশ্বজগত থেকে স্রষ্টার বিচ্ছিন্নতা সম্ভব। কিন্তু স্রষ্টা থেকে বিশ্বজগত বিচ্ছিন্ন হওয়া অসম্ভব। কেননা স্রষ্টার অবিদ্যমানতায় বিশ্বজগতের অস্তিত্ব কল্পনা করা অসম্ভব। বিশ্বস্রষ্টা অপরিহার্য হওয়ায় তার অস্তিত্বহীনতা অসম্ভব। এমনিভাবে স্থান আপতন থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে। কিন্তু আপতন স্থান থেকে এ অর্থে পৃথক হতে পারে না যে, সেটি সে স্থান ব্যতীত বিদ্যমান হবে। আর যদি غَيْرِيَّتْ (ভিন্নতা) বাস্তবায়িত হওয়ার জন্য শুধু এক দিক থেকে বিচ্ছিন্নতাকে যথেষ্ট মনে করা হয়, তাহলে সংজ্ঞাটি مَانِع হবে না। কেননা পূর্ণবস্তু এবং ভগ্নাংশ, সত্তা এবং গুণের মাঝে غَيْرِيَّتْ (ভিন্নতা) নেই। তবে শুধু এক পক্ষ হতে বিচ্ছিন্নতা সম্ভব হলে এখানেও উভয়ের মাঝে বিচ্ছিন্নতা জরুরী হবে। এখানে এক পক্ষ থেকে বিচ্ছিন্নতা সম্ভব। যেমন, পূর্ণবস্তুর অস্তিত্ব ভগ্নাংশ থেকে যদিও সম্ভব নয় কিন্তু অংশের অস্তিত্ব পূর্ণবস্তু ছাড়া সম্ভব। এমনিভাবে গুণের অস্তিত্ব গুণ বিশিষ্ট সত্তা ব্যতিত যদিও সম্ভব নয়, কিন্তু সত্তার অস্তিত্ব গুণ ব্যতিত সম্ভব।

শারিহ রহ. وَمَا ذُكِرَ ... الخ দ্বারা বলেছেন, অংশের অস্তিত্ব পূর্ণবস্তু ছাড়া সম্ভব। পেছনে অংশ এবং পূর্ণ বস্তুর মাঝে غَيْرِيَّتْ (বিচ্ছিন্নতা) সম্ভব হওয়ার অর্থে না হওয়ার উদাহরণে বলা হয়েছিল, যেভাবে দশের স্থায়িত্ব এক ছাড়া অসম্ভব, তেমনিভাবে দশের একের স্থায়িত্ব দশ ছাড়া অসম্ভব। এ বক্তব্যকে শারিহ রহ. প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন, 'দশের এক' এর অস্তিত্ব দশ ছাড়া অসম্ভব –এ কথা সঠিক নয়। কেননা যদি দশ না থাকে বরং নয় থাকে, তাহলে নয় এর মাঝেও এক বিদ্যমান রয়েছে।

وَلَا يُقَالُ اَلْمُرَادُ اِمْكَانُ تَصَوُّرِ وُجُوْدِ كُلٍّ مِّنْهُمَا مَعَ عَدَمِ الْاٰخَرِ وَلَوْ بِالْفَرْضِ وَاِنْ كَانَ مَحَالاً وَالْعَالَمُ قَدْ يُتَصَوَّرُ مَوْجُوْدًا ثُمَّ يُطْلَبُ بِالْبُرْهَانِ ثُبُوْتُ الصَّانِعِ بِخِلَافِ الْجُزْءِ مَعَ الْكُلِّ فَاِنَّهُ كَمَا يَمْتَنِعُ وُجُوْدُ الْعَشَرَةِ بِدُوْنِ الْوَاحِدِ يَمْتَنِعُ وُجُوْدُ الْوَاحِدِ مِنَ الْعَشَرَةِ بِدُوْنِ الْعَشَرَةِ اِذْ لَوْ وُجِدَ لَمَا كَانَ وَاحِدًا مِّنَ الْعَشَرَةِ وَالْحَاصِلُ اَنَّ وَصْفَ الْاِضَافَةِ مُعْتَبَرٌ وَامْتِنَاعُ الْاِنْفِكَاكِ ظَاهِرٌ لِاَنَّا نَقُوْلُ قَدْ صَرَّحُوْا بِعَدَمِ الْمُغَايَرَةِ بَيْنَ الصِّفَاتِ بِنَاءً عَلٰى اَنَّهَا لَا يُتَصَوَّرُ عَدَمُهَا لِكَوْنِهَا اَزَلِيَّةً مَعَ الْقَطْعِ بِاَنَّهُ يُتَصَوَّرُ وُجُوْدُ الْبَعْضِ كَالْعِلْمِ مَثَلًا ثُمَّ يُطْلَبُ اِثْبَاتُ الْبَعْضِ الْاٰخَرِ فَعُلِمَ اَنَّهُمْ لَمْ يُرِيْدُوْا هٰذَا الْمَعْنٰى مَعَ اَنَّهُ لَا يَسْتَقِيْمُ فِى الْعَرَضِ مَعَ الْمَحَلِّ وَلَوِ اعْتُبِرَ وَصْفُ الْاِضَافَةِ لَزِمَ عَدَمُ الْمُغَايَرَةِ بَيْنَ كُلِّ مُتَضَائِفَيْنِ كَالْاَبِ وَالْاِبْنِ وَالْاَخَوَيْنِ وَكَالْعِلَّةِ وَالْمَعْلُوْلِ بَلْ بَيْنَ الْغَيْرَيْنِ لِاَنَّ الْغَيْرِيَّةَ مِنَ الْاَسْمَاءِ الْاِضَافِيَّةِ وَلَا قَائِلَ بِذٰلِكَ.

সহজ তরজমা

বলা যাবে না যে, আমাদের উদ্দেশ্য, দুটি বস্তু থেকে প্রত্যেকটির অস্তিত্বের কল্পনা করা সম্ভব। যদিও অপরটি না হয়। আর দ্বিতীয় বিষয়টির অনস্তিত্ব মেনে নেওয়ার বিষয় হোক। যদিও মেনে নেওয়া বিষয়টি অসম্ভবই হোক না কেন? অথচ জগতের অস্তিত্বের কল্পনা করা যায়। অবশেষে প্রমাণ দ্বারা বিশ্বস্রষ্টার অস্তিত্ব তলব করা হয়। এ বিপরীত অংশ ও পরিপূর্ণ বস্তু। যেমনিভাবে দশের অস্তিত্ব এক ছাড়া সম্ভব নয়, তদ্রূপ দশের একের অস্তিত্ব দশ ছাড়া সম্ভব নয়। কেননা যদি তা হয় তখন এক দশের অন্তর্ভুক্ত হবে না। মূলকথা, এখানে وَصْفِ اِضَافَت তথা সম্বোধন ধর্তব্য। আর এমতাবস্থায় একটি থেকে অপরটির বিচ্ছিন্নতা যে অসম্ভব, তা সুস্পষ্ট। কেননা আমরা বলব, মাশায়েখে কিরাম এ কথার ভিত্তিতে যে, সিফাতের অনস্তিত্ব তার আদি হওয়ার কারণে কল্পনা করা যায় না –এটা সিফাতের মাঝে পরস্পর বিচ্ছিন্নতা না হওয়ার সুস্পষ্ট বিবরণ। অথচ নিশ্চিত কোন কোন সিফাত যেমন ইলমের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায়। এরপর অন্য সিফাতের অস্তিত্ব তলব করা হয়। এতে বুঝা গেল, তারা এ অর্থ উদ্দেশ্য করেন নি। তাছাড়া এ বিষয়টি عَرَض এবং مَحَل এর ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ হয় না। যদি وَصْفِ اِضَافَت ধর্তব্য হয়, তাহলে প্রতি দুইটি আপেক্ষিক বস্তু যেমন পিতা-পুত্র, দু'ভাই, ইল্লত ও মা'লূল বরং দুটি পরস্পর পৃথক জিনিসের মধ্যেও غَيْرِيَّت না হওয়া আবশ্যক হয়ে পড়বে। পরস্পর স্বতন্ত্র বিষয়েও غَيْرِيَّت না হওয়ার জরুরী হয়ে পড়বে। কারণ, غَيْرِيَّت আপেক্ষিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। অথচ এর প্রবক্তা কেউ নেই।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

গাইরিয়ত প্রসঙ্গে মাশাইখের ব্যাখ্যা নিয়ে কারও কারও অলিক মন্তব্য

ব্যাখ্যাকার মাশায়েখে কিরামের পক্ষ হতে বর্ণিত غَيْرِيَّت এর ব্যাখ্যায় فِيْهِ نَظَرٌ দ্বারা যে প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন, সে প্রশ্নটি নিরসনের জন্য কেউ কেউ মাশায়েখের উল্লেখিত ব্যাখ্যার এমন ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যার ফলে উপরিউক্ত প্রশ্নের নিরসন হয়ে যায়। ব্যাখ্যাকার সেসব ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করেছেন। উপরিউক্ত ব্যাখ্যার সারমর্ম হল, غَيْرِيَّت এর ব্যাখ্যায় ভিন্নতার সম্ভাবনা দ্বারা মাশায়েখের উদ্দেশ্য হচ্ছে, দুটি আলাদা আলাদা বস্তুর মধ্য হতে প্রত্যেকটির অস্তিত্বের কল্পনা দ্বিতীয়টির অস্তিত্বহীনতাসহ সম্ভব হওয়া। যদিও দ্বিতীয়টির অস্তিত্বহীনতা মেনে নেওয়া সম্ভব হোক। এ ব্যাখ্যার পর উপরিউক্ত প্রশ্ন প্রত্যাখ্যানে কোন একটি অংশের উপরও প্রশ্ন উত্থাপিত হবে না। কেননা প্রথম উপায়ে অর্থাৎ غَيْرِيَّت দ্বারা উভয় পক্ষ থেকে ভিন্নতার সম্ভাবনা উদ্দেশ্য করলে জগত এবং স্রষ্টার মাঝে غَيْرِيَّت (ভিন্নতা) প্রমাণিত হবে। কেননা যেমনিভাবে স্রষ্টার অস্তিত্বের কল্পনা বিশ্বজগতের সঙ্গে সম্ভব, তদ্রূপ জগতের কল্পনা স্রষ্টার অনস্তিত্বের সাথে সম্ভব। কেননা প্রথমতঃ জগতের অস্তিত্ব সম্পর্কে কল্পনা হয়, অতঃপর স্রষ্টার অস্তিত্বের দলীল অন্বেষন করা হয়।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْجُزْءِ الخ ঃ এ জবাবটি প্রত্যাখ্যানের দ্বিতীয় পন্থা অর্থাৎ পৃথকতার আশঙ্কা এক দিক থেকে যথেষ্ট প্রমাণিত করার পন্থায় প্রযোজ্য হয়। জবাবের মূলকথা হল, غَيْرِيَّتْ (ভিন্নতা) বাস্তবায়িত হওয়ার জন্য এক পক্ষ থেকে ভিন্নতার সম্ভাবনাকে যথেষ্ট প্রমাণিত করা। جُزْء এবং كُلّ এর মাঝে ভিন্নতাকে জরুরী করে না। কারণ, যেভাবে দশের অস্তিত্ব এক ছাড়া কল্পনা করা অসম্ভব, তদ্রূপ দশের এক অর্থাৎ যে এক দশের অংশ, তার অস্তিত্ব দশ ব্যতিত সম্ভব নয়। কেননা দশ ছাড়া যেমন নয় –এর মধ্যে এক থাকবে বটে, তবে তা নয় এর এক; দশের এক নয়। মোটকথা, এখানে وَصْفِ اِضَافَتْ ধর্তব্য। অর্থাৎ সাধারণ এক তো প্রত্যেক সংখ্যায়ই রয়েছে। বরং যে এক দশের অংশ এবং অংশ হিসেবে দশের সাথে সম্পৃক্ত, সে একের অস্তিত্ব দশ ছাড়া অসম্ভব।

قَوْلُهُ لَانَا نَقُوْلُ الخ ঃ এখানে لَايُقَالُ দ্বারা বর্ণিত ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। সারমর্ম হল, উপরিউক্ত ব্যাখ্যাটি تَوْجِيْهُ الْقَوْلِ بِمَا لَا يَرْضَى بِهِ الْقَائِلُ এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা উপরিউক্ত ব্যাখ্যাটি সঠিক বলে ধরে নেওয়া হলে গুণগুলোর মধ্যেও পারস্পরিক ভিন্নতা আবশ্যক হবে। যেমন ধরুন, প্রথমতঃ ইলম গুণের অস্তিত্বের কল্পনা করা হয়। এরপর অন্য গুণ যেমন কালাম এর অস্তিত্বের উপর প্রমাণ খোঁজা হয়। আবার এর বিপরীতও হতে পারে। সে মতে জ্ঞান ও কথন গুণ দুটির মাঝে, এমনকি অন্য সব গুণের মাঝেও ভিন্নতাকে মেনে নিতে হবে। অথচ মাশায়েখে কিরাম স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, গুণগুলোর মাঝে ভিন্নতা নেই। এতে বুঝা যায়, মাশায়েখে কিরাম পৃথকতার সম্ভাবনা দ্বারা উপরিউক্ত অর্থ উদ্দেশ্য করেন নি।

قَوْلُهُ مَعَ اَنَّهُ لَايَسْتَقِيْمُ الخ ঃ এখানে উপরিউক্ত ব্যাখ্যা বাতিল হওয়ার দ্বিতীয় প্রমাণ বর্ণনা করা হয়েছে। মূলকথায় হল, আপতন এবং স্থানের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে বটে। অথচ غَيْرِيَّتْ উপরিউক্ত বিচ্ছিন্নতার সম্ভাবনার অর্থে শুদ্ধ নয়।

قَوْلُهُ : وَلَوْاعْتُبِرَتْ الخ ঃ এখানে উপরিউক্ত ব্যাখ্যা বাতিল হওয়ার তৃতীয় প্রমাণ বর্ণনা করা হয়েছে। এটি ব্যাখ্যাকারের উক্তি وَالْحَاصِلُ اَنَّ وَصْفَ الْاِضَافَةِ مُعْتَبَرٌ বাক্যের সাথে সম্পৃক্ত। সারমর্ম হল, যদি وَصْفِ اِضَافَتْ (আপেক্ষিকতা) ধর্তব্য হয়, তবে এমন দুটি বস্তুর মাঝে সর্বদাই অভিন্নতা জরুরী হবে, যেগুলোর মাঝে تَضَايُفْ এর সম্পর্ক অর্থাৎ যার মধ্যে প্রত্যেকটি বোঝা অন্য বস্তু বোঝার উপর স্থগিত। যেমন, পিতা-পুত্রের মাঝে এবং দু'ভাই এর মাঝে ভিন্নতা থাকা জরুরী হবে। কেননা বাপ-ছেলের মাঝে একজনের অস্তিত্ব অন্যের অস্তিত্ব ব্যতিত এবং এক ভাই অপর ভাই ছাড়া কল্পনা করা সম্ভব নয়। এমনিভাবে عِلَّتْ এবং مَعْلُوْل এর মাঝে ভিন্নতা না হওয়া জরুরী হবে বরং দুটি পৃথক পৃথক বস্তুর মাঝে ও ভিন্নতা না হওয়া জরুরী হবে। কেননা দুটি ভিন্ন ভিন্ন জিনিসের মধ্যে প্রত্যেকটি অপরটি অপেক্ষা স্বতন্ত্র। কাজেই অপরটি ছাড়া কোন একটির অস্তিত্বও কল্পনা করা সম্ভব নয়।

فَاِنْ قِيْلَ لِمَ لَايَجُوْزُ اَنْ يَكُوْنَ مُرَادُهُمْ اَنَّهَا لَاهُوَ بِحَسْبِ الْمَفْهُوْمِ وَلَاغَيْرُهُ بِحَسْبِ الْوُجُوْدِ كَمَا هُوَ حُكْمُ سَائِرِ الْمَحْمُوْلَاتِ بِالنِّسْبَةِ اِلَى مَوْضُوْعَاتِهَا فَاِنَّهُ يُشْتَرَطُ الْاِتِّحَادُ بَيْنَهُمَا بِحَسْبِ الْوُجُوْدِ لِيَصِحَّ الْحَمْلُ وَالتَّغَايُرُ بِحَسْبِ الْمَفْهُوْمِ لِيُفِيْدَ كَمَا فِىْ قَوْلِنَا اَلْاِنْسَانُ كَاتِبٌ بِخِلَافِ قَوْلِنَا اَلْاِنْسَانُ حَجَرٌ فَاِنَّهُ لَايَصِحُّ وَقَوْلِنَا اَلْاِنْسَانُ اِنْسَانٌ فَاِنَّهُ لَايُفِيْدُ قُلْنَا لِاَنَّ هٰذَا اِنَّمَا يَصِحُّ فِىْ مِثْلِ الْعَالِمِ وَالْقَادِرِ بِالنِّسْبَةِ اِلَى الذَّاتِ لَا فِىْ مِثْلِ الْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ مَعَ اَنَّ الْكَلَامَ فِيْهِ وَلَا فِى الْاَجْزَاءِ الْغَيْرِ الْمَحْمُوْلَةِ كَالْوَاحِدِ مِنَ الْعَشَرَةِ وَالْيَدِ مِنْ زَيْدٍ .

সহজ তরজমা

অধিকন্তু যদি বলা হয়– কেন এমন হতে পারবে না যে, لَاهُوَ وَلَا غَيْرُهُ দ্বারা মাশায়েখে কিরামের উদ্দেশ্য হল, সে গুণগুলো অর্থগত দিক দিয়ে হুবহু সত্তা নয়; বাস্তব অস্তিত্বের দিকে লক্ষ্য করলে সেগুলো সত্তা থেকে পৃথক কিছুও নয়। কেননা উভয়ের মাঝে অস্তিত্বের দিক দিয়ে একতা শর্ত। যাতে حَمْل (আরোপ) বৈধ হয়। আর

অর্থগত দিক দিয়ে বিরোধ, যাতে حَمَل উপকারী হয়। যেমন, আমাদের উক্তি اَلْاِنْسَانُ كَاتِبٌ এর মধ্যে। পক্ষান্তরে আমাদের উক্তি اَلْاِنْسَانُ حَجَرٌ । কারণ, এটি অশুদ্ধ এবং আমাদের উক্তি اَلْاِنْسَانُ اِنْسَانٌ (এর পরিপন্থী)। কেননা এটি উপকারী নয়। আমরা বলব, এ উক্তিটি عَالِمٌ، قَادِرٌ এর মত শব্দগুলোতে সত্তার বিপরীতে বৈধ নয়। অথচ আমাদের আলোচ্য বিষয় হল, এটি। এমনিভাবে اَجْزَاء غَيْر مَحْمُوْلَه যেমন দশের এক এবং যায়েদের হাত –এর মধ্যেও বৈধ হবে না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

মাওয়াকিফ প্রণেতার ব্যাখ্যা ঃ

قَوْلُهُ فَاِنْ قِيْلَ الخ ঃ মাওয়াফিক -এর লেখক আশ'আরীদের উক্তি لَاهُوَ وَلَاغَيْرُهٗ এর এমন একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যদ্বারা اِرْتِفَاعُ نَقِيْضَيْن এবং اِجْتِمَاع نَقِيْضَيْن এর প্রশ্ন উত্থাপিত হয় না। মাওয়াকিফে উদ্ধৃত বক্তব্যের সারকথা হল, গুণগুলোর জন্য مَوْضُوْع আর مَوْضُوْع ও مَحْمُوْل এর মাঝে বাস্তবিক ঐক্য জরুরী। যাতে حَمَل বৈধ হয়। আর অর্থগত দিক দিয়ে উভয়ের মাঝে ভিন্নতা থাকা জরুরী, যাতে حَمَل উপকারী হয়। যেমন, اَلْاِنْسَانُ كَاتِبٌ । এর মধ্যে মাওযু এবং মাহমূল বাস্তবে এক। বাস্তবে যে সত্তাটি ইনসান সেই কাতিব। কিন্তু উভয়টির আভিধানিক অর্থ আলাদা আলাদা। কিন্তু اَلْاِنْسَانُ حَجَرٌ এর পরিপন্থী। কেননা এখানে مَوْضُوْعٌ এবং مَحْمُوْل এ মধ্যে বাস্তবতার নিরিখে ঐক্য না থাকার কারণে এই حَمَل বৈধ নয়। اَلْاِنْسَانُ اِنْسَانٌ বাক্যটিও তদ্রূপ। কেননা مَوْضُوْع এবং مَحْمُوْل এর মাঝে অর্থগত পৃথকতা না থাকায় এ حَمَل ও উপকারী নয়। কারণ, حَمَل উপকারী হওয়ার অর্থ হল, مَوْضُوْع এর শব্দটি দ্বারা যে অর্থ বুঝে আসবে মাহমূলের শব্দ দ্বারা, তদপেক্ষা বাড়তি কিছু বুঝে আসবে। অথচ এখানে তা হয়নি। সুতরাং مَوَاقِف রচয়িতার উক্তিমতে যখন গুণগুলো مَوْضُوْع এর সাথে এক হয়ে যাবে; বাস্তবতায় এবং অর্থগত দিক দিয়ে ভিন্ন হবে। সুতরাং কেন এমন হতে পারবে না যে, لَاهُوَ وَلَاغَيْرُهٗ দ্বারা আশ'আরীদের উদ্দেশ্য হল, গুণ অর্থগত দিক দিয়ে হুবহু সত্তা নয় বরং ভিন্ন ভিন্ন হবে। আর বাস্তব অস্তিত্বের দিক দিয়ে সত্তা থেকে ভিন্ন নয় বরং উভয়টি এক। যেমনিভাবে প্রতিটি مَحْمُوْل তার مَوْضُوْع এর বিপরীতে এমন হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় عَيْنِيَّت এবং غَيْرِيَّت এর রূপ পরিবর্তন হওয়ার কারণে اِرْتِفَاعُ نَقِيْضَيْن এবং اِجْتِمَاعُ نَقِيْضَيْن এর মধ্য হতে কোনটিই জরুরী হবে না।

قَوْلُهُ: قُلْنَا الخ ঃ এখানে لِمَ لَا يَجُوْزُ এর উত্তর প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ ইলম-জ্ঞান কুদরত শ্রবন, দর্শন ইত্যাদি গুণ গুলো সত্তার উপর প্রযোজ্য হয় না। যেমন, اَللّٰهُ عِلْم অথবা اَللّٰه قُدْرَت বলা হয় না বরং অপরিহার্য সত্তার উপর عَالِمٌ - قَادِرٌ - سَمِيْعٌ - بَصِيْرٌ ইত্যাদি গুণ প্রযোজ্য হয়। যেগুলো সব صِفَت مُشْتَقَّه সুতরাং উপরিউক্ত ব্যাখ্যা عِلْم - قَادِر ইত্যাদি اَسْمَاء صِفَات এর ব্যাপারে বৈধ হতে পারে; عِلْم، قُدْرَة ইত্যাদি গুণের ব্যাপারে নয়। অথচ আশআরীদের هِيَ لَا هُوَ وَلَا غَيْرُهٗ উক্তিটি গুণ সম্পর্কে প্রযোজ্য; اَسْمَاء صِفَات সম্পর্কে নয়।

قَوْلُهُ: وَلَا فِي الْاَجْزَاءِ الخ ঃ اَجْزَاء غَيْر مَحْمُوْلَه যেমন দশের এক নিজ كُل তথা দশের উপর, তদ্রূপ যায়েদের হাত যায়েদের উপর প্রযোজ্য হয় না। সুতরাং দশের এক যেমনিভাবে দশের মাঝে, অদ্রূপ যায়েদের হাত এবং পূর্ণ যায়েদে মাঝে عَيْنِيَّت এর সম্পর্কও নেই; غَيْرِيَّت এর সম্পর্কও নেই। তদুপরি এ দুটোর ক্ষেত্রে لَاهُوَ بِحَسْبِ الْمَفْهُوْمِ وَلَا غَيْرِهٖ بِحَسْبِ الْوُجُوْدِ প্রযোজ্য নয়।

وَذُكِرَ فِى التَّبْصِرَةِ اَنَّ كَوْنَ الْوَاحِدِ مِنَ الْعَشَرَةِ وَالْيَدِ مِنْ زَيْدٍ غَيْرُهُ مِمَّا لَمْ يَقُلْ بِهٖ اَحَدٌ مِنَ الْمُتَكَلِّمِيْنَ سِوٰى جَعْفَرِ بْنِ حَارِثٍ وَقَدْ خَالَفَ فِىْ ذٰلِكَ جَمِيْعُ الْمُعْتَزِلَةِ وَعَدَّ ذٰلِكَ مِنْ جَهَالَاتِهٖ وَهٰذَا لِاَنَّ الْعَشَرَةَ اِسْمٌ لِجَمِيْعِ الْاَفْرَادِ مُتَنَاوِلٌ لِكُلِّ فَرْدٍ مَعَ اَغْيَارِهٖ فَلَوْ كَانَ الْوَاحِدُ غَيْرَهَا لَصَارَ غَيْرَ نَفْسِهٖ لِاَنَّهٗ مِنَ الْعَشَرَةِ وَاَنْ تَكُوْنَ الْعَشَرَةُ بِدُوْنِهٖ وَكَذَا لَوْ كَانَ يَدُ زَيْدٍ غَيْرَهٗ لَكَانَ الْيَدُ غَيْرَ نَفْسِهَا هٰذَا كَلَامُهٗ وَلَا يَخْفٰى مَافِيْهِ .

সহজ তরজমা

তাবসিরাহ গ্রন্থে বর্ণিত আছে, দশের এক এবং যায়েদের হাত তার থেকে ভিন্ন হওয়া এমন একটি বিষয়, যার প্রবক্তা জাফর ইবনে হারিছ ছাড়া কালাম শাস্ত্রবিদদের মধ্যে অন্য কেউ নেই। তিনি এ বিষয়টিতে সকল মুতাযিলার বিরোধিতা করেছেন। এ কথাটি তার অন্যান্য মূর্খতাসূলভ কথার মত গণ্য করা হয়েছে। এর কারণ, দশ সমুদয় এককের নাম। প্রতিটি একক অন্যান্য একক সহকারে তাতে অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যদি এক দশ ভিন্ন অন্য কিছু হয়, তাহলে নিজেরই পর হবে। কারণ, এক তো দশেরই অন্তর্ভুক্ত। এমনিভাবে বাধ্যতামূলক দশ এক ব্যতিত মওজূদ হবে। তদ্রূপ যদি যায়েদের হাত যায়েদ ভিন্ন অন্য কিছু হয়, তবে তো হাতটি নিজেরই পর হবে। এ ছিল তাবসিরাহ গ্রন্থকারের উক্তি। এতে যে দুর্বলতা আছে, তা অস্পষ্ট নয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

"তাবসিরা" গ্রন্থকারের ভাষ্য

قَوْلُهٗ : وَذُكِرَ فِى التَّبْصِرَةِ ঃ ইতোপূর্বে বলা হয়েছে, اَجْزَاء غَيْر مَحْمُوْلَه নিজ كُل বা হুবহু পূর্ণ বস্তু নয় لَاهُوَ بِحَسْبِ الْمَفْهُوْمِ وَلَا غَيْرُهٗ بِحَسْبِ এবং তা থেকে পৃথকও নয়। তদুপরি مَوَاقِف গ্রন্থকারের ব্যাখ্যা الْوُجُوْد প্রযোজ্য হয় না। এখন اَجْزَاء غَيْر مَحْمُوْلَه নিজ পূর্ণ বস্তু থেকে ভিন্ন না হওয়ার পক্ষে শায়খ আবুল মুঈন রহ. এর উক্তি দ্বারা দলীল পেশ করেছেন। তিনি স্বরচিত তাবসিরা গ্রন্থে লিখেছেন, দশের এক দশ থেকে এবং যায়েদের হাত যায়েদ থেকে ভিন্ন হওয়ার প্রবক্তা মুতাকাল্লিমীনের মধ্য হতে কেউ নেই। এমনকি মুতাযিলারাও এর প্রবক্তা নয়। শুধুমাত্র জাফর ইবনে হারিছ মুতাযিলী এর প্রবক্তা। যার বিরুদ্ধে সকল মুতাযিলা নিন্দাবাদ করেছেন। এমনকি তার এ উক্তিকে তার মূর্খতাসূলভ বক্তব্য বলে বর্ণনা করেছেন। কেননা দশ সে সব এককের সমষ্টির নাম, যেগুলো দ্বারা দশ গঠিত। আর প্রতিটি একক অন্যান্য এককগুলোর সাথে শামিল। সুতরাং প্রতিটি এককের ক্ষেত্রেই বলা যাবে, সেটি অবশিষ্ট নয়টি এককের সাথে মিলে দশ হয়েছে। কাজেই যদি দশের এক দশ থেকে ভিন্ন হয়, তাহলে এ দশের মধ্যে যেহেতু উক্ত এক ও অন্তর্ভুক্ত আছে, এ কারণে সেটি নিজ সত্তা থেকেও ভিন্ন কিছু হবে। আর একটি বস্তু তার থেকে ভিন্ন কোন বস্তু ব্যতিত অস্তিত্ব লাভ করে। সুতরাং দশ এক ছাড়া অস্তিত্ব লাভ করা আবশ্যক হবে। এমনিভাবে যদি যায়েদের হাত যায়েদ হতে ভিন্ন কোন কিছু হয়, তাহলে তা আপন ছাড়া অন্য কিছু হওয়া আবশ্যক হবে। কেননা যায়েদের মধ্যে হাতটিও অন্তর্ভূক্ত এবং একটি বস্তু স্ববিরোধী হওয়া বাতিল।

قَوْلُهٗ : وَلَا يَخْفٰى مَا فِيْهِ ঃ কেননা একটি বস্তু কোন বস্তুর অন্তর্ভূক্ত হওয়া মানে অভিন্নতা নয়। তাছাড়া দশ হল, সমস্ত এককের সমষ্টির নাম। প্রতিটি একককে দশ বলা যায় না।

وَهِىَ اَىْ صِفَاتُهُ الْاَزَلِيَّةُ الْعِلْمُ وَهِىَ صِفَةٌ اَزَلِيَّةٌ تَنْكَشِفُ الْمَعْلُوْمَاتُ عِنْدَ تَعَلُّقِهَا بِهَا وَالْقُدْرَةُ وَهِىَ صِفَةٌ اَزَلِيَّةٌ تُؤَثِّرُ فِى الْمَقْدُوْرَاتِ عِنْدَ تَعَلُّقِهَا بِهَا وَالْحَيٰوةُ وَهِىَ صِفَةٌ اَزَلِيَّةٌ تُوْجِبُ صِحَّةَ الْعِلْمِ وَالْقُوَّةُ وَهِىَ بِمَعْنَى الْقُدْرَةِ وَالسَّمْعُ وَهِىَ صِفَةٌ تَتَعَلَّقُ بِالْمَسْمُوْعَاتِ وَالْبَصَرُ وَهِىَ صِفَةٌ تَتَعَلَّقُ بِالْمُبْصَرَاتِ فَتُدْرَكُ بِهِمَا اِدْرَاكًا تَامًّا لَا عَلٰى سَبِيْلِ التَّخَيُّلِ

وَالتَّوَهُّمِ وَلَا عَلٰى طَرِيْقِ تَأَثُّرِ حَاسَّةٍ وَوُصُوْلِ هَوَاءٍ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ قِدَمِهِمَا قِدَمُ الْمَسْمُوْعَاتِ وَالْمُبْصَرَاتِ كَمَا لَايَلْزَمُ مِنْ قِدَمِ الْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ قِدَمُ الْمَعْلُوْمَاتِ وَالْمَقْدُوْرَاتِ لِأَنَّهَا صِفَاتٌ قَدِيْمَةٌ تَحْدُثُ لَهَا تَعَلُّقَاتٌ بِالْحَوَادِثِ.

সহজ তরজমা

আল্লাহ তা'আলার অনাদি-চিরন্তন গুণ ঃ

আর তা আল্লাহর চিরন্তন গুণাবলীর মধ্যে একটি হল ইলম। এটি এমন একটি অনাদি গুণ যার দ্বারা জ্ঞাতব্য বিষয়গুলো প্রতিভাত হয়ে উঠে, এগুলোর সাথে সে গুণটির সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার সময়। দ্বিতীয় গুণটি হল, কুদরত। এটি এমন অনাদি গুণ যা কুদরতের অধীন জিনিসের উপর প্রভাব সৃষ্টি করে, সেই কদুরতের অন্তর্ভুক্ত জিনিসগুলোর সাথে এ গুণটির সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা হওয়ার কালে। তৃতীয় গুণটি হল, حَيٰوة (জীবন)। এটি এমন একটি অনাদি গুণ, যা ইলমের বিশুদ্ধতা ও সম্ভাব্যতার কারণ হয়। قُوَّة শব্দটি قُدْرَة এর সমার্থক। চতুর্থ গুণটি হল, سَمْع (শ্রবণ), এটি এমন একটি গুণ, যার সম্পর্ক শ্রুত বিষয়ের সাথে। পঞ্চম গুণটি হল, بَصَر (দর্শন) এটি এমন একটি অনাদি গুণ, যার সম্পর্ক দৃশ্যমান বিষয়ের সাথে। সুতরাং এ দুটি শক্তির মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গরূপে কোন জিনিস অনুধাবন করা যায়, খেয়াল বা কল্পনার পদ্ধতিতে নয় এবং দর্শনশক্তি তথা চক্ষুর প্রভাবিত হওয়া ও কর্ণ পর্যন্ত বাতাস পৌছার কারণেও নয়। এ দুটি শক্তি প্রাচীন হওয়ার কারণে শ্রবণকৃত ও দৃশ্যমান বিষয়াবলীর সুপ্রাচীনতা জরুরী নয়। কেননা এসব হল, প্রাচীন গুণ; নশ্বর বস্তুগুলোর সাথে এগুলোর সম্পর্কই কেবল নতুন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

আল্লাহর গুণ কয়টি ?

قَوْلُهٗ وَهِيَ الخ ঃ আশ'আরীদের মতে আল্লাহর আসল গুণ সাতটি। জ্ঞান, জীবন, ক্ষমতা, শ্রবণ, দর্শন, ইচ্ছা, কথোপকথন। আর মাতুরীদীদের মতে আটটি। উপরিউক্ত ৭টি এবং تَكْوِيْن সৃজন। মুসান্নিফ রহ. মাতুরীদী মাযহাবী হওয়ায় তিনিও আটটি গুণ বর্ণনা করেছেন।

قَوْلُهٗ وَهِيَ صِفَاتُهٗ الخ ঃ আদিহীনতার শর্তায়নে বুঝা যায়, এ সংজ্ঞাটি সাধারণ عِلْم এর নয় বরং আল্লাহর عِلْم এর সংজ্ঞা। সারমর্ম হল, ইলমে এলাহী দ্বারা আল্লাহর এমন একটি অনাদি গুণ উদ্দেশ্য, যার সম্পর্ক জ্ঞাতব্য বিষয়ের সাথে হওয়ার সময় সে বস্তুগুলো ফুটে উঠে।

قَوْلُهٗ: تَنْكَشِفُ الْمَعْلُوْمَاتِ ঃ এখানে مَعْلُوْمَات দ্বারা এমন সব বস্তু উদ্দেশ্য, যেগুলোতে জ্ঞাতব্য হওয়ার যোগ্যতা আছে। সুতরাং এখানে مَعْلُوْم শব্দটি চয়িত হয়েছে بِالْقُوَّة এর পর্যায়ে। কাজেই এ প্রশ্ন উঠবে না যে, উদ্ভাস বা প্রতিভাত হওয়া কোন বস্তুর পরিজ্ঞাত হওয়ার নাম। সুতরাং مَعْلُوْمَات এর দিকে اِنْكِشَاف এর সম্বোধন تَحْصِيْل حَاصِل তথা অর্জিত জিনিস পুনঃঅর্জনের নামান্তর।

ইলমের অনাদিত্ব নিয়ে একটি প্রশ্নোত্তর ঃ ইলম গুণটি অনাদি হওয়ার ব্যাপারে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। যেমন, অনাদিকালে আল্লাহর ইলম এর সম্পর্ক যদি "যায়েদ প্রবেশ করবে"এর সাথে হয়, তবে কথাটি অবাস্তব হওয়ায় এ হবে অজ্ঞতা। কেননা অনাদিকালে যায়েদ কিংবা তার ঘরের আদৌ ছিল না। আবার যায়েদ ঘরে প্রবেশ করার পর আল্লাহর ইলমের সম্পর্ক হবে, "যায়েদ প্রবিষ্ট" এবং ঘর হতে বের হওয়ার পর তার সম্পর্ক হবে, যায়েদ ঘরে ছিল" -এর সাথে সুতরাং আল্লাহর ইলমের মাঝে পরিবর্তন আসা জরুরী হবে। অথচ পরিবর্তন নশ্বরতাকে আবশ্যক করে। যেটি অনাদিত্বের বিরোধী।

এর উত্তর হল, এই পরিবর্তন সম্পর্কের মাঝে হয়েছে। কখনও কখনও ভবিষ্যতে প্রবেশের সাথে, কখনও বর্তমান আবার কখনও অতীতে প্রবেশের সাথে হয়েছে। আর সম্পর্কের পরিবর্তন সম্পৃক্ত গুণের পরিবর্তনকে আবশ্যক করে না। যেমন, আয়নার সম্পর্ক কখনও সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী মানুষের সাথে হয়। তখন মানুষের রূপের প্রতিচ্ছবি আয়নায় পরিদৃষ্ট হয়। আবার কখনও সামনে দিয়ে অতিক্রমকারীর ঘোড়ার সাথে হয়। তখন আয়নায় ঘোড়ার রূপ পরিদৃষ্ট হয়। সুতরাং আয়নার সম্পর্কের মাঝে পরিবর্তন হল; স্বয়ং আয়নার মধ্যে কোন পরিবর্তন হল না।

অনাদি সিফাত কি ?

قَوْلُهُ : وَهِيَ صِفَةٌ أَزَلِيَّةٌ تَنْكَشِفُ الخ ঃ এটি صِفَت قُدْرَة এর সংজ্ঞা। আশ'আরীরা تَكْوِين কে স্বতন্ত্র একটি গুণ মনে করেন না বরং তারা আসল গুণ সাতটি বলে মনে করেন এবং تَكْوِين এর সারমর্ম কুদরতকেই প্রমাণিত করেন। অর্থাৎ تَكْوِين কোন স্বতন্ত্র গুণ নয় বরং কুদরতের সম্পর্ক কোন বস্তুর উদ্ভাবন বা সৃজনের সাথে হলেই তাকে تَكْوِين বলা হয়। যেন কুদরতই বস্তুর অস্তিত্ব লাভের মধ্যে ক্রিয়াশীল। কিন্তু মাতুরীদীগণ বলেন, কুদরত হল, صِفَت مُصَحِّحَه অর্থাৎ আল্লাহর কুদরত কোন বস্তুর সম্পাদনকে সম্ভব করে। আর ইচ্ছা হল, صِفَت مُرَجِّحَه বা প্রাধান্য দানকারী গুণ। যা একটি বস্তুর অস্তিত্বকে অস্তিত্বহীনতার উপর প্রাধান্য দেয়। আর تَكْوِين হল صِفَت مُؤَثِّرَه (ক্রিয়াশীল) গুণ। এর সম্পৃক্ততার কারণে বস্তু অস্তিত্ব লাভ করে। কিন্তু মুসান্নিফ রহ. মাতুরীদী হওয়া সত্ত্বেও কুদরতের সংজ্ঞায় تُؤَثِّرُ فِي الْمَقْدُوْرَاتِ শব্দ চয়ন বাহ্যতঃ আশআরীদের মাযহাবের উপর নির্ভরশীল, যারা কুদরতকে صِفَت مُؤَثِّرَه প্রমাণিত করেন। অবশ্য বলা যায়, মুসান্নিফ রহ. এর উদ্দেশ্য হল, এখানে কুদরত বস্তুকে আবশ্যক সত্তার থেকে مُمْكِنُ الصُّدُوْر বানানোর ব্যাপারে ক্রিয়াশীল। এ অবস্থায় কুদরত صِفَت مُصَحِّحَه ই হবে।

قَوْلُهُ : لَاعَلَى سَبِيْلِ التَّخَيُّلِ الخ ঃ এটি سَمْع এবং بَصَرْ এর সংজ্ঞার উপসংহার। যেন সৃষ্টের শ্রবণ এবং দর্শন থেকে এটি আলাদা হয়ে যায়। ধারণার ভাণ্ডারে জমাকৃত চিত্রগুলো অনুধাবণের নাম تَخَيُّل । আর ইন্দ্রিয়ানুভূত বস্তুসমূহের মধ্যে ইন্দ্রিয় বহির্ভূত অর্থ এবং ধরনগুলোকে অনুধাবন করার নাম تَوَهُّم ।

قَوْلُهُ: وَلَا عَلَى تَأَثُّرِ حَاسَّةٍ ঃ এখানে একটি সংশয়ের নিরসন করা উদ্দেশ্য। সেটি হল, শ্রবণ এবং দর্শনের দ্বারা অনুধার্বন করা তখনই সম্ভব, যখন শ্রবণেন্দ্রিয় ও দর্শনেন্দ্রিয় শ্রুত এবং পরিদৃষ্ট বস্তুর প্রভাব গ্রহণ করে। এছাড়া শ্রবণের জন্য কানের গভীরে বাতাস পৌছাও আবশ্যক। আর আল্লাহ প্রভাবিত হওয়া ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে পুতঃপবিত্র। এর উত্তর হল, শ্রবণেন্দ্রিয় এবং দর্শনেন্দ্রিয় শ্রুত এবং পরিদৃষ্ট বস্তু দ্বারা প্রাণীসমূহ প্রভাবিত হয়। আল্লাহকে সেগুলোর উপর অনুমান করা শুদ্ধ নয়।

وَلَا يَلْزَمُ الخ ঃ এখানে দার্শনিকদের একটি প্রশ্ন তিরহিত করা হয়েছে। প্রশ্ন হল, শ্রবণ এবং দর্শন অনাদি হওয়ার ফলে এগুলোর সাথে সম্পৃক্ত বিষয় অনাদি হওয়া জরুরী হবে। অথচ এগুলো নশ্বর। এর উত্তর হল, গুণ কাদীম হওয়ার দ্বারা তার সাথে সম্পৃক্ত বিষয়াবলীর কাদীম হওয়া আবশ্যক হয় না। যেমন– জ্ঞান ও ক্ষমতা প্রাচীন হওয়ার কারণে এগুলোর সাথে সম্পৃক্ত বিষয়াগুলো তথা পরিজ্ঞাত ও ক্ষমতাধীন বিষয়গুলোর প্রাচীনতা আবশ্যক হয় না। কেননা এ গুণগুলো অর্থাৎ শ্রবণ, দর্শন, জ্ঞান, ক্ষমতা ইত্যাদি অনাদি; নশ্বর বিষয়ের সাথে এগুলোর সম্পর্ক নশ্বর। আর একটি গুণের অস্তিত্বের জন্য কোন কিছুর সাথে এর সম্পৃক্ততা আবশ্যক নয়। যেমন, যখন কোন আওয়াজ হয় না, তখনও আমাদের মধ্যে শ্রবণ গুণটি উপস্থিত থাকে। অথচ তখন কোন শ্রুত জিনিসের সাথে তা সম্পৃক্ত হয় না। এমনিভাবে উপরিউক্ত গুণগুলোও অনাদিকাল থেকে আল্লাহর জন্য বিদ্যমান। কিন্তু অনাদিকালে এগুলোর সাথে কোন বস্তুর সম্পর্ক ছিল না, যার ফলে সেগুলোর প্রাচীনত্ব আবশ্যক হবে।

وَالْإِرَادَةُ وَالْمَشِيَّةُ وَهُمَا عِبَارَتَانِ عَنْ صِفَةٍ فِي الْحَيِّ تُوجِبُ تَخْصِيصَ أَحَدِ الْمَقْدُوْرَيْنِ فِي أَحَدِ الْأَوْقَاتِ بِالْوُقُوْعِ مَعَ اسْتِوَاءِ نِسْبَةِ الْقُدْرَةِ إِلَى الْكُلِّ وَكَوْنِ تَعَلُّقِ الْعِلْمِ تَابِعًا لِلْوُقُوْعِ.

সহজ তরজমা

ষষ্ঠ গুণঃ إِرَادَه وَمَشِيَّت বা ইচ্ছা করা, মনস্থ করা। এ দুটি গুণ দ্বারা প্রাণীর এমন একটি গুণ উদ্দেশ্য, যা কুদরাত বা ক্ষমতার সম্পর্ক সব জিনিসের সাথে সমান হওয়া এবং ইলমের সম্পর্ক বাস্তব অস্তিত্বের অধীনস্থ হওয়া সত্ত্বেও ক্ষমতাধীন জিনিসগুলোর মধ্যে একটিকে কোন একটি সময়ে বাস্তবায়নের সাথে বিশেষিত করার আবেদন রাখে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

ইরাদাও মাশিয়াতের মর্মার্থ

وَهُمَا عِبَارَتَانِ الخ ঃ কোন কোন কালাম শাস্ত্রবিদ ইরাদা ইচ্ছাকে হুবহু قُدْرَةٌ (ক্ষমতা) প্রমাণিত করেছেন। আবার কেউ কেউ হুবহু জ্ঞান বলেছেন। শারেহ রহ. ইরাদার এমন একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন, যার দ্বারা ইরাদা গুণটি জ্ঞান এবং কুদরত ভিন্ন একটি স্বতন্ত্র গুণ হিসেবে প্রকাশ পায়। ইরাদার সংজ্ঞা বুঝার পূর্বে ভূমিকা স্বরূপ নাতিদীর্ঘ কিছু বিষয় মনে রাখতে হবে। **এক.** কুদরত এমন একটি গুণ, যদ্দরুন কোন কাজ করা-না করা উভয়ই সম্ভব হয়। সুতরাং কুদরাতের সম্পর্ক দুটি পরস্পর বিরোধী কাজ তথা করা-না করা উভয়ের সাথে সমান। যেমন, যে ব্যক্তি সব সময় বসে থাকে, সে বসা ছেড়ে দাঁড়ানোর ক্ষমতা রাখে না। সে বসার উপর ক্ষমতাবান নয় বরং এ ব্যাপারে সে বাধ্য। **দুই.** ইলমের সম্পর্ক দুটি ক্ষমতাধীন জিনিসের একটির বাস্তবায়নের অধীনস্থ হয়ে থাকে। **তিন.** দুটি ক্ষমতাধীন বস্তুর একটির বাস্তবায়ন নিজ প্রাধান্য দানকারী কারণের অধীনস্থ হয়।

ইরাদার প্রকৃত সংজ্ঞা ঃ মনে করুন, আল্লাহ তা'আলা যায়েদকে ছেলে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা করলে দিতে পারেন আবার নাও দিতে পারেন। আবার দিলে দিনেও দিতে পারেন; রাতেও দিতে পারেন। সুতরাং যদি যায়েদের সন্তান জন্ম হয় এবং রাত্রে জন্ম হয় তাহলে প্রশ্ন হয়– যখন সন্তান দান করা এবং না করা উভয়টি আল্লাহর ক্ষমতাধীন, তাহলে কোন বস্তুটি দান করাকে দান না করার উপর প্রাধান্য দিল? এমনিভাবে যখন দিন এবং রাত এর উভয়টি আল্লাহর ক্ষমতাধীন ছিল তাহলে রাত্রে কেন দিলেন; দিনে কেন দিলেন না?

এর উত্তর হচ্ছে, এটিই আল্লাহর মর্জি ছিল। তিনি এমনই করতে চেয়েছেন। অর্থাৎ সন্তান দান করা এবং না করা তদ্রুপ দিনে দেওয়া বা রাত্রে দেওয়া উভয়টিই তার ক্ষমতাধীন ছিল। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা দেওয়াকে না দেওয়ার এবং রাত্রকে দিনের উপর প্রাধান্য দিয়েছে। এতে বুঝা গেল, ইরাদা এমন একটি গুণ, যা একটি সময় ছেড়ে অন্য সময়ে ক্ষমতাধীন দুটি বস্তুর একটির বাস্তবায়নকে প্রাধান্য দেয়। কাজেই ইরাদা একটি প্রাধান্য দানকারী গুণ বলেই এটি কুদরত ছাড়া অন্য একটি গুণ হবে। কেননা দুটি পরস্পর বিরোধী জিনিসের সাথে কুদরতের সম্পর্ক সমান হয়ে থাকে। তা উভয়টির মধ্য থেকে একটির বাস্তবায়নকে প্রাধান্য দানকারী নয়। অনুরূপভাবে আল্লাহর ইচ্ছা দুটি ক্ষমতাধীন বস্তুর মধ্য হতে একটির বাস্তবায়নকে প্রাধান্য দানকারী গুণ বলে তৃতীয় ভূমিকা হিসেবে দুটি ক্ষমতাধীন বস্তুর মধ্য হতে একটির বাস্তবায়ন নিজ প্রাধান্য দাকারীর অধীনস্থ হবে। কাজেই ইরাদা হুবহু ইলমও হবে না বরং এটি ভিন্ন আরেকটি গুণ হবে। কেননা ইলমের সম্পর্ক হয় বাস্তবের অধীনস্থ। আবার ইলম যদি দুটি ক্ষমতাধীন বস্তুর মধ্য হতে একটির বাস্তবায়নের জন্য প্রাধান্য দানকারী হয়, তাহলে তৃতীয় ভূমিকা হিসেবে বাস্তবায়ন ইলমের অধীনস্থ হবে। ফলে দাওর আবশ্যক হয়ে পড়বে।

قَوْلُهُ مَعَ اسْتِوَاءِ نِسْبَةِ الْقُدْرَةِ ঃ এটি ইরাদাটি কুদরত ভিন্ন অন্য আরেকটি সিফাত হওয়ার দিকে ইশারা।

قَوْلُهُ: وَكَوْنُ تَعَلُّقِ الْعِلْمِ ঃ এটি عَطْف হয়েছে اِسْتِوَاى এর ওপর। এতে সেসব দার্শনিকদের মত প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, যারা ইরাদাকে হুবহু জ্ঞান প্রমাণিত করেন।

وَفِيْمَا ذُكِرَ تَنْبِيْهٌ عَلَى الرَّدِّ عَلٰى مَنْ زَعَمَ اَنَّ الْمَشِيَّةَ قَدِيْمَةٌ وَالْاِرَادَةُ حَادِثَةٌ قَائِمَةٌ بِذَاتِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَعَلٰى مَنْ زَعَمَ اَنَّ مَعْنٰى اِرَادَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى فِعْلَهُ اَنَّهُ لَيْسَ بِمُكْرَهٍ وَلَا سَاهٍ وَلَا مَغْلُوْبٍ وَمَعْنٰى اِرَادَتِهٖ فِعْلَ غَيْرِهٖ اَنَّهُ اٰمِرٌ بِهٖ كَيْفَ وَقَدْ اَمَرَ كُلَّ مُكَلَّفٍ بِالْاِيْمَانِ وَسَائِرِ الْوَاجِبَاتِ وَلَوْ شَاءَ لَوَقَعَ.

সহজ তরজমা

এবং উপরিউক্ত আলোচনায় সেসব লোকদের মত প্রত্যাখ্যানের প্রতি সতর্ক করা হয়েছে, যারা বলে مَشِيَّتْ প্রাচীন। আর اِرَادَه (ইচ্ছা) হল নশ্বর, আল্লাহর সত্তার সাথে প্রতিষ্ঠিত। তদ্রূপ সে সব লোকদের মত প্রত্যাখ্যানের প্রতিও সতর্ক করা হয়েছে, যারা বলে– আল্লাহ কর্তৃক নিজ কাজের ইচ্ছা করার অর্থ, তিনি বাধ্য নন। তিনি ভুল করেন না এবং পরাস্ত বা বাধ্যও হন না। আর অন্যের কাজ করার ইচ্ছার অর্থ হল, তিনি তাকে সে কাজটি করার নির্দেশ দেন। মূলতঃ এমন কিভাবে হবে? কেননা তিনি তো প্রতিটি দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তিকে ঈমান এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় বিষয়াবলীর নির্দেশ দিয়েছেন। যদি তিনি ইচ্ছাও করতেন তবে সেগুলো নিশ্চয় বাস্তাবায়িত হত।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ وَفِيْمَا ذُكِرَ الخ ঃ মুছান্নিফ রহ. وَلَهُ صِفَاتٌ اَزَلِيَّةٌ قَائِمَةٌ بِذَاتِهِ বলে দুটি বিষয়ে ইশারা করেছেন। যথা– **এক**. আল্লাহর গুণগুলো সুপ্রাচীন। **দুই**. এগুলো আল্লাহর সত্তার সাথে প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এগুলো প্রকৃত গুণাবলী। অতঃপর এ গুণাবলীকে অনাদি এবং প্রকৃত গুণের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। যেগুলোর মধ্যে ইচ্ছা এবং مَشِيَّت বা চাওয়াও অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং বুঝা গেল, ইরাদা ও مَشِيَّت (চাওয়া) প্রাচীন এবং উভয়টি মূলতঃ একটি গুণ। তাছাড়া ইরাদা একটি প্রকৃত গুণ। আর ইরাদা مَشِيَّت কে কাদীম বলে কাররামিয়াদের মত খণ্ডন করা হয়েছে। তারা مَشِيَّت এবং ইরাদার মধ্যে পার্থক্য করে বলেন, مَشِيَّت হল, একটি প্রাচীন গুণ। এর সম্পর্ক হল, সাধারণ উদ্ভাবন এর সাথে। আর ইরাদা হল নশ্বর। এর সম্পর্ক হয় নির্ধারিত সময়ে কোন বস্তুর অস্তিত্ব দানের সাথে। কুদরতের অধীনস্থ বিষয়ের নতুনত্বের সময় এটিও নতুন ও নশ্বর হয়। আর নশ্বর হওয়া সত্ত্বেও এটি প্রকৃত গুণ। আল্লাহর সত্তার সাথে প্রতিষ্ঠিত। কেননা নশ্বর বিষয়াবলী আল্লাহর সত্তার সাথে প্রতিষ্ঠিত হওয়া তাদের মতে জায়েয। এমনিভাবে قَائِمَةٌ بِذَاتِهِ উক্তি দ্বারা সে সব গুণাবলীকে যেগুলোর মাঝে ইরাদাও রয়েছে, প্রকৃত বলে প্রমাণিত করার মাঝে কোন কোন মুতাযিলীর মত প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। যারা বলে, ইরাদার সম্বোধন আল্লাহর দিকে প্রকৃত নয় বরং রূপক। তিনি স্বয়ং কোন কাজের ইচ্ছা করার অর্থ হল, সে কাজ করার ব্যাপারে তিনি বাধ্য নন এবং ভুলও করেন না। না কোন কিছুর থেকে প্রভাবিত হয়ে সে কাজটি পূর্ণ করেন। আর বান্দার কোন কাজ তার পক্ষ থেকে করার ইচ্ছা করার অর্থ হল, তিনি বান্দাকে সে কাজটি করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেন তাদের মতে ইরাদার অর্থ, হুকুমের সমার্থক।

قَوْلُهُ كَيْفَ الخ ঃ অর্থাৎ ইরাদা নির্দেশের অর্থে কিভাবে হবে? এতে আবশ্যক হয়ে পড়ে যে, আল্লাহ যে কাজের নির্দেশ দিয়েছেন, সেটির ইচ্ছাও তিনি করেছেন। অথচ বিষয়টি এমন নয়। কেননা তিনি প্রতিটি مُكَلَّف (আদিষ্ট) ব্যক্তিকে ঈমান এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় কাজগুলো করার আদেশ করেছেন বটে। কিন্তু ইচ্ছা করেননি। কেননা আল্লাহ যে বস্তুর ইচ্ছা করবেন, সেটা বাস্তবায়িত হওয়া আবশ্যক। সুতরাং যদি আল্লাহ সমস্ত مُكَلَّف বা আদিষ্ট ব্যক্তি থেকে ঈমান এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় কাজগুলো বাস্তবায়নের ইচ্ছা করতেন, তাহলে তাদের সবার দ্বারা এ কাজগুলো অবশ্যই বাস্তবায়িত হত, সবাই ঈমানদার ও অনুগত হত। কিন্তু এখনে تَالِي বাতিল। সুতরাং মুকাদ্দমও বাতিল হবে। অর্থাৎ সমস্ত مُكَلَّف এর ঈমান-আনুগত্যের ইচ্ছা করাও বাতিল। কাজেই যখন নির্দেশ আছে; ইচ্ছা নেই, তাতে বুঝা যায়, এ ইচ্ছা নির্দেশের অর্থে ব্যবহৃত নয়।

وَالْفِعْلُ وَالتَّخْلِيْقُ عِبَارَتَانِ عَنْ صِفَةٍ اَزَلِيَّةٍ تُسَمّٰى بِالتَّكْوِيْنِ وَسَيَجِئُ تَحْقِيْقُهُ وَعَدَلَ عَنْ لَفْظِ الْخَلْقِ لِشُيُوْعِ اِسْتِعْمَالِهِ فِى الْمَخْلُوْقِ وَالتَّرْزِيْقُ هُوَ تَكْوِيْنٌ مَخْصُوْصٌ صَرَّحَ بِهِ اِشَارَةً اِلٰى اَنَّ مِثْلَ التَّخْلِيْقِ وَالتَّصْوِيْرِ وَالتَّرْزِيْقِ وَالْاِحْيَاءِ وَالْاِمَاتَةِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ مِمَّا اُسْنِدَ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى كُلٌّ مِنْهُمَا رَاجِعٌ اِلٰى صِفَةٍ حَقِيْقِيَّةٍ اَزَلِيَّةٍ قَائِمَةٍ بِالذَّاتِ هِىَ التَّكْوِيْنُ لَا كَمَا زَعَمَ الْاَشْعَرِىُّ مِنْ اَنَّهَا اِضَافَاتٌ وَصِفَاتٌ لِلْاَفْعَالِ

সহজ তরজমা

অনাদি প্রকৃত গুণগুলোর মধ্যে একটি হল فِعْل وَتَخْلِيْق তথা সৃজন। এ দুটি শব্দ দ্বারা এমন একটি অনাদি গুণ উদ্দেশ্য, যাকে বলা হয় تَكْوِيْن। অতিশীঘ্রই এর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ আসছে। خَلْق শব্দটির অধিকাংশ ব্যবহার মাখলূক অর্থে হওয়ার কারণে সে শব্দটি উল্লেখ করা হয়নি। আরেকটি গুণ হল, তারযীক বা রিযিকদান। এটিও একটি বিশেষ তাকবীন বা সৃজন। এ কথাটির স্পষ্ট বিবরণ দেওয়া হয়েছে এদিকে ইশারা করার জন্য যে, تَخْلِيْق ـ تَصْوِيْن ـ تَرْزِيْق ـ اِحْيَاء ـ اِمَاتَت ইত্যাদি যেসব ক্রিয়া আল্লাহর দিকে সম্বোধিত হয়, সবগুলোর সারকথা হল, একটি প্রকৃত অনাদি গুণ, যেটি আল্লাহর সত্তার সাথে বিদ্যমান। সেটি হল, صِفَت تَكْوِيْن। এমনটি নয়, যেমন আশ'আরী রহ. বলেছেন অর্থাৎ এগুলো হল, صِفَت اِضَافِيَّه এবং صِفَت اَفْعَال তথা আপেক্ষিক এবং ক্রিয়া গুণ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তাক্‌বীনের মর্মার্থ

قَوْلُهُ: وَالْفِعْلُ وَالتَّخْلِيْقُ ঃ فِعْل এবং تَخْلِيْق দ্বারা এমন একটি অনাদি গুণ উদ্দেশ্য, যাকে تَكْوِيْن বলা হয়। تَكْوِيْن অর্থ, উদ্ভাবন ও সৃজন। রিযিকের সৃজনের সাথে এর সম্পর্ক হলে সে تَكْوِيْن কে تَرْزِيْق বা রিযিক প্রদান বলে। সৃজনের সম্পর্ক রূপের সাথে হলে তাকে تَصْوِيْر বা চিত্রায়ণ বা রূপায়ন বলে। আর জীবনের সাথে হলে তাকে اِحْيَاء বা জীবনদান বলে। সুতরাং রিযিকদান, চিত্রায়ণ, জীবনদান ইত্যাদি সবগুলোর মূল হল تَكْوِيْن । বস্তুতঃ সম্পর্কের বৈচিত্রের কারণে এরূপ বিশেষ বিশেষ নাম হয়।

তাখলীক শব্দ চয়নের কারণ

قَوْلُهُ : عَدَلَ ঃ অর্থাৎ خَلْق শব্দটির অধিকতর ব্যবহার সৃষ্টের অর্থে হয়। বিধায় কারও বিবেক উক্ত প্রসিদ্ধ অর্থটির দিকে ধাবিত হতে পারে। ফলে বিভ্রান্তির সম্ভাবনা ছিল অর্থাৎ خَلْق শব্দটি مَخْلُوْق এর অর্থে আল্লাহর গুণ। এটি আল্লাহর সাথে বিদ্যমান। অথচ সৃষ্ট বস্তু হল নশ্বর। আল্লাহর সাথে নশ্বর বস্তু প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নয়। মুছান্নিফ রহ. এ বিভ্রান্তি থেকে বাঁচানোর জন্য خَلْق শব্দ ব্যবহার না করে تَخْلِيْق শব্দ ব্যবহার করেছেন।

মৌলিক গুণ আটটি

قَوْلُهُ : لَاكَمَا زَعَمَ الْاَشْعَرِيُّ ঃ শায়খ আবুল হাসান আশ'আরী রহ. বলেন, تَكْوِيْن কোন প্রকৃত গুণ নয় বরং আপেক্ষিক। এটি সত্তাগত গুণ নয় বরং صِفَت اَفْعَال বা ক্রিয়াগত গুণ। কাজেই তাদের মতে আসল গুণ সাতটি। পক্ষান্তরে মাতুরীদীদের মতে تَكْوِيْن আসল গুণের অন্তর্ভুক্ত। অন্যান্য মূল গুণ যথা– জ্ঞান, জীবন, ইত্যাদি যেমন আল্লাহর সত্তার সাথে বিদ্যমান, এটিও তদনুরূপ। সুতরাং মূল গুণ আটটি।

সত্তাগত গুণ ও ক্রিয়াবাচক গুণ

সত্তাগত গুণ এমন গুণাবলীকে বলা হয়, যেগুলোর অস্তিত্বহীনতা আল্লাহর সত্তার ত্রুটির কারণ হয়। যেমন– ইলম, কুদরত, ইত্যাদি। কেননা জ্ঞান না থাকা অজ্ঞতাকে এবং ক্ষমতা না থাকা অক্ষমতাকে আবশ্যক করে। উভয়টিই দোষণীয়। আর صِفَت اَفْعَال এমন কতগুলো গুণকে বলে, অপরিহার্য সত্তায় যেগুলোর অবিদ্যমানতা ক্ষতির কারণ হয় না। যেমন, কাউকে ইজ্জত দান করা, অপদস্থ করা ইত্যাদি।

وَالْكَلَامُ وَهِيَ صِفَةٌ اَزَلِيَّةٌ عُبِّرَ عَنْهَا بِالنَّظْمِ الْمُسَمّٰى بِالْقُرْاٰنِ الْمُرَكَّبِ مِنَ الْحُرُوْفِ وَذٰلِكَ لِاَنَّ كُلَّ مَنْ يَاْمُرُ وَيَنْهٰى وَيُخْبِرُ يَجِدُ فِىْ نَفْسِهٖ مَعْنًى ثُمَّ يَدُلُّ عَلَيْهِ بِالْعِبَارَةِ اَوِ الْكِتَابَةِ اَوِ الْاِشَارَةِ وَهُوَ غَيْرُ الْعِلْمِ اِذْ قَدْ يُخْبِرُ الْاِنْسَانُ عَمَّا لَمْ يَعْلَمْهُ بَلْ يَعْلَمُ خِلَافَهٗ وَغَيْرُ الْاِرَادَةِ لِاَنَّهٗ قَدْ يَاْمُرُ بِمَا لَايُرِيْدُهٗ كَمَنْ اَمَرَ عَبْدَهٗ قَصْدًا اِلٰى اِظْهَارِ عِصْيَانِهٖ وَعَدَمِ اِمْتِثَالِهٖ لِاَوَامِرِهٖ وَيُسَمّٰى هٰذَا كَلَامًا نَفْسِيًّا عَلٰى مَا اَشَارَ اِلَيْهِ الْاَخْطَلُ بِقَوْلِهٖ شِعْرٌ :

اِنَّ الْكَلَامَ لَفِى الْفُؤَادِ وَاِنَّمَا ـ جُعِلَ اللِّسَانُ عَلَى الْفُؤَادِ دَلِيْلًا ـ

وَقَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اِنِّىْ زَوَّرْتُ فِىْ نَفْسِىْ مَقَالَةً وَكَثِيْرًا مَّاتَقُوْلُ لِصَاحِبِكَ اِنَّ فِىْ نَفْسِىْ كَلَامًا اُرِيْدُ اَنْ اَذْكُرَهٗ لَكَ وَالدَّلِيْلُ عَلٰى ثُبُوْتِ صِفَةِ الْكَلَامِ اِجْمَاعُ الْاُمَّةِ وَتَوَاتُرُ النَّقْلِ عَنِ الْاَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ اَنَّهٗ تَعَالٰى مُتَكَلِّمٌ مَعَ الْقَطْعِ بِاسْتِحَالَةِ التَّكَلُّمِ مِنْ غَيْرِ ثُبُوْتِ صِفَةِ الْكَلَامِ فَثَبَتَ اَنَّ لِلّٰهِ تَعَالٰى صِفَاتٌ ثَمَانِيَةٌ هِىَ الْعِلْمُ وَالْقُدْرَةُ وَالْحَيٰوةُ وَالسَّمْعُ وَالْبَصَرُ وَالْاِرَادَةُ وَالتَّكْوِيْنُ وَالْكَلَامُ

সহজ তরজমা

সিফাতে কালামের আলোচনা

আর অষ্টম গুণটি হল, কালাম। এটি এমন এক অনাদি গুণ যাকে কুরআন দ্বারা প্রমাণিত করা হয়। যেটি হরফ দ্বারা গঠিত। এর কারণ, যেসব লোক আদেশ-নিষেধ করে, সংবাদ দেয়, সে তার অন্তরে এমন একটি বিষয় অনভুব করে, এরপর সেটাকে শব্দের মাধ্যমে অথবা লেখার মাধ্যমে বা ইশারায় বলে দেয়। এ গুণটি ইলম নয়। কেননা মানুষ অনেক সময় এমন সংবাদ দেয়, যার সম্পর্কে তার জ্ঞান থাকে না বরং তার বিপরীত জ্ঞান থাকে। আবার এটি ইরাদাও নয়। কেননা অনেক সময় মানুষ এমন বিষয়েরও আদেশ করে, যার বাস্তবায়ন তার উদ্দেশ্য হয় না। যেমন, এক ব্যক্তি নিজ দাস– যে তার অবাধ্য, তার হুকুম বাস্তবায়ন করে না –এ বিষয়টিকে প্রকাশ করার জন্য তাকে কোন কাজের আদেশ করল। বস্তুতঃ এটাকেই كَلَام نَفْسِى (আত্মিক কথন) বলে। যেমন, কবি আখতাল স্বীয় উক্তিতে এদিকে ইশারা করেছেন যে, নিশ্চয়ই আসল কথা তো অন্তরে; জিহবাকে তার প্রমাণ নির্ধারিত করা হয়েছে।

তদ্রূপ হযরত উমর রাযি. বলেছেন, 'আমি আমার মনে একটি কথা সাজিয়ে রেখেছি' এবং অনেক সময় তোমরাও তোমাদের সঙ্গী-সাথীদের বল যে, আমার মনে একটি কথা আছে, যা আমি তোমাদের কাছে বলতে চাই। তবে সিফাতে কালামের অস্তিত্বের প্রমাণ হল, উম্মতের ইজমা এবং আম্বিয়ায়ে কিরামের থেকে মুতাওয়াতিররূপে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ মুতাকাল্লিম (কথক)। কেননা নিশ্চিতভাবে বিদিত আছে, কথা বলা সিফাতে কালাম ছাড়া সম্ভব নয়। সুতরাং প্রমাণিত হল যে, আল্লাহর আটটি গুণ রয়েছে। যেমন, عِلْم (জ্ঞান) قُدْرَت (ক্ষমতা) حَيَاة (জীবন) سَمْع (শ্রবণ) بَصَر (দর্শন) إِرَادَة (ইচ্ছা) تَكْوِين (সৃজন) كَلَام (কথন)।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

আল্লাহর কালাম

قَوْلُهُ : وَالْكَلَامُ ঃ অষ্টম অনাদি গুণটি হল, কালাম। কিন্তু সমাজে কালাম দ্বারা তিলাওয়াতযোগ্য শব্দ বুঝা যায়, যার নাম কুরআন। যেটি আপতনের অন্তর্ভুক্ত শব্দ এবং স্বর দ্বারা গঠিত হওয়ায় নশ্বর। বলা বাহুল্য যে, নশ্বর বস্তু আল্লাহর গুণ হতে পারে না। বিধায় মুতাযিলাদের মতে কালাম শুধু এ কালামে লফযী বা শাব্দিক বাণী। তাদের মতে কালাম আল্লাহর সিফাত নয়। শারেহ এ ভ্রান্তি নিরসনের লক্ষ্যে বলেছেন, এখানে আল্লাহর সিফাতের আওতাধীন একটি হল কালাম। এটি দ্বারা তিলাওয়াতযোগ্য শব্দ উদ্দেশ্য নয় বরং এর দ্বারা এমন একটি অনাদি গুণ উদ্দেশ্য, যাকে কুরআন নামক শব্দ দ্বারা এমনভাবে ব্যক্ত করা হয়, যেভাবে কোন একটি অর্থকে তার জন্য প্রণীত শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়। যেন এ 'কুরআন' শব্দ لَفْظ مَوْضُوْع প্রণীত শব্দ পর্যায়ের এবং এটি হল دَال বা নির্দেশক ও শাব্দিক বাণী। আর সে অনাদি গুণ যা 'কুরআন' শব্দের مَوْضُوْع لَهُ বা মূল অর্থ তা হল, প্রকৃত কালাম। যাকে বলা হয়, কালামে নফসী বা আত্মিক বাণী। এখানে সিফাতে কালাম দ্বারা এ কালামে নফসীই উদ্দেশ্য, যা পঠিতব্য শব্দের অর্থ।

কালামে নফসীর প্রমাণ

قَوْلُهُ : عُبِّرَ عَنْهَا بِالنَّظْمِ الْمُسَمّٰى بِالْقُرْاٰنِ ঃ صِفَت أَزَلِيَه তথা অনাদি গুণের ভাব প্রকাশ কুরআনের শব্দের সাথে বিশেষিত নয় বরং যখন এটাকে আরবী শব্দে ব্যক্ত করা হয়, তখন এটা কুরআন। আবার যখন সেমেটিক ভাষায় প্রকাশ করা হলে বলা হয় যাবুর গ্রীক ভাষায় প্রকাশ করা হলে ইঞ্জিল আর হিব্রু বা ইবরানী ভাষায় প্রকাশ করলে তাকে তাওরাত বলে। সবগুলোর অর্থ সে আত্মিক অনাদি কালাম।

কালামে নফসীর অস্তিত্বের প্রমাণ

وَذَالِكَ لِأَنَّ الخ ঃ এখানে কালামে নফসীর অস্তিত্বের প্রমাণ বর্ণনা করা হয়েছে। মূলকথা হল, কালামে লফযী বা শাব্দিক বাণী কখনও নির্দেশ সূচক, কখনও নিষেধাজ্ঞাসূচক আবার কখনও সংবাদসূচক হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় যে কোন কথক কথা বলার পূর্বে স্বীয় অন্তরে একটি অর্থ এবং ধরণ অনভুব করে। আর এ গোপন অর্থ এবং ভাবের নামই কালামে নফসী। যা কখনও কখনও ভাষা-শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। কখনও লেখা অথবা কখনও ইশারা দ্বারাও প্রকাশ করা হয়।

কালামে নফসী কি হুবহু জ্ঞান ও ইচ্ছা

قَوْلُهُ : وَهُوَ غَيْرُ الْعِلْمِ الخ ঃ যারা কালামকে আল্লাহর আসল গুণ বলে স্বীকার করে না, তারা বলেন– অন্তরে সুপ্ত (গোপন) যে অর্থটি আপনি কালামে নফসী বলেন, সেটি হুবহু জ্ঞান ও ইচ্ছা। কেননা খবরের মধ্যে ইবারত এ কথা বুঝায় যে, বক্তা এ বিষয়ে জ্ঞান রাখেন এবং নিদেশসূচক শব্দে এ কথা বুঝানো হয় যে, বক্তা শ্রোতার কাছ থেকে আদিষ্ট বস্তুটির বাস্তবায়ন কামনা করেন। মোটকথা, শাব্দিক বাণী চাই খবর হোক কিংবা ইনশা হোক উভয়টির মর্ম হল, এমন অর্থ যা হয়ত জ্ঞান, নয়ত ইচ্ছা। এ দুটি ছাড়া অন্য কিছু নয়। সুতরাং কালামে নফসী প্রমাণিত হল না।

শারেহ এ প্রশ্ন নিরসনে বলেছেন, খবরের শব্দটি যে অর্থ বুঝায়, সেটি ইলমও নয়। কারণ, মানুষ কোন কোন সময় এমন বিষয়ে সংবাদ দেয়, যার সম্পর্কে তার জ্ঞান নেই বরং তার বিপরীত জ্ঞান রয়েছে। যেমন, সমস্ত মিথ্যা সংবাদের ক্ষেত্রে এমনটি হয়। এমনিভাবে আদেশ ও নিষেধ সূচক শব্দগুলোর যে অর্থ হয়, সেগুলো কাম্য হয় না। কেননা কোন কোন সময় মানুষ এমন বিষয়ে আদেশ দেয়, যার বাস্তবায়ন সে কামনা করে না। যেমন, কোন ব্যক্তি তার দাসকে মারছে। লোকজন তার নিন্দবাদ করায় সে বলল, দাসটি তার অবাধ্য। তার কোন হুকুম দাসটি তামিল করে না। অতঃপর সে দাসটির অবাধ্যতা প্রকাশ করার জন্য মানুষের সামনে তাকে কোন কাজের আদেশ দিল। এমতাবস্থায় নির্দেশ পাওয়া গেল বটে। কিন্তু তা বাস্তবায়নের ইচ্ছা পাওয়া যায়নি। কারণ, মনিব কখনও কামনা করবে না যে, গোলাম এ আদেশটি পালন করুক বরং সে চাইবে, গোলাম তার আদেশ অমান্য করুক। এতে মানুষের সামনে সে গোলামের অবাধ্যতা প্রকাশ পাবে এবং মানুষ সে মবিনকে নিন্দাবাদ করা থেকে নিবৃত হবে।

قَوْلُهُ : وَيُسَمَّى هٰهُنَا الْمَعْنٰى ঃ অর্থাৎ আদেশদাতা, নিষেধকারী এবং সংবাদদাতা যে অর্থটি তাদের অন্তরে উপস্থিত পায়, সেটিকে কখনও বাক্য দ্বারা, লেখা দ্বারা, ইশারা দ্বারা প্রকাশ করে, যা ইলম ও ইরাদা ছাড়া অন্য একটি গুণ, সেটিই হল কালামে নফসী।

قَوْلُهُ : عَلٰى مَا اَشَارَ اِلَيْهِ الخ ঃ শব্দ এবং বাক্যের যে অর্থ অন্তরে সুপ্ত থাকে তাকে কালামে নফসী বলার দরুন একটি প্রশ্ন উঠেছিল যে, আরবরা তো অন্তরের সুপ্ত অর্থকে কালাম বলে না বরং কালাম শুধু শব্দকেই বলেন। শারেহ এ প্রশ্নটির নিরসন করতে আরবী পণ্ডিতদের উক্তি দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। যারা অন্তরের সুপ্ত অর্থকে কালাম বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং অন্তরকে কালামের স্থান প্রমাণিত করেছেন। যেমন, বনু উমাইয়া শাসনের গোড়ার দিকে জনৈন খ্রিস্টান কবি আখতাল বলেছিল– কালাম তো মানুষের অন্তরেই থাকে। যবান শব্দাবলী দ্বারা সে সব বুঝায়। এমনিভাবে রাসূলে আকরাম ﷺ এর ওফাতের পর সাকীফায়ে বণী সাইদায় খেলাফত সংক্রান্ত বাদানুবাদ সম্পর্কে হযরত উমরা রাযি. বলেন,

اِجْتَمَعَتِ الْاَنْصَارُ عَلٰى اَنْ يَّاْمُرَ وَاسَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فَمَشَيْتُ اِلَيْهِمْ مَعَ اَبِىْ بَكْرٍ وَزَوَّرْتُ فِىْ نَفْسِىْ مَقَالَةً فَتَكَلَّمَ اَبُوْبَكْرٍ وَلَمْ يَتْرُكْ مِمَّا زَوَّرْتُ شَيْئًا

এখানে প্রামান্য স্থানটি হল, হযরত উমর রাযি. এর উক্তি– زَوَّرْتُ فِىْ نَفْسِىْ مَقَالَةً বাক্যটি। এর অর্থ হল, আমি আমার অন্তরে একটি কথা সাজিয়ে রেখেছিলাম। লক্ষ্য করুন, হযরত উমর রাযি. কথার স্থান অন্তরকে প্রমাণিত করেছেন। এটা হল, কালামে নফসী। এমনিভাবে সমাজে কথিত আছে, আমার মনে একটি কথা আছে, যা আমি তোমাদের সামনে বলতে চাই।

قَوْلُهُ : وَالدَّلِيْلُ عَلٰى ثُبُوْتِ ঃ কালাম সিফাতটির অস্তিত্বের দলীল হল, সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরাম থেকে ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত আছে এবং এ ব্যাপারে সকলে একমত যে, আল্লাহ তা'আলা মুতাকাল্লিম বা কথক। আর নিশ্চিত কালাম সিফাত বিদ্যমান থাকা ছাড়া কারও জন্য মুতাকাল্লিম হওয়া সম্ভব নয়। এতে বুঝা যায়, নিশ্চিত আল্লাহ জন্য সিফাতে কালাম রয়েছে। মুতাযিলারা বলে– আল্লাহ মুতাকাল্লিম হওয়ার অর্থ হল, তিনি কালামের সৃষ্টিকর্তা; কালাম তার সিফাত এমনটি নয়। মূলতঃ তাদের এ ধরনের উক্তি একেবারে অহেতুক। কারণ, সকল আভিধানবেত্তা এ ব্যাপারে একমত যে, فَاعِل বা কর্তা তার ক্ষেত্রেই প্রয়োগ হয়, যার সাথে ক্রিয়াটি সংগঠিত হয়; যিনি এর স্রষ্টা, তার সাথে নয়।

قَوْلُهُ فَثَبَتَ الخ ঃ বাহ্যতঃ এটি কালাম সিফাতটির অস্তিত্বের ফল। অথাৎ যখন কালাম আল্লাহর গুণ প্রমাণিত হল, তখন উপরিউক্ত সাতটি গুণসহকারে সর্বমোট সিফাতের সংখ্যা দাঁড়াল, আটটি। আবার এটি প্রথমোক্ত সকল গুণের বিস্তারিত বিবরণের ফলও হতে পারে।

وَلَمَّا كَانَ فِى الثَّلٰثَةِ الْاَخِيْرَةِ زِيَادَةُ نِزَاعٍ وَخَفَاءٍ كَرَّرَ الْاِشَارَةَ اِلٰى اِثْبَاتِهَا وَقِدَمِهَا وَفَصَّلَ الْكَلَامَ بِبَعْضِ التَّفْصِيْلِ فَقَالَ وَهُوَ اَىِ اللّٰهُ تَعَالٰى مُتَكَلِّمٌ بِكَلَامٍ هُوَ صِفَةٌ لَهٗ ضَرُوْرَةَ اِمْتِنَاعِ اِثْبَاتِ الْمُشْتَقِّ لِلشَّيْئِ مِنْ غَيْرِ قِيَامِ مَاْخَذِ الْاِشْتِقَاقِ بِهٖ وَفِى هٰذَا رَدٌّ عَلَى الْمُعْتَزِلَةِ حَيْثُ ذَهَبُوْا اِلٰى اَنَّهٗ مُتَكَلِّمٌ بِكَلَامٍ هُوَ قَائِمٌ بِغَيْرِهٖ لَيْسَ صِفَةً لَهٗ اَزَلِيَّةً ضَرُوْرَةَ اِمْتِنَاعِ قِيَامِ الْحَوَادِثِ بِذَاتِهٖ تَعَالٰى لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الْحُرُوْفِ وَالْاَصْوَاتِ ضَرُوْرَةَ اَنَّهَا اَعْرَاضٌ حَادِثَةٌ مَشْرُوْطٌ حُدُوْثُ بَعْضِهَا بِاِنْقِضَاءِ الْبَعْضِ لِاَنَّ اِمْتِنَاعَ التَّكَلُّمِ بِالْحَرْفِ الثَّانِىْ بِدُوْنِ اِنْقِضَاءِ الْحَرْفِ الْاَوَّلِ بَدِيْهِىٌّ وَفِى هٰذَا رَدٌّ عَلَى الْحَنَابِلَةِ وَالْكَرَّامِيَّةِ الْقَائِلِيْنَ بِاَنَّ كَلَامَهٗ عَرَضٌ مِنْ جِنْسِ الْاَصْوَاتِ وَالْحُرُوْفِ وَمَعَ ذٰلِكَ فَهُوَ قَدِيْمٌ .

সহজ তরজমা

আল্লাহ তা'আলা মুতাকাল্লিম : আর যেহেতু শেষ তিনটি গুণের ব্যাপারে অধিক বিতর্ক ছিল, এজন্য সেগুলো প্রমাণে এবং সেগুলোর প্রাচীনতার দিকে আবার ইশারা করেছেন। কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন– এবং তিনি তথা আল্লাহ তা'আলা মুতাকাল্লিম। এমন কালামের মাধ্যমে যেটি তার গুণ। কেননা একটি বস্তুর জন্য اِسْم مُشْتَق নির্ধারিত করা, তাতে مَاخَذ اِشْتِقَاق বা ক্রিয়ামূল প্রতিষ্ঠিত হওয়া ব্যতীত সম্ভব নয়। এতে মুতাযিলার মত খণ্ডন করার হয়েছে। কারণ, তাদের মতে আল্লাহ এমন একটি কালামের মাধ্যমে মুতাকাল্লিম, যা তার সত্তা ছাড়া অন্যের সাথে প্রতিষ্ঠিত; তার গুণ নয়। সেই গুণটি অনাদি। কারণ, আল্লাহ সত্তার সাথে নশ্বর বস্তু প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। সেটি হরফ এবং স্বর জাতীয় নয়। কারণ, হরফ এবং স্বর নতুন عَرَض এর অন্তর্ভুক্ত। কোন একটির নতুনত্ব অপরটির যবনিকাপাতের সাথে শর্তযুক্ত। কারণ, প্রথম হরফটি শেষ হওয়া ছাড়া দ্বিতীয় হরফটি উচ্চারণ করার অসম্ভাব্যতা তো সুস্পষ্ট। এতে হাম্বলী মাযহাবীদের এবং কার্‌রামিয়াত মত প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। যারা বলেন, আল্লাহর কালাম আর– হরফ এবং স্বর জাতীয়। তদুপরি তা কাদীম বা প্রাচীন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : ضَرُوْرَةَ اِمْتِنَاعِ اِثْبَاتِ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার মুতাকাল্লিম হওয়ার ব্যাপারে ঐক্যমত রয়েছে। মুতাযিলাও এর প্রবক্তা। মুতাকাল্লিম শব্দটি ইসমে মুশতাক। এর ক্রিয়ামূল হল كَلَام । মূলনীতি হচ্ছে, মুশতাক শব্দটি তার ক্ষেত্রেই ব্যবহার হয়, যার সাথে ক্রিয়ামূল প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং আল্লাহ পাকের মুতাকাল্লিম হওয়া ইজমা দ্বারা প্রমাণিত বলে কালাম ক্রিয়ামূলও তার সাথেই বিদ্যমান হবে। আর বস্তু যার সাথে কায়েম হয়, সেটি তার গুণ হয়ে থাকে। সুতরাং কালাম আল্লাহরই গুণ। তাছাড়া আল্লাহর সত্তার সাথে নশ্বর বিষয়াবলী কায়েম হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং কালাম আল্লাহর অনাদী এবং প্রাচীন গুণ হবে।

قَوْلُهٗ : وَفِى هٰذَا رَدٌّ : এখানে বলা হয়েছে, হাম্বলী মাযহাবী এবং কাররামিয়্যা উভয় ফিরকা আল্লাহর কালামকে হরফ, স্বর এবং আপতনের অন্তর্ভুক্ত মনে করে। কিন্তু কাররামিয়া হরফ এবং স্বরের সমজাতীয় মেনেও এটাকে নশ্বর বলে মনে করে। আর হাম্বলীগণ হরফ এবং স্বর জাতীয় হওয়া সত্ত্বেও এগুলোকে কাদীম বা প্রাচীন বলে মনে করেন।

وَهُوَ اَىِ الْكَلَامُ صِفَةٌ اَىْ مَعْنًى قَائِمٌ بِالذَّاتِ مُنَافِيَةٌ لِلسُّكُوْتِ الَّذِىْ هُوَ تَرْكُ التَّكَلُّمِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ وَالْاٰفَةِ الَّتِىْ هِىَ عَدَمُ مُطَاوَعَةِ الْاٰلَاتِ اِمَّا بِحَسْبِ الْفِطْرَةِ كَمَا فِى الْخَرَسِ اَوْ بِحَسْبِ ضَعْفِهَا وَعَدَمِ بُلُوْغِهَا حَدَّ الْقُوَّةِ كَمَا فِى الطُّفُوْلِيَّةِ فَاِنْ قِيْلَ هٰذَا اِنَّمَا يَصْدُقُ عَلٰى

اَلْكَلَامِ اللَّفْظِيِّ دُوْنَ الْكَلَامِ النَّفْسِيِّ اِذِ السُّكُوْتُ وَالْخَرَسُ اِنَّمَا يُنَافِي التَّلَفُّظَ قُلْنَا اَلْمُرَادُ السُّكُوْتُ وَالْاٰفَةُ الْبَاطِنِيَّتَانِ بِاَنْ لَايُدَبِّرَ فِيْ نَفْسِهِ اَلتَّكَلُّمَ اَوْلَا يَقْدِرُ عَلٰى ذٰلِكَ فَكَمَا اَنَّ الْكَلَامَ لَفْظِيٌّ وَنَفْسِيٌّ فَكَذَا ضِدُّهٗ اَعْنِيْ السُّكُوْتَ وَالْخَرَسَ .

সহজ তরজমা

কালামের আরও ব্যাখ্যা ঃ এবং এ কালাম এমন একটি গুণ অর্থাৎ এমন একটি مَعْنٰى যা অপরিহার্য সত্তার সাথে প্রতিষ্ঠিত, নীরবতার পরিপন্থী, কথা বলার শক্তি-সামর্থ থাকা সত্ত্বেও কথা না বলার অপর নাম। এমনিভাবে আপদের পরিপন্থী, যা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা উপকরণগুলোর কাজ না করার অপর নাম। চাই জন্মগতভাবেই হোক। যেমন, বোবা হওয়া অথবা কথাবার্তা বলার উপকরণগুলোর দুর্বলতার কারণেই হোক। এমনিভাবে শক্তি প্রয়োজনীয় স্তর পর্যন্ত না পৌঁছার কারণেই হোক। যেমন হয়ে থাকে শৈশবে। সুতরাং যদি বলা হয়, এতো শুধু كَلَامِ لَفْظِي এর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য; كَلَامِ نَفْسِي এর ক্ষেত্রে নয়। কারণ, নীরবতা এবং বোবা হওয়া শুধুমাত্র تَلَفُّظ বা উচ্চারণেরই পরিপন্থী। আমরা এর জবাবে বলব, এখানে আমাদের লক্ষ্য হল, سُكُوْت بَاطِنِي ও اٰفَت যেমন, কেউ অন্তরে কথা বলার চিন্তা-ফিকির করল না বা তার সামর্থ রাখল না। সুতরাং যেমনিভাবে কালাম لَفْظِي এবং نَفْسِي হয়, তেমনিভাবে এর বিপরীত জিনিসটিও হয়ে থাকে অর্থাৎ নীরবতা ও বোবা হওয়া।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهٗ : وَهُوَ اَيِ الْكَلَامُ ঃ এখানে মুছান্নিফ রহ. কালাম গুণটির অতিরিক্ত বিশ্লেষণ করতে চান। তিনি বলেন, কালাম আল্লাহর এমন একটি গুণ, যা নীরবতা এবং আপদের পরিপন্থী। এখানে নীরবতা মানে কথা বলার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কথা না বলা। এমতাবস্থায় কথা বলা ও নীরবতার মাঝে تَقَابُل عَدَم وَمَلَكَه হবে। আর আপদ মানে কথাবার্তা বলার উপকরণ যেমন, জিহবা ও রসনাকে গতিদায়ক রগ থাকা সত্ত্বেও সেগুলো অকেজো থাকা। কখনও কখনও জন্মগতভাবে এমন হয়ে থাকে। যেমন, বোবা হলে। আবার কখনও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোর দুর্বলতার কারণেও এমন হয়ে থাকে। যেমন হয়ে থাকে শৈশবে।

قَوْلُهٗ : فَاِنْ قِيْلَ الخ ঃ এখানে প্রশ্নের সারকথা হল, আল্লাহর সিফাতে কালামকে আপনি নীরবতা ও আপদের বিপরীত প্রমাণিত করেছেন। বস্তুতঃ সুকুতের অর্থ, কথা না বলা। এটি কথা বলার বিপরীত। আর কথা বলা কালামে লফযীর মধ্যে হয়ে থাকে। এতে বুঝা গেল, আল্লাহর সাথে প্রতিষ্ঠিত গুণটি কালামে লফযী হবে।

قُلْنَا الخ ঃ এখানে উক্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ যেভাবে কালাম দুই প্রকার। যথা- কালামে লফ্যী ও নফসী। তেমনি এর বিপরীত নীরবতা-আপদও দুই প্রকার। যথা- বাহ্যিক নীরবতা এবং অভ্যন্তরীণ নীরবতা। সুতরাং কালামে লফ্যীর পরিপন্থী হল, বাহ্যিক নীরবতা। আর কালামে নফসীর পরিপন্থী হল, অভ্যন্তরীণ নীরবতা। এখানে নীরবতা ও আপদ বলে দ্বিতীয়টি উদ্দেশ্য, যার পরিপন্থী হল কালামে নফসী।

وَاللّٰهُ تَعَالٰى مُتَكَلِّمٌ بِهَا اٰمِرٌ وَنَاهٍ وَمُخْبِرٌ يَعْنِيْ اَنَّهٗ صِفَةٌ وَّاحِدَةٌ تَتَكَثَّرُ بِالنِّسْبَةِ اِلَى الْاَمْرِ وَالنَّهْيِ وَالْخَبَرِ بِاخْتِلَافِ التَّعَلُّقَاتِ كَالْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ وَسَائِرِ الصِّفَاتِ فَاِنَّ كُلًّا مِّنْهَا وَاحِدَةٌ قَدِيْمَةٌ وَالتَّكَثُّرُ وَالْحُدُوْثُ اِنَّمَا هُوَ فِي التَّعَلُّقَاتِ وَالْاِضَافَاتِ لِمَا اَنَّ ذٰلِكَ اَلْيَقُ بِكَمَالِ التَّوْحِيْدِ.

সহজ তরজমা

আল্লাহ তা'আলা এ গুণে কথক ঃ এবং আল্লাহ এ সিফাতের মাধ্যমে মুতাকাল্লিম বা কথক, নির্দেশ দাতা, নিষেধকারী এবং সংবাদদাতা। অর্থাৎ কালাম একটি সিফাত, যার সম্পর্কের বিভিন্নতার কারণে আদেশ, নিষেধ, খবরের দিকে লক্ষ্য করলে বৈচিত্রের অধিকারী। যেমন, عِلْم - قُدْرَت এবং অন্যান্য গুণ এর মধ্যে প্রত্যেকটি قَدِيْم ও প্রাচীন। আর আধিক্য ও নতুনত্ব শুধু সম্পর্ক এবং আপেক্ষিক বিষয়াবলী। কেননা এটিই পূর্ণাঙ্গ তাওহীদের জন্য বেশি উপযোগী।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

কালাম নিছক একটি সিফাত

قَوْلُهُ : وَاللّٰهُ تَعَالٰى مُتَكَلِّمٌ ঃ এখানে সংখ্যালঘু আশ'আরীর মত খণ্ডন করা হয়েছে। তারা বলেন, কালাম শুধু একটি গুণ নয় বরং কালামা শিরোনামে রয়েছে পাঁচটি গুণ। যথা– أَمْر . نَهْيٌ . خَبَر . اِسْتِفْهَام . نِدَا জবাবের সারকথা হল, কালাম একটি গুণই বটে। কিন্তু এটি كُلِّي নয় যে, আদেশ-নিষেধ ইত্যাদির তার جزئيات বা শাখা হবে। আর كُل ও নয় যে, আদেশ-নিষেধ ইত্যাদি তার جُزْء হবে। যার ফলে এর মধ্যে আধিক্য দেখা দিবে এবং সে আধিক্য প্রকৃত পক্ষেই আধিক্য হবে বরং যেভাবে একটি جُزْئِ حَقِيْقِي এর নানা সম্পর্ক থাকে, উক্ত বহুমুখী সম্পর্কের কারণে তার মধ্যে আপেক্ষিক আধিক্য হয়ে থাকে। যেমন, যায়েদ প্রকৃত অর্থেই একজন ব্যক্তি। লেখার সাথে জড়িত হওয়ার কারণে সে লেখক, কাব্যের সাথে জড়িত বলে সে কবি, ব্যবসার সাথে জড়িত হওয়ায় সে ব্যবসায়ী বা বণিক। সুতরাং এ আধিক্যতা আপেক্ষিক বিষয়। প্রকৃত অর্থে সে একজন ব্যক্তি মাত্র। ঠিক অনুরূপ কালাম একটি جُزْئِ حَقِيْقِي। আদেশ-নিষেধ, খবর ইত্যাদি নাম হয় শুধু বিভিন্ন জিনিসের সাথে সম্পর্কের কারণে। কোন একটি আদেশ বাস্তাবায়ন তলব করার সাথে সম্পৃক্ততার কারণে সেটি আমর বা আদেশ আবার কোন একটি কাজ বর্জন তলবের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ায় সেটি নাহী-নিষেধ আর ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত হওয়ায় খবর। সুতরাং কালামের মধ্যে আসলে একত্বের অর্থ আছে। আর আধিক্য হল আপেক্ষিক।

قَوْلُهُ : بِتَكَثُّرِ اِلَى الْاَمْرِ الخ ঃ অর্থাৎ শুধু আমর-নাহী, খবর ইত্যাদির আলোচনা করা হয়েছে উদাহনরূপে; সীমিত আকারে নয়। কেননা এ তিনটি ছাড়াও কালামের আরও বহু প্রকার রয়েছে।

قَوْلُهُ : لِمَا اَنَّ ذَالِكَ الخ ঃ এখানে কালাম একটিমাত্র গুণ হওয়ার প্রমাণ দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ তাওহীদের যথার্থতার লক্ষ্যে গুণগুলোকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করা উচিৎ। কিন্তু প্রয়োজনের খাতিরে কেবল আটটি গুণ প্রমাণ করা হয়েছে। সুতরাং যথাসম্ভব কম গুণাবলী স্বীকার করা এবং প্রয়োজন অতিরিক্তটি বাদ দেওয়াই সমীচীন।

وَلِاَنَّهٗ لَا دَلِيْلَ عَلٰى تَكَثُّرِ كُلٍّ مِّنْهَا فِىْ نَفْسِهَا فَاِنْ قِيْلَ هٰذِهٖ اَقْسَامٌ لِلْكَلَامِ لَا يُعْقَلُ وُجُوْدُهٗ بِدُوْنِهَا فَيَكُوْنُ مُتَكَثِّرًا فِىْ نَفْسِهٖ قُلْنَا مَمْنُوْعٌ بَلْ اِنَّمَا يَصِيْرُ اَحَدُ تِلْكَ الْاَقْسَامِ عِنْدَ التَّعَلُّقَاتِ وَذٰلِكَ فِيْمَا لَا يَزَالُ وَاَمَّا فِى الْاَزَلِ فَلَا اِنْقِسَامَ اَصْلًا وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ اِلٰى اَنَّهٗ فِى الْاَزَلِ خَبَرٌ وَمَرْجِعُ الْكُلِّ اِلَيْهِ لِاَنَّ حَاصِلَ الْاَمْرِ اِخْبَارٌ عَنْ اِسْتِحْقَاقِ الثَّوَابِ عَلَى الْفِعْلِ وَالْعِقَابِ عَلَى التَّرْكِ وَالنَّهْيُ عَلَى الْعَكْسِ وَحَاصِلُ الْاِسْتِخْبَارِ اَلْخَبَرُ عَنْ طَلَبِ الْاِعْلَامِ وَحَاصِلُ النِّدَاءِ اَلْخَبَرُ عَنْ طَلَبِ الْاِجَابَةِ وَرُدَّ بِاَنَّا نَعْلَمُ اِخْتِلَافَ هٰذِهِ الْمَعَانِىْ بِالضَّرُوْرَةِ وَاسْتِلْزَامُ الْبَعْضِ لِلْبَعْضِ لَا يُوْجِبُ الْاِتِّحَادَ .

সহজ তরজমা

তাছাড়া সে সবের আধিক্যতার পক্ষে মূলতঃ কোন প্রমাণ নেই। এখন যদি প্রশ্ন করা হয়, এসব হল কালামের প্রকারভেদ, যেগুলো ছাড়া কালামের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। সুতরাং কালাম স্বত্তাগতভাবেই অধিক হবে। আমরা বলব, তা মানা যায় না বরং সম্পর্কের সময় কালাম এসব প্রকারের মধ্যে থেকে একটি প্রকারে পরিণত হয়। আর তা হয় অনাদিকালের পর। তাছাড়া অনাদিকালে কোন বিভাজন ছিলই না। আবার কারও কারও মতে কালাম অনাদিকালে খবর ছিল। আর যতগুলো প্রকার আছে, সবগুলোরই মূল কথা খবর। কারণ, আদশের সারকথা হচ্ছে কোন একটি কাজ করার ফলে প্রতিদানের উপযুক্ত হওয়া এবং বর্জনের ফলে শাস্তিযোগ্য হওয়ার সংবাদ দেওয়া। আর নিষেধাজ্ঞা এর পরিপন্থী।

বস্তুতঃ استخبار মানে উদিষ্ট বিষয়ে ঘোষণা সম্পর্কে খবর দেওয়া। ندا বা আহ্বানের মর্ম ডাকে সাড়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে খবর দেওয়া। বস্তুতঃ এ মাযহাবটিকে প্রত্যাখ্যান করতঃ বলা হয়েছে, আমরা সুনিশ্চিতরূপে এ অর্থগুলোর বৈপরিত্যের কথা জানি। একটি জিনিসের জন্য আরেকটি জিনিসের আবশ্যকীয়তা উভয়টির ঐক্যের কারণ হয় না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

কালাম কি একটি সিফাত ?

قَوْلُهُ فَاِنْ قِيْلَ الخ ঃ এখানে প্রশ্নটি কালাম শুধুমাত্র একটি সিফাত হওয়ার ওপর। প্রশ্ন ঃ কালাম হচ্ছে كُلِّى আর আমর-নাহি ইত্যাদি প্রকারগুলো এরই প্রচুর جُزْئِيَّات। যেরূপভাবে كُلِّى বাস্তবে তার প্রচুর جُزْئِيَّات এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হওয়ার কারণে আধিক্যের উপযুক্ত, এরূপভাবে কালাম সিফাতটিও তার প্রচুর جُزْئِيَّات এর মাধ্যমে বাস্তবে বিদ্যমান এবং একাধিক হবে। সুতরাং আপনারা যে কালামকে একটি সিফাত বলেছেন, তা শুদ্ধ নয়।

জবাব ঃ

قَوْلُهُ: قُلْنَا مَمْنُوْعٌ الخ ঃ এ জবাবটি আব্দুল্লাহ ইবনে সাঈদ আল কাত্তান এবং পূর্ববর্তী কিছু মনীষীর মাযহাবের উপর নির্ভরশীল, যারা অনাদিকালে আল্লাহ তা'আলার কালামের জন্য আমর-নাহী ইত্যাদি প্রকারের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তারা বলেন, অনাদিকালে আল্লাহ তা'আলার কালামে কোন প্রকার বিভাজন ছিল না। কাজেই এ মাযহাব মতে অনাদিকালে আল্লাহর কালাম এক হওয়ার উপর উপরিউক্ত প্রশ্ন উত্থাপিত হবে না। অবশ্য অনাদিকালের পর আল্লাহর কালাম আমর-নাহি, খবরে বিভক্ত হয়েছে। এমতাবস্থায় উপরিউক্ত প্রশ্ন উত্থাপিত হবে। এর জবাব হবে, কালাম এসব বিভিন্ন প্রকারের মাধ্যমে বিদ্যমান। এগুলো ছাড়া অস্তিত্ববান হয় না বলে আমরা স্বীকার করি না। কারণ, কালাম হল كُلِّى আর উপরিউক্ত প্রকারভেদ তার جُزْئِيَّات নয় যে, এগুলো ছাড়া কালামের অস্তিত্বই হবে না। যেমনটি আপনাদের দাবী। বরং কালামটি অনির্দিষ্ট ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার সময় নাহী, আর ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার সময় খবরে পরিণত হয়। বস্তুতঃ সম্পর্ক একটি আপতন। আর কালাম جزء حَقِيْقِى। যেরূপভাবে جُزْء حَقِيْقِى তার প্রচুর عَوَارِض বা আপতনের সাথে সম্পর্ক হিসাবে বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত হয়। যেমন, যায়দ লেখার সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার সময় লেখক, কাব্য চর্চার সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার সময় কবি, বাণিজ্যের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার সময় বণিক হয়। এভাবে প্রচুর নাম প্রচুর সম্পর্কের সাথে গুণান্বিত হওয়ার সময় যায়দের সত্তার মধ্যে কোন প্রকার আধিক্য সৃষ্টির কারণ হয় না, তদ্রুপভাবে কালামও প্রচুর সম্পর্ক হিসাবে আমর-নাহী, খবর ইত্যাদি নামে ভূষিত হয়। এতে মূল কালামের মধ্যে আধিক্যের কারণ হয় না। সুতরাং কালাম বস্তুতঃ একটি সিফাতই হবে।

قَوْلُهُ : اَمَّا فِى الْاَزَلِ فَلَا اِنْقِسَامَ اَصْلًا الخ ঃ এটি আব্দুল্লাহ ইবনে সাঈদ আল কাত্তান এবং কতিপয় পূর্ববর্তী আশ'আরীর অভিমত। উপরিউক্ত জবাবটি এর উপরই নির্ভরশীল। তবে অধিকাংশ আশ'আরীদের মতে কালামটি مَامُوْرٌ بِهٖ - مَنْهِى عَنْهُ ও مُخْبَرٌ عَنْهُ এর সাথে আদিকালেই সম্পৃক্ত ছিল এবং কালাম আদিকালেই আমর, নাহী, খবরে বিভক্ত ছিল। এমতাবস্থায় উপরিউক্ত প্রশ্নের উত্তর হবে, সম্পর্কের কারণে সৃষ্ট আধিক্যতা সত্তাগত আধিক্যের কারণ নয়। যদিও সে সম্পর্কটি অনাদি হয়।

ইমাম রাযী রহ. এর মাযহাব

قَوْلُهُ : وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ الخ ঃ এখানে ইমাম রাযী রহ. এর মাযহাব বর্ণনা করা হয়েছে। তার মতে অনাদিকালে সব কালামই খবর ছিল। আর সমস্ত প্রকারের মূল কথা হল খবর। আমরের মূলকথা, আদেশ পালনকারী সওয়াবের যোগ্য হওয়া ও বর্জনকারীদের শাস্তি যোগ্য হওয়ার সংবাদ প্রদান করা। আর নাহীর মূল কথা হল, নিষিদ্ধ বস্তু বর্জনকারী সওয়াবের যোগ্য হওয়া এবং এ কাজে লিপ্ত ব্যক্তি শাস্তির যোগ্য হওয়ার সংবাদ দেওয়া। নেদার মূল কথা হল, শ্রোতার মনোযোগীতা কাম্য হওয়ার সংবাদ দেওয়া। আর সমস্ত প্রকারকে খবরের দিকে ফিরানো হয়েছে দুটি কারণে। প্রথমতঃ মুতাযিলাদের নিম্নোক্ত পশ্নের উত্তর দেওয়া অর্থাৎ যদি কালাম অনাদি হয়, তাহলে আমর-নাহী, ইসতিফহাম, নেদার কোন অর্থ হবে না। কেননা এ সব প্রকারের জন্য কোন শ্রোতার প্রয়োজন ছিল। অথচ অনাদিকালে কোন শ্রোতার অস্তিত্ব ছিল না। দ্বিতীয়তঃ সেসব লোকের মত খণ্ডন করা, যারা সিফাতে কালামকে পাঁচটি বিষয় সাব্যস্ত করেন।

قَوْلُهُ : وَرَدَّ بِاَنَّا نَعْلَمُ ঃ অর্থাৎ ইমাম রাযীর উপরিউক্ত অভিমত প্রত্যাখ্যাত। কারণ, আমর-নাহী ও খবরের অর্থ পরস্পর বিরোধী হওয়া সুনিশ্চিত। বস্তুতঃ এগুলো কালামের বিভিন্ন প্রকার। আর বিভিন্ন প্রকার পরস্পর বিরোধী হয়ে থাকে। বিধায় খবরের মধ্যে সত্য-মিথ্যার সম্ভাবনা থাকে; আমর-নাহীর মধ্যে তা থাকে না।

قَوْلُهُ: وَاسْتِلْزَامُ الْبَعْضِ الخ ঃ সারকথা, আমরা স্বীকার করি যে, اَمر কোন জিনিসের সংবাদ দেওয়াকে আবশ্যক করে। যেমন, আদিষ্ট পালনকারী ব্যক্তি প্রতিদানের যোগ্য, বর্জনকারী শাস্তির যোগ্য। কিন্তু এ আবশ্যকীয়তা এবং খবর হওয়া উভয়টি এক কথা নয়। নতুবা এরূপ দুটি পরস্পর আবশ্যকীয় বিষয় এক হওয়া জরুরী হবে। অথচ তা শুদ্ধ নয়।

فَإِنْ قِيلَ اَلْاَمْرُ وَالنَّهْيُ بِلَامَأْمُوْرٍ وَمَنْهِيٍّ سَفَهٌ وَعَبَثٌ وَالْاِخْبَارُ فِى الْاَزَلِ بِطَرِيْقِ الْمُضِيِّ كِذْبٌ مَحْضٌ يَجِبُ تَنْزِيْهُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَنْهُ قُلْنَا اِنْ لَمْ نَجْعَلْ كَلَامَهُ فِى الْاَزَلِ اَمْرًا وَنَهْيًا وَخَبَرًا فَلَا اِشْكَالَ وَاِنْ جَعَلْنَاهُ فَالْاَمْرُ فِى الْاَزَلِ لِاِيْجَابِ تَحْصِيْلِ الْمَامُوْرِ بِهٖ فِىْ وَقْتِ وُجُوْدِ الْمَامُوْرِ وَصَيْرُوْرَتِهٖ اَهْلًا لِتَحْصِيْلِهٖ فَيَكْفِىْ وُجُوْدُ الْمَامُوْرِ فِىْ عِلْمِ الْاٰمِرِ كَمَا اِذَا قَدَّرَ الرَّجُلُ اِبْنًا لَهٗ فَاَمَرَهٗ بِاَنْ يَّفْعَلَ كَذَا بَعْدَ الْوُجُوْدِ وَالْاَخْبَارُ بِالنِّسْبَةِ اِلَى الْاَزَلِ لَاتَتَّصِفُ بِشَيْءٍ مِنَ الْاَزْمِنَةِ اِذْ لَا مَاضِىَ وَلَا مُسْتَقْبَلَ وَلَا حَالَ بِالنِّسْبَةِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى لِتَنَزُّهِهٖ عَنِ الزَّمَانِ كَمَا اَنَّ عِلْمَهٗ اَزَلِيٌّ لَايَتَغَيَّرُ بِتَغَيُّرِ الْاَزْمَانِ.

সহজ তরজমা

অতঃপর যদি প্রশ্ন করা হয়, আদিষ্ট ব্যক্তি ছাড়া আদেশ এবং নিষেধাজ্ঞা প্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া নিষেধ করা নির্বুদ্ধিতা ও মুর্খতা। তদ্রুপ অনাদিকালে অতীত শব্দ দ্বারা সংবাদ দেওয়া মিথ্যা বৈ কিছু নয়। যা থেকে আল্লাহ তা'আলাকে পুতঃপবিত্র মনে করা আবশ্যক। আমরা এর প্রত্যুত্তরে বলব, যদি আমরা অনাদিকালে আল্লাহ তা'আলার কালামকে আদেশ, নিষেধ এবং খবর সাব্যস্ত না করি, তাহলে তো কোন প্রশ্নই নেই। আর যদি এসব সাব্যস্ত করি, তাহলে উদ্দেশ্য হবে, অনাদিকালে যাকে আদেশ করা হবে আদেশদাতা আদিষ্ট ব্যক্তিকে তার অস্তিত্বকালে নির্দেশিত কাজ আঞ্জাম দেওয়া আবশ্যক করার জন্য। সুতরাং নির্দেশতার ইলমে আদিষ্ট ব্যক্তির অস্তিত্বই যথেষ্ট। যেমন, কেউ তার নিজের জন্য ছেলের কল্পনা করল এবং তাকে নির্দেশ দিল, সে যেন অস্তিত্ব লাভের পর অমুক কাজটি করে। আর অনাদিকালে খবর কোন কালের সাথে গুণান্বিত নয়। কেননা আল্লাহ পাকে দিকে লক্ষ্য করলে অতীত, ভবিষ্যত, বর্তমান কিছুই নেই। তিনি কাল থেকে পুতঃপবিত্র হওয়ার কারণে। যেমনিভাবে তার জ্ঞান অনাদিকালের পরিবর্তনে তা পরিবর্তিত হয় না।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

আশ'আরীদের বিরুদ্ধে মু'তাযিলার প্রশ্ন

قَوْلُهُ : فَإِنْ قِيلَ الخ ঃ এখানে মুতাযিলার পক্ষ থেকে আশ'আরীদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত দুটি প্রশ্নের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। **প্রথমতঃ** আল্লাহ তা'আলার কালাম যেটি আমর, নাহী, খবরের সমন্বয়কারী, তা যদি অনাদি হয়ে থাকে, তাহলে আমর-নাহীও অনাদি হবে। আল্লাহ তা'আলা অনাদিকালে নির্দেশ দাতা এবং নিষেধকারী হবেন। আর আমর-নাহীর জন্য প্রয়োজন হবে কোন সম্বোধিত ব্যক্তির। অথচ অনাদিকালে আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কোন সত্তার অস্তিত্বই ছিল না, যে আমর-নাহীর শ্রোতা বা সম্বোধিত ব্যক্তি হতে পারে। কাজেই আল্লাহ তা'আলার অনাদিকালে কোন সম্বোধিক ব্যক্তি ব্যতীত আদেশকারী ও নিষেধকারী হওয়া আবশ্যক হবে। অথচ বিষয়টি অযৌক্তিক। **দ্বিতীয়তঃ** কুরআনে কারীমের প্রচুর স্থানে صِيْغَه مَاضِى দ্বারা সংবাদ দেওয়া হয়েছে। যেমন, اِنَّا اَرْسَلْنَا نُوْحًا الخ ، قَالَ مُوْسٰى، قُلْنَا يَاذَا الْقَرْنَيْنِ ইত্যাদি। আর অতীতের সাথে কোন জিনিসের সংবাদ দেওয়ার সত্যতা নির্ভর করে সংবাদ দানের পূর্বে সে বিষয়টির বাস্তব অস্তিত্বের ওপর। যেমন, ضَرَبَ زَيْدٌ তথা যায়েদ মেরেছে– এ সংবাদ প্রদান করা তখনই বৈধ হবে, যখন খবর প্রদানের পূর্বে প্রহার কাজটি বাস্তবায়িত হয়। অথচ মাযীর সীগার সাথে কুরআনে যে সমস্ত খবর এসেছে, সে সব তখন বাস্তবায়িত হয়নি। যেমন, হযরত নূহ (আ.) কে অনাদিকালে প্রেরণ করা হয়নি, তৎপরবর্তীকালে প্রেরণ করা হয়েছে। কাজেই অনাদিকালে অতীত শব্দ দ্বারা সংবাদ দেওয়া মানে আল্লাহ তা'আলার মিথ্যুক হওয়া। অথচ আল্লাহ তা'আলা মিথ্যা থেকে পবিত্র।

প্রথম প্রশ্নের উত্তর ঃ অনাদিকারে আল্লাহ তা'আলার কালাম আমর-নাহী সংক্রান্ত হওয়ার ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতানৈক্য রয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনে সাইদ আল কাত্তান এর মাযহাব মতে অনাদিকালে আল্লাহ কালাম এসব গুণে গুণান্বিত ছিল না বরং আম্বিয়ায়ে কিরামের উপর নাযিল করার সময় আমর-নাহী ইত্যাদি গুণে গুণান্বিত হয়েছে। ইতোপূর্বে শারেহ রহ. স্বীয় উক্তি أَمَّا فِى الْأَزَلِ فَلَا اِنْقِسَامَ اَصْلًا উক্তি দ্বারা এ মাযহাবটি গ্রহণ করেছেন। এ মতের ভিত্তিতে উপরিউক্ত প্রশ্ন উথাপিত হবে না। দ্বিতীয় মতটি শাইখ আবুল হাসান আশআরী রহ. এর। তিনি বলেন, আল্লাহর কালাম আদিকালে আমর-নাহী ইত্যাদি ছিল। উক্ত আদিষ্ট কাজ ও নিষিদ্ধ কাজের সাথে তার সম্পর্কও অনাদি-চিরন্তন। এমতাবস্থায় উপরিউক্ত প্রশ্ন হবে অর্থাৎ অনাদিকালে তো কোন সম্বোধিত ব্যক্তি বাস্তবে ছিল না। সুতরাং শ্রোতা বা সম্বোধিত ব্যক্তি ব্যতীত আদেশ-নিষেধ হওয়া আবশ্যক হবে। এর জবাবে وَإِنْ جَعَلْنَاهُ الخ বলা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, আমর-নাহীর জন্য শ্রোতা বা সম্বোধিত ব্যক্তি হওয়া আবশ্যক বটে। কিন্তু আমরা স্বীকার করি না যে, সম্বোধিত ব্যক্তি বাস্তবে বিদ্যমান থাকা জরুরী বরং আদেশকারীর জ্ঞানে তার অস্তিত্ব থাকাই যথেষ্ট। একেই وُجُوْد ذِهْنِى (মানসিক অস্তিত্ব) আখ্যায়িত করা হয়। কাজেই অনাদিকালে শ্রোতাকে আদেশ করার সময় আদেশ দাতার মনে এতটুকু থাকাই যথেষ্ট যে, যখনই আদিষ্ট ব্যক্তির অস্তিত্ব হবে তখন যেন সে উক্ত কাজটি সম্পাদন করে।

قَوْلُهُ: فَيَكْفِى الخ ঃ অর্থাৎ সম্বোধিত ব্যক্তির বাস্তবে বিদ্যমান থাকা আক্ষরিক সম্বোধনের জন্য জরুরী। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার কালাম হল নফসী। সুতরাং নির্দেশের সাথে তার সম্বোধন হবে আত্মিক, যাকে বলা হয় খেতাবে নফসী। এর জন্য বাস্তবে সম্বোধিক ব্যক্তি থাকা আবশ্যক নয়। যেমন, কোন ব্যক্তি তার ছেলেকে জন্মের পূর্বেই ছেলে ভেবে মনে মনে তাকে নির্দেশ করল– আমার ছেলে যেন এটা করে, ওটা করে। এখানে কল্পনায় নিজের ছেলের অস্তিত্ব থাকাই যথেষ্ট।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরঃ

قَوْلُهُ : وَالْأَخْبَارُ بِالنِّسْبَةِ الخ ঃ এটি দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব অর্থাৎ وَالْأَخْبَارُ فِى الْأَزَلِ بِطَرِيْقِ الْمُضِىِّ كِذْبٌ مَحْضٌ এর উত্তর। এখানে বলা হয়েছে, আল্লাহর কালাম অনাদিকালে যদিও অতীতরূপে রয়েছে ঠিক, কিন্তু বস্তুতঃ সেটি কোন কালের সাথে গুণান্বিত নয় বরং কাল থেকে শূন্য শুধু খবর। সম্পর্ক নতুন হওয়ার কারণে কালের সাথে সেটি গুণান্বিত হয়েছে অনাদি কালের পর।

অনাদিকালে কালামুল্লাহ কালের সাথে গুণান্বিত নয় কেন ?

قَوْلُهُ : اِذْ لَا مَاضِىَ الخ ঃ এখানে অনাদিকালে আল্লাহ তা'আলার কালাম কালের সাথে গুণান্বিত না হওয়ার প্রমাণ পেশ করা হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা পরিবর্তনশীল নন। অথচ কালের সাথে গুণান্বিত বস্তু পরিবর্তনশীল। কাজেই আল্লাহ তা'আলা কালের সাথে সাথে গুণান্বিত নন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার মধ্যে কোন কাল নেই বরং তিনি কাল থেকে পুতঃপবিত্র। বিধায় তার মধ্যে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত কোন কিছুই নেই।

মু'তাযিলাদের পক্ষ থেকে আরেকটি প্রশ্ন ঃ

قَوْلُهُ: كَمَا اَنَّ عِلْمَهُ الخ ঃ এখানে মুতাযিলার পক্ষ্য থেকে উপরিউক্ত উত্তরের উপর উথাপিত একটি প্রশ্নের জবাবের দিকে ইংগিত রয়েছে। প্রশ্ন হল, যদি অনাদিকালে আল্লাহর কালাম কালের সাথে গুণান্বিত না হয়ে থাকে বরং পরবর্তীতে কালের সাথে গুণান্বিত হয়, তাহলে তাতে পরিবর্তন আবশ্যক হবে। অথচ পরিবর্তন অনাদিত্বের বিরোধী। কেননা পরিবর্তনশীল জিনিস নশ্বর হয়ে থাকে। কাজেই আল্লাহর কালাম অনাদি হবে না। এর জবাব হল, সিফাতের সম্পর্কের পরিবর্তন স্বয়ং আল্লাহর সিফাতের মধ্যে পরিবর্তন ও নশ্বরতাকে আবশ্যক করে না। যেভাবে আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান অনাদি, তদুপরি অনাদিকালের পর কখনও এর সম্পর্ক ছিল "যায়েদের অস্তিত্ব হবে" –এর সাথে। যখন তার অস্তিত্ব হয়ে গেছে, তখন আল্লাহর ইলমের সম্পর্ক হয়ে গেছে, যায়েদের অস্তিত্বের সাথে। যখন যায়দ মারা গেছে, তখন তার ইলমের সম্পর্ক হয়েছে, অতীতে যায়েদের বিদ্যমানতার সাথে।

সুতরাং কাল এবং কালের সাথে সম্পর্ক বদলাতে থাকে কিন্তু এ পরিবর্তন ইলম গুণের মধ্যে পরিবর্তন এবং নশ্বরতা সৃষ্টি করে না।

وَلَمَّا صَرَّحَ بِأَزَلِيَّةِ الْكَلَامِ حَاوَلَ التَّنْبِيْهَ عَلٰى اَنَّ الْقُرْاٰنَ اَيْضًا قَدْ يُطْلَقُ عَلٰى هٰذَا الْكَلَامِ النَّفْسِيِّ الْقَدِيْمِ كَمَا يُطْلَقُ عَلَى النَّظْمِ الْمَتْلُوِّ الْحَادِثِ فَقَالَ وَالْقُرْاٰنُ كَلَامُ اللّٰهِ تَعَالٰى غَيْرُ مَخْلُوْقٍ وَعَقَّبَ الْقُرْاٰنَ بِكَلَامِ اللّٰهِ تَعَالٰى لِمَا ذَكَرَ الْمَشَايِخُ مِنْ اَنَّهٗ يُقَالُ اَلْقُرْاٰنُ كَلَامُ اللّٰهِ تَعَالٰى غَيْرُ مَخْلُوْقٍ وَلَا يُقَالُ اَلْقُرْاٰنُ غَيْرُ مَخْلُوْقٍ لِئَلَّا يَسْبِقَ اِلَى الْفَهْمِ اَنَّ الْمُؤَلَّفَ مِنَ اْلاَصْوَاتِ وَالْحُرُوْفِ قَدِيْمٌ كَمَا ذَهَبَتْ اِلَيْهِ الْحَنَابِلَةُ جَهْلًا اَوْ عِنَادًا وَاَقَامَ غَيْرَ الْمَخْلُوْقِ مَقَامَ غَيْرِ الْحَادِثِ تَنْبِيْهًا عَلٰى اِتِّحَادِهِمَا وَقَصْدًا اِلٰى جَرْيِ الْكَلَامِ عَلٰى وِفْقِ الْحَدِيْثِ حَيْثُ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْقُرْاٰنُ كَلَامُ اللّٰهِ تَعَالٰى غَيْرُ مَخْلُوْقٍ وَمَنْ قَالَ اِنَّهٗ مَخْلُوْقٌ فَهُوَ كَافِرٌ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَتَنْصِيْصًا عَلٰى مَحَلِّ الْخِلَافِ بِالْعِبَارَةِ الْمَشْهُوْرَةِ فِيْمَا بَيْنَ الْفَرِيْقَيْنِ وَهُوَ اَنَّ الْقُرْاٰنَ مَخْلُوْقٌ اَوْ غَيْرُ مَخْلُوْقٍ وَلِهٰذَا تُتَرْجَمُ هٰذِهِ الْمَسْئَلَةُ بِمَسْاَلَةِ خَلْقِ الْقُرْاٰنِ.

সহজ তরজমা

মুছান্নিফ রহ. যখন কালাম সিফাতটির অনাদিত্বের সুস্পষ্ট বিবরণ দিলেন, তাই এবার এ সম্পর্কে সতর্ক করতে চান যে, কুরআন শব্দটি এ كَلَام نَفْسِيّ قَدِيْم এর ক্ষেত্রেও ব্যবহার হয়, যেরূপভাবে حَادث ،كَلَام لَفْظِي مَتْلُو এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং তিনি বলেছেন, কুরআন আল্লাহ তা'আলার কালাম, মাখলূক বা সৃষ্টি নয়। এখানে কুরআন শব্দটির পর কালামুল্লাহ শব্দটি উল্লেখ করেছেন। কেননা মাশায়েখে কিরাম লিখেছেন, اَلْقُرْاٰن كَلَامُ اللّٰهِ غَيْرُ مَخْلُوْق বলা হবে; اَلْقُرْاٰن مَخْلُوْق বলা হবে না। যাতে মন এদিকে ধাবিত না হয় যে, সে কালামটি হরফ ও স্বর দ্বারা গঠিত, তা-ও সুপ্রাচীন। যেমন- মূর্খতা অথবা ধৃষ্টতা থেকে হাম্বালী মাযহাবপন্থীরা এ মত পোষণ করেছেন। আর غَيْر حَادث এর পরিবর্তে غَيْرُ مَخْلُوْق শব্দ উল্লেখ করেছেন, উভয়টি অর্থ এক হওয়ার প্রতি সতর্ক করার জন্য এবং বাক্যটিকে হাদীস মোতাবিক প্রয়োগ করার ইচ্ছায়। কেননা নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন-

اَلْقُرْاٰن كَلَامُ اللّٰهِ غَيْرُ مَخْلُوْقٍ وَمَنْ قَالَ اِنَّهٗ مَخْلُوْقٌ فَهُوَ كَافِرٌ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ

অর্থাৎ কুরআন আল্লাহর কালাম, সৃষ্টি নয়। যে বলবে, এটি সৃষ্ট, সে মহান আল্লাহ তা'আলার সাথে কুফরী করল। অনুরূপভাবে দ্বিপাক্ষিক সুপ্রসিদ্ধ ইবারতের মাধ্যম বিতর্কিত বিষয়টি সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিবরণ দেওয়ার জন্য। আর তা হচ্ছে, কুরআন সৃষ্ট না অসৃষ্ট। বিধায় এ বিষয়টি শিরোনাম দেওয়া হয় مَسْئَلَةُ خَلْقِ الْقُرْاٰن।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

কুরআন কালামে লফ্যী না নফসী?

قَوْلُهٗ: حَاوَلَ التَّنْبِيْهَ الخ ঃ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কালাম বলে কালামে নফসী উদ্দেশ্য। সুতরাং اَلْقُرْاٰن كَلَامُ اللّٰهِ বলে কুরআনের উপর আল্লাহর কালাম তথা কালামে নফসী আরোপ করা হয়েছে। উদ্দেশ্য হল, কালামে নফ্সী। এতে বুঝা যায়, সমাজে কুরআন শব্দের প্রয়োগ যেভাবে কালামে লফযী তথা গঠিত শব্দের উপর হয়, তদ্রুপভাবে কালামে নফসীর উপরও হয়।

আল-কুরআনের পর কালামুল্লাহ আনলেন কেন?

قَوْلُهٗ : وَعَقَّبَ الْقُرْاٰنَ الخ ঃ শারিহ রহ. নিছক اَلْقُرْاٰنُ مَخْلُوْقٌ বলেননি বরং اَلْقُرْاٰنُ এর পর কালামুল্লাহ শব্দটিও যুক্ত করেছেন। কেননা মাশায়েখে কিরাম লিখেছেন, اَلْقُرْاٰن مَخْلُوْق না বলে যেন اَلْقُرْاٰن كَلَامُ اللّٰهِ غَيْرُ مَخْلُوْق বলা হয়। কেননা সমাজ কুরআন দ্বারা পঠিতব্য শব্দ এবং কালামে লফযী বুঝে। যেটি হরফ এবং স্বর দ্বারা সংযুক্ত হওয়ার কারণে নশ্বর। সুতরাং اَلْقُرْاٰن غَيْرُ مَخْلُوْق বলা হলে প্রসিদ্ধির কারণে মন পঠিতব্য শব্দ অসৃষ্ট হওয়ার দিকে ধাবিত হবে। অথচ পঠিতব্য শব্দ সৃষ্ট ও নশ্বর।

غَيْر حَادِث না বলার কারণ

قَوْلُهُ : وَاَقَامَ غَيْرَ الْمَخْلُوق الخ ঃ অর্থাৎ মুসান্নিফ রহ. তিনটি কারণে اَلْقُرْاٰنُ كَلَامُ اللّٰهِ غَيْرُ حَادِث না বলে غَيْر مَخْلُوق বলেছেন। যথা- এক. حَادِث এবং মাখলূক শব্দ দুটি সমার্থক হওয়ার প্রতি ইংগিত করা। দুই. হাদীসের অনুকূলে শব্দ ব্যবহার করা। কেননা হাদীস শরীফে اَلْقُرْاٰنُ كَلَامُ اللّٰهِ غَيْرُ مَخْلُوْق শব্দ এসেছে; غَيْر حَادِث নয়। তিন. উভয়পক্ষের মাঝে আলোচ্য বিষয়টিতে প্রসিদ্ধ ইবারতের মাধ্যমে বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা। আর উভয়পক্ষের মাঝে এ বিতর্কটি اَلْقُرْاٰنُ مَخْلُوْقٌ وَغَيْرُ مَخْلُوْق শব্দে প্রসিদ্ধ ছিল। ফলে এ মাসআলার শিরোনাম مَسْئَلَةُ خَلْقِ الْقُرْاٰنِ হয়ে গিয়েছিল।

قَوْلُهُ: لِهٰذَا تُتَرْجَمُ الخ ঃ এখানে প্রশ্ন হতে পারে, আল্লাহর কালাম অসৃষ্ট বিধায় উচিৎ ছিল, এ বিষয়টির শিরোনাম مَسْئَلَةُ عَدَمِ خَلْقِ الْقُرْاٰنِ নির্ধারণ করা। এর জবাব হল, এ নামটি মুতাযিলাদের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছিল। তারা ছিল কুরআন সৃষ্ট হওয়ার প্রবক্তা। অতঃপর উভয় দলের মাঝে এ নামটিই প্রসিদ্ধ হয়ে যায়।

قَوْلُهُ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ঃ মোল্লা আলী কারী রহ. এর মতে হাদীসটি ভিত্তিহীন।

وَتَحْقِيْقُ الْخِلَافِ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ يَرْجِعُ اِلٰى اِثْبَاتِ الْكَلَامِ النَّفْسِيِّ وَنَفْيِهِ وَاِلَّا فَنَحْنُ لَانَقُوْلُ بِقِدَمِ الْاَلْفَاظِ وَالْحُرُوْفِ وَهُمْ لَايَقُوْلُوْنَ بِحُدُوْثِ الْكَلَامِ النَّفْسِيِّ وَدَلِيْلُنَا مَامَرَّ اَنَّهُ ثَبَتَ بِالْاِجْمَاعِ وَتَوَاتُرِ النَّقْلِ عَنِ الْاَنْبِيَاءِ اَنَّهُ مُتَكَلِّمٌ وَلَا مَعْنٰى لَهُ سِوٰى اَنَّهُ مُتَّصِفٌ بِالْكَلَامِ وَيَمْتَنِعُ قِيَامُ اللَّفْظِيِّ الْحَادِثِ بِذَاتِهِ تَعَالٰى فَتَعَيَّنَ النَّفْسِيُّ الْقَدِيْمُ .

সহজ তরজমা

আমাদের আশ'আরী এবং মুতাযিলার মধ্যকার মতানৈক্য মূলতঃ كَلَام نَفْسِى সাব্যস্ত করা ও অস্বীকার করার দরুন। নতুবা আমরা শব্দ ও অক্ষরকে সুপ্রাচীন বলি না। আর না তারা كَلَام نَفْسِى কে নশ্বর বলে। আমাদের দলীল ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ ইজমা এবং আম্বীয়া আলাইহিমুস সালাম থেকে মুতাওয়াতিররূপে বর্ণিত আছে- আল্লাহ তা'আলা মুতাকাল্লিম-কথক। এতদ্ভিন্ন অন্য কোনও অর্থও হতে পারে না যে, আল্লাহ তা'আলা সিফাতে কালামের গুণে গুণান্বিত এবং আল্লাহর সত্তার সাথে كَلَام لَفْظِى حَادِث প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব। সুতরাং كَلَام نَفْسِى قَدِيْم বলে সুনির্দিষ্ট হয়ে গেল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

মতবিরোধের আসল কারণ

قَوْلُهُ : وَتَحْقِيْقُ الْخِلَافِ الخ ঃ গভীর দৃষ্টিতে দেখলে আমাদের এবং মুতাযিলার মাঝে মতানৈক্য মূলতঃ কালামুল্লাহ সৃষ্ট হওয়া বা না হওয়া সংক্রান্ত নয় বরং কালামে নফসী প্রমাণ করা বা অস্বীকার করা নিয়েই এ মতানৈক্য। কারণ, আমরা যদি মুতাযিলার মত কালামকে শুধু কালামে লফযীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলি; নফসী বলে প্রমাণ না করি, তাহলে আমরাও শব্দ এবং হরফকে সুপ্রাচীন হওয়ার কথা বলব না বরং আমরাও তাদের মত কালামুল্লাহকে নশ্বর বলব। এরূপভাবে যদি তারা আমাদের মত কালামে নফসীকে প্রমাণিত মানে, তাহলে তারা কালামে নফসীকে নশ্বর এবং সৃষ্ট বলবে না বরং আমাদের মত সুপ্রাচীন-অসৃষ্ট বলবে। কাজেই কালামে নফসী থাকা-নাথাকাই বিতর্কের মূল কারণ।

আমাদের প্রমাণ

قَوْلُهُ : وَدَلِيْلُنَا الخ ঃ আল্লাহ তা'আলা মুতাকাল্লিম ও কথক -এ বিষয়টি ইজমা এবং মুতাওয়াতির বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত। অপরদিকে অভিধানবিদগণ এ ব্যাপারে একমত যে, মুশতাক (নিষ্পন্ন শব্দ) কিছুর উপর প্রয়োগ হতে হলে সেটি ক্রিয়ামূলের গুণে গুণান্বিত হয়। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা মুতাকাল্লিম হওয়ার অর্থ নিশ্চিত এটিই যে, তিনি কালাম গুণে গুণান্বিত। বিধায় কালাম গুণটি আল্লাহ সত্তার সাথে প্রতিষ্ঠিত। তাছাড়া কালামে লফযী নশ্বর হওয়ার কারণে আল্লাহর সত্তার সাথে প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব। কাজেই আল্লাহর সত্তার সাথে প্রতিষ্ঠিত কালামটি শুধু কালামে নফসী হওয়াই চূড়ান্ত হয়ে গেল।

وَاَمَّا اِسْتِدْلَالُهُمْ اَنَّ الْقُرْاٰنَ مُتَّصِفٌ بِمَا هُوَ مِنْ صِفَاتِ الْمَخْلُوْقِ وَسِمَاتِ الْحُدُوْثِ مِنَ التَّاْلِيْفِ وَالتَّنْظِيْمِ وَالْاِنْزَالِ وَالتَّنْزِيْلِ وَكَوْنِهٖ عَرَبِيًّا مَسْمُوْعًا فَصِيْحًا مُعْجِزًا اِلٰى غَيْرِ ذٰلِكَ فَاِنَّمَا يَقُوْمُ حُجَّةً عَلَى الْحَنَابِلَةِ لَا عَلَيْنَا لِاَنَّا قَائِلُوْنَ بِحُدُوْثِ النَّظْمِ وَاِنَّمَا الْكَلَامُ فِى الْمَعْنَى الْقَدِيْمِ.

সহজ তরজমা

অবশ্য (সুপ্রাচীন كَلَام نَفْسِى এর অস্বীকৃতি এবং কুরআনের নশ্বরতার পক্ষে) মুতাযিলাদের প্রদত্ত নিম্নোক্ত প্রমাণ তথা কুরআন এরূপ কতগুলো গুণে গুণান্বিত, যেগুলো মাখলূকের সিফাত ও নতুনত্বের নিদর্শন। যেমন, বিভিন্ন হরফ-শব্দ দ্বারা গঠিত হওয়া, নাযিলকৃত হওয়া, আরবী হওয়া, শ্রুত হওয়া, ভাষা অলংকার থাকা, অলৌকিক হওয়া ইত্যাদি। সুতরাং এটি হাম্বলীদের বিরুদ্ধে প্রমাণ হতে পারে; আমাদের বিরুদ্ধে নয়। কারণ, শব্দের নশ্বরতার প্রবক্তা তো আমরাও। তাছাড়া আমাদের কথা তো كَلَام نَفْسِى সম্পর্কে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

মু'তাযিলার প্রমাণ

قَوْلُهٗ : وَاَمَّا اِسْتِدْلَالُهُمْ ঃ মুতাযিলারা কালামে নফসী না থাকা এবং কুরআন নশ্বর ও সৃষ্ট হওয়ার পক্ষে দলীল হিসেবে বলেছে, কুরআনের এরূপ কিছু গুণাবলি রয়েছে, যেগুলো সৃষ্ট বস্তুর গুণ এবং নশ্বরতার নিদর্শন। সেটি যদি সৃষ্টের গুণাবলীর সাথে গুণান্বিত হয়, তবে অবশ্যই সেটিও সৃষ্ট এবং নশ্বর হবে। সুতরাং কুরআন নশ্বর।

নশ্বরতার লক্ষণ

قَوْلُهٗ : مِنَ التَّاْلِيْفِ الخ ঃ এটি اَلْمَخْلُوْق এর সিফাতের বিবরণ। تَاْلِيْف দ্বারা উদ্দেশ্য শব্দ এবং হরফ দ্বারা যুক্ত হওয়া। تَاْلِيْف এবং تَنْظِيْم এ কারণে নশ্বরতার নিদর্শন যে, এগুলো বিভিন্ন অংশের উপর নির্ভরশীল। আর একটি বস্তু যার উপর স্থগিত থাকে, সেটির প্রতি মোখাপেক্ষী হয়। আর মোখাপেক্ষীতা নশ্বরের লক্ষণ। অতএব تَاْلِيْف، تَنْظِيْم নশ্বর হবে। আর اِنْزَال ও تَنْزِيْل এর অর্থ, উর্ধ্বস্থান থেকে নিম্ন স্থানের দিকে স্থানান্তরিত হওয়া। অতএব এ দুটি বস্তু স্থান বিশিষ্ট হল। আর যে বস্তু স্থান বিশিষ্ট হয় অর্থাৎ স্থানের গুণে গুণে গুণান্বিত হয়, সেটি নশ্বর। এরূপভাবে আরবী হওয়া আরবদের প্রণয়নের উপর নির্ভশীল। আর وَضْع বা প্রণয়ন নশ্বর। বস্তুতঃ পাণ্ডিত্যপূর্ণ হওয়া প্রচুর ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল। অথচ ব্যবহার হল নশ্বর। ফলে فَصَاحَت বা পাণ্ডিত্য নশ্বর হবে। এরূপভাবে শ্রুত হওয়া স্বরের গুণ। স্বর আরয বা আপতনের অন্তর্ভুক্ত বিধায় তা-ও নশ্বর। তাই শ্রুত হওয়াও নশ্বর। এরূপভাবে অলৌকিকত্ব চ্যালেঞ্জের সময় প্রকাশিত হয়। আর চ্যালেঞ্জ নশ্বর। বিধায় অলৌকিকত্বও নশ্বরই হবে।

মু'তাযিলাদের প্রমাণের উত্তর

قَوْلُهٗ : فَاِنَّمَا يَقُوْمُ الخ ঃ এটি উপরিউক্ত দলীলের জবাব। অথাৎ উপরিউক্ত গুণাবলীর সাথে গুণান্বিত হয় কালামে লফযী, যাকে মুতাযিলার মত আমরাও নশ্বর বলি। কাজেই এ প্রমাণ আমাদের বিরুদ্ধে দলীল নয় বরং হাম্বলীদের বিরুদ্ধে প্রমাণ হবে। যারা কালামে ইলাহীকে শব্দ এবং হরফ দ্বারা সংযুক্ত ও গঠিত মানা সত্ত্বেও সুপ্রাচীন মনে করে। আর আমরা বলি– আল্লাহর কালাম অসৃষ্ট। এটি কালামে লফযী প্রসঙ্গে নয় বরং কালামে নফসী প্রসঙ্গে।

وَالْمُعْتَزِلَةُ لَمَّا لَمْ يُمْكِنْهُمْ اِنْكَارُ كَوْنِهٖ تَعَالٰى مُتَكَلِّمًا ذَهَبُوْا اِلٰى اَنَّهٗ تَعَالٰى مُتَكَلِّمٌ بِمَعْنٰى اِيْجَادِ الْاَصْوَاتِ وَالْحُرُوْفِ فِىْ مَحَالِّهَا اَوْ اِيْجَادِ اَشْكَالِ الْكِتَابَةِ فِى اللَّوْحِ الْمَحْفُوْظِ وَاِنْ لَمْ يُقْرَأْ عَلٰى اِخْتِلَافٍ بَيْنَهُمْ وَاَنْتَ خَبِيْرٌ بِاَنَّ الْمُتَحَرِّكَ مَنْ قَامَتْ بِهِ الْحَرَكَةُ لَا مَنْ اَوْجَدَهَا

وَالَّا يَصِحُّ اِتِّصَافُ الْبَارِىْ بِالْاَعْرَاضِ الْمَخْلُوْقَةِ لَهُ تَعَالٰى وَاللّٰهُ تَعَالٰى عَنْ ذٰلِكَ عُلُوًّا كَبِيْرًا.

সহজ তরজমা

আর মুতাযিলার পক্ষে যখন আল্লাহ তা'আলা মুতাকাল্লিম বা কথক হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করা সম্ভব হয়নি, তখন তারা এ মত পোষণ করল যে, আল্লাহ তা'আলার মুতাকাল্লিম হওয়ার অর্থ– হরফ এবং স্বরকে সেগুলোর স্ব-স্ব স্থানে সৃষ্টি করা অথবা লাওহে মাহফুযে (সংরক্ষিত ফলকে) লেখার রূপ দান করা; যদিও আল্লাহ তা'আলা সেটি পাঠ করেননি। এ বিষয়টি স্বয়ং তাদের মাঝেই বিতর্কিত। আপনি ভাল করেই জানেন, এমন বস্তুই গাতশীল, যার সাথে গতি প্রতিষ্ঠিত; যিনি গতি স্রষ্টা তিনি নন। নতুবা সৃষ্টিকর্তার সেসব আরযের সাথে গুণান্বিত হওয়া আবশ্যক হবে, যেগুলো তার সৃষ্ট মাখলূক। অথচ আল্লাহ তা'আলা এগুলো থেকে অনেক উর্ধ্বে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

মু'তাযিলার অলীক ব্যাখ্যা

قَوْلُهُ : وَالْمُعْتَزِلَةُ الخ ঃ মুতাযিলারা আল্লাহ পাকের মুতাকাল্লিম হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করতে পারল না। কেননা কুরআনে কারীমে সুস্পষ্টভাবে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আমর-নাহী এবং খবরের বিভিন্ন শব্দ এসেছে, যেগুলো কালামের বিভিন্ন প্রকার। তাছাড়া বিষয়টি নবীগণ থেকেও মুতাওয়াতিররূপে বর্ণিত। ফলে তারা ব্যাখ্যা দিয়েছে, আল্লাহ তা'আলা মুতাকাল্লিম হওয়ার অর্থ তিনি তার কালামের স্বরগুলোকে স্ব-স্ব স্থানে যেমন, তূর পাহাড় বা মূসা (আ.) এর বক্ষে অস্তিত্ব দান করেছেন অথবা কালামের হরফগুলোকে স্ব-স্ব স্থানে যেমন হযরত জিবরাঈল (আ.) এর কিংবা নবীর যবানে সৃষ্টি করেছেন অথবা যেসব চিত্র ও লেখার রূপ কালাম বুঝায়, সেগুলোকে লাওহে মাহফুযে অস্তিত্ব দান করেছেন। যদিও আল্লাহ তা'আলা সে কালাম পাঠ করেননি এবং পাঠ করা জরুরীও নয়। কেননা গ্রন্থকারগণ স্ব স্ব গ্রন্থাবলীতে কেবল লেখার রূপ তৈরি করে দেন। যেসব কথাবার্তা তাদের কিতাবে পাওয়া যায়, সেগুলো গ্রন্থকারদের দিকে সম্বোধিত করা হয়। যেমন, বলা হয় ইমাম রাযী রহ. স্বরচিত অমুক গ্রন্থে এরূপ বলেছেন।

মু'তাযিলার ব্যাখ্যাটির ভ্রান্তি

قَوْلُهُ: وَاَنْتَ خَبِيْرٌ الخ ঃ এখানে মুতাযিলাদের প্রদত্ত ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। বলা হয়েছে, উপরিউক্ত ব্যাখ্যা অভিধানের মূলনীতির পরিপন্থী। কারণ, অভিধানের মূলনীতি অনুসারে মুশতাক শব্দটি তার ক্ষেত্রেই প্রয়োগ হয়, যেটি ক্রিয়ামূলের সাথে গুণান্বিত। এর অস্তিত্ব দানকারী বা স্রষ্টার ক্ষেত্রে নয়। যেমন, مُتَحَرِّك বা গতিশীল তাকেই বলা হয়, যে গতির গুণে গুণান্বিত। যিনি গতির স্রষ্টা তাকে مُتَحَرِّك বলা হয় না। এরূপভাবে مُتَكَلِّم তাকেই বলা হবে, যিনি কালামের গুণে গুণান্বিত; কালামের স্রষ্টাকে নয়।

জিবরাঈল (আ.) এর কালাম প্রাপ্তী

قَوْلُهُ : عَلٰى اِخْتِلَافٍ بَيْنَهُمْ الخ ঃ জিবরাঈল (আ.) আল্লাহ তা'আলা থেকে কিভাবে কুরআন অর্জন করলেন– এ নিয়ে মুতাযিলাদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। কারও কারও মতে আল্লাহ তা'আলা নিজ কালাম বুঝানোর মত স্বর সৃষ্টি করেন, যা জিবরাঈল (আ.) শ্রবণ করেন এবং তা নিয়ে অবতীর্ণ হন। আবার কারও কারও মতে আল্লাহ তা'আলা লাওহে মাহফুযে লেখার নকশা তৈরী করেন, যা জিবরাঈল (আ.) দর্শন করেন। বস্তুতঃ শারেহ রহ. مُتَكَلِّمٌ بِمَعْنٰى... اَوْلِلَّوْحِ الْمَحْفُوْظ এর মধ্যে او হরফ এনে এ মতোনৈক্যের দিকেই ইংগিত করেছেন।

وَمِنْ اَقْوٰى شُبَهِ الْمُعْتَزِلَةِ اَنَّكُمْ مُتَّفِقُوْنَ عَلٰى اَنَّ الْقُرْاٰنَ اِسْمٌ لِمَا نُقِلَ اِلَيْنَا بَيْنَ دُفَّتَى الْمَصَاحِفِ تَوَاتُرًا وَهٰذَا يَسْتَلْزِمُ كَوْنَهُ مَكْتُوْبًا فِى الْمَصَاحِفِ مَقْرُوًّا بِالْاَلْسُنِ، مَسْمُوْعًا بِالْاٰذَانِ وَكُلُّ ذٰلِكَ مِنْ سِمَاتِ الْحُدُوْثِ بِالضَّرُوْرَةِ فَاَشَارَ اِلَى الْجَوَابِ بِقَوْلِهِ وَهُوَ اَىِ الْقُرْاٰنُ الَّذِىْ كَلَامُ اللّٰهِ تَعَالٰى مَكْتُوْبٌ فِىْ مَصَاحِفِنَا اَىْ بِاَشْكَالِ الْكِتَابَةِ وَصُوَرِ الْحُرُوْفِ الدَّالَّةِ عَلَيْهِ مَحْفُوْظٌ فِىْ قُلُوْبِنَا اَىْ بِالْفَاظٍ مُخَيَّلَةٍ مَقْرُوٌّ بِاَلْسِنَتِنَا بِحُرُوْفِهِ الْمَلْفُوْظَةِ الْمَسْمُوْعَةِ

مَسْمُوْعٌ بِاٰذَانِنَا بِتِلْكَ اَيْضًا غَيْرُ حَالٍّ فِيْهَا اَىْ مَعَ ذٰلِكَ لَيْسَ حَالًّا فِى الْمَصَاحِفِ وَلَا فِى الْقُلُوْبِ وَلَا فِى الْاَلْسِنَةِ وَلَا فِى الْاٰذَانِ بَلْ هُوَ مَعْنًى قَدِيْمٌ قَائِمٌ بِذَاتِ اللّٰهِ تَعَالٰى يُلْفَظُ وَيُسْمَعُ بِالنَّظْمِ الدَّالِّ عَلَيْهِ وَيُحْفَظُ بِالنَّظْمِ الْمُخَيَّلِ وَيُكْتَبُ بِنُقُوْشٍ وَاَشْكَالٍ مَوْضُوْعَةٍ لِلْحُرُوْفِ الدَّالَّةِ عَلَيْهِ كَمَا يُقَالُ النَّارُ جَوْهَرٌ مُضِيْئٌ مُحَرِّقٌ يُذْكَرُ بِاللَّفْظِ وَيُكْتَبُ بِالْقَلَمِ وَلَايَلْزَمُ مِنْهُ كَوْنُ حَقِيْقَةِ النَّارِ صَوْتًا وَحَرْفًا.

সহজ তরজমা

মুতাযিলাদের সর্বাধিক শক্তিশালী প্রমাণ হল, তোমরা আশ'আরীরা এ ব্যাপারে একমত যে, কুরআন সে কালামের নাম, যেটি মুতাওয়াতিররূপে মুসহাফের (কুরআন কারীমের) দুই কভারের মাঝে হয়ে আমাদের নিকট পৌছেছে। এটা এ সত্যটিকে অবশ্যম্ভাবীরূপে প্রমাণ করে যে, কুরআন মুসহাফে লিখিত, যবানে পঠিত এবং কানে শ্রুত। আর অকাট্যরূপে এসব নতুনত্বের নিদর্শন। অতএব মুসান্নিফ রহ. নিম্নোক্ত উক্তি দ্বারা এ প্রশ্নের জবাবের দিকে ইংগিত করেছেন, সেটি অর্থাৎ কুরআন আল্লাহ তা'আলার কালাম আমাদের মুসহাফে লিখিত অর্থাৎ কালামে ইলাহী বোধক হরফের রূপে এবং লেখার রূপের মাধ্যমে আমাদের অন্তরে সংরক্ষিত, খেয়ালের ভাণ্ডারে সঞ্চিত শব্দের মাধ্যমে, আমাদের মুখে পঠিত হয় এর উচ্চারণ যোগ্য এবং শ্রবণযোগ্য হরফের মাধ্যমে, আমাদের কানে শ্রুত হয় উচ্চারণযোগ্য ও শ্রবণযোগ্য হরফের মাধ্যমে। তদুপরি এগুলোর মধ্যে কুরআন প্রবিষ্ট নয়। অর্থাৎ এত সবের পরও কুরআন মুসহাফের মধ্যে প্রবিষ্ট নয়, না অন্তরে, না যবানে, না কানে। বরং এটি একটি সুপ্রাচীন অর্থ, যেটি আল্লাহর সত্তার সাথে প্রতিষ্ঠিত, এর উচ্চারণ হয় এবং শ্রুত হয় –কালামে নফসী বোধক শব্দের মাধ্যমে, খেয়ালে সঞ্চিত লফযের মাধ্যমে এটাকে সংরক্ষণ করা হয়, এটাকে যেসব শব্দ বুঝায় সে সমস্ত প্রণীত হরফের রূপ এবং নকশার মাধ্যমে এটাকে লেখা হয়। যেমন, বলা হয়– আগুণ একটি উজ্জল জ্বালানি। এ কথাটি শব্দের মাধ্যমে উল্লেখ করা হয়, কলমের মাধ্যমে লেখা হয়। অথচ এতে আগুনের হাকীকত বর্ণ কিংবা শব্দ হওয়া আবশ্যক নয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

মু'তাযিলাদের শক্তিশালী প্রমাণ

قَوْلُهُ : وَمِنْ اَقْوَى الخ ঃ কুরআন সৃষ্ট হওয়ার ব্যাপারে মুতাযিলাদের সর্বাধিক মজবুত দলীল হচ্ছে, আশআরীগণ এ ব্যাপারে এক মত যে, কুরআন এরূপ এক কালামের নাম, যেটি দুই কভারে মাঝে হয়ে মুতাওয়াতিররূপে আমাদের নিকট পৌছেছে। আমরা এ কালাম পাঠ করি, শ্রবণ করি, হিফয করি। আর পাঠ করা, লেখা, শ্রবণ করা, হিফয করা সব কিছুই মাখলূক বা সৃষ্ট। অতএব এগুলোর সাথে গুণান্বিত বস্তু অর্থাৎ কুরআনও সৃষ্ট ও নশ্বর হবে।

এর জবাব হল, কালামে নফসী পঠন, লিখান, হিফয ইত্যাদির সাথে গুণান্বিত হয় রূপক অর্থে। প্রকৃত অর্থে এসব কালামে নফসী বোধক জিনিসের গুণাবলী। অতএব কালামে নফসী মুসহাফে লিখিত হওয়ার অর্থ, কালামে নফসী বোধক হওরফের আকৃতি এবং লেখার চিত্রগুলো লিখে দেওয়া। অনুরূপভাবে অন্তরে হিফয হওয়ার অর্থ, কালামে নফসী বুঝানোর শব্দগুলো হিফয হওয়া, যেগুলো ধারণার ভাণ্ডারে সঞ্চিত। আর পঠিত ও শ্রুত হওয়ার অর্থ, যেসব শব্দ এ কালাম বুঝায়, সেগুলো শ্রুত হওয়া।

قَوْلُهُ: وَلَيْسَ حَالًّا ঃ কালামে নফসী উপরিউক্ত অর্থে লিখিত, পঠিত এবং শ্রুত হওয়া সত্ত্বেও মুসহাফে, অন্তরে, যবানে অথবা কানে প্রবিষ্ঠ হয় না, যদ্দরুন স্থানটি নশ্বর হওয়ার কারণে প্রবেশকারী অর্থাৎ কালামে নফসীর নশ্বরতা আবশ্যক হয়ে পড়ে বরং সে কালামে নফসী হল– এরূপ একটি অর্থ, যেটি সুপ্রাচীন-চিরন্তন ও আল্লাহর সত্তার সাথে প্রতিষ্ঠিত। তা উচ্চারিত এবং শ্রুত হওয়ার অর্থ হচ্ছে, যে শব্দ কালামে নফসী বুঝায়, সেগুলো উচ্চারিত এবং শ্রুত হয়। একে হিফয করলে যে শব্দ কালামে নফসী বুঝায়, তা হিফয হয়, যেটি কল্পনার ভাণ্ডারে সঞ্চিত। আর লেখার ফলে যে সব তৈরী নকশা ও রূপ কলামে নফসী বুঝায়, সেগুলো লিখিত হয়।

قَوْلُهُ : كَمَا يُقَالُ الخ ঃ যেভাবে "আগুন একটি ভস্মকারী উপকরণ" বাক্যটি বলা ও লেখা হয়। আর উচ্চারিত হওয়া ও লিখিত হওয়া স্বর এবং হরফের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এতে যেই প্রকৃত বস্তুটিকে আমরা গুণ বলি, সেটিও স্বর এবং হরফের অন্তর্ভূক্ত হওয়া আবশ্যক হয় না। কারণ, সেই হাকীকতকে উচ্চারণও করা যায় না; লেখাও যায় না বরং যে শব্দটি আগুন বুঝায়, সে শব্দটিকেই উচ্চারণ করা হয় এবং লেখা হয়। এমনিভাবে কালামে নফসী স্বয়ং লিখিত অথবা পঠিত হয় না বরং যে শব্দাবলি কালামে নফসী বুঝায়, সে শব্দ লিখিত এবং পঠিত হয়। আর دال বা নির্দেশক শব্দাবলি লিখিত এবং পঠিত হওয়ার দ্বারা مَدْلُول (অর্থ) তথা কালামে নফসী লিখিত এবং পঠিত হওয়া আবশ্যক নয়। মোটকথা, আশআরীদের পক্ষ থেকে কালামে নফসীকে লিখিত, পঠিত এবং শ্রুত বলা وَصْفُ الْمَدْلُولِ بِصِفَةِ الدَّالِ এর অন্তর্ভুক্ত।

قَوْلُهُ : دُفَّتَى الْمَصَاحِفِ ঃ এখানে دُفَّتَى শব্দটি মূলতঃ دُفَّتَيْنِ ছিল। অর্থ– পার্শ্ব, বাহু। যেমন– دُفَّتَا الطَّائِرِ বলা হয়, পাখীর দুই ডানাকে। কেননা তা দুই বাহুতে থাকে। আর دُفَّتَا الْمُصْحَفِ দ্বারা উদ্দেশ্য, দুই পাশের গাঁথুনি অথবা এ ধরনের মোটা কাভার ইত্যাদি। যেগুলো গ্রন্থাবলীর পাতা সংরক্ষণের জন্য কিতাবের দুই পাশে লাগানো হয়। مُصْحَفٌ ঃ বাইণ্ডিংকৃত পাতাগুলো, যাতে কুরআন লিপিবদ্ধ হয়েছে।

وَتَحْقِيْقُهُ أَنَّ لِلشَّيْءِ وُجُوْدًا فِى الْأَعْيَانِ وَوُجُوْدًا فِى الْأَذْهَانِ وَوُجُوْدًا فِى الْعِبَارَةِ وَوُجُوْدًا فِى الْكِتَابَةِ فَالْكِتَابَةُ تَدُلُّ عَلَى الْعِبَارَةِ وَهِىَ عَلَى مَافِى الْأَذْهَانِ وَهُوَ عَلَى مَا فِى الْأَعْيَانِ فَحَيْثُ يُوْصَفُ الْقُرْآنُ بِمَا هُوَ مِنْ لَوَازِمِ الْقَدِيْمِ كَمَا فِىْ قَوْلِنَا اَلْقُرْآنُ غَيْرُ مَخْلُوْقٍ فَالْمُرَادُ حَقِيْقَتُهُ الْمَوْجُوْدَةُ فِى الْخَارِجِ وَحَيْثُ يُوْصَفُ بِمَا هُوَ مِنْ لَوَازِمِ الْمَخْلُوْقَاتِ وَالْمُحْدَثَاتِ يُرَادُ بِهِ الْأَلْفَاظُ الْمَنْطُوْقَةُ الْمَسْمُوْعَةُ كَمَا فِىْ قَوْلِنَا قَرَأْتُ نِصْفَ الْقُرْآنِ أَوِ الْمُخَيَّلَةُ كَمَا فِى قَوْلِنَا حَفِظْتُ الْقُرْآنَ أَوْ يُرَادُ بِهِ الْأَشْكَالُ الْمَنْقُوْشَةُ كَمَا فِى قَوْلِنَا يَحْرُمُ لِلْمُحْدِثِ مَسُّ الْقُرْآنِ.

সহজ তরজমা

উপরিউক্ত উত্তরটির তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ হচ্ছে, বস্তুর একটি অস্তিত্ব বাস্তব, আরেকটি আত্মিক,একটি অস্তিত্ব আক্ষরিক এবং আরেকটি অস্তিত্ব থাকে লৈখিক। অতএব লিখনী ভাষা বুঝায়, ইবারত আত্মিক অস্তিত্ব বুঝায় আর আত্মিক অস্তিত্ব বুঝায় (তার) বাস্তব অস্তিত্ব। কাজেই যেখানে কুরআনের এমন কোন গুণ বর্ণনা করা হবে, যেটি সুপ্রাচীন বস্তুর জন্য আবশ্যক। যেমন, আমাদের উক্তি اَلْقُرْآنُ غَيْرُ مَخْلُوْقٍ এর মধ্যে। সুতরাং সেখানে এর এরূপ একটি হাকীকত উদ্দেশ্য, যেটি বাস্তবে বিদ্যমান। আর যেখানে এরূপ কোন সিফাত বর্ণনা করা হয়, যেটি সৃষ্টি এবং নশ্বর জিনিসের আবশ্যকীয় বিষয়াবলীর অন্তর্ভুক্ত, তদ্বারা সে সব শব্দ উদ্দেশ্য, যেগুলো ব্যক্ত করা হয়, শ্রুত হয়। যেমন– আমাদের উক্তি قَرَأْتُ نِصْفَ الْقُرْآنِ (আমি কুরআনের অর্ধাংশ পাঠ করেছি।) অথবা কাল্পনিক শব্দাবলী উদ্দেশ্য হবে। যেমন, আমাদের উক্তি حَفِظْتُ الْقُرْآنَ (আমি কুরআন হিফয করেছি।) এর মধ্যে অথবা এর দ্বারা অঙ্কিতরূপ উদ্দেশ্য হবে। যেমন, আমাদের উক্তি يَحْرُمُ لِلْمُحْدِثِ مَسُّ الْقُرْآنِ (অযু বিহীন লোকের জন্য কুরআন স্পর্শ করা হারাম) এর মধ্যে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

উপরিউক্ত জবাবের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ: وَتَحْقِيْقُهُ ঃ এখানে উপরিউক্ত উত্তরের তাত্তিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অর্থাৎ বস্তুর বিভিন্ন প্রকার অস্তিত্ব থাকে। সে সব বিচিত্র অস্তিত্বের দিকে লক্ষ্য করে বস্তুর উপর বিভিন্ন হুকুম আরোপিত হয়। যেমন, বস্তুর একটি অস্তিত্ব থাকে বাস্তব। সেটি সর্বাবস্থায়ই অস্তিত্ববান থাকে। চাই সেটি কেউ কল্পনা করুক বা না করুক। কেউ তাকে মানুক বা না মানুক। অর্থাৎ বাস্তব অস্তিত্ব কল্পনাকারীর কল্পনা অথবা স্বীকৃতি দানকারীর স্বীকৃতি অথবা লেখকের লেখা, কথকের কথার উপর নির্ভরশীল নয়। দ্বিতীয়তঃ আত্মিক ও মানসিক অস্তিত্ব। যেমন, তার কোন রূপ মেধা-মননে বিদ্যমান আছে। তৃতীয়তঃ শাব্দিক অস্তিত্ব। অর্থাৎ কোন একটি জিনিস বুঝানোর জন্য প্রণীত

শব্দটি মুখে উচ্চারণ করা। চতুর্থ, লিখিত অস্তিত্ব। অর্থাৎ উক্ত বস্তুটি বুঝানোর জন্য প্রণীত শব্দটি কোন কিছুর উপর লিখিত হওয়া ইত্যাদি। এরূপভাবে কালামের বিভিন্ন অস্তিত্ব রয়েছে। সেগুলোর দিকে লক্ষ্য করে বিভিন্ন হুকুম আরোপিত হয়। যেমন– যেখানে কুরআনের এরূপ কোন গুণ বর্ণনা করা হবে, যেগুলো সুপ্রাচীন-চিরন্তন বস্তুর জন্য আবশ্যকীয়। যেমন, আমাদের উক্তি اَلْقُرْآنُ غَيْرُ مَخْلُوْقٍ এর মধ্যে –সেখানে কালামের বাস্তব অস্তিত্ব উদ্দেশ্য হবে। সেটি হচ্ছে কালামে নফসী। আর যেখানে এরূপ কোন গুণ বর্ণনা করা হবে, যেটি সৃষ্টের জন্য অবশ্যকীয়, সেখানে শাব্দিক অস্তিত্ব উদ্দেশ্য হবে। যেমন, আমাদের উক্তি قَرَأْتُ نِصْفَ الْقُرْآنِ এর মধ্যে অথবা মেধাগত অস্তিত্ব তথা কল্পনার ভাণ্ডারে সঞ্চিত শব্দ উদ্দেশ্য হবে। যেমন, আমাদের উক্তি حَفِظْتُ الْقُرْآنَ এর মধ্যে। অথবা লিখিত অস্তিত্ব অর্থাৎ চিত্রিতরূপ উদ্দেশ্য হবে। যেমন, আমাদের উক্তি يَحْرُمُ لِلْمُحْدِثِ مَسُّ الْقُرْآنِ এর মধ্যে কুরআন দ্বারা লিখিত চিত্র উদ্দেশ্য। উক্ত চারটি অস্তিত্বের মধ্যে বাস্তব অস্তিত্ব হল, প্রকৃত ও মৌলিক; বাকী তিনটি রূপক।

وَلَمَّا كَانَ دَلِيْلُ الْاَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ هُوَ اللَّفْظُ دُوْنَ الْمَعْنٰى الْقَدِيْمُ عَرَّفَهُ اَئِمَّةُ الْاُصُوْلِ بِالْمَكْتُوْبِ فِى الْمَصَاحِفِ الْمَنْقُوْلِ بِالتَّوَاتُرِ وَجَعَلُوْهُ اِسْمًا لِلنَّظْمِ وَالْمَعْنٰى جَمِيْعًا اَىْ لِلنَّظْمِ مِنْ حَيْثُ الدَّلَالَةِ عَلَى الْمَعْنٰى لَا لِمُجَرَّدِ الْمَعْنٰى وَاَمَّا الْكَلَامُ الْقَدِيْمُ الَّذِىْ هُوَ صِفَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى فَذَهَبَ الْاَشْعَرِىُّ اِلٰى اَنَّهٗ يَجُوْزُ اَنْ يَسْمَعَهٗ وَمَنَعَهُ الْاُسْتَاذُ اَبُوْ اِسْحٰقَ الْاِسْفَرَايِنِىُّ وَهُوَ اِخْتِيَارُ الشَّيْخِ اَبِىْ مَنْصُوْرِ الْمَاتُرِيْدِىِّ فَمَعْنٰى قَوْلِهٖ تَعَالٰى حَتّٰى يَسْمَعَ كَلَامَ اللّٰهِ مَايَدُلُّ عَلَيْهِ كَمَا يُقَالُ سَمِعْتُ عِلْمَ فُلَانٍ فَمُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ سَمِعَ صَوْتًا دَالًّا عَلٰى كَلَامِ اللّٰهِ تَعَالٰى لٰكِنْ لَمَّا كَانَ بِلَاوَاسِطَةِ الْكِتَابِ وَالْمَلَكِ خُصَّ بِاسْمِ الْكَلِيْمِ .

সহজ তরজমা

আর যেহেতু শরঈ বিধি-বিধানের দলীল শুধু শব্দ; مَعْنٰى قَدِيْم নয়, তাই উসূলবিদগণ اَلْمَكْتُوْبُ فِى الْمَصَاحِفِ الْمَنْقُوْل শব্দ দ্বারা এর সংজ্ঞা দিয়েছেন এবং লফয ও مَعْنٰى উভয়টির নাম রেখেছেন কুরআন অর্থাৎ শব্দের নাম (দিয়েছেন কুরআন) অর্থ বুঝানো হিসাবে; নিছক অর্থের নাম নয়। অবশ্য كَلَامُ قَدِيْم যেটি আল্লাহর সিফাত, আশ'আরীর মাযহাব মতে সেটা শ্রুত হওয়া সম্ভব। পক্ষান্তরে উস্তাদ আবু ইসহাক তা অস্বীকার করেছেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার বাণী حَتّٰى يَسْمَعَ كَلَامَ اللّٰه এর অর্থ হবে– সেসব শব্দ শোনা, যেটি আল্লাহর কালাম বুঝায়। যেমন, বলা হয়– আমি অমুকের ইলম শুনেছি। কাজেই মূসা (আ.) সে বাণী শ্রবণ করেছেন, যেটি আল্লাহর বাণী বুঝাত। কিন্তু ছিল এ শ্রবণ কিতাব ও ফিরিশতার মাধ্যম ব্যতিত, বিধায় كَلِيْم উপাধিটি তার বৈশিষ্ট্য হয়ে গেল।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

কুরআন কি মুশতারাকে লফযী

قَوْلُهٗ : وَلَمَّا كَانَ ঃ এটি একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব। প্রশ্ন হল, কুরআন যদি مُشْتَرِك لَفْظِى হত আর এ কারণে কুরআন কালামে লফযী এবং কালামে নফসীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ হত, তাহলে উসূলে ফিকহবিদগণ কুরআনের এরূপ সংজ্ঞা দিতেন না, যেটি কেবল কালামে লফযীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়। অথচ তারা কুরআনের সংজ্ঞা দিয়েছেন, اَلْمَكْتُوْبُ فِى الْمَصَاحِفِ الْمَنْقُوْلِ بِالتَّوَاتُرِ শব্দ দ্বারা। অথচ সংজ্ঞাটি কালামে লফযীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়। বুঝা গেল, কুরআন নিছক কালামে লফযীর নাম। উভয়টির মাঝে مُشْتَرَك নয়। একে প্রতিটির জন্য আলাদাভাবে শব্দটি প্রণয়নও করা হয়নি।

এর জবাব হল, আহকামে শরইয়্যাহ যেমন ওয়াজিব হওয়া, হারাম হওয়া ইত্যাদির দলীল কেবল শব্দাবলী। সে মতে তাদের নিকট শব্দাবলীই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। ফলে তারা কুরআনের সংজ্ঞায় اَلْمَكْتُوْبُ... الخ এর মত শব্দাবলী চয়ন করেছেন। যেগুলো কেবল কালামে লফযীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। তারা শুধু অর্থকেই কুরআন সাব্যস্ত করেননি বরং শব্দ ও অর্থ উভয়টির সমষ্টিকে কুরআন সাব্যস্ত করেছেন।

শ্রুত হওয়া কি নশ্বরতার বৈশিষ্ট্য

قَوْلُهُ : وَاَمَّا الْكَلَامُ الْقَدِيْمُ الخ ঃ ইতোপূর্বে শারেহ রহ. বলেছিলেন, যেখানে কুরআনের এরূপ কোন গুণ উল্লেখ করা হবে, যেগুলো নশ্বরতার জন্য আবশ্যকীয়, সেখানে তদ্বারা কালামে লফযী উদ্দেশ্য হবে। এখানে শারেহ রহ. বলতে চান, শ্রুত হওয়া নশ্বরতার জন্য অবশ্যকীয় বিষয়াবলীর অন্তর্ভুক্ত কি না? যাতে প্রথম সুরাতে যেখানে কুরআনকে শ্রুত বলা হয়েছে, সেখানে এর দ্বারা কালামে লফযী আর দ্বিতীয় সুরাতে কালামে নফসী উদ্দেশ্য হয়। সুতরাং তিনি এ প্রসঙ্গে মতানৈক্যের আলোচনা করেছেন।

শায়খ আবুল হাসান আশ'আরী রহ. এর মতে সুপ্রাচীন কালাম অর্থাৎ কালামে নফসী তথা আল্লাহ তা'আলার কালাম এবং আল্লাহর সত্তার সাথে প্রতিষ্ঠিত, তাতে স্বর নেই বটে; তথাপি অলৌকিকভাবে তা শ্রুত হওয়া সম্ভব। যেরূপভাবে কিয়ামতের দিন ঈমানদারগণ আল্লাহ তা'আলার কোন আকার-আকৃতি ও রূপ না থাকা সত্ত্বেও দুনিয়ার সম্পূর্ণ বিপরীত অলৌকিকভাবে দর্শন করবেন। এ মাযহাব মতে শ্রুত হওয়া নশ্বরতার জন্য আবশ্যকীয় বিষয়াবলীর মধ্যে গণ্য হবে না বরং নশ্বর ও অবিনশ্বর এর মাঝে যৌথ একটি গুণ হবে। সুতরাং যে কালাম শ্রবণের গুণে গুণান্বিত হবে, তদ্বারা কালামে নফসীও উদ্দেশ্য হতে পারে। যেমন, حَتّٰى يَسْمَعَ كَلَامَ اللّٰهِ আয়াতে কারীমাটিতে কালামে নফসী উদ্দেশ্য নেওয়া যায়। আবার কালামে লফযী ও উদ্দেশ্য নেওয়া যায়। যেমন, আমাদের উক্তি سَمِعْتُ الْقُرْاٰنَ এর মধ্যে কুরআন দ্বারা কালামে লফযী উদ্দেশ্য।

পক্ষান্তরে উস্তাদ আবু ইসহাক ইসফিরাইনী রহ. সুপ্রাচীন কালাম শ্রুত হওয়া সম্ভব বলে স্বীকার করেন না। কারণ, শ্রবণের যোগ্যতা থাকে স্বরের মধ্যে। আর কালামে নফসী স্বর জাতীয় নয়। এ মতানুসারে শ্রুত হওয়া নশ্বরের অবশ্যকীয় বিষয়াবলীর অন্তর্ভুক্ত হবে এবং যেখানে কালামুল্লাহকে শ্রুত সাব্যস্ত করা হবে, সেখানে তদ্বারা শুধু কালামে লফ্যী উদ্দেশ্য হবে। কাজেই حَتّٰى يَسْمَعَ كَلَامَ اللّٰهِ দ্বারা সে সব শব্দ উদ্দেশ্য হবে, যেগুলো আল্লাহ তা'আলার সিফাতে কালাম অর্থাৎ কালামে নফসী বুঝাবে। যেমন, বাগধারায় মানুষ বলে– "আমি অমুকের ইলম (জ্ঞানগব কথা) শুনেছি" অর্থাৎ আমি তার এরূপ শব্দাবলী শুনেছি, যেগুলো দ্বারা তার জ্ঞান সম্পর্কে ধারণা করা যায়। কেননা জ্ঞান মূলতঃ শ্রবণযোগ্য বস্তু নয়। এরূপভাবে মূসা (আ.) কর্তৃক পাহাড়ে আল্লাহর কালাম শোনার অর্থ, তিনি সে সব শব্দাবলী শুনেছেন, যেগুলো আল্লাহর চিরন্তন কালামে নফসী বুঝায়।

এর উপর প্রশ্ন হয়– তাহলে তো আমরা সবাই কালামে নফসী বুঝানোর মত শব্দ শুনি। কিন্তু কেবল মূসা (আ.) কে কালীম উপাধিতে ভূষিত করা হল কেন? শারেহ রহ. وَلٰكِنِ الخ বলে পরবর্তীতে এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন অর্থাৎ মূসা (আ.) কর্তৃক আল্লাহর কালাম শ্রবণ করা কোন কিতাব কিংবা ফিরিশতার মাধ্যমে ছিল না। এ বৈশিষ্ট্যের কারণে বিষেশভাবে তাঁকেই কালীম উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে।

কে এই উস্তাদ

قَوْلُهُ: وَمَنَعَهُ الْاُسْتَاذُ الخ ঃ কালাম শাস্ত্রবিদদের পরিভাষায় উস্তাদ বলে মুহাম্মদ ইবরাহীম ইসফিরাইনী উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। তিনি ছিলেন শায়খ আবু হাসান আশ'আরীর শিষ্য এবং শায়খ আবুল হাসান রাহেলীর ছাত্র। ১০ই মুহাররম ৪২৮ হিজরীতে নিশাপুরে তাকে সমাহিত করা হয়।

উস্তাদ আবু ইসহাকের মতে কালামে নফসী

قَوْلُهُ : فَمَعْنٰى قَوْلِهٖ حَتّٰى الخ ঃ আবু ইসহাক ইসফিরাইনীর মতে কালামে নফসী শ্রুত হওয়া অসম্ভব। বিধায় حَتّٰى يَسْمَعَ كَلَامَ اللّٰهِ এর মধ্যে كَلَامَ اللّٰهِ দ্বারা কালামে লফযী উদ্দেশ্য হবে; কালামে নফসী নয়। কিন্তু তাই বলে 'কালামে নফসী শ্রুত হওয়া অবৈধ' এরূপ শাখা বের করা নাজায়েয। কেননা এ আয়াতে প্রথম থেকেই "কালামুল্লাহ" দ্বারা কালামে লফযী উদ্দেশ্য হওয়া চূড়ান্ত। চাই কালামে নফসী শ্রুত হওয়া জায়েয হোক, সম্ভব হোক অথবা নাজায়েয-ই হোক। কেননা আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে কাফিরদের সম্পর্কে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلَامَ اللّٰهِ

আর মুশরিক সুনিশ্চিত একমাত্র কালামে লফযী শুনতে পারে। সুতরাং এখানে কালামে লফযী উদ্দেশ্য হওয়াই সুনির্দিষ্ট। কালামে নফসী শ্রুত হওয়া জায়েয বলেন আর নাই-ই বলেন।

فَإِنْ قِيلَ لَوْ كَانَ كَلَامُ اللّٰهِ تَعَالٰى حَقِيْقَةً فِى الْمَعْنَى الْقَدِيْمِ مَجَازًا فِى النَّظْمِ الْمُؤَلَّفِ يَصِحُّ نَفْيُهُ عَنْهُ بِأَنْ يُّقَالَ لَيْسَ النَّظْمُ الْمُنَزَّلُ الْمُعْجِزُ الْمُفَصَّلُ إِلَى السُّوَرِ وَالْاٰيَاتِ كَلَامَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْإِجْمَاعُ عَلٰى خِلَافِهِ وَأَيْضًا اَلْمُعْجِزُ الْمُتَحَدّٰى بِهِ هُوَ كَلَامُ اللّٰهِ تَعَالٰى حَقِيْقَةً مَعَ الْقَطْعِ بِأَنَّ ذٰلِكَ أَنَّمَا يُتَصَوَّرُ فِى النَّظْمِ الْمُؤَلَّفِ الْمُفَصَّلِ إِلَى السُّوَرِ إِذْ لَا مَعْنٰى لِمُعَارَضَةِ الصِّفَةِ الْقَدِيْمَةِ قُلْنَا اَلتَّحْقِيْقُ أَنَّ كَلَامَ اللّٰهِ تَعَالٰى إِسْمٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْكَلَامِ النَّفْسِيِّ الْقَدِيْمِ وَمَعْنَى الْإِضَافَةِ كَوْنُهُ صِفَةً لَهُ تَعَالٰى وَبَيْنَ اللَّفْظِيِّ الْحَادِثِ الْمُؤَلَّفِ مِنَ السُّوَرِ وَالْاٰيَاتِ وَمَعْنَى الْإِضَافَةِ أَنَّهُ مَخْلُوْقُ اللّٰهِ تَعَالٰى لَيْسَ مِنْ تَالِيْفَاتِ الْمَخْلُوْقِيْنَ فَلَا يَصِحُّ النَّفْىُ أَصْلًا وَلَا يَكُوْنُ الْإِعْجَازُ وَالتَّحَدِّىْ إِلَّا فِىْ كَلَامِ اللّٰهِ تَعَالٰى.

সহজ তরজমা

সুতরাং যদি প্রশ্ন করা হয়, কালামুল্লাহর প্রকৃত অর্থ যদি مَعْنٰى قَدِيْم অর্থাৎ كَلَام نَفْسِى হয় এবং শব্দ হয় তার রূপক অর্থ, তাহলে গঠিত শব্দ হতে কালামুল্লাহকে নাকচ করা বিশুদ্ধ হওয়া উচিৎ। অর্থাৎ এমন বলা যে, নাযিলকৃত শব্দ ও ইবারত যা মুজিযা এবং আয়াত ও সূরাসমূহে বিভক্ত, তা কালামুল্লাহ নয়। অথচ এর বিপরীত ইজমা রয়েছে। তাছাড়া আল্লাহ তা'আলার মূল কালাম হল, মুজিযা এবং চালেঞ্জজকৃত। কিন্তু চিরন্তন সত্য হল, মুজিযা ও চ্যালেঞ্জকৃত হওয়া ঐ যুক্ত শব্দের ব্যাপারেই কল্পনা করা যায়, যা বিভিন্ন সূরায় বিভক্ত। কেননা প্রাচীন গুণাবলীর সাথে মুকাবিলা করার কোন অর্থই হয় না। আমরা জবাব দিব, কালামুল্লাহ শব্দটি مُشْتَرَك কালামে نَفْسِى قَدِيْم (তখন كَلَام শব্দটি আল্লাহর দিকে إِضَافَت হওয়ার অর্থ দাঁড়াবে, এটি আল্লাহ তা'আলার সিফাত বা গুণ) এবং ঐ কালামে لَفْظِى حَادِث এর মাঝে, যা বিভিন্ন সূরায় বিভক্ত ও আয়াতসমূহ দ্বারা সুবিন্যস্ত। তখন আল্লাহর দিকে كَلَام এর إِضَافَت এর অর্থ দাঁড়াবে, উক্ত কালাম আল্লাহ ত'আলার মাখলূক বা সৃষ্ট। আর মাখলূক বান্দাদের সৃষ্ট নয়। কাজেই একে (কালামুল্লাহ হতে) অস্বীকার করা মোটেই শুদ্ধ হবে না। আর অলৌকিকত্ব ও চ্যালেঞ্জ কেবল কালামুল্লাহর ক্ষেত্রেই হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

কালামে লফযীকে কালামের রূপক অর্থ বলে অস্বীকার করা ঃ ইতোপূর্বে মুসান্নিফ রহ. যে কালাম আল্লাহর প্রকৃত সিফাত, তার ব্যাপারে বলে এসেছেন, لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الْحُرُوْف। এতে বুঝা যায়, শব্দ ও অক্ষর জাতীয় যুক্ত শব্দাবলি আসল কালামুল্লাহ নয় বরং তাকে রূপকার্থে কালামুল্লাহ বলা হয়। এমনিভাবে ইতোপূর্বে শারিহ রহ. বলেছিলেন, بَلْ هُوَ مَعْنٰى قَدِيْم قَائِمٌ بِذَاتِ اللّٰهِ تَعَالٰى। এতে বুঝা যায়, কালামুল্লাহ মূলতঃ كَلَام نَفْسِى কদীমকেই বলে, আর যুক্ত শব্দাবলীকে কালামুল্লাহ বলা হয় রূপকার্থে।

এর উপর প্রশ্ন উঠে যে, শব্দকে তার রূপক অর্থ হতে অস্বীকার করা জায়েয। যেমন বাঘ এর রূপক অর্থ বীরপুরুষ। সুতরাং বীরপুরুষ হতে বাঘকে অস্বীকার করা জায়েয। বিধায় বীরপুরুষ বাঘ নয় বরং মানুষ এরূপ বলাও জায়েয হবে। এমনিভাবে কালাম শব্দটি যদি كَلَام نَفْسِى قَدِيْم এর অর্থে প্রকৃত হয় এবং যুক্তশব্দ অর্থাৎ কালামে لَفْظِى এর ক্ষেত্রে রূপক হয়, তাহলে যুক্তশব্দ যা কালাম এর রূপক অর্থ এটাকে অস্বীকার করা এবং যুক্ত শব্দ কালামুল্লাহ নয় বলাও জায়েয হত। কিন্তু تَالِى অর্থাৎ যুক্তশব্দকে কালামুল্লাহ হতে অস্বীকার করা বাতিল। কেননা যুক্ত শব্দ কালামুল্লাহ হওয়ার ব্যাপারে উম্মতের ইজমা রয়েছে। সুতরাং মুকদ্দমও তদ্রূপ হবে অর্থাৎ কালামুল্লাহ শব্দটি كَلَام نَفْسِى قَدِيْم এর অর্থে حَقِيْقَت হওয়া এবং যুক্ত শব্দের অর্থে مَجَاز হওয়াও বাতিল।

প্রশ্নের বিবরণ

قَوْلُهُ : اَيْضًا اَلْمُعْجِزُ الْمُتَحَدّٰى بِه ঃ উক্ত প্রশ্নের সারমর্ম হল, কালামুল্লাহ শব্দটি যুক্তশব্দের অর্থে রূপক হওয়া ইজমা বিরোধী হওয়াকে আবশ্যক করায় বাতিল। বিশদ বিবরণে বলা যায়, আল্লাহ তা'আলা কালামুল্লাহর মুকাবিলা করা ও তার সাদৃশ রচনা করে আনার চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করেছেন। সুতরাং যখন তার মুকাবিলা করতে ও

তার সাদৃশ কালাম রচনা করতে অক্ষম এবং অপারগ হবে, তখন এটি আল্লাহর কালাম হওয়ার ব্যাপারে তাদের সংশয়-সন্দেহ এবং তা মানুষের কালাম হওয়ার ধারণাও দূরীভূত হয়ে যাবে। আর কাফিরদের সন্দেহ ছিল যুক্ত শব্দাবলীর ব্যাপারেই অর্থাৎ তা আল্লাহ কালাম কি না? কাজেই চ্যালেঞ্জও যুক্ত শব্দবলীর বেলায়ই হবে এবং যুক্ত শব্দাবলীর সাথেই মোকাবিলা করার আদেশ হবে। কেননা صِفَات قَدِيْمَة (প্রাচীন গুণ) এর সাথে মুকাবিলার হুকুম দেওয়ার অর্থ দাঁড়ায়, তোমরা নিজেদের মধ্যে ঐ صِفَت قَدِيْمَة (প্রাচীনগুণ) এর সাদৃশ তৈরী কর। আর এটা তো অসাধ্য বস্তুর নির্দেশ, যা বৈধ নয়। সুতরাং صِفَت قَدِيْمَة এর সাথে মুকাবিলা করার কোন অর্থ নেই। মোটকথা, এ চ্যালেঞ্জ যুক্ত শব্দাবলীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সুতরাং কালামুল্লাহ যদি যুক্ত শব্দের বেলায় রূপক হয়, তাহলে তো চ্যালেঞ্জকৃত কালামুল্লাহও রূপক হওয়া আবশ্যক। অথচ তা ইজমা বিরোধী। কেননা اَلْمُعْجِزُ اَلْمُتَحَدّٰى بِه كَلَامُ اللّٰهِ حَقِيْقَة। তথা চ্যালেঞ্জকৃত কালামুল্লাহ হল, প্রকৃত কালামুল্লাহ; রূপক কালামুল্লাহ নয় –এর উপর উম্মতের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কাজেই কালামুল্লাহ যুক্ত শব্দের অর্থে রূপক হওয়া ইজমা বিরোধী হওয়াকে আবশ্যক করায় বাতিল।

আমাদের জবাব ঃ

قَوْلُهٗ قُلْنَا ঃ উত্তরের সারমর্ম হল, কালামুল্লাহ যুক্তশব্দ এবং কালামে লফযী এর অর্থে রূপক নয়। কালামুল্লাহ শব্দটি مَعْنٰى قَدِيْم অর্থাৎ কালামে নফসী এবং কালামে লফ্যীর মাঝে مُشْتَرِك لَفْظِى আর مُشْتَرِك لَفْظِى এর সকল অর্থেই حَقِيْقَت হয়। কাজেই كَلَام لَفْظِى এবং كَلَام نَفْسِى উভয়টি কালামুল্লাহ হবে। সুতরাং যখন كَلَام نَفْسِى এর মত كَلَام لَفْظِى কালামুল্লাহর حَقِيْقِى অর্থ হল, তখন كَلَام لَفْظِى হতে কালামুল্লাহর نَفِى করা (কালামুল্লাহ নয় বলা) জায়েয হবে না। কেননা শব্দকে তার حَقِيْقِى অর্থ হতে نَفِى করা যায় না। কাজেই কালামে লফ্যী প্রকৃত কালামুল্লাহ হওয়ায় চ্যালেঞ্জ প্রকৃত কালামুল্লাহর সাথেই হল, যার উপর ইজমা হয়েছে। অবশ্য যখন কালামুল্লাহ দ্বারা كَلَام نَفْسِى উদ্দেশ্য হবে, যা আল্লাহ তা'আলার গুণ তখন আল্লাহ তা'আলার দিকে كَلَام এর এযাফতটি اِضَافَةُ الصِّفَةِ اِلَى الْمَوْصُوْف জাতীয় হবে। আর কালামুল্লাহর অর্থ হবে– ঐ কালাম, যা আল্লাহ তা'আলার গুণ অর্থাৎ কালামে নফসী। আর যখন কালামে লফযী উদ্দেশ্য হবে তখন আল্লাহ তা'আলার দিকে কালামের এযাফতটি اِضَافَةُ الْمَخْلُوْقِ اِلَى الْخَالِق জাতীয় হবে এবং কালামুল্লাহ এর অর্থ হবে– ঐ কালাম, যা আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট, বান্দাগণের তৈরী নয় অর্থাৎ ঐ কালামে লফযী যা রাসূল ﷺ এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে।

وَمَا وَقَعَ فِىْ عِبَارَةِ بَعْضِ الْمَشَائِخِ مِنْ اَنَّهٗ مَجَازٌ فَلَيْسَ مَعْنَاهُ اَنَّهٗ غَيْرُ مَوْضُوْعٍ لِلنَّظْمِ الْمُؤَلَّفِ بَلْ اَنَّ الْكَلَامَ فِى التَّحْقِيْقِ وَبِالذَّاتِ لِلْمَعْنَى الْقَائِمِ بِالنَّفْسِ وَتَسْمِيَةُ اللَّفْظِ بِهٖ وَوَضْعُهٗ لِذٰلِكَ اِنَّمَا هُوَ بِاعْتِبَارِ دَلَالَتِهٖ عَلَى الْمَعْنٰى فَلَا نِزَاعَ لَهُمْ فِى الْوَضْعِ وَالتَّسْمِيَةِ .

সহজ তরজমা

আর কোন কোন মাশায়িখের চয়িত বাক্যে উদ্ধৃত হয়েছে যে, যুক্তশব্দ রূপকার্থে কালামুল্লাহ। এর অর্থ এই নয় যে, কালামুল্লাহ শব্দকে যুক্তশব্দের জন্য গঠন করা হয়নি বরং উদ্দেশ্য হল, কালাম মূলতঃ ঐ مَعْنٰى কে বলে, যা ذَات এর সাথে প্রতিষ্ঠিত। আর لَفْظ কে কালাম বলে অভিহিত করা এবং কালামকে لَفْظ এর জন্য গঠন করা শুধু এই অর্থে যে, সেটি ঐ অর্থ বুঝায়। সুতরাং মাশায়িখগণ কর্তৃক যুক্তশব্দের জন্য কালামুল্লাহকে গঠন করা এবং তাকে কালামুল্লাহ নামে অভিহিত করার মাঝে কোন বিরোধ নেই।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

কালামে লফযী রূপকার্থে কালামুল্লাহ ? ঃ এটি একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্নটি হল, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতপন্থী কোন কোন মাশায়িখ যুক্ত শব্দকে রূপকার্থে কালামুল্লাহ সাব্যস্ত করেছেন। তথাপি আপনি কিভাবে বলেন, কালামুল্লাহ "কালামে নফসী ও যুক্ত শব্দ" অর্থে مُشْتَرِك لَفْظِى এবং দুটিই প্রকৃত কালামুল্লাহ? উত্তরের সারমর্ম হল, مُجَاز শব্দটি اِشْتِرَاك لَفْظِى হিসেবে দু অর্থে ব্যবহৃত হয়। (১) ঐ শব্দ যা مَعْنٰى غَيْر مَوْضُوْع لَهٗ তথা যে অর্থের জন্য গঠিত নয়, সে অর্থে ব্যবহৃত হয়। (২) ঐ শব্দ যাকে কোন অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে কিন্তু তা কোন সম্পর্ক থাকায় গঠন করা হয়েছে। সুতরাং মাশায়িখগণ কালামুল্লাহকে যুক্ত শব্দাবলীর

(কালামে লফযী) অর্থে যে مَجَاز বলেছেন। তার অর্থ এই নয় যে, কালামুল্লাহ কালামে লফযীর জন্য গঠন করা হয়নি এবং কালামে লফযী বা যুক্ত শব্দাবলী তার غَيْر مَوْضُوع لَهُ বা অপ্রণীত অর্থ বরং তারা দ্বিতীয় অর্থে مَجَاز বলেছেন অর্থাৎ কালামুল্লাহকে কালামে নফসীর জন্য প্রত্যক্ষভাবে ও সরাসরি গঠন করা হয়েছে। আর যুক্ত শব্দাবলীর জন্য এ কারণে গঠন করা হয়েছে যে, যুক্ত শব্দাবলী কালামে নফসী قَدِيْم এর উপর ইংগিতবহ। এতে বুঝা গেল, যুক্ত শব্দাবলী ও কালামে নফসীকে কালামুল্লাহ বলা এবং তার জন্য কালামুল্লাহ শব্দকে গঠন করাতে কোন বিরোধ নেই। কাজেই যখন কালামুল্লাহ শব্দটি مَعْنَى قَدِيْم এবং যুক্ত শব্দ উভয়টির জন্য গঠিত। তখন উভয়টিই তার مَعْنَى مَوْضُوع لَهُ হল। আর مَعْنَى مَوْضُوع لَهُ বা শব্দের অর্থকেই حَقِيْقَت বলে। অতএব مَعْنَى قَدِيْم অর্থাৎ কালামে নফসী এবং যুক্ত শব্দ উভয়টি কালামুল্লাহর حَقِيْقِى অর্থ হবে। তবে কথা হল, দ্বিতীয় حَقِيْقِى অর্থ তথা কালামে নফসীর সাথে دَال হওয়ার সম্পর্ক বিদ্যমান। যেমনিভাবে مَعْنَى حَقِيْقِى এর সাথে مَعْنَى مَجَازِى এর دَال এবং مَدْلُوْل হওয়া অথবা سَبَب ও مُسَبَّب হওয়ার সম্পর্ক থাকে। এ কারণে দ্বিতীয় حَقِيْقِى অর্থটি তথা যুক্ত শব্দ مَجَاز এর মত হয়ে গেছে। مَجَاز এর সাথে সাদৃশ্যতা থাকায় কোন কোন মাশায়িখ যুক্ত শব্দকে রূপকার্থে কালামুল্লাহ বলে দিয়েছেন।

وَذَهَبَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِيْنَ اِلٰى اَنَّ الْمَعْنٰى فِىْ قَوْلِ مَشَائِخِنَا كَلَامُ اللّٰهِ تَعَالٰى مَعْنًى قَدِيْمٌ لَيْسَ فِىْ مُقَابَلَةِ اللَّفْظِ حَتّٰى يُرَادَ بِهٖ مَدْلُوْلُ اللَّفْظِ وَمَفْهُوْمُهٗ بَلْ فِىْ مُقَابَلَةِ الْعَيْنِ وَالْمُرَادُ بِهٖ مَالَا يَقُوْمُ بِذَاتِهٖ كَسَائِرِ الصِّفَاتِ وَمُرَادُهُمْ اَنَّ الْقُرْاٰنَ اِسْمٌ لِلَّفْظِ وَالْمَعْنٰى شَامِلٌ لَهُمَا وَهُوَ قَدِيْمٌ لَا كَمَا زَعَمَتِ الْحَنَابِلَةُ مِنْ قِدَمِ النَّظْمِ الْمُؤَلَّفِ الْمُرَتَّبِ الْاَجْزَاءِ فَاِنَّهٗ بَدِيْهِىُّ الْاِسْتِحَالَةِ لِلْقَطْعِ بِاَنَّهٗ لَايُمْكِنُ التَّلَفُّظُ بِالسِّيْنِ مِنْ بِسْمِ اللّٰهِ اِلَّا بَعْدَ التَّلَفُّظِ بِالْبَاءِ بَلِ الْمَعْنٰى اَنَّ اللَّفْظَ الْقَائِمَ بِالنَّفْسِ لَيْسَ مُرَتَّبَ الْاَجْزَاءِ فِىْ نَفْسِهٖ كَالْقَائِمِ بِنَفْسِ الْحَافِظِ مِنْ غَيْرِ تَرَتُّبِ الْاَجْزَاءِ وَتَقَدُّمِ الْبَعْضِ عَلَى الْبَعْضِ وَالتَّرَتُّبُ اِنَّمَا يَحْصُلُ فِى التَّلَفُّظِ وَالْقِرَاءَةِ لِعَدَمِ مُسَاعَدَةِ الْاٰلَةِ وَهٰذَا مَعْنٰى قَوْلِهِمُ الْمَقْرُوُّ قَدِيْمٌ وَالْقِرَاءَةُ حَادِثَةٌ وَاَمَّا الْقَائِمُ بِذَاتِ اللّٰهِ تَعَالٰى فَلَا تَرَتُّبَ فِيْهِ حَتّٰى اَنَّ مَنْ سَمِعَ كَلَامَهٗ تَعَالٰى سَمِعَهٗ غَيْرَ مُرَتَّبِ الْاَجْزَاءِ لِعَدَمِ اِحْتِيَاجِهٖ اِلَى الْاٰلَةِ هٰذَا حَاصِلُ كَلَامِهٖ.

সহজ তরজমা

কোন কোন মুহাক্কিক বলেছেন, আমাদের মাশায়িখদের উক্তি "কালামুল্লাহ একটি مَعْنَى قَدِيْم" এ অর্থ لَفْظ এর বিপরীত নয় যে, তাতে لَفْظ এর مَدْلُوْل উদ্দেশ্য করা হবে বরং عَيْن এর বিপরীত। এর দ্বারা উদ্দেশ্য, সে সব জিনিস যা স্বধিষ্ঠ নয়। যেমন, অন্যান্য গুণাবলী। আর তাদের উদ্দেশ্য হল, لَفْظ ও مَعْنَى উভয়কেই কুরআন বলে, উভয়টি এর অন্তর্ভুক্ত এবং তা কদীম। তবে তদ্রূপ নয়, যেরূপ হাম্বলীগণ বলেন অর্থাৎ এ বিন্যস্ত অংশরূপে যুক্ত শব্দ যা সাজানো অংশ বিশিষ্ট, সেটি কদীম। কেননা এটা অসম্ভব হওয়া তো সুস্পষ্ট। তাছাড়া এটাও নিশ্চিত যে, بِسْمِ اللّٰه এর সীনের উচ্চারণ "বা" এর উচ্চারণের পরই সম্ভব। বরং উদ্দেশ্য হল, যে শব্দ وَاجِب সত্ত্বার সাথে প্রতিষ্ঠিত, তা মূলতঃ বিন্যস্ত অংশ বিশিষ্ট হয় না। যেমন, ঐ শব্দ যা حَافِظ এর সত্ত্বার সাথে অংশ সমূহের ধারাবাহিকতা ও একটি অপরটির আগে পরে হওয়া ছাড়াই প্রতিষ্ঠিত। আর ধারাবাহিকতা তো কেবল উচ্চারণের বেলায় হয়। কেননা উচ্চারণ যন্ত্রের সাথে সামঞ্জস্য হয় না।

আর এটাই তাদের সে কথার উদ্দেশ্য তথা পঠিত বস্তু সুপ্রাচীন আর পঠন নশ্বর। মোটকথা, ঐ শব্দ যা আল্লাহর সত্তার সাথে প্রতিষ্ঠিত, তাতে কোন বিন্যাস নেই। এমনকি যে আল্লাহ তা'আলার কালাম শুনেছে, সে অবিন্যস্ত কালাম শুনেছে। কারণ, তিনি উচ্চারণ যন্ত্রের মুখাপেক্ষী নন। এটা ঐ মুহাক্কিকগণের কালামের সারমর্ম।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

দ্বিতীয় উত্তর ঃ কালামে লফযীকে কোন মাশায়িখ রূপকার্থে কালামুল্লাহ বলায় যে প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল, তার একটি উত্তর শারিহ রহ. স্বীয় উক্তি وَمَا وَقَعَ فِىْ عِبَارَةِ بَعْضِ الْمَشَائِخِ এর মাধ্যমে প্রদান করেছেন। এখানে তিনি তার দ্বিতীয় উত্তর মাওয়াকিফ প্রণেতা আল্লামা ইয্যুদ্দীন রহ. এর উক্তির আলোকে দিতে যাচ্ছেন। মাওয়াকিফ প্রণেতার উত্তরের সারমর্ম হল, مَعْنٰى এ ব্যবহার কখনও لَفْظ এর বিপরীত হয় এবং তা দ্বারা لَفْظ এর مَدْلُوْل তথা অর্থ উদ্দেশ্য হয়; হুবহু শব্দ উদ্দেশ্য হয় না। সে মতে لَفْظ ও مَعْنٰى উভয়টির মাঝে বৈপরিত্ব রয়েছে। আবার مَعْنٰى এর ব্যবহার কখনও عَيْن এর বিপরীতে হয়ে থাকে। আর عَيْن বলে স্বাধিষ্ঠ বস্তুকে। সুতরাং তার বিপরীত مَعْنٰى দ্বারা قَائِمٌ بِالْغَيْرِ (অন্যের উপর প্রতিষ্ঠিত) উদ্দেশ্য হবে। শাইখ আশ'আরী রহ. যখন كَلَامُ اللّٰهِ مَعْنٰى قَدِيْم বলেছেন, তখন তার অনুসারীদের অনেকে প্রথম ব্যবহার এর দিকে গিয়েছেন। তারা বুঝেছেন, কালামে নফসীই আসল কালামুল্লাহ, যা কালামে লাফযীর অর্থ। কালামে লফযী স্বয়ং حَقِيْقِىْ কালামুল্লাহ নয় বরং তাকে রূপকার্থে কালামুল্লাহ বলা হয়। অথচ আশ'আরী রহ. এর উক্তিতে مَعْنٰى শব্দটি عَيْن এর বিপরীত ব্যবহৃত হয়েছে। আর আশ'আরীর উদ্দেশ্য হল, কালামুল্লাহ عَيْن এবং قَائِمٌ بِالذَّاتِ নয় বরং সেটি مَعْنٰى অর্থাৎ قَائِم بِالْغَيْرِ বা অন্যের মাধ্যমে অধিষ্ঠিত। আর যেহেতু অন্যের মাধ্যমে অধিষ্ঠিত مَعْنٰى অর্থাৎ কালাম নফসী এবং لَفْظ অর্থাৎ যুক্ত শব্দাবলী উভয়কে শামিল করে। এ কারণে আশআরীর মতে কালামে নফসী ও কালামে লফযী উভয়টি কালামুল্লাহ। কাজেই কালামুল্লাহকে قَدِيْم এবং আল্লাহর সত্ত্বার সাথে প্রতিষ্ঠিত মেনে নিলে যুক্ত শব্দাবলীও قَدِيْمٌ এবং আল্লাহ তা'আলার সত্ত্বার সাথে প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক হবে। অথচ যুক্ত শব্দ قَدِيْمٌ হওয়া এবং আল্লাহ তা'আলার সত্ত্বার সাথে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় আকীদা হল হাম্বলীদের; আশআরীদের নয়।

মাওয়াকিফ গ্রন্থকার এ প্রশ্নের সে উত্তরই দিয়েছেন, যা শারিহ রহ. তার উক্তি لَا كَمَا زَعَمَتِ الْحَنَابِلَةُ দ্বারা দিয়েছেন। সারকথা হল, আমরা যুক্ত শব্দকে قَدِيْم এবং আল্লাহর সত্ত্বার সাথে প্রতিষ্ঠিত সে অর্থে বলি না, যে অর্থে হাম্বলীগণ বলে থাকেন অর্থাৎ বিন্যস্ত যুক্ত শব্দ কাদীম। কেননা এটা তো স্পষ্ট অসম্ভব। যেমন, بِسْمِ اللّٰهِ এর সীন এর উচ্চারণ ততক্ষণ সম্ভব নয়, যতক্ষণ ب এর উচ্চারণ না হবে। এমনিভাবে মীম এর উচ্চারণ ততক্ষণ সম্ভব নয়, যতক্ষণ সীন এর উচ্চারণ শেষ না হবে। আর শেষ হওয়া, নিশ্চিহ্ন হওয়া নশ্বর হওয়ার লক্ষণ, যা قَدِيْم হওয়ার পরিপন্থী। বরং আমরা বলি, যেমনিভাবে একজন হাফেয এর স্মৃতিতে কুরআন শরীফ কোন বিন্যাস ও আগে-পরে হওয়া ছাড়াই বিদ্যমান আছে। আর বিন্যাস ও আগ-পিছ কেবল উচ্চারণের সময়ই হয়। কেননা উচ্চারণের যন্ত্র তথা জিহ্বা অবিন্যস্তভাবে একবারে সবগুলো হরফ উচ্চারণ করতে পারে না। এমনিভাবে যেসব শব্দাবলী আল্লাহ তা'আলার সত্তার সাথে বিদ্যমান, সেগুলো অবিন্যস্ত। সেগুলোতে কোন আগ-পর নেই। এমনকি যে আল্লাহর কালাম শুনেছে, সে অবিন্যস্ত কালামই শুনেছে। কারণ, জিহ্বাই বিন্যাসের মুখাপেক্ষী। আর আল্লাহ তা'আলা আপন বাণী শোনাতে জিহ্বার মুখাপেক্ষী নন। এ হল মাওয়াকিফ গ্রন্থকারের আলোচনার সারকথা।

وَهُوَ جَيِّدٌ لِمَنْ يَتَعَقَّلُ لَفْظًا قَائِمًا بِالنَّفْسِ غَيْرَ مُؤَلَّفٍ مِنَ الْحُرُوْفِ الْمَنْطُوْقَةِ اَوِ الْمُخَيَّلَةِ الْمَشْرُوْطِ وُجُوْدُ بَعْضِهَا بِعَدَمِ الْبَعْضِ وَلَا مِنَ الْاَشْكَالِ الْمُرَتَّبَةِ الدَّالَّةِ عَلَيْهِ وَنَحْنُ لَانَتَعَقَّلُ مِنْ كَلَامِ الْحَافِظِ اِلَّاكَوْنَ صُوَرِ الْحُرُوْفِ مَخْزُوْنَةً مُرْتَسِمَةً فِىْ خِيَالِهٖ بِحَيْثُ اِذَا الْتُفِتَ اِلَيْهَا كَانَتْ كَلَامًا مُؤَلَّفًا مِنْ اَلْفَاظٍ مُتَخَيَّلَةٍ اَوْ نُقُوْشٍ مُتَرَتِّبَةٍ وَاِذَا تُلُفِّظَ كَانَتْ كَلَامًا مَسْمُوْعًا .

সহজ তরজমা

আর এটা (مُوَاقِف গ্রন্থকারের কথার সারমর্ম) ঐ ব্যক্তির নিকট ভাল হবে– যে এমন শব্দের কল্পনা করতে পারে, যা আল্লাহর সত্ত্বার সাথে প্রতিষ্ঠিত। এমতাবস্থায় যেন তা উচ্চারণযোগ্য বর্ণমালা দ্বারা কিংবা ধারণাকৃত বর্ণমানলা দ্বারা গঠিত নয়, যার কিছুর অস্তিত্ব অপর কিছুর বিলুপ্তির সাথে শর্ত যুক্ত এবং আকার-আকৃতি দ্বারাও গঠিত নয়, যা শব্দ বুঝায়। আসলে আমরা তো এরূপ বুঝি না যে, হাফেযে কুরআনের স্মৃতিতে কুরআন বিদ্যমান থাকা মানে বর্ণসমূহের রূপ তার কল্পনা জগতে এমনভাবে একত্রিত হওয়া যে, যখন তার প্রতি লক্ষ্য করা হবে, তখন তা কল্পিত শব্দাবলী অথবা বিন্যস্ত নকশা দ্বারা গঠিত কালাম হবে। আর যখন উচ্চারণ করবে তখন তা শ্রুত কালাম হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

মাওয়াকিফ গ্রন্থকারের সমালোচনা ঃ শারিহ রহ. এখানে مُوَاقِف গ্রন্থকারের সমালোচনা করেছেন। সারকথা হল, শব্দ আল্লাহ তা'আলার সত্ত্বার সাথে প্রতিষ্ঠিত হওয়া এ দিক থেকে খুবই ভাল যে, এতে অনায়াসে শরী'আতের মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্যতা লাভ হয়। কিন্তু এ কথাটি বোধগম্য নয়। কেননা এমন শব্দের কল্পনা করাই সম্ভব নয়, যা আল্লাহর সত্ত্বার সাথে প্রতিষ্ঠিত এবং তার অংশসমূহে বিন্যাস ও আগ-পর নেই। এমনকি উচ্চারণযোগ্য বর্ণমালা বুঝায় এবং এরূপ শব্দাবলী ও বর্ণমালা বুঝায় এমন নকশা দ্বারা গঠিত নয়।

وَالتَّكْوِيْنُ وَهُوَ الْمَعْنَى الَّذِىْ يُعَبَّرُ عَنْهُ بِالْفِعْلِ وَالْخَلْقِ وَالتَّخْلِيْقِ وَالْاِيْجَادِ وَالْاِحْدَاثِ وَالْاِخْتِرَاعِ وَنَحْوِ ذٰلِكَ وَيُفَسَّرُ بِاِخْرَاجِ الْمَعْدُوْمِ مِنَ الْعَدَمِ اِلَى الْوُجُوْدِ صِفَةٌ لِلّٰهِ تَعَالٰى لِاِطْبَاقِ الْعَقْلِ وَالنَّقْلِ عَلٰى اَنَّهُ خَالِقٌ لِلْعَالَمِ مُكَوِّنٌ لَهُ وَامْتِنَاعُ اِطْلَاقِ الْاِسْمِ الْمُشْتَقِّ عَلَى الشَّيْئِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَكُوْنَ مَاْخَذُ الْاِشْتِقَاقِ وَصْفًا لَهُ قَائِمًا بِهِ .

সহজ তরজমা

তাকবীন প্রসঙ্গ ঃ আর তাকবীন দ্বারা ঐ সিফাত উদ্দেশ্য, যাকে فِعْل - خَلْق - تَخْلِيْق - اِيْجَاد - اِحْدَاث - اختراع ইত্যাদি দ্বারা ব্যক্ত করা হয় এবং যার উদ্দেশ্য "অস্তিত্বহীনতা থেকে বের করে অস্তিত্বের দিকে নিয়ে আসা" বর্ণনা করা হয়। (এটা) আল্লাহ তা'আলার সিফাত। যুক্তি ও বর্ণনা এ ব্যাপারে একমত হওয়ায় যে, আল্লাহ তা'আলা জগতের স্রষ্টার অস্তিত্ব দাতা এবং কোন বস্তুর উপর اِسْم مُشْتَق এর ব্যবহার مَاخَذ اِشْتِقَاق তার গুণ এবং তার সাথে প্রতিষ্ঠিত ব্যতিত অসম্ভব।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

সৃষ্টি করা আল্লাহ তা'আলার একটি গুণ

এ পর্যন্ত আলোচিত সাতটি গুণ যথা, عِلْم - حَيَات - قُدْرَت - اِرَادَه - سَمْع - بَصَر - كَلَام এর আল্লাহ পাকের প্রকৃত সিফাত হওয়ার ব্যাপারে আশ'আরী ও মাতুরিদী সকলেই একমত। এখানে অষ্টম সিফাত বর্ণনা করছেন, যা বিরোধপূর্ণ। আর তা হল تَكْوِيْن, যাকে اِيْجَاد - خَلْق - تَخْلِيْق দ্বারা ব্যক্ত করা হয়। আশআরিয়াগণ এটাকে একটি আপেক্ষিক এবং কাল্পনিক বিষয় মনে করেন। আল্লাহ তা'আলার প্রকৃত গুণ বলে মনে করেন না। আর মাতুরিয়্যাহ যাদের মধ্যে মুসান্নিফ রহ. ও রয়েছেন, তারা تَكْوِيْن কে সিফাত মনে করেন এবং উদ্দেশ্য নেন, যা অস্তিত্বহীন বস্তুসমূহকে অস্তিত্বের বের করে আনা প্রমাণিত হয়। মাতুরিদিগণ تَكْوِيْن এবং خَلْق আল্লাহ তা'আলার প্রকৃত সিফাত হওয়ার স্বপক্ষে দলীল দেন, আল্লাহ তা'আলা বিশ্বজগতের خَالِق এবং مُكَوِّن হওয়ার বিষয়টিতে যুক্তি ও বর্ণনা উভয়টির ঐক্যমত রয়েছে। আর خَالِق ও مُكَوِّن হল, اِسْم مُشْتَاق যার ব্যবহার আল্লাহ তা'আলা সত্ত্বার সাথে তার مَاخَذ اِشْتِقَاق তথা خَلْق ও تَكْوِيْن আল্লাহ তা'আলার গুণ ও তার সত্ত্বার সাথে প্রতিষ্ঠিত হওয়া ছাড়া অসম্ভব। এতে প্রমাণিত হল, خَلْق ও تَكْوِيْن আল্লাহ তা'আলার সিফাত এবং তার সাথে প্রতিষ্ঠিত। আর যে صِفَت টি তার مَوْصُوْف এর সাথে প্রতিষ্ঠিত হয়, তা প্রকৃত হয়। কাজেই তাকবীন ও আল্লাহ তা'আলার প্রকৃত সিফাত।

اَزَلِيَّةٌ بِوُجُوْهٍ الْاَوَّلُ اَنَّهُ يَمْتَنِعُ قِيَامُ الْحَوَادِثِ بِذَاتِهِ تَعَالٰى لِمَا مَرَّ الثَّانِىْ اَنَّهُ وَصَفَ ذَاتَهُ فِىْ كَلَامِهِ الْاَزَلِىِّ بِاَنَّهُ الْخَالِقُ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِى الْاَزَلِ خَالِقًا لَزِمَ الْكِذْبُ اَوِ الْعُدُوْلُ اِلَى الْمُجَازِ وَاللَّازِمُ بَاطِلٌ اَىِ الْخَالِقُ فِيْمَا يَسْتَقْبِلُ اَوِ الْقَادِرُ عَلَى الْخَلْقِ مِنْ غَيْرِ تَعَذُّرِ الْحَقِيْقَةِ عَلٰى اَنَّهُ لَوْ جَازَ اِطْلَاقُ الْخَالِقِ عَلَيْهِ بِمَعْنَى الْقَادِرِ عَلَى الْخَلْقِ لَجَازَ اِطْلَاقُ كُلِّ مَا يَقْدِرُ هُوَ عَلَيْهِ مِنَ الْاَعْرَاضِ عَلَيْهِ الثَّالِثُ اَنَّهُ لَوْ كَانَ حَادِثًا فَاِمَّا بِتَكْوِيْنٍ اٰخَرَ فَيَلْزَمُ التَّسَلْسُلُ وَهُوَ

مَحَالٌ وَيَلْزَمُ مِنْهُ اِسْتِحَالَةُ تَكْوِيْنِ الْعَالَمِ مَعَ اَنَّهُ مُشَاهَدٌ وَاِمَّا بِدُوْنِهِ فَيَسْتَغْنِى الْحَادِثُ عَنِ الْمُحْدِثِ وَالْاِحْدَاثِ وَفِيْهِ تَعْطِيْلُ الصَّانِعِ اَلرَّابِعُ اَنَّهُ لَوْحَدَثَ لَحَدَثَ اِمَّا فِىْ ذَاتِهِ فَيَصِيْرُ مَحَلًّا لِلْحَوَادِثِ اَوْ فِىْ غَيْرِهِ كَمَا ذَهَبَ اِلَيْهِ اَبُو الْهُذَيْلِ مِنْ اَنَّ تَكْوِيْنَ كُلِّ جِسْمٍ قَائِمٍ بِهِ فَيَكُوْنُ كُلُّ جِسْمٍ خَالِقًا وَمُكَوِّنًا لِنَفْسِهِ وَلَا خَفَاءَ فِىْ اِسْتِحَالَتِهِ.

সহজ তরজমা

তাকবীন অনাদী গুণ ঃ (এ تَكْوِيْن সিফাতটি) চার কারণে অনাদি। **প্রথমতঃ** আল্লাহ তা'আলার সাথে নশ্বর বস্তু প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব, প্রাগুক্ত দলীলের কারণে। **দ্বিতীয়তঃ** তিনি তার অনাদি কালামে নিজ সত্ত্বাকে خَالِق হওয়ার গুণে গুণান্বিত বলেছেন। সুতরাং তিনি যদি আদিকালে خَالِق না হন তাহলে মিথ্যাবাদী হওয়া অথবা প্রকৃত অর্থ অসম্ভব হওয়া ছাড়াই রূপক অর্থাৎ ভবিষ্যত স্রষ্টা অথবা সৃষ্টির ক্ষমতা বা ক্ষমতাবান ইত্যাদি অর্থের দিকে সরে যাওয়া আবশ্যক হবে। আর এ আবশ্যকতা বাতিল। তাছাড়া যদি আল্লাহ তা'আলার উপর সৃষ্টি করতে ক্ষমতাবান হওয়ার অর্থে خَالِق শব্দের ব্যবহার জায়েয হয়, তাহলে প্রত্যেক ঐ عَارِض এর ব্যবহার জায়েয হবে, যার উপর তিনি সক্ষম। **তৃতীয়তঃ** তিনি যদি নশ্বর হন, তাহলে হয়ত দ্বিতীয় تَكْوِيْن এর মাধ্যমে নশ্বর হবেন। এমতাবস্থায় تَسَلْسُلُ আবশ্যক হবে। আর এটা অসম্ভব। এতে বিশ্বজগতের تَكْوِيْن অসম্ভাব্যতা আবশ্যক হবে। অথচ তা প্রত্যক্ষ বিষয়। অথবা তিনি অন্য تكوين ব্যতিত নশ্বর হবেন, তাহলে নশ্বর বস্তুর কোন مُحْدث এবং اَحْدَاث। হতে অমূখাপেক্ষীতা আবশ্যক হয়। এতে স্রষ্টা বেকার এবং অকেজো হওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে।

চতুর্থ, তিনি যদি حَادِث হন, তাহলে তার মধ্যে حَادِث হবেন। এমতাবস্থায় তিনি حَوَادِث এর মহল বা স্থান হবেন। অথবা অন্যত্র حَادِث হবেন। যেমনটি আবুল ফুযাইল বলেন, প্রতিটি দেহের সৃজন তার সাথেই প্রতিষ্ঠিত। এমতাবস্থায় প্রতিটি দেহ তার নিজের مُكَوِّن ও خَالِق (স্রষ্টা) হওয়া আবশ্যক হবে। আর এটা অসম্ভ হওয়ার ব্যাপারে কোন অস্পষ্টতা নেই।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তাকবীন অনাদী হওয়ার ৪টি প্রমাণ

শারিহ রহ. تَكْوِيْن অনাদি হওয়া প্রসঙ্গে মাতুরিয়্যাদের পক্ষ্য থেকে চারটি দলীল পেশ করেছেন। যথা–

১. تَكْوِيْن আল্লাহ তা'আলার সিফাত কোন বস্তুর সিফাত। আর তার সাথে প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং تَكْوِيْن কে নশ্বর মানলে আল্লাহ তা'আলার সাথে নশ্বর বস্তুর প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক হয়। অথচ আল্লাহ তা'আলার নশ্বর হওয়া অসম্ভব। কাজেই تَكْوِيْن ও নশ্বর হওয়া অসম্ভব বরং اَزَلِىْ। তথা অনাদি হওয়া নির্ধারিত ও অনিবার্য।

২. আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনাদি কালামে নিজেকে خَالِق হওয়ার কথা বর্ণনা করেছেন এবং নিজের দিকে خَلْق (সৃষ্টির) এর নিসবত করেছেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা যদি আদিকালে خَلْق ও تَكْوِيْن এর সাথে গুণান্বিত না হন, তাহলে আল্লাহ তা'আলার মিথ্যাবাদী হওয়া আবশ্যক হবে। আর আল্লাহ তা'আলার মিথ্যাবাদী হওয়া ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় তা অসম্ভব। অধিকন্তু আদিকালে অনাদি কালামে আল্লাহ তা'আলা নিজেকে রূপকার্থে খালিক বলেছেন। خَالِق অর্থ, ভবিষ্যত স্রষ্টা অথবা সৃজনের ক্ষমতাবান। আর প্রকৃত অর্থ জটিল না হওয়া সত্তেও مُجَاز এর দিকে গমন করা বাতিল। তাছাড়া যদি আল্লাহ তা'আলার উপর قَادِر শব্দের ব্যবহার قَادِرٌ عَلَى الْخَلْقِ। তথা সৃজনের ক্ষমতাবান অর্থে جَائِز হয় তাহলে সব اَعْرَاض এর اِسْم مُشْتَق যেমন اَسْوَد - اَبْيَض - اَحْمَر ইত্যাদি ক্রমান্বয়ে قَادِرٌ عَلَى السَّوَاد - قَادِرٌ عَلَى الْبَيَاض - قَادِرٌ عَلَى الْحُمْرَة অর্থে جَائِز হওয়া উচিৎ। কেননা আল্লাহ তা'আলা এ সব اِسْم এর ক্রিয়ামূল اَعْرَاض। এর উপর ক্ষমতাবান। অথচ আল্লাহ তা'আলার শানে এসব নামের ব্যবহার সর্বসম্মাতিক্রমে বাতিল। সারকথা, স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা নিজেকে তার অনাদি কালামে এ হিসাবে خَالِق বলেছেন যে, তিনি আদিকালে خَلْق ও تَكْوِيْن গুণে গুণান্বিত ছিলেন। কাজেই خَلْق ও تَكْوِيْن তার অনাদি গুণ সাব্যস্ত হল।

৩. যদি تَكْوِيْن নশ্বর হয়, তাহলে হয়ত অন্য কোন تَكْوِيْن এর কারণে নশ্বর হবে। এ হিসেবে যে, প্রতিটি নশ্বর বস্তু কোন مُكَوِّن এবং কোন আবিষ্কারকের আবিষ্কারের মুখাপেক্ষী হয়। এমতাবস্থায় تَسَلْسُل আবশ্যক

হবে। কেননা দ্বিতীয় تَكْوِيْن টিও নশ্বর হওয়ায় তৃতীয় একটি تَكْوِيْن এর মুখাপেক্ষী হবে এবং তৃতীয় تَكْوِيْن ও নশ্বর হওয়ায় ৪র্থ تَكْوِيْن এর মুখাপেক্ষী হবে। এভাবে অসীম সীমা পর্যন্ত চলতে থাকবে। আর تَسَلْسُل অসম্ভব। এর ফলে বিশ্বজগতের অস্তিত্বও অসম্ভব হওয়া আবশ্যক হবে। কারণ, বিশ্বজগতের অস্তিত্ব ঐ সব অসীম تَكْوِيْن এর উপর নির্ভরশীল। অথচ تَكْوِيْن অসীম হওয়া تَسَلْسُل কে আবশ্যক করায় অসম্ভব। আর যে জিনিস অসম্ভবের উপর নির্ভরশীল তাও অসম্ভব। কাজেই বিশ্বজগতের অস্তিত্বও অসম্ভব হবে। অথচ তা বিদ্যমান ও চাক্ষুশ বিষয়। আর যদি تَكْوِيْن অন্য কোন تَكْوِيْن এবং مُحْدِث এর আবিষ্কার ব্যতিত নিজেই নতুনভাবে সৃষ্টি এবং বিদ্যমান হয়, তাহলে حَادِث বস্তু مُحْدِث এর إِحْدَاث ও إِيْجَاد থেকে অমুখাপেক্ষী হওয়া আবশ্যক। আর অমুখাপেক্ষীতার অর্থ হল, স্রষ্টার নিষ্ক্রিয়তা আবশ্যক হওয়া। কেননা যখন একটি জিনিস কোন স্রষ্টার إِحْدَاث (সৃষ্টি) ছাড়াই বিদ্যমান হওয়া সম্ভব হবে, তখন গোটা সৃষ্টিজগতই কোন স্রষ্টা ব্যতিত সৃষ্টি হওয়া সম্ভব হবে। ফলে স্রষ্টার কোন প্রয়োজন রইল না।

(৪) আবার تَكْوِيْن নশ্বর হলে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে। হয়ত আল্লাহ তা'আলার সত্ত্বায় নশ্বর হবে। তখন আল্লাহ তা'আলার সত্ত্বা حَوَادِث এর মহল বা স্থান হওয়া আবশ্যক হবে। আর আল্লাহ তা'আলার সত্ত্বা حَوَادِث স্থান হওয়ায় স্বয়ং নশ্বর হওয়াকে আবশ্যক করে। বিধায় তা অসম্ভব। কাজেই تَكْوِيْن আল্লাহ তা'আলার সত্ত্বায় নশ্বর হওয়া অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ তা'আলার সত্তা ব্যতিত অন্যত্র নশ্বর হবে। যেমন, মুতাযিলাদের মধ্যে আবুল হুযাইল আল্লাফ এর মতে প্রতিটি দেহের تَكْوِيْن তার নিজের সাথে প্রতিষ্ঠিত। এমতাবস্থায় প্রতিটি দেহ তার নিজের خَالِق ও مُكَوِّن হওয়া আবশ্যক হয়। কেননা দেহের تَكْوِيْن যখন তার সাথে প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন ঐ দেহই مُكَوِّن হবে। কেননা تَكْوِيْن যার সাথে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাকেই مُكَوِّن বলা হয়। কাজেই প্রতিটি দেহ তার مُكَوِّن (স্রষ্টা) হওয়া আবশ্যক হবে, যা স্পষ্ট অসম্ভব। সুতরাং تَكْوِيْن এর নশ্বর হওয়ার উভয় সূরত বাতিল সাব্যস্ত হল। এতে تَكْوِيْن এর নশ্বর হওয়াও বাতিল বলে গণ্য হল। তৎসঙ্গে সেটি أَزَلِي তথা অনাদি হওয়া নির্ধারিত হল।

وَمَبْنٰى هٰذِهِ الْاَدِلَّةِ عَلٰى اَنَّ التَّكْوِيْنَ صِفَةٌ حَقِيْقِيَّةٌ كَالْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ وَالْمُحَقِّقُوْنَ مِنَ الْمُتَكَلِّمِيْنَ عَلٰى اَنَّهٗ مِنَ الْاِضَافَاتِ وَالْاِعْتِبَارَاتِ الْعَقْلِيَّةِ مِثْلُ كَوْنِ الصَّانِعِ تَعَالٰى وَتَقَدَّسَ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَمَعَهٗ وَبَعْدَهٗ وَمَذْكُوْرًا بِاَلْسِنَتِنَا وَمَعْبُوْدًا وَمُمِيْتًا وَمُحْيِيًا وَنَحْوُ ذٰلِكَ وَالْحَاصِلُ فِى الْاَزَلِ هُوَ مَبْدَأُ التَّخْلِيْقِ وَالتَّرْزِيْقِ وَالْاِمَاتَةِ وَالْاِحْيَاءِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ وَلَا دَلِيْلَ عَلٰى كَوْنِهٖ صِفَةً اُخْرٰى سِوَى الْقُدْرَةِ وَالْاِرَادَةِ فَاِنَّ الْقُدْرَةَ وَاِنْ كَانَتْ نِسْبَتُهَا اِلٰى وُجُوْدِ الْمُكَوَّنِ وَعَدَمِهٖ عَلَى السَّوَاءِ لٰكِنْ مَّعَ اِنْضِمَامِ الْاِرَادَةِ يَتَخَصَّصُ اَحَدُ الْجَانِبَيْنِ .

সহজ তরজমা

আর সে সব দলীলাদির ভিত্তি এ কথার উপর যে, تَكْوِيْن প্রকৃত সিফাত, যেমন ইলম ও কুদরত (প্রকৃত সিফাত)। মুহাক্কিক কালাম শাস্ত্রবিদগণ মনে করেন, তা (তাকবীন) আপেক্ষিক এবং কাল্পনিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। যেমন, স্রষ্টা প্রত্যেক জিনিসের পূর্বে হওয়া। প্রত্যেক জিনিসের সাথে হওয়া। প্রত্যেক জিনিসের পরে হওয়া। আমাদের মুখে আলোচিত হওয়া। মাবুদ হওয়া। মৃত্যুদাতা হওয়া। জীবনদাতা হওয়া। আর যে জিনিস আদিকালে বিদ্যমান, তা تَخْلِيْق (সৃষ্টি করা), تَرْزِيْق (রিযিক দেওয়া), إِمَاتَت (মৃত্যু দেওয়া), إِحْيَاء (জীবন দেওয়া) ইত্যাদির উৎস এবং এটি তার ইচ্ছা ও শক্তি ব্যতিত সিফাত হওয়ার উপর কোন দলীল নেই। কেননা قُدْرَت এর সম্পর্ক যদিও مُكَوَّن এর অস্তিত্ব এবং অনস্তিত্বের সাথে একই রকম, তথাপি এর সাথে إِرَادَه (ইচ্ছা) মিলিত হলে কোন একদিক প্রাধান্য লাভ করে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

শারিহ রহ. এর নিকট আশআরীদের মতের অগ্রাধিকার ঃ এখানে শারিহ রহ. আশ'আরিয়্যাহদের মতামতকে প্রধান্য দিতে চান। যারা تَكْوِيْن কে প্রকৃত صِفَت মানতে অস্বীকার করেন। সুতারাং তিনি বলেন,

উপরে تَكْوِيْن এর অনাদি হওয়া প্রসঙ্গে সে সব দলীলাদি পেশ করা হয়েছে, সেগুলো تَكْوِيْن প্রকৃত সিফাত হওয়ার উপর নির্ভরশীল। কেননা تَكْوِيْن যদি আপেক্ষিক ও কাল্পনিক বিষয় হয়, যেমন আশ'আরিয়াহগণ বলেন, তাহলে প্রথম দলীল যাতে تكوين নশ্বর হওয়ার সূরতে আল্লাহ তা'আলার সত্তার সাথে তা প্রতিষ্ঠিত হওয়াকে অসম্ভব সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর চতুর্থ দলীল যাতে تَكْوِيْن এর حَادِث হওয়ার সূরতে আল্লাহ তা'আলার স্বত্ত্বাকে তার মহল ও স্থান হওয়াকে অসম্ভব সাব্যস্ত করা হয়েছে –এর কোনটিই সঠিক হবে না। কেননা আপেক্ষিক ও কাল্পনিক বিষয়াদি আল্লাহর স্বত্ত্বার সাথে প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং আল্লাহ তা'আলার স্বত্ত্বা কাল্পনিক বিষয়াদির মহল ও স্থান হওয়া বৈধ। এমনিভাবে তৃতীয় দলীল যাতে تَكْوِيْن কে حَادِث মানার সূরতেও অন্য تَكْوِيْن এর মুখাপেক্ষী সাব্যস্ত করা হয়েছে, সেটিও শুদ্ধ হবে না। কারণ, যখন تَكْوِيْن আপেক্ষিক ও কাল্পনিক বিষয় হবে, তখন সেটি অন্য تَكْوِيْن এর মুখাপেক্ষী হবে না।

মুহাক্কিক আশ'আরীগণ এবং স্বয়ং শারিহ রহ. বলেন, যেমনিভাবে আগে হওয়া, পরে হওয়া এবং প্রত্যেক জিনিসের সাথে হওয়া ইত্যাদি এদিক থেকে আপেক্ষিক ও কাল্পনিক যে, এগুলো বুঝতে অন্য জিনিসের প্রতি সম্বন্ধ করতে হয়– এগুলো হাদেস ও নশ্বর। আর এগুলো হাদেস-নশ্বর হওয়ায় কোন অসম্ভব বিষয় আবশ্যক হয় না। এমনিভাবে তাকবীনও একটি আপেক্ষিক ও কাল্পনিক বিষয়, সেটি হাদেস-নশ্বর হলেও কোন অসম্ভব আবশ্যক হবে না। আর অনাদি তো সে সব জিনিস, যা আপেক্ষিক বিষয়াদি তথা সৃষ্টি করা, রিযিক দেওয়া, মৃত্যু দেওয়া, জীবন দেওয়া ইত্যাদির উৎস এবং কারণ, যার মাধ্যমে অস্তিত্বহীন জিনিস অস্তিত্ব লাভ করে আর এমন সিফাত একমাত্র কুদরাত ও ইচ্ছা ব্যতিত অন্য কিছু নয়। কেননা قُدْرَت এর সম্পর্ক যদিও মাখলূকের অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব সব ব্যাপারেই সমান, কিন্তু যখন তার সাথে ইচ্ছা মিলিত হয় তখন অস্তিত্ব অনস্তিত্বের উপর প্রাধান্য লাভ করে। মোটকথা, কুদরত কোন জিনিসের অস্তিত্ব দানের সাথে সম্পর্ক রাখাই হল তাকবীন। আর সম্পর্কইও আপেক্ষিক ও কাল্পনিক বিষয়। কাজেই তাকবীনও আপেক্ষিক ও কাল্পনিক হবে।

আসলে মাতুরীদীদের প্রমাণই অগ্রগণ্য ঃ মাতারিয়্যাহগণ কুদরত ও ইচ্ছা ছাড়াও تَكْوِيْن কে সিফাত সাব্যস্ত করেন এবং বলেন, কুদরত এর প্রভাব হল, صِحَّتِ وُجُوْد অর্থাৎ إِمْكَان وُجُوْد এ অর্থে যে, কুদরত যে জিনিসের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়, সেটি مُمْكِن (সম্ভব্য) হয়। আর مُمْكِن (সাব্যস্ত বস্তু) এর অনস্তিত্ব ও অস্তিত্ব উভয়টির সম্ভাবনা থাকে। অপরদিকে ইচ্ছার প্রভাব হল, تَرْجِيْحِ وُجُوْد অর্থাৎ ইচ্ছা যে জিনিসের সাথে সম্পৃক্ত হয়, তার অস্তিত্ব অনস্তিত্বের উপর প্রাধান্য লাভ করে। আর تَكْوِيْن এর প্রভাব হল, কার্যতঃ কোন জিনিসের অস্তিত্ব প্রদান করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ –এতেও উক্ত মতামতের সমর্থন মিলে। কেননা قُدْرَت ও ইচ্ছা উভয়টিই যদি কোন বস্তুর কার্যতঃ অস্তিত্ব প্রদানের জন্য যথেষ্ট হত, তাহলে বলা হত, إِذَا أَرَادَ شَيْئًا فَيَكُوْنُ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যখন কোন জিনিসের ইচ্ছা করেন তখন জিনিসটি বিদ্যমান হয়ে যায়। কিন্তু এমটি বলা হয়নি বরং আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, যখন তিনি কোন জিনিসকে অস্তিত্ব দানের ইচ্ছা করেন তখন কেবল ইচ্ছাই যথেষ্ট হয় না বরং আরও কিছু করতে হয়, তবে তা বেশী নয় বরং শুধু এতটুকু যে, إِنْ يَقُوْلَ لَهُ كُنْ তিনি সে জিনিসকে আদেশ দেন তুমি হয়ে যাও অর্থাৎ তিনি كُنْ বলে দেন, তখন فَيَكُوْنُ বস্তুটি হয়ে যায়। আর উক্ত كُنْ বলাই হল তাকবীন। বুঝা গেল, تَكْوِيْن কাজটি কার্যতঃ অস্তিত্ব দান করা। কোন কোন মাতুরিয়্যাদের উক্তি তথা قُدْرَت হল صِفَة مُصَحِّحَه এবং ইচ্ছা صِفَة مُرَجِّحَه আর تَكْوِيْن হল, صِفَة مُؤَثِّرَه অর্থাৎ قُدْرَت সম্পৃক্ত হলে وُجُوْد অস্তিত্ব সম্ভব হয়, ইচ্ছা সম্পৃক্ত হলে অস্তিত্বটা অনস্তিত্বের উপর প্রাধান্য পায় আর تَكْوِيْن সম্পৃক্ত হলে বস্তুটি কার্যতঃ বিদ্যমান হয়ে যায় –এর উদ্দেশ্য এটিই।

وَلَمَّا اسْتَدَلَّ الْقَائِلُوْنَ بِحُدُوْثِ التَّكْوِيْنِ بِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ بِدُوْنِ الْمُكَوَّنِ كَالضَّرْبِ بِدُوْنِ الْمَضْرُوْبِ فَلَوْ كَانَ قَدِيْمًا لَزِمَ قِدَمُ الْمُكَوَّنَاتِ وَهُوَ مُحَالٌ أَشَارَ إِلَى الْجَوَابِ بِقَوْلِهِ وَهُوَ أَيِ

التَّكْوِيْنُ تَكْوِيْنُهُ لِلْعَالَمِ وَلِكُلِّ جُزْءٍ مِنَ الْأَجْزَاءِ لَا فِى الْأَزَلِ بَلْ لِوَقْتِ وُجُوْدِهِ عَلَى حَسْبِ عِلْمِهِ وَإِرَادَتِهِ فَالتَّكْوِيْنُ بَاقٍ أَزَلًا وَأَبَدًا وَالْمُكَوَّنُ حَادِثٌ بِحُدُوْثِ التَّعَلُّقِ كَمَا فِى الْعِلْمِ

وَالْقُدْرَةِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الصِّفَاتِ الْقَدِيْمَةِ الَّتِىْ لَايَلْزَمُ مِنْ قِدَمِهَا قِدَمُ مُتَعَلِّقَاتِهَا لِكَوْنِ تَعَلُّقَاتِهَا حَادِثَةً :

সহজ তরজমা

আর যখন تَكْوِيْن কে حَادِث বলার প্রবক্তাগণ দলীল পেশ করলেন, مُكَوَّن বা সৃষ্ট বস্তু ব্যতিত تَكْوِيْن এর কল্পনাই করা যায় না, যেমন مَضْرُوْب ব্যতিত ضَرب এর কল্পনা করা যায় না। সুতরাং تَكْوِيْن যদি قَدِيم হয় তাহলে مَكَوِّنَات তথা সৃষ্ট বস্তুগুলোও قَدِيْم হওয়া আবশ্যক হবে। আর এটা অসম্ভব। তখন মুসান্নিফ রহ. তার এ উক্তি দ্বারা উত্তরের প্রতি ইশারা করেছেন, সেটি অর্থাৎ تَكْوِيْن হল আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক বিশ্বজগত ও তার প্রতিটি অংশকে সৃষ্টি করা, তবে আদিকালে নয় বরং তার জ্ঞান ও শক্তি অনুযায়ী তার অস্তিত্বকালে। তাহলে আদিকাল থেকে অন্ত পর্যন্ত বাকি আছে। আর مُكَوِّن (সৃষ্ট বস্তু) যেমন, ইলম, কুদরত এগুলো আল্লাহর তা'আলার ক্বাদীম সিফাত। এগুলো কাদীম হওয়ায় এগুলোর সাথে সম্পৃক্ত বিষয়াদি কাদীম হওয়া আবশ্যক হয় না। কেননা এগুলোর সম্পর্ক নশ্বর।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

তাকবীনকে যারা হাদেস বলেন তাদের প্রমাণ

তাকবীনকে যারা হাদেস-নশ্বর বলেন, তারা দলীল পেশ করেন, যেমনিভাবে مَضْرُوْب ব্যতিত ضَرب হতে পারে না, তেমনি مُكَوَّن (واو এর যবর) ব্যতিত تَكْوِيْن এর কল্পনাও করা যায় না। সুতরাং تَكْوِيْن যদি قَدِيْمٌ হয়, তাহলে مُكَوَّن বা সৃষ্ট বস্তুও قَدِيْم এবং অনাদি হওয়া আবশ্যক। আর এটা অসম্ভব। কেননা مُكَوَّن অর্থাৎ বিশ্বজগৎ তার সকল অংশসহ حَادِث হওয়াটা পূর্বেই প্রমাণিত হয়েছে।

এখানে মুসান্নিফ রহ. যে উত্তরের প্রতি ইংগিত করেছেন, তার সারমর্ম হল, تَكْوِيْن সুপ্রাচীন-কদীম, তবে مُكَوَّن এবং مَخْلُوْق এর সাথে তার সম্পৃক্ত হল হাদেস-নশ্বর। আর সম্পর্কের নশ্বরতা مُكَوَّن ও مَخْلُوْق নশ্বরতাকে আবশ্যক করে না। যেমনিভাবে عِلْم এবং قُدْرَت ইত্যাদি সুপ্রাচীনতা এগুলোর সাথে সম্পৃক্ত বিষয়াদি যথা مَقْدُوْرَات ও مَعْلُوْمَات ইত্যাদি সুপ্রাচীনতাকে আবশ্যক করে না। কেননা এগুলোর সম্পর্ক হল নশ্বর। আর সম্পর্ক নশ্বর হওয়া সংশ্লিষ্ট বিষয়ের নশ্বরতাকে আবশ্যক করে। অবশ্য মুসান্নিফ রহ. উল্লেখিত ইবারত উত্তরটিকে স্পষ্টরূপে বুঝায় না। এ কারণে শারিহ রহ. উক্ত ইবারতকে উত্তর বলেননি বরং উত্তরের প্রতি ইংগিত বলেছেন। মুসান্নিফ রহ. এর জন্য নিম্নরূপ ইবারত গ্রহণ করা যথাযথ ছিল ঃ اِنَّ اللّٰهَ مَوْصُوْفٌ فِى الْاَزَلِ بِكَوْنِهِ مُكَوِّنًا لِلْعَالَمِ وَلِكُلِّ جُزْءٍ مِنْ اَجْزَائِهِ وَقْتَ وُجُوْدِهِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বিশ্বজগত ও তার প্রতিটি অংশের অস্তিত্বের সময় خَالِق ও مُكَوِّن (স্রষ্টা) হওয়ার গুণে আদিকাল থেকে গুণান্বিত ছিলেন, তবে তার স্রষ্ট হওয়ার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে, আদিকালের পর, যখন تَكْوِيْن গুণটি مُكَوَّن (সৃষ্ট বস্তু) এর সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে।

وَهٰذَا تَحْقِيْقُ مَايُقَالُ اِنَّ وُجُوْدَ الْعَالَمِ اِنْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِذَاتِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَصِفَةٍ مِّنْ صِفَاتِهِ لَزِمَ تَعْطِيْلُ الصَّانِعِ وَاسْتِغْنَاءُ الْحَوَادِثِ عَنِ الْمُوْجِدِ وَهُوَ مُحَالٌ وَاِنْ تَعَلَّقَ فَاِمَّا اَنْ يَسْتَلْزِمَ ذٰلِكَ قِدَمَ مَايَتَعَلَّقُ وُجُوْدُهٗ بِهٖ فَيَلْزَمُ قِدَمُ الْعَالَمِ وَهُوَ بَاطِلٌ اَوْلَا فَلْيَكُنِ التَّكْوِيْنُ اَيْضًا قَدِيْمًا مَعَ حُدُوْثِ الْمُكَوَّنِ الْمُتَعَلِّقِ بِهٖ .

সহজ তরজমা

উপরিউক্ত উত্তরটি নিচের এ উত্তরের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ যা এরূপ বর্ণনা করা হয় যে, যদি বিশ্বজগতের অস্তিত্বের সম্পর্ক আল্লাহ তা'আলার সত্তা ও তার গুণাবলীর মধ্য হতে কোন একটির সাথে না হয়, তাহলে সৃষ্টিকর্তা অকর্মা হয়ে যাওয়া, অনুরূপভাবে حَادِث জিনিসের অস্তিত্ব مُوْجِد তথা স্রষ্টা থেকে সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী হওয়ার আবশ্যক হয়ে পড়বে। অথচ এটা অসম্ভব। আর যদি সম্পৃক্ত হয়, তাহলে উক্ত সম্পৃক্ততা সে জিনিসটির قَدِيْم হওয়াকে আবশ্যক

করবে, যার অস্তিত্বের সম্পর্ক তার সাথে রয়েছে। তাহলে এমতাবস্থায় বিশ্বজগৎ قَدِيْم হওয়া আবশ্যক হয়ে যাবে। অথচ এটা বাতিল। অথবা এর قَدِيْم হওয়াকে আবশ্যক করবে না। তাহলে তো تَكْوِيْن সিফাতটি তার সাথে সম্পৃক্ত مُكَوَّن ও مَخْلُوْق (সৃষ্ট মাখলূক) حَادِث হওয়া সত্ত্বেও قَدِيْم হবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

"উমদা" প্রণেতা ইমাম নুরুদ্দীন বুখারী যিনি ইমাম সাবূনী নামে প্রসিদ্ধ তিনি تَكْوِيْن এর حَادِث হওয়ার ব্যাপারে আশ'আরীগণ কর্তৃক প্রদত্ত দলীলের বিরুদ্ধে تَكْوِيْن এর قديم হওয়ার স্বপক্ষে দলীল স্বরূপ বলেন, বিশ্বজগতের অস্তিত্বে তিনটি সম্ভাবনা আছে। (১) বিশ্বজগতের অস্তিত্বের সাথে আল্লাহ তা'আলার সত্তা ও তার গুণাবলীর কোন সম্পর্কই নেই। এ সূরতটি ঐ কারণে বাতিল যে, এতে স্রষ্টা অকেজো এবং নামমাত্র স্রষ্টা হওয়া আবশ্যক হয়। তাছাড়া حَوَادِث এর স্রষ্টা ও অস্তিত্বদানকারী হতে অমুখাপেক্ষী হওয়া আবশ্যক হয়।

(২) দ্বিতীয় সম্ভাবনা হল, বিশ্বজগতের অস্তিত্বের সাথে আল্লাহ তা'আলার সত্ত্বা ও তার সুপ্রাচীন গুণাবলীর কোন না কোনটির সাথে সম্পর্ক রয়েছে। قَدِيْم সিফাতের সাথে উক্ত সম্পর্ক বিশ্বজগতের অস্তিত্ব قَدِيْم হওয়াকে আবশ্যক করে। এটাও বাতিল। কেননা বিশ্বজগত তার সকল অংশসহ حَادِث হওয়ার বিষয়টি পূর্বেই প্রমাণিত হয়েছে।

(৩) তৃতীয় সম্ভাবনা হল, বিশ্বজগতের অস্তিত্বের সাথে আল্লাহ তা'আলার কোন কাদীম সিফাতের সাথে সম্পর্ক রয়েছে। আর قَدِيْم সিফাতের সাথে উক্ত সম্পর্ক বিশ্বজগত قَدِيْم হওয়াকে আবশ্যক করে না। এমনিভাবে تَكْوِيْن সিফাতটি قَدِيْم হবে। আর সেটি قَدِيْم হওয়া সত্ত্বেও তার সাথে সম্পৃক্ত مُكَوَّن (সৃষ্ট) قَدِيْم হওয়া আবশ্যক হবে না। শারিহ রহ. মুসান্নিফ রহ. এর ইশারাকৃত উত্তরকে উমদা প্রণেতার উক্ত উত্তরের বিশ্লেষণ বলেছেন। কেননা উপরিউক্ত উত্তরে শুধু তাকবীন সিফাতটিকে قَدِيْم ও তার সাথে সম্পৃক্ত مُكَوَّن কে حَادِث বলার উপর ক্ষ্যান্ত করা হয়েছে। আর শুধু এতটুকু কথা দ্বারাই আশআরিয়্যাদের দলীল لَوْكَانَ التَّكْوِيْنُ قَدِيْمًا كَانَ الْمُكَوَّنُ قَدِيْمًا খণ্ডন হয়ে যায়। তবে উমদা প্রণেতা উত্তর এর বিপরীত। কেননা এটি এমন কিছু মুকাদ্দম বাতিল করার উপর নির্ভরশীল, যার কোন উপকারীতা নেই। যেমন, স্রষ্টা অকেজো হওয়া حَوَادِث গুলো স্রষ্টা হতে অমুখাপেক্ষী হওয়া এবং বিশ্বজগত কাদীম হওয়া ইত্যাদি। কেননা এগুলোর ভ্রান্ততা ও বাতিল হওয়ার ব্যাপারে সকলেই একমত।

وَمَا يُقَالُ مِنْ اَنَّ الْقَوْلَ بِتَعَلُّقِ وُجُوْدِ الْمُكَوَّنِ بِالتَّكْوِيْنِ قَوْلٌ بِحُدُوْثِهٖ اِذِ الْقَدِيْمُ مَا لَايَتَعَلَّقُ وُجُوْدُهٗ بِالْغَيْرِ وَالْحَادِثُ مَا يَتَعَلَّقُ بِهٖ فَفِيْهِ نَظَرٌ لِاَنَّ هٰذَا مَعْنَى الْقَدِيْمِ وَالْحَادِثِ بِالذَّاتِ عَلٰى مَا تَقُوْلُ بِهِ الْفَلَاسِفَةُ وَاَمَّا عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِيْنَ فَالْحَادِثُ مَا لِوُجُوْدِهٖ بِدَايَةٌ اَىْ يَكُوْنُ مَسْبُوْقًا بِالْعَدَمِ وَالْقَدِيْمُ بِخِلَافِهٖ وَمُجَرَّدُ تَعَلُّقِ وُجُوْدِهٖ بِالْغَيْرِ لَا يَسْتَلْزِمُ الْحُدُوْثَ بِهٰذَا الْمَعْنٰى لِجَوَازِ اَنْ يَكُوْنَ مُحْتَاجًا اِلَى الْغَيْرِ صَادِرًا عَنْهُ دَائِمًا بِدَوَامِهٖ كَمَا ذَهَبَ اِلَيْهِ الْفَلَاسِفَةُ فِيْمَا ادَّعَوْا قِدَمَهٗ مِنَ الْمُمْكِنَاتِ كَالْهَيُوْلٰى مَثَلًا .

সহজ তরজমা

আর এ কথা যে বলা হয়, تَكْوِيْن এর সাথে مُكَوَّن এর অস্তিত্বে সম্পর্কের প্রবক্তা হওয়া مُكَوَّن এর حَادِثٌ হওয়ার শামিল। কেননা قَدِيْم ঐ সত্ত্বাকে বলে, যার অস্তিত্ব অন্যের সাথে সম্পৃক্ত নয়। আর حَادِثٌ ঐ জিনিসকে বলে, যার অস্তিত্ব অন্যের সাথে সম্পৃক্ত হয়। এ উক্তির ব্যাপারে আপত্তি রয়েছে। কেননা এটা দার্শনিকদের উক্তি অনুসারে قَدِيْم এবং حَادِثٌ بِالذَّاتِ এর অর্থ। বাকি রইল কালাম শাস্ত্রবিদদের মত। তাদের মতে حَادِث বলে ঐ জিনিসকে যার অস্তিত্বের শুরু আছে। অর্থাৎ যার পূর্বে অনস্তিত্ব রয়েছে। আর قَدِيْم হল, এর বিপরীত। আর مُكَوَّن এর অস্তিত্ব অন্যের সাথে সম্পৃক্ত হওয়াই কেবল এ অর্থে حَادِث হওয়াকে আবশ্যক করে না। কেননা হয়ত সেটি অন্যের মুখাপেক্ষী অন্য হতে প্রকাশিত হয় এবং ঐ অন্য জিনিসটি স্থায়ী হওয়ায় সেটিও স্থায়ী হয়। যেমন, ঐ সব مُمْكِنَات যার قَدِيْم হওয়ার ব্যাপারে তাদের দাবী রয়েছে। যেমন, هَيُوْلٰى সম্পর্কে দার্শনিকদের মতামত রয়েছে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

কিফায়া প্রণেতার প্রত্যাখ্যান ঃ কিফায়া প্রণেতা تَكْوِيْن নশ্বর হওয়ার ব্যাপারে আশায়েরাদের দলীল অন্যভাবে খণ্ডন করেছেন। তিনি বলেন, যদি تَكْوِيْن অনাদি হয়, তাহলে تَكْوِيْن এর সাথে مُكَوَّن এর অস্তিত্বের সম্পর্কও আদিকালে হবে। আর এমতাবস্থায় مُكَوَّن তথা বিশ্বজগত অনাদি হওয়া আবশ্যক হয়, যা অসম্ভব। তাহলে আপনি দেখুন! এখানে আশ'আরী মতাবলম্বীগণ তাদের দলীলে একথা স্বীকার করেছেন যে, تَكْوِيْن এর সাথে مُكَوَّن এর অস্তিত্বের সম্পর্ক রয়েছে, এবার এর সাথে দ্বিতীয় মুকাদ্দামা যুক্ত করুন যে, যার অস্তিত্ব অন্যের সাথে সম্পৃক্ত হয় তা حَادِث হয়। এতে বুঝা গেল, مُكَوَّن হল নশ্বর। যদিও تَكْوِيْن টা কদীম এবং অনাদি। শারিহ রহ. কিফায়া প্রণেতার উক্ত খণ্ডনের উপর আপত্তি করে বলেন, মাওকিফ গ্রন্থকার حَادِث এর যে সংজ্ঞা প্রদান করেছেন, এটি মূলতঃ দার্শনিকদের মতানুসারে حَادِثٌ بِالذَّاتِ এর সংজ্ঞা; মুতাকাল্লিমীনদের নিকট এ সংজ্ঞা গ্রহণযোগ্য নয়। তাদের মতে তো حُدُوْث বলতে حُدُوْث زَمَانِي উদ্দেশ্য। আর حَادِث অর্থ, যার পূর্বে অস্তিত্ব ছিল না অর্থাৎ প্রথমে ছিল না পরিবর্তেতে অস্তিত্ব লাভ করেছে। আর কোন জিনিসের অস্তিত্ব অন্যের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া এ অর্থে حَادِث হওয়া কে আবশ্যক করে না যে, সেটি পূর্বে অস্তিত্বহীন ছিল; পরে অস্তিত্ব লাভ করেছে। যেমন, কোন কোন مُمْكِنٌ এমন রয়েছে। যেমন, هَيُوْلَى এর অস্তিত্বের ব্যাপারে দার্শনিকদের মাযহাব হল, তার অস্তিত্ব আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পৃক্ত এবং সেটি তার ইচ্ছা ও ইখতিয়ার ছাড়াই অস্তিত্ব লাভ করেছে। এ হিসেবে সেটি حَادِثٌ بِالذَّاتِ তবে তিনি (আল্লাহ তা'আলা) স্থায়ী অনাদি হওয়ার কারণে এটিও অনাদি এবং কদীম বিয্-যমান।

نَعَمْ إِذَا اَثْبَتْنَا صُدُوْرَ الْعَالَمِ عَنِ الصَّانِعِ بِالْاِخْتِيَارِ دُوْنَ الْاِيْجَابِ بِدَلِيْلٍ لَايَتَوَقَّفُ عَلَى حُدُوْثِ الْعَالَمِ كَانَ الْقَوْلُ بِتَعَلُّقِ وُجُوْدِهٖ بِتَكْوِيْنِ اللّٰهِ تَعَالَى قَوْلًا بِحُدُوْثِهٖ .

সহজ তরজমা

হ্যাঁ, আমরা যখন স্রষ্টা থেকে ইচ্ছাধীনভাবে বাধ্যতামূলকভাবে নয় বিশ্বজগতের অস্তিত্ব এমন দলীলের মাধ্যমে প্রমাণিত করব, যা বিশ্বজগত حَادِث হওয়ার উপর নির্ভরশীল নয়, তাহলে আল্লাহ তা'আলা تَكْوِيْن এর সাথে তার অস্তিত্বের সম্পর্কের প্রবক্তা হওয়া সেটির حادث হওয়ার প্রবক্তা হওয়াকে আবশ্যক করবে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

কিফায়া রচয়িতার কথার ব্যাখ্যা

এটা কিফায়া গ্রন্থকারের বক্তব্যের ব্যাখ্যা এবং একটি পরিশিষ্টসহ তার বিশুদ্ধতার স্বীকারোক্তি। ব্যাখ্যাটির সারমর্ম হল, যদি مُكَوَّن অর্থাৎ বিশ্বজগত স্বাধীন স্রষ্টার সৃষ্টি হওয়া এমন দলীল দ্বারা প্রমাণ করি, যা বিশ্বজগত حَادِث হওয়ার উপর নির্ভরশীল নয়। তাহলে এমতাবস্থায় مُكَوَّن (সৃষ্টি) এর تَكْوِيْن (সৃষ্টি) এর সাথে সম্পর্ক مُكَوَّن (সৃষ্ট বস্তু) এর নশ্বরতা অর্থাৎ পূর্বে অস্তিত্বহীন থাকাকে আবশ্যক করবে। এ কারণে নয় যে, তার অস্তিত্ব অন্যের সাথে সম্পৃক্ত বরং একারণে যে, সেটি স্বাধীন স্বত্তার সৃজিত আর স্বাধীন সত্তার সৃজিত জিনিস حَادِث তথা পূর্বে অস্তিত্বহীন থাকে। কেননা কর্তা ঐ বস্তুটির সৃজনের ইচ্ছা হয়ত তার অস্তিত্বাবস্থায় করবেন অথবা তার অস্তিত্বহীনতায়। প্রথমাবস্থায় তো تَحْصِيلِ حَاصِل (অর্জিত জিনিস অর্জন করা) আবশ্যক হওয়ায় তা অসম্ভব, তাহলে নিঃসন্দেহে তাকে সৃজনের ইচ্ছা সেটি না থাকাবস্থায় হবে। আর যে জিনিস অনস্তিত্বের সাথে পরিচিত তা حَادِث بِالزَّمَان অর্থাৎ পূর্বে অস্তিত্বহীন থাকে। বাকি রইল, স্রষ্টা স্বাধীন হওয়া এমন দলীল দ্বারা প্রমাণ করা, যা বিশ্বজগত حَادِث হওয়ার উপর নির্ভরশীল নয়। তার কারণ হল, বিশ্বজগত حَادِثٌ হওয়া স্রষ্টার স্বাধীন হওয়ার মাধ্যমে সাব্যস্ত করা হয়। বলা হয়, যদি عَالَم (বিশ্বজগত) قَدِيْمٌ হত, তাহলে তার স্রষ্টা স্বাধীন হত না। কিন্তু তার স্রষ্টা তো স্বাধীন। বুঝা গেল, বিশ্বজগত قَدِيْمٌ নয় বরং حَادِثٌ। সুতরাং যদি স্রষ্টা স্বাধীন হওয়ার বিষয়টি এমন দলীল দ্বারা প্রমাণ করা হয়, যা বিশ্বজগত حَادِث হওয়ার উপর নির্ভরশীল, তাহলে دَوْر আবশ্যক হবে, যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

وَمِنْ هٰهُنَا يُقَالُ اِنَّ التَّنْصِيْصَ عَلٰى كُلِّ جُزْءٍ مِنْ اَجْزَاءِ الْعَالَمِ اِشَارَةٌ اِلَى الرَّدِّ عَلٰى مَنْ زَعَمَ قِدَمَ بَعْضِ الْاَجْزَاءِ كَالْهَيُوْلٰى وَاِلَّا فَهُمْ اِنَّمَا يَقُوْلُوْنَ بِقِدَمِهَا بِمَعْنٰى عَدَمِ الْمَسْبُوْقِيَّةِ بِالْعَدَمِ لَابِمَعْنٰى عَدَمِ تَكَوُّنِهٖ بِالْغَيْرِ .

সহজ তরজমা

আর এ কারণেই বলা হয়, মুসান্নিফ রহ. বিশ্বজগতের প্রতিটি অংশকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ ঐ সমস্ত লোকদের মতামত খণ্ডনের প্রতিই ইংগিত, যারা কোন কোন অংশ যেমন هَيُوْلٰى কাদীম হওয়ার প্রবক্তা। অন্যথায় তারা তার قديم তথা পূর্বে অস্তিত্বহীন না থাকার প্রবক্তা; مُكَوَّنْ بِالْغَيْرِ (অন্যের মাধ্যমে সৃষ্ট) না হওয়ার অর্থে নয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

উপরিউক্ত প্রশ্নের শেষাংশ ঃ এটা উল্লেখিত অভিযোগের অবশিষ্ট অংশ। মাঝে শারিহ রহ. এর উক্তি "نَعَم اِذَا اَثْبَتْنَا الخ" জুমলায়ে মু'তারিয়া হিসেবে এসেছে। শারিহ রহ. উপরে বর্ণনা করেছেন, কালাম শাস্ত্রবিদদের মতে حَادِث ঐ জিনিসকে বলে, যা পূর্বে অস্তিত্বহীন থাকে। এখন সে অর্থের সমর্থনে উল্লেখ করেছেন যে, এ কারণেই অর্থাৎ, কালাম শাস্ত্রবিদদের মতে حَادِث এর অর্থ হল, পূর্বে অস্তিত্বহীন থাকা –এজন্য অনেকেই বলেছেন, মুসান্নিফ রহ. কর্তৃক বিশ্বজগতের প্রতিটি অংশের দিকে ইংগিত করা এবং প্রতিটি অংশের প্রতি تَكْوِيْن তথা অস্তিত্বহীনকে অস্তিত্বে নিয়ে আসার সম্বোধন করায় সে সকল দার্শনিকদের মতামত খণ্ডনের দিকে ইংগিত বহন করে, যারা কোন কোন অংশ যেমন هَيُوْلٰى ক্বাদীম হওয়ার প্রবক্তা, অন্যথায় قَدِيْم যদি অন্যের মাধ্যমে সৃষ্ট্য না হওয়া এবং حَادِث যদি অন্যের মাধ্যমে সৃষ্ট হওয়া অর্থাৎ স্বীয় অস্তিত্বে অন্যের মুখাপেক্ষী হওয়ার অর্থে হয়, তাহলে দার্শনিকদের মতামত খণ্ডন হয় না। কেননা তারা هَيُوْلٰى ইত্যাদির قَدِيْم তথা পূর্বে অস্তিত্বহীন না থাকার প্রবক্তা; مُكَوَّنْ بِالْغَيْرِ (অন্যের মাধ্যমে সৃষ্টি) না হওয়ার প্রবক্তা নন বরং বিশ্বজগতকে مُكَوَّنْ بِالْغَيْرِ অর্থাৎ আপন অস্তিত্বে অন্য তথা আল্লাহ তা'আলার মুখাপেক্ষী হওয়ার বিষয়টি তারা মেনে নেন।

وَالْحَاصِلُ اَنَّا لَانُسَلِّمُ اَنَّهٗ لَايُتَصَوَّرُ التَّكْوِيْنُ بِدُوْنِ وُجُوْدِ الْمُكَوَّنِ وَاَنَّ وِزَانَ مَعَهٗ وِزَانَ الضَّرْبِ مَعَ الْمَضْرُوْبِ فَاِنَّ الضَّرْبَ صِفَةٌ اِضَافِيَّةٌ لَايُتَصَوَّرُ بِدُوْنِ الْمُضَافَيْنِ اَعْنِى الضَّارِبَ وَالْمَضْرُوْبَ وَالتَّكْوِيْنُ صِفَةٌ حَقِيْقِيَّةٌ هِىَ مَبْدَأُ الْاِضَافَةِ الَّتِى هِىَ اِخْرَاجُ الْمَعْدُوْمِ مِنَ الْعَدَمِ اِلَى الْوُجُوْدِ لَاعَيْنُهَا حَتّٰى لَوْ كَانَتْ عَيْنَهَا عَلٰى مَاوَقَعَ فِى عِبَارَةِ الْمَشَائِخِ لَكَانَ الْقَوْلُ بِتَحَقُّقِهَا بِدُوْنِ الْمُكَوَّنِ مُكَابَرَةً وَاِنْكَارًا لِلضَّرُوْرِيِّ فَلَا يَنْدَفِعُ بِمَا يُقَالُ مِنْ اَنَّ الضَّرْبَ عَرَضٌ مُسْتَحِيْلُ الْبَقَاءِ فَلَابُدَّ لِتَعَلُّقِهٖ بِالْمَفْعُوْلِ وَوُصُوْلِ الْاَلَمِ اِلَيْهِ مِنْ وُجُوْدِ الْمَفْعُوْلِ مَعَهٗ اِذْ لَوْ تَاَخَّرَ بِالْمَفْعُوْلِ وَوُصُوْلِ الْاَلَمِ اِلَيْهِ مِنْ وُجُوْدِ الْمَفْعُوْلِ مَعَهٗ اِذْ لَوْ تَاَخَّرَ لَانْعَدَمَ هُوَ بِخِلَافِ فِعْلِ الْبَارِىْ تَعَالٰى فَاِنَّهٗ اَزَلِيٌّ وَاجِبُ الدَّوَامِ يَبْقٰى اِلٰى وَقْتِ وُجُوْدِ الْمَفْعُوْلِ

সহজ তরজমা

মোটকথা, আমরা এ কথা মানি না যে, সৃষ্টির অস্তিত্ব ছাড়া সৃজনের অস্তিত্বের কল্পনা করা যায় না এবং تَكْوِيْن এর সাথে مُكَوَّنْ এর সম্পর্ক তেমনি, ضَرب এর সাথে مَضْرُوْب এর সম্পর্ক যেমন। কেননা ضَرب হল, একটি আপেক্ষিক ও কাল্পনিক গুণ। দুটি আপেক্ষিক বিষয় অর্থাৎ ضَارِبٌ ও مَضرب ব্যতিত তার অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। আর تَكْوِيْن হল, একটি প্রকৃত সিফাত, যা ঐ اِضَافَت (সম্বন্ধের) এর বুনিয়াদ যাকে অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্বে নিয়ে আসা বলে। হুবহু اِضَافَت (সহ অর্থ) নয়। এমনকি যদি হুবহু اِضَافَت হত যেমনটি মাশায়িখদের

ইবারতে রয়েছে, তাহলে مُكَوَّن ব্যতিত সেটি পাওয়া যাওয়ার উক্তিটি অহংকারমূলক হবে এবং স্পষ্ট বিষয়কে অস্বীকার করা হবে। সুতরাং (আশায়েরাদের দলীল পেশ করা) খণ্ডিত হবে না ঐ উত্তর দ্বারা, যা এভাবে বর্ণনা করা হয় যে, ضَرب একটি عَرَض (আপতন) যা অবশিষ্ট থাকা অসম্ভব, তাহলে مَفْعُوْل এর সাথে তার সম্পৃক্ততা এবং مَفْعُوْل পর্যন্ত ব্যাখ্যা পৌঁছার জন্য তার সাথে مَفْعُوْل এর অস্তিত্ব থাকা আবশ্যক। কেননা সেটি যদি উহা (مَفْعُوْل) থেকে পিছিয়ে থাকে, তাহলে ضَرب অস্তিত্বহীন হয়ে পড়বে। আল্লাহ তা'আলার فِعْل (কাজ) এর বিপরীত। কেননা সেটি অনাদি এবং স্থায়ী। مَفْعُوْل পাওয়া যাওয়া পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

মুসান্নিফ রহ. স্বীয় উক্তি وَهُوَ تَكْوِيْنُهُ لِلْعَالَمِ দ্বারা تَكْوِيْن নশ্বর হওয়ার ব্যাপারে আশ'আরীদের দলীলের উত্তরের প্রতি ইশারা করেছেন। এর সারমর্ম হল, আমরা মানি না যে, تَكْوِيْن এর সাথে مُكَوَّن এর এমনই সম্পর্ক আছে, ضَرب এর সাথে مَضْرُوْب এর। যেমনিভাবে مَضْرُوْب ব্যতিত ضَرب এর অস্তিত্ব লাভ হয় না, তেমনি مُكَوَّن ব্যতিত مُكَوَّن এর অস্তিত্বের কথা ভাবা যায় না। কাজেই تَكْوِيْن যদি অনাদি হয়, তাহলে مُكَوَّن তথা বিশ্ব জগতও অনাদি হওয়া আবশ্যক হবে। এর কারণ হল, تَكْوِيْن ও ضَرب এর মাঝে স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। যেমন, ضَرب হল, একটি আপেক্ষিক ও কাল্পনিক গুণ, যা ضَارِب ও مَضْرُوْب ব্যতিত কল্পনাতীত। কিন্তু تَكْوِيْن এমন নয় বরং তা প্রকৃত গুণ, যা আপেক্ষিক অর্থাৎ অস্তিত্বহীনতা থেকে বের করে অস্তিত্ব দান করার বুনিয়াদ ও ইল্লত; সরাসরি আপেক্ষিক বিষয় অর্থাৎ অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্ব দান করা নয়। যেমন, কোন কোন আশ'আরী মাশায়িখদের কালামে ভুল বশতঃ একে আপেক্ষিক বিষয় تَكْوِيْن বলা হয়েছে। বাস্তবিকই যদি তাই হয়, তাহলে তো مُكَوَّن ব্যতিত تَكْوِيْن এর অস্তিত্ব স্বীকার করার উক্তি অহংকার বশতঃ স্পষ্ট বিষয়কে অস্বীকার করা হত।

قَوْلُهُ : فَلَا يَنْدَفِعُ ঃ কোন কোন মাশায়িখ যখন অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্বে নিয়ে আসা দ্বারা تَكْوِيْن ব্যাখ্যা করেছেন, তখন উমদা প্রণেতা ইমাম সাবুনী রহ. মাশায়িখগণের উক্ত ব্যাখ্যাকে ظَاهِر এর উপর প্রয়োগ করে বলেছেন, تَكْوِيْن হুবহু আপেক্ষিক বিষয় অর্থাৎ অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্বে আনা। আর আশায়েরাদের দলীলের উত্তর ضَرب এবং تَكْوِيْن এর মাঝে এভাবে পার্থক্য বর্ণনা করে দিয়েছেন যে, ضَرب এটা এমন عَرَض নয়, যা অবশিষ্ট থাকে। একারণে তার অস্তিত্বের সময় مَفْعُوْل অর্থাৎ مَضْرُوْب বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। তবে تَكْوِيْن এমন নয় বরং তা বাকী থাকা আবশ্যক। তাই সেটি আদিকাল থেকে مُكَوَّن (সৃষ্টে) এর অস্তিত্ব পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে। শারিহ রহ. তাদের উক্ত উত্তরকে খণ্ডন করে বলেন, এ উত্তর দ্বারা আশায়েরাদের দলীল খণ্ডন হবে না। কেননা আশ'আরীগণ تَكْوِيْن কে হুবহু اِضَافَت মনে করে না।

قَوْلُهُ بِخِلَاف ঃ আল্লাহ তা'আলার فِعْل দ্বারা تَكْوِيْن উদ্দেশ্য। যেহেতু শারিহ রহ. আশ'আরী। আর আশ'আরীদের মতে تَكْوِيْن টা সিফাতে اِفْعَال এর অন্তর্ভুক্ত, এ কারণে তারা تَكْوِيْن কে فِعْل শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছে।

وَهُوَ غَيْرُ الْمُكَوَّنِ عِنْدَنَا لِاَنَّ الْفِعْلَ يُغَايِرُ الْمَفْعُوْلَ بِالضَّرُوْرَةِ كَالضَّرْبِ مَعَ الْمَضْرُوْبِ وَالْاَكْلِ مَعَ الْمَاكُوْلِ وَلِاَنَّهُ لَوْكَانَ نَفْسُ الْمُكَوَّنِ لَزِمَ اَنْ يَّكُوْنَ الْمُكَوَّنُ مُكَوَّنًا مَخْلُوْقًا بِنَفْسِهِ ضَرُوْرَةَ اَنَّهُ مُكَوَّنٌ بِالتَّكْوِيْنِ الَّذِىْ هُوَ عَيْنُهُ فَيَكُوْنُ قَدِيْمًا مُسْتَغْنِيًا عَنِ الصَّانِعِ وَهُوَ مَحَالٌ وَاَنْ لَايَكُوْنَ لِلْخَالِقِ تَعَلُّقٌ بِالْعَالَمِ سِوٰى اَنَّهُ اَقْدَمُ مِنْهُ قَادِرٌ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ صُنْعٍ وَتَاْثِيْرٍ فِيْهِ ضَرُوْرَةَ تَكَوُّنِهِ بِنَفْسِهِ وَهٰذَا لَايُوْجِبُ كَوْنَهُ خَالِقًا وَالْعَالَمُ مَخْلُوْقًا فَلَا يَصِحُّ الْقَوْلُ بِاَنَّهُ خَالِقٌ لِلْعَالَمِ وَصَانِعُهُ هٰذَا خُلْفٌ، وَاَنْ لَّايَكُوْنَ اللّٰهُ تَعَالٰى مُكَوِّنًا لِلْاَشْيَاءِ ضَرُوْرَةَ اَنَّهُ لَامَعْنٰى لِلْمُكَوِّنِ اِلَّا مَنْ قَامَ بِهِ التَّكْوِيْنُ، وَالتَّكْوِيْنُ، اِذَا كَانَ عَيْنَ الْمُكَوَّنِ لَايَكُوْنُ قَائِمًا بِذَاتِ اللّٰهِ

تَعَالٰى ، وَاَنْ يَّصِحَّ الْقَوْلُ بِاَنَّ خَالِقَ سَوَادِ هٰذَا الْحَجَرِ اَسْوَدُ وَهٰذَا الْحَجَرِ خَالِقٌ لِلسَّوَادِ اِذْ لَامَعْنٰى لِلْخَالِقِ وَالْاَسْوَدِ اِلَّا مَنْ قَامَ بِهِ الْخَلْقُ وَالسَّوَادُ وَهُمَا وَاحِدٌ فَمَحَلُّهُمَا وَاحِدٌ .

সহজ তরজমা

تَكْوِيْن ও مُكَوَّن এক নয় ঃ আর উহা (تَكْوِيْن) আমাদের মাতুরিদিয়্যাদের মতে مُكَوَّن ভিন্ন অন্য কিছু। কেননা فِعْل নিশ্চিতভাবে তার مَفْعُوْل এর غَيْر (ভিন্ন) হয়। যেমন– ضَرْب - مَضْرُوْب এর সাথে এবং مَاكُوْل - اَكْل এর সাথে (ভিন্নতা রাখে) এবং আবশ্যক হবে। (১) مُكَوَّن নিজে নিজে مُكَوَّن এবং مَخْلُوْق হওয়া। এ কথা নিশ্চিত হওয়া যে, উহা ঐ تَكْوِيْن এর কারণে مُكَوَّن তথা অস্তিত্ববান হয়েছে, যা হুবহু مُكَوَّن সুতরাং সেটি قَدِيْم হবে এবং স্রষ্টা থেকে অমূখাপেক্ষী হবে। আর এটা তো অসম্ভব। এবং (আবশ্যক হবে) (২) যে স্রষ্টার সাথে বিশ্বজগতের কোন সম্পর্ক না থাকা, এতটুকু ছাড়া যে, তিনি বিশ্বজগত হতে قَدِيْم এবং তিনি বিশ্বজগত সৃষ্টির ক্ষমতা রাখেন। তাকে বানানো এবং তাতে কোন প্রকার প্রভাব সৃষ্টি করা ছাড়াই। সেটি নিজে নিজে সৃষ্টি হয়ে যাওয়া আর ইহা তার স্রষ্টা হওয়া এবং বিশ্বজগত সৃষ্ট বস্তু হওয়াকে প্রমাণিত করে না। সুতরাং এ কথা বলা বিশুদ্ধ হবে না যে, তিনি বিশ্ব জগতের স্রষ্টা, এটা স্বীকৃত বিষয়ের বিপরীত এবং (আবশ্যক হবে) (৩) আল্লাহ তা'আলা বস্তু সমূহের স্রষ্টা ও مُكَوَّن না হওয়া। একথা নিশ্চিত হওয়ার কারণে যে, مُكَوَّن বলতে ইহাই উদ্দেশ্য, যার সাথে تَكْوِيْن প্রতিষ্ঠিত আছে, আর تَكْوِيْن যখন হুবহু مُكَوَّن হবে, তখন তা আল্লাহর সত্তার সাথে প্রতিষ্ঠিত থাকবে না

(৪) এবং (আবশ্যক হবে) এ কথা বলা শুদ্ধ হবে যে, পাথরের কালো রংয়ের স্রষ্টা হল اَسْوَد এবং এ পাথরটি কালো রংয়ের স্রষ্টা। কেননা স্রষ্টা ও اَسْوَد এর কোন অর্থ হয় না ঐ ব্যক্তি ব্যতিত, যার সাথে সৃষ্টি ও سَوَاد (কালো) প্রতিষ্ঠিত এবং উভয়টি এক, তাহলে উভয়টির স্থানও এক ।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

আশায়েরাদের মতে مُكَوَّن ও تَكْوِيْن

তারা যখন দেখলেন, নসগুলোতে مَخْلُوْق এর জন্য خَلْق শব্দের প্রয়োগ হয়েছে। যেমন,

هٰذَا خَلْقُ اللّٰهِ فَاَرُوْنِىْ مَاذَا خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ

এমনিভাবে اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

এমনিভাবে বলা হয় اِجْتَمَعَ خَلْقٌ عَظِيْمٌ - এ সবগুলোতে خَلْق শব্দ مَخْلُوْق অর্থে ব্যবহৃত। এ কারণে আশআরিয়্যাহগণ বলেছেন, خَلْق হুবহু مَخْلُوْق এবং تَكْوِيْن হুবহু مُكَوَّن মুসসান্নিফ রহ. তাদের মতামত খণ্ডন করতে গিয়ে বলেন, আমাদের মুতারিয়্যাহদের মতে تَكْوِيْن ও مُكَوَّن এর মাঝে ভিন্নতা হয়েছে। শারিহ রহ. মাতুরিদিয়্যাহদের পক্ষ থেকে এ প্রসঙ্গে দুটি দলীল পেশ করেছেন।

প্রথম দলীলঃ যার صُغْرٰى উহ্য রয়েছে, তা হল تَكْوِيْن একটি فِعْل আর প্রতিটি فِعْل তার مَفْعُوْل এর غَيْر (ভিন্ন) হয়। কাজেই تَكْوِيْن ও তার مَفْعُوْل তথা مُكَوَّن এর غَيْر হবে। যেমন ضَرْب - مَضْرُوْب হতে এবং اَكْل - مَاكُوْل হতে ভিন্ন হয়।

দ্বিতীয় দলীলঃ যদি تَكْوِيْن হুবহু مُكَوَّن হয় তাহলে একাধিক অসম্ভব বিষয় আবশ্যক হবে। যেমন,

(১) مُكَوَّن নিজে নিজে সৃষ্টি ও বিদ্যমান হওয়া আবশ্যক হবে। কেননা উহা তো সৃষ্টি ও বিদ্যমান হবে ঐ تَكْوِيْن এর কারণে, যা হুবহু مُكَوَّن তাহলে নিজে আপন সত্তা থেকে বিদ্যমান হয়েছে। আর যে জিনিস নিজে নিজে অস্তিত্ব লাভ করে এবং এক্ষেত্রে অন্যের মূলাপেক্ষী হয় না, তা قَدِيْم হয়। কাজেই مُكَوَّن তথা বিশ্বজগত قَدِيْم হবে। আর قَدِيْم যেহেতু, স্রষ্টা থেকে অমূখাপেক্ষী হয়, এ কারণে مُكَوَّن ও স্রষ্টা থেকে অমূখাপেক্ষী হবে। আর এটা তো অসম্ভব।

(২) তদ্রূপ স্রষ্টা বিশ্বজগত হতে বেশী قَدِيْم হওয়া এবং তাকে সৃষ্টির ক্ষমতাবান আখ্যা দেওয়া ব্যতিত তাদের মাঝে অন্য কোন সম্পর্ক থাকবে না। কেননা تَكْوِيْن টা হুবহু مُكَوَّن হলে তো নিজে নিজে অস্তিত্ব লাভ করবে। তখন তার অস্তিত্বে স্রষ্টার কোন দখল থাকবে না এবং خَالِق কে خَلْق (স্রষ্টা) বলা শুদ্ধ হবে না।

(৩) যখন تَكْوِيْن হুবহু مُكَوَّن হবে, তখন مكون টা حادث হওয়ায় تَكْوِيْن ও حَادِث হওয়া আবশ্যক হবে। আর আল্লাহ তা'আলার সত্তার সাথে حَوَادِث প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব। কাজেই تَكْوِيْن ও আল্লাহ তা'আলার সত্ত্বার সাথে প্রতিষ্ঠিত হবে না, তাহলে আল্লাহ তা'আলা বস্তু সমূহের স্রষ্টা হবে না। কারণ, مُكَوِّن (স্রষ্টা) তো তিনি হবেন, যার সাথে تَكْوِيْن প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

(৪) تَكْوِيْن কে হুবহু مُكَوَّن মেনে নেওয়ার ফলে আবশ্যকীয়ভাবে এ কথা বলাও শুদ্ধ হবে যে, এ পাথরের কালো রংয়ের স্রষ্টা হল أَسْوَد কেননা خَلْق হল تَكْوِيْن আর কালো রং হল مُكَوَّن। যখন مُكَوَّن ও تَكْوِيْن এক হবে তখন সৃষ্টি ও কালো রং একই হবে। যেহেতু উভয়টি এক; উভয়টির স্থানও এক হবে। সুতরাং পাথরের কালো রংয়ের স্রষ্টা সেটিই হবে, যার সাথে خَلْق (সৃষ্টি) প্রতিষ্ঠিত। আর সৃষ্টি যার সাথে প্রতিষ্ঠিত হবে কালো রং ও তার সাথে প্রতিষ্ঠিত হবে। মূলতঃ কালো রং যার সাথে প্রতিষ্ঠিত তা হল, أَسْوَد তথা কালো। তাহলে বুঝা গেল, উক্ত পাথরের কালো রংয়ের স্রষ্টা হল কালো। এমনিভাবে কালো রংয়ের স্রষ্টা তা-ই হবে, যার সাথে সৃষ্টি প্রতিষ্ঠিত। আর সৃষ্টি তার সাথে প্রতিষ্ঠিত কালো রং যার সাথে প্রতিষ্ঠিত। অতএব বুঝা গেল কালো রংয়ের স্রষ্টা হল উক্ত পাথর।

وَهٰذَا كُلُّهُ تَنْبِيْهٌ عَلٰى كَوْنِ الْحُكْمِ بِتَغَايُرِ الْفِعْلِ وَالْمَفْعُوْلِ ضَرُوْرِيًّا لٰكِنَّهُ يَنْبَغِىْ لِلْعَاقِلِ أَنْ يَتَأَمَّلَ فِىْ أَمْثَالِ هٰذِهِ الْمَبَاحِثِ وَلَا يُنْسَبُ إِلَى الرَّاسِخِيْنَ مِنْ عُلَمَاءِ الْأُصُوْلِ مَاتَكُوْنُ اِسْتِحَالَتُهُ بَدِيْهِيَّةً ظَاهِرَةً عَلٰى مَنْ لَهُ أَدْنٰى تَمْيِيْزٍ ، بَلْ يُطْلَبُ لِكَلَامِهِ مَحْمَلًا يَصْلُحُ مَحَلًّا لِنِزَاعِ الْعُلَمَاءِ وَخِلَافِ الْعُقَلَاءِ ، فَإِنَّ مَنْ قَالَ التَّكْوِيْنُ عَيْنُ الْمُكَوَّنِ أَرَادَ أَنَّ الْفَاعِلَ إِذَا فَعَلَ شَيْأً ، فَلَيْسَ هٰهُنَا إِلَّا الْفَاعِلُ وَالْمَفْعُوْلُ ، وَأَمَّا الْمَعْنَى الَّذِىْ يُعَبَّرُ عَنْهُ بِالتَّكْوِيْنِ وَالْإِيْجَادِ وَنَحْوِ ذٰلِكَ ، فَهُوَ أَمْرٌ اِعْتِبَارِيٌّ يَحْصُلُ فِى الْعَقْلِ مِنْ نِسْبَةِ الْفَاعِلِ إِلَى الْمَفْعُوْلِ ، وَلَيْسَ أَمْرًا مُحَقَّقًا مُغَايِرًا لِلْمَفْعُوْلِ فِى الْخَارِجِ ، وَلَمْ يُرِدْ أَنَّ مَفْهُوْمَ التَّكْوِيْنِ هُوَ بِعَيْنِهِ مَفْهُوْمُ الْمُكَوَّنِ ، لِتَلْزَمَ الْمُحَالَاتُ ، وَهٰذَا كَمَا يُقَالُ إِنَّ الْوُجُوْدَ عَيْنُ الْمَاهِيَةِ فِى الْخَارِجِ بِمَعْنٰى أَنَّهُ لَيْسَ فِى الْخَارِجِ لِلْمَاهِيَةِ تَحَقُّقٌ ، وَلِعَارِضِهَا الْمُسَمّٰى بِالْوُجُوْدِ تَحَقُّقٌ آخَرُ ، حَتّٰى يَجْتَمِعَا اِجْتِمَاعَ الْقَابِلِ وَالْمَقْبُوْلِ كَالْجِسْمِ وَالسَّوَادِ بَلِ الْمَاهِيَةُ إِذَا كَانَتْ ، فَكَوْنُهَا هُوَ وُجُوْدُهَا لٰكِنَّهُمَا مُتَغَايِرَانِ فِى الْعَقْلِ ، بِمَعْنٰى أَنَّ لِلْعَقْلِ أَنْ يُلَاحِظَ الْمَاهِيَّةَ دُوْنَ الْوُجُوْدِ وَبِالْعَكْسِ فَلَا يَتِمُّ إِبْطَالُ هٰذَا الرَّأْىِ إِلَّا بِإِثْبَاتِ أَنْ تَكُوْنَ الْأَشْيَاءُ وَصُدُوْرُهَا عَنِ الْبَارِىْ تَعَالٰى يَتَوَقَّفُ عَلٰى صِفَةٍ حَقِيْقِيَّةٍ قَائِمَةٍ بِالذَّاتِ مُغَايِرَةٍ لِلْقُدْرَةِ وَالْإِرَادَةِ .

সহজ তরজমা

আর এসব কিছু হল فِعْل এবং مَفْعُوْل এর মধ্য হতে প্রত্যেকটি একটি অপরটির বিপরীত হওয়ার হুকুম সর্বসম্মত হওয়ার প্রতি হুঁশিয়ারী। তবে জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য উচিৎ হল, এ ধরনের আলোচনাগুলোতে গভীর চিন্তা ভাবনা করা এবং বিজ্ঞ উলামায়ে উসূলের দিকে এমন কোন কথা সম্বোধিত না করা, যা স্পষ্টতঃ অসম্ভ বরং তার

কর্তব্য হল, তার কথায় এমন কোন সদার্থ বের করা, যা উলামায়ে কিরামের বিতর্ক ও মতানৈক্যের কেন্দ্রবিন্দু এবং জ্ঞানী-গুণীজনদের বিতর্কের বিষয় হতে পারে। কেননা যিনি বলেছেন, تَكْوِين ও مُكَوَّن এক জিনিস, তার উদ্দেশ্য ছিল, فَاعِل (কর্তা) যখন কোন কাজ সম্পাদন করে তখন সেখানে مَفْعُول ও فَاعِل ব্যতিত বাস্তবে অন্য কিছু থাকে না। আর যে কথাটি তাকবীন ও ইজাদ প্রভৃতি শব্দে ব্যক্ত করা হয়, সেটি একটি আপেক্ষিক বিষয় অর্জিত হয় মাফউলের দিকে ফায়েলের নিসবত করায় মানুষের জ্ঞানে। এমন নয় যে, তা মাফউল ব্যতীত অন্য কিছু, যা বাস্তবে বিদ্যমান, তাদের উদ্দেশ্য এই নয় যে, تَكْوِين অর্থই হুবহু مُكَوَّن এর অর্থ, যার কারণে অসম্ভব বিষয়াবলী আবশ্যক হয়ে পড়বে। এ বিষয়টি ঠিক তেমন, যেমন বলা হয় وُجُود (অস্তিত্ব) বাস্তবে হুবহু مَاهِيَت কে বলে অর্থাৎ এমন নয় যে, বাস্তবে ماهت এর পৃথক একটি অস্তিত্ব আছে এবং এর সাথে সংযুক্ত বাস্তবে অন্য একটি জিনিস আছে, এমনকি উভয়টি একই সাথে বিদ্যমান, যেভাবে قَابِل (গ্রহীতা) এবং مَقْبُول (গৃহিত বস্তু) যেমন جِسْم (দেহ) এবং سَوَاد (কালো রং) এক সাথে বিদ্যমান থাকে বরং مَاهِيَت যখনই অস্তিত্ব লাভ করবে তখন তার كَوْن ই তার অস্তিত্ব তবে উভয়টি স্মৃতিতে এ অর্থে ভিন্ন যে, অন্তরের পক্ষে مَاهِيَت এর কল্পনা করা বা অস্তিত্বের কল্পনা না করা সম্ভব এবং এর বিপরীরতও হতে পারে। সুতরাং ঐ মতাতের ভ্রান্ততা সাব্যস্ত করা এটা প্রমাণিত না করা পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ হবে না যে, বস্তুসমূহের تَكَوُّن (অস্তিত্ব) এবং আল্লাহ তা'আলা থেকে এগুলোর প্রকাশ পাওয়া এমন একটি গুণের উপর নির্ভরশীল, যা حَقِيْقِيْ বা প্রকৃত। যা আল্লাহ তা'আলার সত্ত্বায় قُدْرَت ও ইচ্ছা ব্যতিত প্রতিষ্ঠিত।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

قَوْلُهُ : هٰذَا تَنْبِيْهٌ ঃ যেহেতু مَفْعُول ও فِعْل এর মধ্যকার ভিন্নতা স্পষ্ট। আর স্পষ্ট বিষয়াদি দলীলপ্রমাণের মুখাপেক্ষী নয়। এ কারণেই শারিহ রহ. فِعْل ও مَفْعُول এর মধ্যকার ভিন্নতার উল্লেখিত দিকগুলোকে সতর্কবাণী বলে আখ্যা দিয়েছেন, দলীল হিসেবে নয়।

জ্ঞানীজনের উক্তিকে তাচ্ছিল্য করবে না

قَوْلُهُ : لٰكِنَّهُ يَنْبَغِيْ ঃ মাতুরিদী মতাবলম্বী মুসান্নিফ রহ. যখন বললেন, আমাদের মাতুরিদিয়াদের মতে تَكْوِين টা مكون এর غَيْر (ভিন্ন)। কেমন যে তিনি আশায়িরাদেরকে নিজেদের বিরোধী পক্ষ এবং تَكْوِين হুবহু مُكَوَّن হওয়ার প্রবক্তা সাব্যস্ত করেছেন। এ কারণে শারিহ রহ. প্রথমে মুসান্নিফ রহ. এর উপর অভিযোগ ও পরে আশারিয়াদের উক্তির ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। অভিযোগের সারমর্ম হল, فِعْل ও مَفْعُول এমনিভাবে تَكْوِين ও مُكَوَّن এর মধ্যকার ভিন্নতা এত স্পষ্ট বিষয় যে, তা আশ'আরীগণের মত বিজ্ঞ ওলামায়ে উসূল তো দূরের কথা একজন সাধারণ জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিও অস্বীকার করতে পারে না। কাজেই আশয়ারীদের প্রতি মুসান্নিফ কর্তৃক এমন কথা নিসবত করা উচিৎ হয়নি। যা অসম্ভব হওয়া সুস্পষ্ট ও সর্বসম্মত। বরং আশয়ারিয়্যাদের কথার এমন কোন ব্যাখ্যা করা উচিৎ, যাতে জ্ঞানীদের বিতর্কের সুযোগ রয়েছে। আর যদি এমন সম্ভব না হয় তাহলে এটা তাদের ভুল মনে করতে হবে, যারা আশ'আরীদের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন।

আশ'আরীদের কথার ব্যাখ্যা

قَوْلُهُ: فَإِنَّ مَنْ قَالَ ঃ এখানে বলা হয়েছে تَكْوِين কে হুবহু مُكَوَّن বলায় আশ'আরীদের উদ্দেশ্য আদৌ এমন নয় যে, উভয়টি এক ও অভিন্ন। যেমন মাতুরিদিয়্যাহগণ বুঝেছেনে। বরং তাদের উদ্দেশ্য হল, فَاعِل যখন কোন কাজ সম্পাদন করে, যেমন– কোন প্রহারকারী কাউকে প্রহার করে তখন বাস্তবে শুধু ضَارِب (প্রহারকারী) ও مَضْرُوْب (প্রহৃত) এর অস্তিত্ব থাকে। ضَرْب (প্রহার) বলে যা ব্যক্ত করা হয়, তা মূলতঃ বাস্তবে বিদ্যমান হয় না বরং তা হল, ضَارِب ও مَضْرُوْب এর মধ্যকার সম্পর্ক, যা কাল্পনিক বিষয়। এমনিভাবে تَكْوِين টাও مُكَوِّن (স্রষ্টা) ও مُكَوَّن (সৃষ্টি) এর মধ্যকার একটি সম্পর্ক, যা কেবল অন্তরে কল্পনায় আসে, বাস্তবে বিদ্যমান হয় না এবং تَكْوِين হুবহু مُكَوَّن হওয়ার বিষয়টি এমনই, যেমন বলা হয় বাস্তবে مَاهِيَت অস্তিত্ব হুবহু مَاهِيَت এর অর্থ আদৌ এমন নয় যে, مَاهِيَت ও مَاهِيَت এর অস্তিত্বের আভিধানিক অর্থ এক। বরং এর উদ্দেশ্য হল, এমন নয় যে, বাস্তবে مَاهِيَت এর একটি অস্তিত্ব আছে। আর وُجُود (অস্তিত্ব) নামের যে গুণটি مَاهِيَت এর সাথে যুক্ত হয়েছে, তার একটি পৃথক অস্তিত্ব আছে এবং উভয়টি বাস্তবে এমনভাবে একসাথে বিদ্যমান, যেমন ভাবে قَابِل (গ্রহীতা) যেমন جِسْم (দেহ)

এবং مَقْبُوْل (গৃহীত) যেমন কাল রং এক সাথে বিদ্যমান বরং কোন বস্তু যখনই বাস্তবে অস্তিত্ব লাভ করবে, তখন তার এ অস্তিত্বই তার অস্তিত্ব বাস্তবে এদের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। তবে হ্যাঁ অন্তরে উভয়টি পরস্পর ভিন্ন হতে পারে। কেননা مَابِهِ الشَّيْئُ هُوَ هُوَ কে مَاهِيَت বলে। আর কোন বস্তু বাস্তবে বিদ্যমান হওয়াকে وُجُوْد বলে। সুতরাং হতে পারে অন্তর একটি ব্যতিত অপরটির কল্পনা করবে।

قَوْلُهُ: فَلَايَتِمُّ اِبْطَالُ هٰذَا الرَّاْيِ ঃ অর্থাৎ যখন تَكْوِيْن হুবহু مُكَوَّن হওয়ার দ্বারা আশ'আরীদের উদ্দেশ্য হল, বাস্তবে مُكَوَّن ছাড়া অন্য কিছু বিদ্যমান নেই, যাকে تَكْوِيْن বলা যায় বরং এটি হল, একটি আপেক্ষিক বিষয়। অতএব মাতুরীদের উপরোল্লিখিত দলীল-প্রমাণ দ্বারা ততক্ষণ পর্যন্ত এ মাযহাব বাতিল হবে না, যাবৎ না আল্লাহ তা'আলা থেকে বস্তুসমূহের সৃষ্টি এমন গুণের উপর নির্ভশীল হওয়া সাব্যস্ত করা যাবে, যা حَقِيْقِى এবং আল্লাহর সত্তার সাথে প্রতিষ্ঠিত, قُدْرَت ও اِرَادَه ছাড়া অন্য কোন গুণ কেননা উপরোল্লিখিত প্রমাণাদি অর্থগত দিক দিয়ে تَكْوِيْن ও مُكَوَّن এর মাঝে বৈপরিত্ব প্রমাণ করে। আর আশ'আরীগণ তা অস্বীকার করে না বরং তারা বাস্তব অস্তিত্বের দিকে লক্ষ্য করে বৈপরিত্বকে অস্বীকার করে থাকেন, হ্যাঁ تَكْوِيْن যখন حَقِيْقِى গুণ বলে প্রমাণিত হবে, তখন তা নিশ্চিতভাবে আল্লাহ তা'আলার সাথে প্রতিষ্ঠিত হবে। আর আল্লাহ তা'আলার সাথে حادث বস্তসমূহ প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব, বলে সেটি অনাদিও হবে। অথচ مُكَوَّن তথা সৃষ্টিজগৎ অনাদি নয়, তাহলে বাস্তবে تكوين টা مكون থেকে ভিন্ন কিছু হবে।

আশ'আরীদের বিরুদ্ধে আপত্তি

শারিহ রহ. এর উল্লেখিত ব্যাখ্যার উপর মাতরিদীগণ প্রশ্ন করেন, যদি تَكْوِيْن এ কারণে আপেক্ষিক ও কাল্পনিক বিষয় হয় যে, সেটি বাস্তবে বিদ্যমান নয় বরং مُكَوِّن (স্রষ্টা) ও مُكَوَّن (সৃষ্টি) এর মধ্যকার সম্পর্ক, তাহলে ইলমও আপেক্ষিক এবং কাল্পনিক বিষয় হওয়া চাই। কেননা বাস্তবে ইলম ও مَعْلُوْم ব্যতিত অন্য কিছু অস্তিত্বে নেই, যাকে عَالِم বলে আখ্যা দেওয়া যায়। বরং তা তো عَالِم ও مَعْلُوْم এর মধ্যকার এক সম্পর্ক, যা আপেক্ষিক ও কাল্পনিক বিষয়। অথচ عَالِم আপেক্ষিক ও কাল্পনিক গুণ হওয়া উভয়পক্ষের নিকট বাতিল। কাজেই تَكْوِيْن টিও আপেক্ষিক ও কাল্পনিক বিষয় হওয়া বাতিল।

وَالتَّحْقِيْقُ اَنَّ تَعَلُّقَ الْقُدْرَةِ عَلٰى وِفْقِ الْاِرَادَةِ بِوُجُوْدِ الْمَقْدُوْرِ لِوَقْتِ وُجُوْدِهٖ اِذَا نُسِبَ اِلَى الْقُدْرَةِ يُسَمّٰى اِيْجَادًا لَهٗ وَاِذَا نُسِبَ اِلَى الْقَادِرِ يُسَمَّى الْخَلْقُ وَالتَّكْوِيْنُ وَنَحْوُ ذٰلِكَ فَحَقِيْقَتُهٗ كَوْنُ الذَّاتِ بِحَيْثُ تَعَلَّقَتْ قُدْرَتُهٗ بِوُجُوْدِ الْمَقْدُوْرِ لِوَقْتِهٖ ثُمَّ تَتَحَقَّقُ بِحَسَبِ خُصُوْصِيَّاتِ الْمَقْدُوْرَاتِ خُصُوْصِيَّاتُ الْاَفْعَالِ كَالتَّصْوِيْرِ وَالتَّرْزِيْقِ وَالْاِحْيَاءِ وَالْاِمَاتَةِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ اِلٰى مَالَا يَكَادُ يَتَنَاهٰى .

সহজ তরজমা

আর গবেষণালব্ধ কথা হল, ইচ্ছানুযায়ী ক্ষমতাধীন বস্তুর অস্তিত্বের সাথে তার অস্তিত্বের সময় কুদরতের সম্পর্ক যখন কুদরতের দিকে হয়, তখন তাকে اِيْجَاد বলে। আর যখন قادر (ক্ষমতাবান) এর দিকে নিসবত করা হয় তখন তাকে خلق - تكوين ইত্যাদি বলে। সুতরাং تَكْوِيْن এর প্রকৃত অর্থ হল, আল্লাহ তা'আলার সত্তা এমন পর্যায়ে থাকা যে, ক্ষমতাধীন বস্তুর অস্তিত্বের সাথে তার অস্তিত্বের সময় তার কুদরতের সম্পর্ক হবে, অতঃপর বিশেষ বিশেষ ক্ষমতাধীন বস্তু হিসেবে বিভিন্ন ধরনের বিশেষ বিশেষ কাজ হয়। যেমন, تَصْوِيْر (রূপায়ন) تَرْزِيْق (রিযিক প্রদান) اِحْيَاء (জীবনদান) اِمَاتَت (মৃত্যু দান) ইত্যাদি। এমন অনেকগুলো কাজ যেগুলো প্রায় সীমাহীন।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

এখানে শারিহ রহ. আশ'আরীদের ঐ মাযহাবের প্রতি নিজের আকর্ষণ প্রকাশ করেছেন অর্থাৎ تَكْوِيْن একটি আপেক্ষিক ও কাল্পনিক বিষয়। সারকথা হল, আল্লাহ তা'আলার ইলমে কোন সম্ভাব্য বস্তুর অস্তিত্বে যে নির্ধারিত সময় রয়েছে, সে নির্ধারিত সময়ে আল্লাহর ইচ্ছা মুতাবিক সম্ভাব্য বস্তুর অস্তিত্বের সাথে কুরদরতের সম্পর্কের নাম হল خَلْق এবং تَكْوِيْن। বস্তুতঃ সম্পর্ক একটি কাল্পানিক ও আপেক্ষিক বিষয় বলে তাকবীনও তদ্রুপ হবে। তারপর

বিশেষ ক্ষমতাধীন বিষয় এবং সম্ভাব্য বস্তুর সাথে কুদরতের সম্পর্ক হিসেবে সেগুলোর পৃথক নাম থাকে। যেমন, ক্ষমতাধীন জিনিস রিযিক হলে তার সাথে কুদরতের সম্পর্ককে تَرْزِيْق বলে। কোন বস্তুর আকার বা চিত্র হলে তার সাথে কুদরতের সম্পর্ককে تَصْوِيْر বলে। আর ক্ষমতাধীন বস্তু জীবন হলে তার সাথে কুদরতে সম্পর্কে إِحْيَاء বলে, এভাবে বুঝে নাও ।

وَأَمَّا كَوْنُ كُلِّ مِنْ ذٰلِكَ صِفَةً حَقِيْقِيَّةً أَزَلِيَّةً فَمِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ بَعْضُ عُلَمَاءِ مَا وَرَاءَ النَّهْرِ وَفِيْهِ تَكْثِيْرٌ لِلْقُدَمَاءِ جِدًّا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُتَغَايِرَةً وَالْأَقْرَبُ مَاذَهَبَ إِلَيْهِ الْمُحَقِّقُوْنَ مِنْهُمْ وَهُوَ أَنَّ مَرْجِعَ الْكُلِّ إِلَى التَّكْوِيْنِ فَإِنَّهُ إِنْ تَعَلَّقَ بِالْحَيٰوةِ يُسَمَّى إِحْيَاءً وَبِالْمَوْتِ إِمَاتَةً وَبِالصُّوْرَةِ تَصْوِيْرًا وَبِالرِّزْقِ تَرْزِيْقًا إِلَى غَيْرِ ذٰلِكَ فَالْكُلُّ تَكْوِيْنٌ وَإِنَّمَا الْخُصُوْصُ بِخُصُوْصِيَّةِ التَّعَلُّقَاتِ.

সহজ তরজমা

অবশ্য উপরিউক্ত প্রতিটি فِعْل হাক্বীক্বী এবং অনাদি সিফাত হওয়ার বিষয়টি রয়ে গেল। সুতরাং এটি সে সব উক্তির অন্তর্ভূক্ত, যেগুলো এককভাবে مَاوَرَاءِ النَّهْر এর উলামায়ে কিরাম বলেছেন। অথচ এতে অনেক قَدِيْم বিষয় রয়েছে। মূলতঃ সঠিকতার নিকটবর্তী হল, মুহাক্কিক উলামায়ে কিরামের মাযহাব। সেটি হল, সব ক্রিয়া-কলাপের নির্যাস হল, تَكْوِيْن । কেননা تَكْوِيْن এর সম্পর্ক হায়াতের সাথে হলে তাকে إِحْيَاء (জীবন দান) বলে। মৃত্যুর সাথে হলে তাকে إِمَاتَت বলে। আর রিযিকের সাথে সম্পর্ক হলে তাকে تَرْزِيْق বলে। তাহলে সব কিছুই تَكْوِيْن । আর নামের বৈচিত্রতা নিছক সম্পর্কের বৈচিত্রতার কারণে হয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

উল্লেখিত ইবারতের সারমর্ম হল, মাতুরিদিয়াদের মধ্য হতে কোন কোন আলিম উল্লেখিত ফে'লসমূহ যেমন, إِحْيَاء (জীবন দান) إِمَاتَت (মৃত্যু দান) تَرْزِيْق (রিযিক দান) تَصْوِيْر (আকৃতি দান) ইত্যাদির প্রত্যেকটিকে حَقِيْقِي এবং أَزَلِي (অনাদি) গুণ মনে করেন, এতে قَدِيْم অনেক হওয়া আবশ্যক নয়, যা পছন্দনীয় নয়। এই কিছু মুহাক্কিক মাতুরিদী উলামায়ে কিরামের মাযহাবই সঠিকতর। তাদের মতে إِحْيَاء - إِمَاتَت - تَرْزِيْق - تَصْوِيْر ইত্যাদি স্বতন্ত্র কোন গুণ নয় বরং এসব تَكْوِيْن ই। তবে বিশেষ বিশেষ সম্পর্কের দরুন এর বিশেষ বিশেষ নাম রয়েছে। যেমন, تَكْوِيْن এর সম্পর্ক আকৃতির সাথে হলে ঐ تَكْوِيْن কেই تَصْوِيْر বলে। আবার সম্পর্ক رِزْق এর সাথে হয় তখন ঐ تَكْوِيْن কেই تَرْزِيْق বলা হয়। وَعَلٰى هٰذَا الْقِيَاس

قَوْلُهُ: اِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَغَايِرَةً ঃ ইতোপূর্বে لَاهُوَ وَلَا غَيْرُهُ এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, শর্তহীন قَدِيْم বেশী হওয়া অসম্ভব নয় বরং ভিন্ন ভিন্ন অনেক قَدِيْم অসম্ভব। এখানে শারিহ রহ. বলেন, উল্লেখিত ফে'লসমূহ যদিও ভিন্ন ভিন্ন, তথাপি قَدِيْم অনেক হওয়া অনুত্তম।

وَالْإِرَادَةُ صِفَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى أَزَلِيَّةٌ قَائِمَةٌ بِذَاتِهِ كَرَّرَ ذٰلِكَ تَاكِيْدًا وَتَحْقِيْقًا لِإِثْبَاتِ صِفَةٍ قَدِيْمَةٍ لِلّٰهِ تَعَالٰى تَقْتَضِىْ تَخْصِيْصَ الْمُكَوَّنَاتِ بِوَجْهٍ دُوْنَ وَجْهٍ وَفِىْ وَقْتٍ دُوْنَ وَقْتٍ لَا كَمَا زَعَمَتِ الْفَلَاسِفَةُ مِنْ أَنَّهُ تَعَالٰى مُوْجِبٌ بِالذَّاتِ لَافَاعِلٌ بِالْإِرَادَةِ وَالْاِخْتِيَارِ وَالنَّجَّارِيَّةُ مِنْ أَنَّهُ مُرِيْدٌ بِذَاتِهِ لَابِصِفَتِهِ وَبَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ مِنْ أَنَّهُ مُرِيْدٌ بِإِرَادَةٍ حَادِثَةٍ لَا فِىْ مَحَلٍّ وَالْكَرَّامِيَّةُ مِنْ أَنَّ إِرَادَتَهُ حَادِثَةٌ فِىْ ذَاتِهِ.

সহজ তরজমা

এবং ইচ্ছা আল্লাহ তা'আলার অনাদি গুণ, যা তার সত্তার সাথে প্রতিষ্ঠিত, এ কথাটি তাকিদ এর জন্য এবং আল্লাহ তা'আলার জন্য এমন একটি قَدِيْم গুণ প্রমাণিত করার জন্য পুনারায় উল্লেখ করেছেন, যা مُكَوَّنَات (সৃষ্টিকারী) কে নিদিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট গুণে গুণান্বিত করার তাকাদা রাখে। এমন নয় যেমন দার্শনিকগণ বলে থাকেন যে, আল্লাহ তা'আলা স্বত্তাগতভাবে কোন জিনিসকে অস্তিত্ব দান করেন; ইচ্ছা ও ইখতিয়ারে নয় এবং এমনও নয় যেমন নাজজারিয়াগণ বলেন অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা পোষণ করেন স্বীয় কোন গুণে গুণান্বিত হওয়ায় নয় এবং এমনও নয় যেমন কোন কোন মুতাযিলা বলেন, আল্লাহ তা'আলা এমন ইচ্ছা পোষণ করেন, যা حَادِث এবং কোন স্থানে নয় এবং এমনও নয় যেমন কোন কোন كَرَامِيَّه বলে থাকে যে, আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা স্বয়ং তার সত্তার মধ্যে হাদেস।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

আল্লাহর ইচ্ছা ইরাদা ঃ ইচ্ছা-ইরাদা আল্লাহ তা'আলার একটি গুণ ইতোপূর্বে প্রকৃত অনাদি গুণাবলীর বর্ণনায় লেখক একথা উল্লেখ করেছেন। এখানে গুরুত্বারোপের জন্য তার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এ গুণটি বিদ্যমান হওয়ার দলীল হল, مُكَوَّنَات ও مَخْلُوْقَات সকল গুণাবলী ও অবস্থার সাথে এমনিভাবে তার অস্তিত্বের সকল সময়ের সাথে কুদরতের সম্পর্ক সমান। যেমন, আল্লাহ তা'আলা যায়েদকে সুন্দর ছেলে দিতে সক্ষম, তেমনি বিশ্রি ছেলে দিতেও সক্ষম। যেমনিভাবে দিনে তৈরী করতে সক্ষম, তেমনিভাবে রাতে তৈরী করতেও সক্ষম। এখন যদি যায়েদের এখানে দিনে সুন্দর ছেলে জন্ম নেয় তাহলে প্রশ্ন হবে, আল্লাহ তা'আলা যখন বিশ্রী ছেলে সৃষ্টি করতেও সক্ষম ছিলেন এবং রাত্রেও সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেন, তাহলে সুশ্রী সন্তান কেন সৃষ্টি করলেন এবং দিনেই কেন সৃষ্টি করলেন? অর্থাৎ কোন কারণটি সুশ্রীকে কুশ্রীর উপর এবং দিনে সৃষ্টি হওয়াকে রাত্রে উপর প্রধান্য দিয়েছে? একজন সাধারণ মানুষও এসব প্রশ্নের উত্তরে বলবে, আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা অর্থাৎ কুদরতের সম্পর্ক যদিও ছেলের সুন্দর ও বিশ্রী উভয়াবস্থার সাথে এবং রাত অথবা দিনে জন্ম নেওয়ার সাথে বরাবর ছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা সুন্দর হওয়াকে বিশ্রী হওয়ার ওপর এবং দিনে হওয়াকে রাতে হওয়ার উপর প্রাধান্য দিয়েছে।

বুঝা গেল, ইচ্ছা এমন একটি গুণ যা কোন কোন مُكَوَّنَات কে এক গুণে যেমন সৌন্দর্যের সাথে এবং কোন কোন مُكَوَّنَات কে অন্য গুণ যেমন কদাকারের সাথে এবং কোন مُكَوَّنَات কে এক সময় যেমন দিনে বিদ্যমান করার সাথে আবার কোনটিকে অন্য সময় যেমন রাতে আবার কোনটিকে অন্য সময় যেমন রাতে বিদ্যমান করার সাথে বিশেষত্ব দান করা ও প্রাধান্য দেওয়ার তাগাদা রাখে। আল্লাহ তা'আলার জন্য যখন ইচ্ছার গুণ প্রমাণিত আছে, তখন ঐ সকল দার্শনিকদের মতামত খণ্ডন হয়ে গলে, যারা আল্লাহ তা'আলার জন্য ইচ্ছা গুণটি প্রমাণিত হওয়াকে অস্বীকার করে এবং বলে, আল্লাহ তা'আলা কোন বস্তুর অস্তিত্ব নিজেই দান করেছেন অর্থাৎ তার সত্তাই ঐ فِعْل টি অস্তিত্ব দানের দাবী রাখে; এক্ষেত্রে তার ইচ্ছা-ইখতিয়ারের কোন দখল নেই।

তাদের দলীল হল, আল্লাহ তা'আলার জন্য ইচ্ছা গুণটি প্রমাণিত হলে দু অবস্থা থেকে মুক্ত নয়। তা হয়ত حَادِث হবে, নয়ত قَدِيْم হবে। অথচ উভয়টি বাতিল। প্রথমটি এ কারণে যে, এতে আল্লাহ তা'আলার সাথে حَادِث প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আবশ্যক হবে। আর দ্বিতীয়টি বাতিল এ কারণে যে, কোন জিনিসকে সৃষ্টি করার ইচ্ছা বস্তুটি সৃষ্টি করার পর আর বাকি থাকে না। এতে قَدِيْم এর নিঃশেষ হওয়া আবশ্যক হয়, যা অসম্ভব।

উত্তর হল, ইচ্ছা قَدِيْم এবং বস্তুটিকে সৃষ্টি করার পর তা নিশেষ হয় না বরং বস্তুটির অস্তিত্বের সাথে ইচ্ছার যে সম্পর্ক ছিল, তা দূরীভূত হয়। আর সম্পর্ক তো নশ্বর। কাজেই قَدِيْم এর নিঃশেষ ও দূরীভূত হওয়া আবশ্যক হল না। তাছাড়া ইচ্ছা যখন আল্লাহ তা'আলার গুণ আর কোন বস্তুর গুণ হুবহু ঐ বস্তু হয় না। ফলে নাজজারিয়াদের মতামত খণ্ডন হল। যারা বলে, আল্লাহ তা'আলা নিজেই ইচ্ছা পোষণ করেন, যার উদ্দেশ্যে হল, ইচ্ছা ও আল্লাহর সত্তা এক জিনিস। এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলার সত্তার সাথে ইচ্ছা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রবক্তা হওয়ায় কোন কোন মুতাযিলী যেমন আবু আলী জুব্বাঈ এবং আব্দুল জুব্বার মুতাযিলী এর মতামত খণ্ডন হল। যারা বলে, আল্লাহ তা'আলা এমন ইচ্ছা পোষণ করেন যা حَادِثٌ। এমনিভাবে ইচ্ছাকে অনাদি বলায় কাররামিয়াদের মতামত খণ্ডন হল। যারা আল্লাহর ইচ্ছাকে হাদেস এবং আল্লাহর স্বত্তার সাথে حَادِث বস্তু প্রতিষ্ঠিত হওয়া জায়েয বলে।

قَوْلُهُ: اَلنَّجَّارِيَّه ঃ এটি মুহাম্মাদ বিন হুসাইন নাজ্জার এর দিকে সম্বোধিত। কেউ কেউ বলেছেন, এরা মুতাযিলাদের একটি দল। আবার কারও কারও মতে এরা স্বতন্ত্র একটি দল।

وَالدَّلِيْلُ عَلٰى مَاذَكَرْنَا اَلْاٰيَاتُ النَّاطِقَةُ بِاِثْبَاتِ صِفَةِ الْاِرَادَةِ وَالْمَشِيَّةِ لِلّٰهِ تَعَالٰى مَعَ الْقَطْعِ بِلُزُوْمِ قِيَامِ صِفَةِ الشَّيْئِ بِهٖ وَامْتِنَاعِ قِيَامِ الْحَوَادِثِ بِذَاتِهٖ تَعَالٰى وَاَيْضًا نِظَامُ الْعَالَمِ وَوُجُوْدُهٗ عَلَى الْوَجْهِ الْاَوْفَقِ وَالْاَصْلَحِ دَلِيْلٌ عَلٰى كَوْنِ صَانِعِهٖ قَادِرًا مُخْتَارًا وَكَذَا حُدُوْثُهٗ اِذْ لَوْ كَانَ صَانِعُهٗ مُوْجِبًا بِالذَّاتِ لَزِمَ قِدَمُهٗ ضَرُوْرَةَ اِمْتِنَاعِ تَخَلُّفِ الْمَعْلُوْلِ عَنْ عِلَّتِهِ الْمُوْجِبَةِ .

সহজ তরজমা

এবং আমাদের আলোচ্য বিষয়ের (যে ইচ্ছা আল্লাহ তা'আলার গুণও তার সত্তার সাথে প্রতিষ্ঠিত) দলীল হল, বস্তুর গুণ বস্তু সাথে কায়েম থাকা আবশ্যক। তদ্রুপ আল্লাহর সত্তার সাথে حَادِث বস্তু প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব –একথাও নিশ্চিত। এ ব্যাপারে দলীল সেসব আয়াত, যেগুলো আল্লাহর ইচ্ছা-ইরাদা প্রমাণের জন্য সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা দেয়, তাছাড়া বিশ্বের শৃংখলাও সুন্দরভাবে এর অস্তিত্ব –এর সৃষ্টিকর্তা যে ক্ষমতাবান, স্বাধীন ইচ্ছা পোষণকারী এর দলীল। এমনিভাবে বিশ্বজগতের حَادِث হওয়াও (তার দলীল)। কেননা তার স্রষ্টা যদি সত্তাগতভাবে কোন জিনিসের স্রষ্টা হতেন, তাহলে তার قَدِيْم হওয়া আবশ্যক হত। কারণ, مَعْلُوْل তার عِلَّت হতে পিছিয়ে থাকা অসম্ভব –এটা নিশ্চিত বিষয়।

সহজ তাহকীক ও তাশরীহ

ইচ্ছা-ইরাদা যে আল্লাহর অনাদি গুণ এবং আল্লাহ তা'আলার সত্তার সাথে প্রতিষ্ঠিত -এর দলীল প্রথমতঃ সে সব আয়াত, যার মধ্যে আল্লাহ তা'আলার দিকে ইচ্ছা গুণের নিসবত করা হয়েছে। যার ফলে ইচ্ছা আল্লাহ তা'আলার গুণ হওয়া বুঝা যায়। যেমন, فَعَّالٌ لِمَا يُرِيْدُ - يُرِيْدُ بِكُمُ الْيُسْرَ এবং يَخْلُقُ مَايَشَاءُ ইত্যাদি।

তাছাড়া এ কথা নিশ্চিত যে, বস্তুর গুণ বস্তুর সাথে প্রতিষ্ঠিত হয়। কাজেই ইচ্ছা গুণটিও আল্লাহ তা'আলার সাথে প্রতিষ্ঠিত। আর এ কথাও নিশ্চিত যে, আল্লাহ তা'আলার সত্তার সাথে حَادِث বস্তু প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব। কাজেই নিঃসন্দেহে ইচ্ছা গুণটি কদীম অনাদি হবে। আল্লাহ তা'আলার জন্য ইচ্ছা গুণটি প্রমাণিত হওয়ার জন্য বিশ্বজগতের শৃংখলা এবং বিস্ময়কর সৃষ্টি তার অস্তিত্বের দলীল। কেননা কেউ ইচ্ছা বিহীন একটি অদ্ভুত জিনিসও আবিষ্কার করতে পারে না, অসংখ্য অদ্ভুত বিষয় আবিষ্কার করা তো দূরের কথা। আল্লাহ তা'আলার জন্য ইচ্ছা প্রমাণিত করার তৃতীয় দলীল হল, বিশ্বজগতের নশ্বরতা। অর্থাৎ যে সত্তা হতে কোন কাজকর্ম তার ইচ্ছা ও ইখতিয়ারে প্রকাশ পায়, তাকে فَاعِل بِالْاِرَادَةِ বা فَاعِل مُخْتَار (স্বাধীন কর্তা) বলে। আর যার থেকে কোন তার ইচ্ছাবিহীন সম্পাদিত হয়, তাকে فَاعِلٌ بِالْاِيْجَاب - عِلَّت مُوْجِبَه فَاعِل مُوْجِب বা বাধ্য কর্তা বলে। যেমন, আগুন জ্বালানো-পোড়ানোর জন্য বাধ্য বা আবশ্যকীয় কারণ। আর مَعْلُوْل কখনো তার عِلَّت مُوْجِبَه বাধ্য বা আবশ্যকীয় কারণ হতে পিছে থাকতে পারে না। অর্থাৎ এমন হতে পারে না যে, عِلَّت مُوْجِبَه বিদ্যমান হওয়া সত্ত্বেও مَعْلُوْل বিদ্যমান হবে না বরং যখনই عِلَّت এর অস্তিত্ব লাভ হবে তখনই مَعْلُوْل ও অস্তিত্ব লাভ করবে। কাজেই আল্লাহ তা'আলা যদি স্বাধীন কর্তা না হন বরং বাধ্য কর্তা হন তাহলে যেহেতু عِلَّت مُوْجِبَه থেকে مَعْلُوْل পিছিয়ে থাকতে পারে না, তাই আল্লাহ তা'আলা যখন থেকে বিদ্যমান তখন থেকে তার مَعْلُوْل তথা নিশ্চিতজগতও বিদ্যমান হবে। আর আল্লাহ তা'আলা তো আদিকাল থেকে আছেন। কাজেই مَعْلُوْل তথা বিশ্বজগত আর এটা তো বাতিল।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ بِنِعْمَتِهٖ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَمَنْ تَبِعَهٗ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ . رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ . رَبَّنَا لَاتُخْزِنَا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ تَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ وَاَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِيْنَ . اٰمِيْن يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ .

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত